সাজঘর

ইন্দ্রগিরি

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

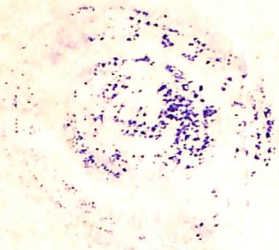

সাজঘর

ইন্দ্রমিত্র (অরবিন্দ ৪২)

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY

ত্রিবেণী প্রকাশন
প্রাইভেট লিমিটেড
২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২



JNAN SANCHAYAN.
জ্ঞান সঞ্চয়ন।
16/3, Gariahat Road, Cal-19

প্রথম সংস্করণ মাঘ ১৩৬৭

প্রকাশক
কানাইলাল সরকার
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

৭৯২ (৫৪৯.২)
ইন্দ্র

মুদ্রাকর
বিজলী ভূষণ ভাদুড়ী
প্রিণ্টেক্স্
৮, নবীন সরকার লেন
কলিকাতা—৩

প্রচ্ছদ
পূর্ণেন্দু পত্রী

84.642

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
চয়নিকা প্রেস

বাঁধাই
তৈফুরআলি মিঞা অ্যাণ্ড ব্রাদাস

দাম ঃ দশ টাকা

পূর্বভাষণ

ভারতবর্ষে নাট্যকলার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি মনোরম উপাখ্যান প্রচলিত আছে।

একদা দেবগণ ব্রহ্মার কাছে চক্ষু ও কর্ণের সমান প্রীতিপ্রদ কোনও বস্তু প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনার ফলেই পঞ্চম বেদের সৃষ্টি হল। চতুর্বেদে কেবল মাত্র দ্বিজগণের অধিকার; কিন্তু পঞ্চমবেদ শূদ্রদিগেরও অধিকারবহির্ভূত নয়।

পঞ্চমবেদ ব্রহ্মার সৃষ্টি। আবৃত্তির যোগ্য ধাতু গৃহীত হয়েছে ঋগ্বেদ থেকে, সঙ্গীতাংশ সামবেদ থেকে, কুশীলবকলা যজুর্বেদ থেকে, রসভাব অথর্ববেদ থেকে। ব্রহ্মার নির্দেশে বিশ্বকর্মা রঙ্গালয় নির্মাণ করলেন। এবং এই নবসৃষ্ট কলার প্রয়োগভার পেলেন ভরত।

শিব দিলেন তাণ্ডবনৃত্য, পার্বতী দিলেন লাস্যনৃত্য। চতুর্বিধ নাটকীয় পদ্ধতি আবিষ্কার করে বিষ্ণু নাট্যকলার প্রবর্তন করলেন। যথাবিহিত আদিষ্ট হয়ে ভরত নাট্যশাস্ত্ররূপ এই পঞ্চমবেদ পৃথিবীতে নিয়ে এলেন।

প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে ভরতই পৃথিবীতে নাট্যের প্রথম সৃষ্টিকর্তা। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ত্রিবিধ রঙ্গালয়ের ব্যবস্থা আছেঃ (১) ১০৮ হাত দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট রঙ্গালয় (কেবলমাত্র দেবতাদের জন্য); (২) ৬৪ হাত দৈর্ঘ্য ও ৩২ হাত প্রস্থ-বিশিষ্ট আয়তাকৃতি (Rectangular) রঙ্গালয় (এই জাতীয় রঙ্গালয়ই জনসাধারণের মনোনীত); এবং (৩) ৩২ হাত দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ত্রিকোণ (Triangular) রঙ্গালয়।

রঙ্গালয়ের একভাগে দর্শকদের উপবেশনস্থান, আরেকভাগে অভিনয়স্থল।

দর্শকদের উপবেশনস্থান স্তম্ভ দ্বারা চিহ্নিত। সম্মুখভাগে শ্বেতবর্ণ স্তম্ভ-চিহ্নিত অংশে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের উপবেশনের অধিকার। তারপর ক্ষত্রিয়দের জন্য ব্যবস্থা—সেখানে রক্তবর্ণের স্তম্ভ। উত্তর-পশ্চিমে পীতবর্ণের স্তম্ভ-চিহ্নিত অংশ বৈশ্যদের জন্য নির্দিষ্ট। উত্তর-পূর্বে নীল-কৃষ্ণ স্তম্ভ-চিহ্নিত অংশে শূদ্রদের অধিকার।

দর্শকদের সম্মুখে ৬৪ বর্গহাতবিশিষ্ট অভিনয়স্থল—নাম 'রঙ্গ'। চিত্র ও মূর্তি দ্বারা রঙ্গ সজ্জিত। রঙ্গের শেষাংশের নাম 'রঙ্গশীর্ষ'। সেই অংশও নানাবিধ মূর্তিতে সজ্জিত।

রঙ্গের পশ্চাতে যবনিকা; নাম 'পটি' বা 'অপটি'। আরও দুই নাম আছে যবনিকার—তিরস্করণী, প্রতিশিরা। যবনিকার অন্তরালে নেপথ্যগৃহ।

যবনিকা সবসময়ে রক্তবর্ণ। মতান্তরে, প্রয়োজনবোধে বিভিন্নবর্ণের যবনিকা ব্যবহৃত হত। আদিরসে শুভ্রবর্ণ, বীররসে পীতবর্ণ, করুণরসে ধূম্রবর্ণ, অদ্ভুতরসে হরিৎবর্ণ, হাস্যরসে বিচিত্রবর্ণ, ভয়ানকরসে নীলবর্ণ, বীভৎসরসে ধূমলবর্ণ, রৌদ্ররসে রক্তবর্ণ। দ্বিখণ্ডে বিভক্ত থাকত যবনিকা। অভিনেতার প্রবেশকালে যবনিকার একেকটি খণ্ড অপসারণের ভার একেকজন সুন্দরী কুমারীর হাতে অর্পিত।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন ঃ

"ইহাতে (ভরতের নাট্যশাস্ত্রে) নাটকের উৎপত্তির কথা আছে। কেমন করিয়া থিয়েটারের বাড়ী তৈয়ার করিতে হয় তাহার কথা আছে। ইহাতে থিয়েটারের অর্দ্ধেকটা প্রেক্ষকদিগের জন্য থাকিত। ইহাতে দোতলা ষ্টেজের কথা আছে। ইহার সিন্‌গুলা নাড়া চাড়া করা যাইত না। সিনের চারি পাশে আঁকা থাকিত। পাশ দিয়া পাত্র প্রবেশ হইত না। ভিতর দিক্ হইতে দু-পাশে দুটি দরজা থাকিত তাহাতে পরদা দেওয়া থাকিত। সেই পর্দ্দা সরাইয়া পাত্র-প্রবেশ হইত। এ বইয়ে ষ্টেজের উপর নাটক আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অনেক জিনিস করিতে হইত। সেগুলিকে পূর্ব্বরঙ্গ বলিত। পূর্ব্বরঙ্গে সূত্রধার আসিয়া প্রথমেই জর্জরের পূজা করিত।

"জর্জর একটা ছেঁচা বাঁশ। তাহার ছেঁচা অংশ বাদ দিয়া ছয়টা পাব থাকিত, প্রত্যেক পাবে ভিন্ন ভিন্ন রং থাকিত। এক এক পাবের এক এক জন দেবতা থাকিত। এই জর্জর হইলেন থিয়েটারের দেবতা। সূত্রধার জর্জরের পূজা করিতেন। তারপর জর্জরকে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইত। তারপর সূত্রধার ষ্টেজের উপর নানা ভঙ্গীতে পায়চারি করিতেন, তাহার নাম "চারি" আর "মহাচারি"; তারপর নান্দীপাঠ।

"সূত্রধার সুস্বরে নান্দীপাঠ করিতেন। নান্দীতে ৮টী কি ১২টী বাক্য (sentence) থাকিত। অথবা ১২টী শ্লোক থাকিত অথবা শ্লোকের ১২টী চরণ থাকিত। এক একটী বাক্য পড়া হইলে পাশে দুজন লোক দাঁড়াইয়া থাকিত। তাহারা বলিত "এই হউক"। নান্দীতে দেবতাদের স্তুতি থাকিত, ব্রাহ্মণদের স্তুতি থাকিত, রাজারও স্তুতি থাকিত। দেশের লোকের মঙ্গল-কামনা হইতে, থিয়েটারের মঙ্গল-কামনা করা হইত। নটনটীদের মঙ্গলকামনা করা হইত। তাহাতে কেবল মঙ্গলের কথাই থাকিত, অমঙ্গলের কথা কিছু থাকিত না। নান্দীপাঠের পর পাত্র-প্রবেশ। এখন যেমন হইয়া থাকে তেমনই হইত। কিন্তু সূত্রধার পাত্র-প্রবেশ করাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িত। মধ্যে অর্থাৎ নান্দীর

পর এবং পাত্র প্রবেশের মধ্যে সূত্রধার প্রেক্ষকদিগের বেশ একটু তোষামোদ করিতেন। কবির গুণের কথা বলিয়া দিতেন এবং দু একটা গান গায়িতেন।

"থিয়েটারের এই বইয়ে নাচের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।···

"থিয়েটারের এই বইয়ে কিরূপ পাত্রকে রাজা করিতে হইবে, রাণী করিতে হইবে, বিদূষক করিতে হইবে, চাকর করিতে হইবে, তাহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপ বিবরণ দেওয়া আছে। তারপর রং করার কথা আছে।···

"নাটকের প্রকৃতি বলিয়া একটা জিনিস ছিল। কোন দেশের লোক নাটকের নাচ দেখিতে ভাল বাসিত। কোন দেশের লোক গান শুনিতে ভাল বাসিত, কোন দেশের লোক অভিনয় ভাল বাসিত। কোন দেশের লোক বক্তৃতাকেই ভাল বলিত।··· নাট্যশাস্ত্রের সব শেষ অধ্যায়ে আছে সিদ্ধির কথা ও ঘাতের কথা। ঘাত মানে যাহাতে রসভঙ্গ হয়। আর সিদ্ধি মানে যাহাতে রস জন্মে।··· সিদ্ধির পরই নাট্যশাস্ত্র একরকম শেষ হইয়া গেল। এইটাই ভরত নাট্যশাস্ত্রের ২৭ অধ্যায়। ২৮ হইতে বাজনার কথা আরম্ভ হইল। বাজনা কয় রকম, কোন্ রসে কোন্ বাজনা ভাল লাগিবে, কোন্ সময়ে কোন্ বাজনা লাগাইতে হইবে,—তার গানের কথা, সুরের কথা, পুরা দস্তুর সঙ্গীত শাস্ত্রের কথা। ৩৬ ও ৩৭ অধ্যায়ে নাট্য-শাস্ত্রের নট ও নটিদের, উৎপত্তি ও বিবরণ—নাট্যশাস্ত্রের একটু ইতিহাস এবং শেষ ফলশ্রুতি।···"

('পঞ্চপুষ্প', আষাঢ়, ১৩৩৬)

বৈদিকযুগের ভারতে নৃত্য, গীত, রঙ্গভঙ্গী ইত্যাদির যথাযোগ্য উল্লেখ আছে, কিন্তু নাটকের অস্তিত্বের কোনও উল্লেখ নেই। বৈদিকসাহিত্যে কুত্রাপি 'নট' শব্দের প্রয়োগ নেই।

যজুর্বেদে অবশ্য 'শৈলূষ' শব্দটি আছে, এবং সেখানে 'নট' শব্দের সমার্থকরূপেই 'শৈলূষ' ব্যবহৃত; বাজসনেয়-সংহিতায় লিখিত আছে: নৃত্তায় সূতং গীতায় শৈলূষং ধর্ম্মায় সভাচরং। মহাভারতে 'নট' শব্দের উল্লেখ আছে; কিন্তু সেই 'নট' শব্দ অভিনেতা অর্থেই ব্যবহৃত কিনা, সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহে কোনও উচ্চারণ অসঙ্গত। রামায়ণে 'নট' উল্লিখিত।

নাট্যাভিনয়ে যাঁরা অংশগ্রহণ করেন, তাঁরা 'কুশীলব' নামে পরিচিত। রামের পুত্র কুশ ও লব রামের কাহিনী গান গেয়ে সাধারণ্যে প্রচার করতেন; কেউ-কেউ বলেন, তাঁদের নাম থেকেই 'কুশীলব' শব্দটি উদ্ভূত। মতান্তরে, 'কুশীলব' শব্দটি 'কু (মন্দ) শীল (আচরণ)' থেকে নিষ্পন্ন। এই দুই বিভিন্ন মতের সমন্বয়ে আরও একটি মত প্রচলিত: 'কুশীলব' শব্দটি মূলত রামপুত্র কুশ ও লবের নাম থেকেই ব্যুৎপন্ন; হয়তো পরবর্তীকালে নটদের চারিত্রিক অবনতির প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যেই শব্দটি নবভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

পাণিনি নট' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। পাণিনি আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ কিম্বা পঞ্চম শতাব্দীর বৈয়াকরণ। শিলালিন্ ও কৃশাশ্ব নামক দুজন নটসূত্রকারের কথা পাণিনি উল্লেখ করেছেন। 'পারাশর্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ।' 'কর্ম্মন্দকৃশাশ্বাদিভিঃ।'

একথা সর্ববাদীসম্মত যে ভরত পাণিনির পরবর্তী। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' সম্ভবত দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় শতাব্দীতে বিরচিত। অবশ্য পরবর্তীকালে 'নাট্যশাস্ত্রে' অংশবিশেষ প্রক্ষিপ্ত। ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দে লিখেছেন ঃ

"That he (Bharata) is the oldest writer on dramaturgy, music and kindred subjects, whose work has survived, is generally admitted ; but at the same time the question arises as to how far the extant version of his work represents his original text. As there are indications that it has been subjected to considerable rehandlings in later times before it assumed its present shape, this question has an importrnt bearing on the date of the supposed author.

There are several passages in the present-day text which probably throw some light on this process of gradual interpolation and recasting. ...

The process of incorporation must have occurred very early and was apparently complete by the end of the 8th century, when the work assumed more or less its present shape."

(Pages 23-24 and 26, Studies in the History of Sanskrit poetics, Vol. I)

ভরতের উক্ত অনুসারে নটের সংজ্ঞা ঃ

নট ইতি ধাত্বর্থভূতং নাটয়তি লোকবৃত্তান্তং
রসভাবসংযুক্তং যস্মা ৎ তস্মাৎ নটো ভবেৎ।

অর্থাৎ রসভাবসংযুক্ত লোকবৃত্তান্ত যিনি অভিনয় করেন তিনি নট।

ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে ভারতীয় নাটক ও নাট্যশালার উৎপত্তি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত করা চলে না। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে ভরতের নাট্যশাস্ত্র রচনার পূর্বকালে ভারতীয় নাটক ও নাট্যশালার অস্তিত্ব ছিল। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত সিদ্ধান্ত করেছেন ঃ

"By the 2nd century B. C. there were actually the stage or the *ranga* where the *natas* imitated the actions of the legendary heroes and that their performances included prose speeches at least....Dramas were probably

in existence in the 5th or 6th century B.C." [page-640, A History of Sanskrit Literature (Vol. I)]

বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত। কামসূত্রে 'গীতম্,,' 'বাদ্যম্', 'নৃত্যম্', 'নাটকাখ্যায়িকা-দর্শনম্' ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার সেকালের নাট্যাভিনয়ের অস্তিত্বের কথা আমাদের জ্ঞানগোচর করে।

প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে নাট্যরঙ্গের উল্লেখ দুর্লভ নয়। যেসময়ে ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহে উপস্থিত, তাঁর দুই শিষ্য—মৌদ্গাল্যায়ন ও উপতিষ্য—সর্বসমক্ষে অভিনয় করেছিলেন।

সংস্কৃত নাটকাদিতে নটনটীর বহুল উল্লেখ আছে। কথা, দেশ, বৃত্তি, ভাব ও রসাদি চতুর্বিধ অভিনয় দ্বারা প্রদর্শিত হলে, মনীষীরা তাকে 'নাট্য' বলেছেন। "নাটকাদি কথা দেশ বৃত্তি ভাব রসাশ্রয়ং। চতুর্দ্ধাভিনয়োপেতং নাট্যমুক্তং মনীষিভীঃ॥" অভিনয় চতুর্বিধ—বাচিক, আহার্য, সাত্বিক, আঙ্গিক। তন্মধ্যে বাচিক অভিনয়ই শ্রেষ্ঠ বলে কথিত। "চতুর্দ্ধাভিনয়ঃ সঃ স্যাৎ বাচিকাহার্য্যসাত্বিকাঃ। আঙ্গিকশ্চেতি তন্মধ্যে বাচিকঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥" এবং 'অভিনয়' শব্দটি 'অভি' উপসর্গপূর্বক 'নিঞ্' ধাতু থেকে উৎপন্ন। "অভিপূর্ব্বস্তু নিঞ্ ধাতুরাভিমুখ্যার্থ নির্ণয়ে। যস্মাৎ প্রয়োগং নয়তি তস্মাদভিনয়ঃ স্মৃতঃ।" নটচর্যা সামান্য নয়। "নানাণি রূপাণি মনোবচোভিঃ সংতন্বতো নটচর্য্যামিবাস্য।"

শতাব্দীর পর শতাব্দী ভারতবর্ষ নাট্যকলার সাধনা করেছে। বিপুল গৌরব অর্জন করেছে।

ভারতীয় নাট্যকলায় গ্রীক নাট্যকলা প্রভাব বিস্তার করেছিল কি না, সে-বিষয়ে পণ্ডিতেরা বিস্তর বাদানুবাদ করেছেন। কিন্তু অদ্যাবধি কোন সর্বজনসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন; ভারতের যে-অংশে তিনি অধিকার বিস্তার করেছিলেন, সেখানেই গ্রীক নাটক অভিনীত হত। স্বয়ং আলেকজাণ্ডার অভিনয়প্রিয় ছিলেন। A. B. Keith লিখেছেন :

"We know indeed that Alex ander was fond of theatrical spectacles with which he amused himself in the intervals allowed by his victories, and we hear that at Ekbatana there were no fewer than three thousand Greek artists who had come from Greece.....We need not doubt...the existence of

performances of Greek dramas throughout the provinces which formed the Empire of Alexander ;....."

[Page-59, The Sanskrit Drama (Reprinted Lithographically 1954)]

খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে মিনাণ্ডারের শাসনকালেই ভারতে গ্রীক প্রভাব সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। সব দিক থেকে বিচার করলে মনে হয় ভারতীয় নাট্যমঞ্চে কিঞ্চিৎ গ্রীক প্রভাব হয়তো নিতান্ত অসম্ভব নয়। কিন্তু এ-বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণের অনুপস্থিতিতে সাধারণভাবে স্বীকার করা যেতে পারে যে, ভারতীয় নাট্যমঞ্চ মৌল ও দেশজ। E. P. Horrwitz লিখেছেন ঃ

'The Indian theatre is home-grown, and not a foreign-graft.' (Page, 77 'The Indian Theatre,')

সেকালে নটের সামাজিক সম্মান উচ্চশ্রেণীস্থ ছিল না। কথিত আছে, সেকালের নটেরা স্বেচ্ছায় আপন পত্নীদের ঘৃণ্য ব্যবসায়ে পণ্য করতেন। নটীদের সতীত্ববোধ খুব প্রখর ছিল, এমন কথা উচ্চারণ করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। বিচারালয়ে নটের সাক্ষ্যের কোন মূল্য ছিল না। ব্রাহ্মণেরা নটের অন্ন গ্রহণ করতেন না। কিন্তু সেকালের নটনটীদের বন্ধুভাগ্য ঈর্ষাযোগ্য। একজন নট এবং একজন নটীর সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা বাণভট্ট 'হর্ষচরিতে' উল্লেখ করেছেন। ভর্তৃহরি এবং অন্যান্য স্মরণীয় লেখকদের রচনা থেকে আমরা জানতে পারি রাজারা নটনটীদের সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ থাকতেন। ভবভূতি নটদের সঙ্গে আপন বন্ধুত্বের কথা অসঙ্কোচে ব্যক্ত করেছেন।

প্রচীন ভারতে নারীর ভূমিকায় নারীর অভিনয়ই সাধারণ নিয়ম। ব্যতিক্রম-স্বরূপ অবশ্য কখনও কখনও নারীরা পুরুষের ভূমিকায় এবং পুরুষেরা নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। নাট্যাভিনয়ে যাতে কোন অশ্লীলতা প্রশ্রয় না পায়, সে-বিষয়ে প্রাচীন ভারত সতর্কচক্ষু। রঙ্গস্থলে শয়ন বা চুম্বন-আলিঙ্গন বিশেষ-রূপে নিষিদ্ধ। "ন কার্য্যং শয়নং রঙ্গে নাট্যধর্ম্মং বিজানতা॥" "যদা স্বপেদর্থবশাদেকাকী সহিতোঽপি বা। চুম্বনালিঙ্গনং চৈব তথা গুহ্যং চ যদ্ভবেৎ॥... রঙ্গমধ্যে ন কারয়েৎ॥"

নাটক ও নাট্যমঞ্চ তো বটেই, প্রাচীন ভারতে অভিনয়ের জন্যে উপযুক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেরও অস্তিত্ব ছিল। শিক্ষার্থীরা সেখানে আচার্যদের কাছে অভিনয় বিদ্যায় শিক্ষার্জন করতেন। দীর্ঘকালের সাধনার ফলে ভারতবর্ষ নাট্যকলা সম্পর্কিত নানা সত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। তিনঘণ্টার (অর্থাৎ, এক

যামের) অধিককালব্যাপী একটি নাট্যাভিনয় যে দর্শকদের নাট্যানুরাগ বর্ধন করে না, পরম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি, এ-সত্যও নিতান্ত আধুনিককালের আবিষ্কার নয়। 'সঙ্গীত দামোদরে' উল্লিখিত আছে ঃ যামমাত্রসমাপ্যং যত্তন্নাট্যং রাগবর্দ্ধনম্। দীর্ঘং বিরাগজননমতস্তৎ পরিবর্জয়েৎ ॥

কিন্তু এই গৌরবময় নাট্যকলার ধারা একদিন অধঃপতিত হল। মুসলমানদের ধারাবাহিক আক্রমণ ও ভারত-জয় নিঃসন্দেহে ভারতীয় নাট্যকলার অধঃপতনের কারণ। কালক্রমে ভারতীয় নাট্যকলার ধারা স্তিমিত হয়ে এল। এ-বিষয়ে A. B. Keith লিখেছেন ঃ

"When such dramatic exhibitions became rare we do not know ; it is certain that in the eleventh century in Kashmir they were not uncommon ;... Doubtless the Mahomedan conquest seriously affected the vogue of the classical drama, which was obnoxious to Mahomedan fanaticism as being closely identified both with the national religion and the national spirit of India. The kings, who had been the main support of the actors and poets alike, disappeared from their thrones or suffered grave reverses in fortune."

[Page-371, The Sanskrit Drama (Reprinted Lithographically 1954)]

ভারতে মুসলমান প্রভুত্ব নিশ্চয়ই ভারতীয় নাট্যমঞ্চের অধঃপতনের কারণ, কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। মুসলমান আক্রমণের আগে থেকেই নাটকে—তথা সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে—অবক্ষয়ের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ-বিষয়ে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লিখেছেন ঃ

"The decline had already commenced widely even before the foreign occupation became an actual fact. The drama lost all contact with real life and became an abstract thing of fancy, not as a consequence of external disturbances, but because the really creative period of Sanskrit literature in almost all its aspects closed with the 10 th century. The period ended with the standardisation of the forms and methods of the dramatic, as well as the poetic, art ; and though much was produced thereafter, there was nothing of real merit. The standard patterns were already there, and with a fund of ready-made words and ideas, it was not difficult for the proverbial prolixity of bad writers to turn out poems and dramas in vast number.

But the vein of originality had exhausted itself, and the foerign incursion never brought in its train any vigorous dramatic literature which might have furnished the much needed impetus towards a revival. The foreign occupation, therefore, which was necessarily a slow and diffused process, could not save it from stagnation, and perhaps hastened the decline, but it was never responsible for a state of things which had commenced, independently and much beforehand, from causes inherent in the literature itself.

The history of the Sanskrit drama, therefore, does not close with the 10th century, but it loses genuine interest thereafter....."

(Pages 447—448, A History of Sanskrit Literature, vol. 1)

নাটকের এই হীনাবস্থা নিঃসন্দেহে নাট্যমঞ্চে সংক্রামিত। এবং তারই অনিবার্য ফলস্বরূপ কালক্রমে ভারতীয় মঞ্চাভিনয়ের ধারা গতপ্রাণ হয়ে গেল।

অতঃপর ভারতীয় নাট্যমঞ্চের ইতিহাস অনুসন্ধানের আগে একবার ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভ হল। একথা অনস্বীকার্য যে ইংরেজের মধ্যবর্তিতায়ই আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছি। বাঙলা নাট্যকলা সেই পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙলাদেশের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অন্যতম ফসল। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার সঙ্গে তার সম্পর্ক সুদূরতম।

স্যার যদুনাথ সরকার লিখেছেন ঃ

"আজ আমরা নাটক ও থিয়েটার বলিতে যাহা বুঝি তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি। নব্য বাঙ্গালীরা খাটিয়া খাটিয়া চেষ্টা ও পরীক্ষা করিয়া তবে এই দুটিকে বর্ত্তমান আকারে আনিতে পারিয়াছে, এবং সমগ্র ভারতকে, অপরাপর সমস্ত প্রাদেশিক ভাষাকে এ দুটি দান করিয়াছে।..."

('ভারতবর্ষ', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১)

আধুনিক ভারতীয় নাট্যকলার ইতিবৃত্তে বাঙলাদেশের দাবি প্রথম ও প্রধান। অদ্যাবধি কলকাতার বাইরে ভারতের আর কোন শহরে সম্ভবত নিয়মিতভাবে সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় অনুষ্ঠিত হয় না। Faubion Bowers যথার্থ লিখেছেন ঃ

"Calcutta is the only city of India which has and still consistently maintains professional troupes of actors and theatres for them to appear in. And for this reason the Bengalis have a right to claim the most advanced theatre of India." [Page-65, Theatre in the East (1956)]

বাঙলা নাট্যশালার ইতিহাস বহুবিচিত্র। বাঙলা নাট্যশালার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী রূপে সংশ্লিষ্ট প্রধান নাট্যশিল্পীদের জীবনের ইতিহাসেও বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। কিন্তু, যতদূর জানি, বাঙলার নাট্যশালা ও প্রধান নাট্যশিল্পীদের জীবনের সুখ-দুঃখ, গৌরব-অগৌরব, নিন্দা-প্রশংসা, পতন-অভ্যুদয়ের একটি সম্মিলিত ও সামগ্রিক চিত্ররচনার প্রয়াস অদ্যাবধি কেউ করেন নি। আপন অযোগ্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েও আমি অতএব এই কর্মে আমার জীবনের কয়েকটি বৎসর সানন্দে নিবেদন করেছি। এই প্রচেষ্টা আমার পক্ষে নিঃসন্দেহে দুঃসাহসের পরিচায়ক। বাঙলার নাট্যশালা ও প্রধান নাট্যশিল্পীদের প্রতি আমার অকুণ্ঠ ভালোবাসাই হয়তো আমার মত অযোগ্যকেও এই দুঃসাহসিক কর্মে প্ররোচিত করেছে।

পুরনো তথ্যের সূক্ষ্ম-পরীক্ষণে ও নতুন তথ্যের সযত্ন-সন্ধানে আমি তিলতম কার্পণ্য করিনি। এই গ্রন্থের অন্তর্গত ঘটনাবলী তো বটেই, কথোপকথনের প্রতিটি অংশ পর্যন্ত ঐতিহাসিক প্রমাণসিদ্ধ; একটি বর্ণও আমার স্বকপোল-কল্পনায় ফল নয়। তথ্যের বিশুদ্ধতা আমার একান্ত কাম্য। পূর্ববর্তী লেখকদের রচনা ও সাময়িকপত্রাবলীর সংবাদাদি থেকেই আমি সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছি, কিন্তু কোন তথ্যই নির্বিচারে গ্রহণ করি নি। 'সাজঘরে'র প্রতিটি তথ্য যাতে ভ্রান্তি হীন হয়, সেদিকে আমি যথাসাধ্য সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি।

পূর্ববর্তী লেখকদের বাঙলা নাট্যশালা ও গিরিশচন্দ্র সম্পর্কিত রচনায় তথ্যের কী পরিমাণ অতলান্ত ভ্রান্তি প্রশ্রয় পেয়েছে, প্রসঙ্গত তার একটি উদাহরণ প্রদান করি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম গিরিশ-অধ্যাপক শ্রীকুমুদবন্ধু সেন লিখেছেন;

বঙ্কিম গিরিশকে লিখিয়াছিলেন, "আপনি সুলেখক ও উৎকৃষ্ট বোদ্ধা, আপনার যত্নে আমার রচনা আশাতীত সফলতা লাভ করিবে ইহা আমি খুব ভরসা করি—ইতি," শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[পৃষ্ঠা—২৪০, গিরিশচন্দ্র' (দ্বিতীয় সংস্করণ)]

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকজন গিরিশ-অধ্যাপক ডক্টর শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করিতেন যে গিরিশবাবু ভিন্ন তাঁহার উপন্যাসের কেহ যথার্থ রূপ দিতে সক্ষম হইবে না। এই বিষয়ে তিনি নিজে গিরিশবাবুকে একখানি সুন্দর মর্ম্মে পত্রও লেখেন।···পত্রখানির খানিকাংশ আপনাদের কাছে বিবৃত করিতেছি। "আপনি সুলেখক এবং উৎকৃষ্ট বোদ্ধা, আপনার হাতে আমার উপন্যাস যথার্থ আদর পাইবে, আমি বিশ্বাস করি।"···গিরিশবাবুও নিশ্চয়ই এই পত্রের উত্তর লেখেন।

[পৃষ্ঠা-১১৯-১২০, ভারতীয় নাট্যমঞ্চ (দ্বিতীয় খণ্ড)

লক্ষণীয়, ভাবে মিল থাকলেও, দুজনের উদ্ধৃত পত্রাংশের ভাষা বিভিন্ন। এবং দুজনের তথ্যই শোচনীয়রূপে অশুদ্ধ। যে-পত্রের অংশ তাঁরা ব্যবহার করেছেন, তা বঙ্কিমচন্দ্রেরই লেখা বটে, কিন্তু গিরিশচন্দ্রকে লেখা নয়, বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রখ্যাত সমালোচক গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরীকে লেখা। গিরিজা-প্রসন্নের 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় উক্ত পত্রখানা মুদ্রিত আছে। যে-কোন কৌতূহলী পাঠক অনায়াসে আমার উক্তির সত্যাসত্য যাচাই করে দেখতে পারেন।

ইতিহাসের একটি নিষ্করুণ সত্য এই যে বাঙলা নাট্যশালা বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে প্রীতিপ্রদ হয়ে উঠতে পারে নি।

'মৃণালিনী' ১৮৬৯ সালের নভেম্বরে প্রথম প্রকাশিত। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় 'মৃণালিনী'র সর্বসাকল্যে দশটি সংস্করণ হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী কালে প্রকৃতপক্ষে 'মৃণালিনী'কেই সর্বাধিক পরিবর্তিত, পরিবর্জিত ও সংশোধিত করেছেন।

সপ্তম সংস্করণের 'মৃণালিনী' সম্পর্কে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন, 'বইটে নাটক ও ভাষাংশে আগেকার চেয়ে ভাল হইয়াছে বটে...।'

(পৃষ্ঠা—১৯০, 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ')

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন ঃ

আমি বলিলাম, "আমার বোধ হয় যেন আপনার নাট্য-সৃষ্টির শক্তি এখন বাড়িতেছে। বঙ্কিমবাবু —"হাঁ,...চন্দ্রবাবুও তাই বলেন, আমার নিজেরও তাই বোধ হয়। মৃণালিনীর নূতন সংস্করণ আগাগোড়া প্রায় নাটক। থিয়েটারে আমার বইয়ের যে দুর্দশা করা হইয়াছে, তাহা দেখিয়া ওরূপ করিতে আমার ইচ্ছা হয়েছিল।" আমি বলিলাম, এইবার কেন একবার নাটক লিখিতে চেষ্টা করুন না ?" উত্তর—"লিখিব কার জন্য ? তেমন শ্রোতা নাই অভিনেতা নাই তারপর নাটকের ভাষা এখনও হয় নাই।"...

(পৃষ্ঠা-১৯১, 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ')

শ্রীশচন্দ্রের উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয়, বাঙলা নাট্যশালায় আপন উপন্যাসের নাট্যরূপের অভিনয় বঙ্কিমচন্দ্রকে হতাশ করেছে, বাঙলা নাট্যশালার অভিনেতা বঙ্কিমচন্দ্রের তুষ্টিসাধনে ব্যর্থ হয়েছেন।

কেবলমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র নন, বাঙলার সাধারণ রঙ্গালয় সম্পর্কে, অন্ততপক্ষে ১৯২৭ সালের প্রথমার্ধে, রবীন্দ্রনাথও উচ্চ ধারণা পোষণ করেন নি। সেসময়ে

বাঙলার সাধারণ রঙ্গালয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, অন্যের ভাষায় লিপিবদ্ধ তার সারমর্ম, উদ্ধার করি ঃ

"যে-ভাবে এখন সাধারণ রঙ্গালয় চলছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। যাঁর মনে রসবোধ ও কলাজ্ঞান আছে সেখানে গিয়ে তাঁর প্রাণ কিছুতেই তিষ্ঠুতে পারবে না।

সর্ব্বসাধারণের জন্যে নয়—যাঁরা ললিতকলার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে চান—তাঁদের জন্যে কি বাংলাদেশে একটি অতিরিক্ত রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করা চলে না?

সাধারণ রঙ্গালয়ে হপ্তায় অনেকবার ক'রে অভিনয় হয়, এই অতিরিক্ত রঙ্গালয়ে তা হবে না।

সাধারণ রঙ্গালয়ের শিল্পীরা দিনের পর দিন ধ'রে দীর্ঘকাল একই নাটকে একই ভূমিকায় নামতে বাধ্য হন। মানুষ কলের পুতুল নয়, প্রকৃত শিল্পীর প্রাণ এই একঘেয়ে জীবনের ভিতরে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত রঙ্গালয়ে কোন নাটকই দীর্ঘকাল ধ'রে চালানো হবে না।

এমন একটি অতিরিক্ত রঙ্গালয় অবশ্য সর্ব্বসাধারণের সাহায্যে চলতে পারে না। এজন্যে কয়েকজন গুণগ্রাহী রসিকের সাহায্য আবশ্যক। দেশে এমন দুশো লোক খুঁজলে নিশ্চয়ই পাওয়া যায় মাসে যাঁরা দশ টাকা ক'রে দর্শনী দেবেন। তার উপরে অন্যান্য দর্শকের কাছ থেকেও সাহায্য পাওয়া যাবে। তাতেই অতিরিক্ত রঙ্গালয়ের ব্যয় সংকুলান হবে।

অতিরিক্ত রঙ্গালয় আকারে খুব বড় না হ'লেও চলবে কারণ সেখানে যাঁদের মিলনক্ষেত্র হবে তাঁরা সকলেই বাছা বাছা লোক। সেখানকার আসনাদির ব্যবস্থা হবে সমস্তই উচ্চশ্রেণীর উপযোগী।

পাশ্চাত্য দেশে "লীট্‌ল্ থিয়েটার" নামে যে প্রেক্ষাগারগুলি আছে এই অতিরিক্ত রঙ্গালয় সেই আদর্শেই প্রতিষ্ঠিত হবে।

সাধারণ রঙ্গালয় দর্শকদের মুখ চেয়ে যেমন চলচে চলুক, অতিরিক্ত রঙ্গালয়ের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই থাকবে না।

এখানে যে-সব নাটক নির্ব্বাচিত হবে, কলারসিকের উন্নত মনে তা ভাবের রেখাপাত করতে পারবে। সর্ব্বসাধারণের উপযোগী নয় ব'লে যে-সব উচুদরের নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অচল, এখানে আনায়াসেই সেই সব নাটকের অভিনয় সম্ভব হবে।

এমন রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হ'লে আমাদেরও অভিনয় দেখতে সাধ হয় এবং মনের ভিতরে নাটক লেখবারও ইচ্ছা জাগে।"

('নাচঘর', ৩-জুন, ১৯২৭ সাল)

নাট্যকারের মনের ভিতরে নাটক-রচনার ইচ্ছা জাগানো রঙ্গালয়ের অন্যতম দায়িত্বের অন্তর্গত কি না, আপাতত আমি সে-প্রসঙ্গে প্রবেশ করতে অনিচ্ছুক। কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের উক্তির উপরে নির্ভর করে বলি, বাঙলার নাট্যশালা রবীন্দ্রনাথের মনে নাটক রচনার প্রেরণা সঞ্চার করতে পারে নি।

রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কখনও-কখনও আপন চিন্তা ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতানুসারে অভিনয়বিদ্যা নিতান্ত পরাশ্রিতা,

নাটকের মুখাপেক্ষী, নাট্যোক্ত সংলাপ অভিনেতার পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু অভিনেতা চিত্রকরেরও মুখাপেক্ষী হবেন, তা রবীন্দ্রনাথের অনভিপ্রেত। নাট্যমঞ্চে দৃশ্যপটের ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের তিলমাত্র সমর্থন নেই। বিংশ-শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ 'রঙ্গমঞ্চ' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

"বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য ; তাহাতে লক্ষ্মীর পেঁচাই সরস্বতীর পদ্মকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে।···বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাড়া করিতে হইবে এবং স্ত্রীচরিত্র অকৃত্রিম স্ত্রীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে, এইরূপ অত্যন্ত স্থূল বিলাতি বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।" (পৃষ্ঠা ২০-২১, 'বিচিত্র প্রবন্ধ')

দৃশ্যপট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীকালেও অপরিবর্তিত থেকেছে। ১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষী। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত।···অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান্, প্রাণবান্, গতিশীল ; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত ; অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থানু ; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সঙ্কীর্ণ করে রাখে। মন যে-জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েচে, পূর্ব্বে ছিল না। আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালা-গানে লোকের ভিড়ে স্থান সঙ্কীর্ণ হয় বটে কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সঙ্কীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে-নাট্য-অভিনয়ে আমার কোনো হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানুষীকে আমি প্রশ্রয় দিইনে।···"
(পৃষ্ঠা-৵০-৶০, 'তপতী')

কেবলমাত্র মঞ্চশিল্পে নয়, অভিনয়েও রবীন্দ্রনাথ আতিশয্যের বিরোধী, সংযমের পক্ষপাতী। অভিনয়েও রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য বাস্তব নয়, সত্য ; বাহিরের রূপ নয়, অন্তরের রূপ। 'অন্তর বাহির' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

"অভিনয়-জিনিসটা যদিও মোটের উপর অন্যান্য কলাবিদ্যার চেয়ে নকলের দিকে বেশি ঝোঁক দেয়, তবু তাহা একেবারে হরবোলার কাণ্ড নহে। তাহাও স্বাভাবিকের পর্দা ফাঁক করিয়া তাহার ভিতর দিকের লীলা দেখাইবার ভার লইয়াছে। স্বাভাবিকের দিকে বেশি ঝোঁক দিতে গেলেই সেই ভিতরের দিকটাকে আচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়। রঙ্গমঞ্চে প্রায়ই দেখা যায়, মানুষের হৃদয়াবেগকে অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইবার জন্য অভিনেতারা কণ্ঠস্বরে ও অঙ্গভঙ্গে জবরদস্তি প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি সত্যকে প্রকাশ না করিয়া সত্যকে নকল করিতে চায় সে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার মতো বাড়াইয়া বলে। সংযম আশ্রয় করিতে তাহার সাহস হয় না। আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যহই মিথ্যাসাক্ষীর সেই গলদ্ঘর্ম ব্যায়াম দেখা যায়। কিন্তু, এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলাম

বিলাতে। সেখানে বিখ্যাত অভিনেতা আর্ভিঙের হ্যাম্‌লেট ও ব্রাইড অফ লামার্মুর দেখিতে গিয়াছিলাম। আর্ভিঙের প্রচণ্ড অভিনয় দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। এরূপ অসংযত আতিশয্যে অভিনেতব্য বিষয়ের স্বচ্ছতা একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে; তাহাতে কেবল বাহিরের দিকেই দোলা দেয়, গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করিবার এমন বাধা তো আমি আর কখনো দেখি নাই।

আর্ট জিনিসটাতে সংযমের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি।···সংযমের দ্বারা তাহা আমাদিগকে অন্তরের গভীরতার মধ্যে লইয়া যাইবে, এই তাহার সত্য লক্ষ্য।" (পৃষ্ঠা ৭৪-৭৬, 'পথের সঞ্চয়')

বর্তমান গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত নন। সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের নটজীবন আমাদের পরিপূর্ণ অভিনিবেশ দাবি করে। রবীন্দ্রনাথ শৌখিন নাট্যশিল্পী; তাঁর প্রথম মঞ্চাবতরণের কয়েক বছর আগেই বাঙালীর সাধারণ রঙ্গালয় জন্মগ্রহণ করেছে। বাঙালীর সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্মলাভের পর যেসব শৌখিন নাট্যশিল্পী মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেছেন তাঁদের বিষয়ে আমি সাধারণত নিঃশব্দ থেকেছি। কেবলমাত্র বিরল ব্যতিক্রম হিসেবে দু-এক জায়গায় অনিবার্যভাবে রবীন্দ্রনাথের নট-জীবনের প্রসঙ্গ প্রবেশ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যকলা সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা বহুবার মূর্ত হয়ে উঠেছিল শান্তিনিকেতনের রঙ্গমঞ্চে। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী লিখেছেন ঃ

"বাংলাদেশের আধুনিক কালের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস লিখিতে গেলে শান্তিনিকেতনের রঙ্গমঞ্চকে বাদ দেওয়া চলিবে না। এবিষয়ে দেশের রুচি যেটুকু ঘুরিয়াছে, তাহার মূলে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আইডিয়া শান্তিনিকেতনের রঙ্গমঞ্চ ও অভিনেতাদের মধ্য দিয়াই কাজ করিয়া চলিয়াছিল। রঙ্গমঞ্চের দু-একটা নূতনত্বে যুগান্তর, বিপ্লব এই রকম ধুয়া কয়েক বছর আগে কলিকাতা শহরে উঠিয়াছিল, সে সবই প্রায় শান্তিনিকেতনের রীতির ক্ষীণ অনুকরণ—সেইজন্যে কলিকাতার ব্যাপারে আমরা নূতন কিছু দেখি নাই—বরঞ্চ পুরাতন রীতি লইয়া এত হৈচৈ দেখিয়া কলিকাতার ক্ষুদ্রতায় বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম।" (পৃষ্ঠা—৭৪, 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন')

নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথের মহিমা সামান্য নয়; কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এ-পর্যন্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'শৌখিন নাট্যকলায় রবীন্দ্রনাথ' ছাড়া রবীন্দ্রনাথের নটজীবন সম্পর্কে দ্বিতীয় কোন উল্লেখযোগ্য স্বতন্ত্র আলোচনাগ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের নটজীবন সম্পর্কে অনতিবিলম্বে অন্ততপক্ষে একখানা তথ্যসমৃদ্ধ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থরচনার দায়িত্ব পালন করা আমাদের অন্যতম সাংস্কৃতিক অবশ্যকৃত্য।

বর্তমান গ্রন্থ শিশিরকুমারের প্রসঙ্গে পরিসমাপ্ত। আমি ভুলি নি, শিশির-কুমারের পরেও বাঙলা নাট্যশালায় একাধিক শক্তিশালী নাট্যশিল্পী আবির্ভূত

হয়েছেন এবং বাঙলা নাট্যশালার ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায় সংযোজিত করেছেন। বাঙলার নাট্যশালার ইতিহাসের পটভূমিকায় সেই সব নাট্যশিল্পীর সম্পর্কে এ-গ্রন্থে আশানুরূপ উচ্চারণ নেই। এ-বিষয়ে ভবিষ্যতে একখানা স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থরচনার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি।

বাঙালীর রঙ্গালয়ে প্রথম টিকিট বিক্রি করে নাট্যভিনয় প্রদর্শিত হয় ঢাকায়, ১৮৭২ সালের প্রথমার্ধে। কিন্তু সেটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, তার ফলে বাঙলা-দেশে সাধারণ রঙ্গালয় পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, বাঙলাদেশে অবিচ্ছিন্ন নাট্যাভিনয়ের ধারা প্রবাহিত হতে পারে নি। বাঙলা নাট্যশালার ইতিহাসে সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগ আরম্ভ হয়েছে কলকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্ম থেকে। ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত নাটকের নাম 'নীলদর্পণ'।

নানা জনের মুখে শুনেছি, 'নীলদর্পণে' অত্যাচারী উডসাহেবের ভূমিকায় স্বনামধন্য অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর নিপুণ অভিনয় দেখে একদিন স্থানকালপাত্র বিস্মৃত হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর; পায়ের একপাটি চটি তিনি ছুঁড়ে মেরেছিলেন উডসাহেবরূপী অর্ধেন্দুশেখরের গায়ে; এবং অর্ধেন্দুশেখর মহানন্দে বিদ্যাসাগরের পায়ের চটি শিরোধার্য করেছিলেন। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে এই বিষয়টিকে, বহুল প্রচারিত হলেও, আমি ঐতিহাসিক সত্যের মর্যাদা দিতে পারি নি। ('সাজঘরে'র ১৭২-১৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ১৯৬০ সালের ১৩ই নভেম্বরের আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় আলোচনীতে 'বিদ্যাসাগরের চটি ও অর্ধেন্দুশেখর' শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছি যে এটি ঘটনা নয়, রটনা; ঐতিহাসিক সত্য নয়, কিংবদন্তি। নিষ্প্রয়োজনবোধে উক্ত প্রবন্ধটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হল না।

'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-কর্তৃপক্ষের সক্রিয় সহযোগিতার ফলে বর্তমান গ্রন্থে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র-প্রতিলিপির সংযোজন সম্ভব হল। সেজন্যে কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

ইন্দ্রমিত্র

সাজঘর

উৎসর্গ

বাঙলা নাট্যশালার
বিগত আগত ও অনাগত
মুহূর্তমালার উদ্দেশে

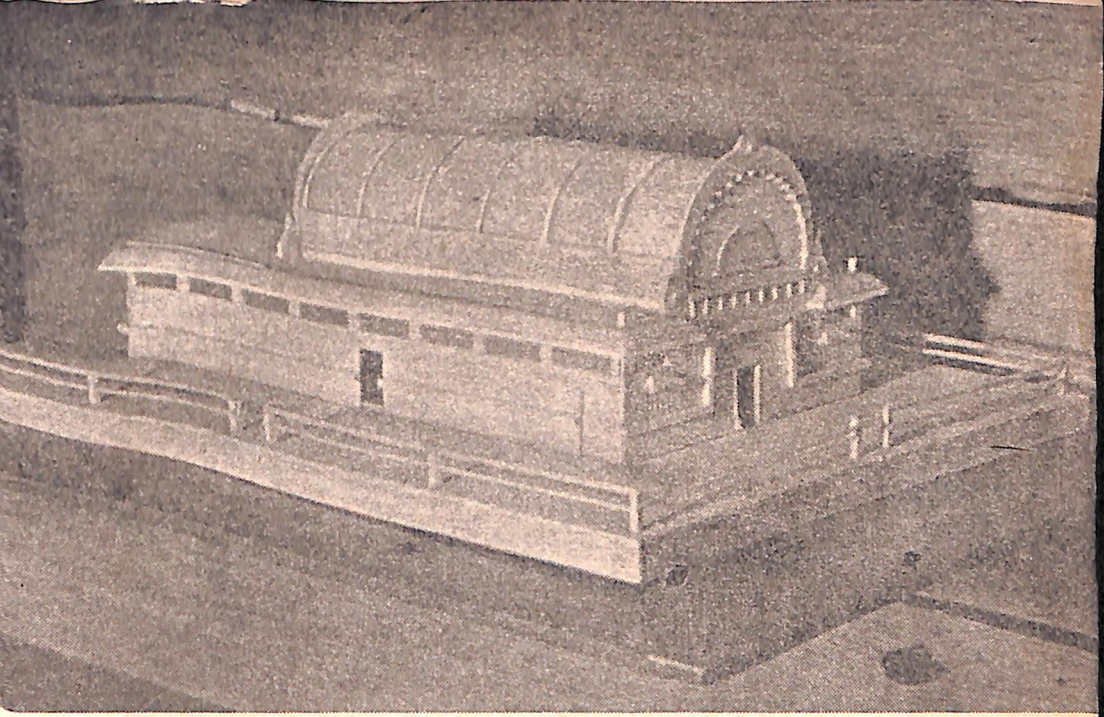

নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশে পরিকল্পিত প্রাচীন ভারতীয় নাট্যগৃহ

★

নতজ্ জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
ন স যোগো ন তৎ কর্ম নাট্যেঽস্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে॥

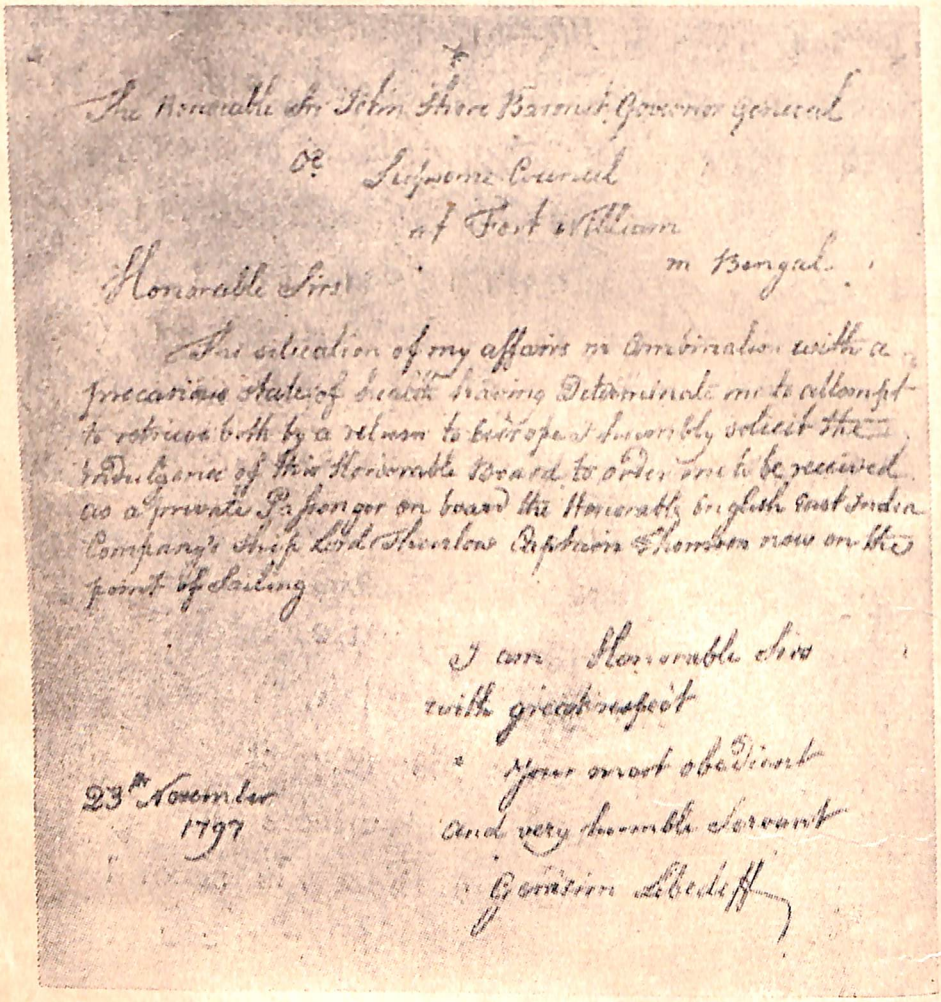

The Honorable Sir John Shore Baronet Governor general
&c Supreme Council
at Fort William
in Bengal.

Honorable Sirs

The situation of my affairs in Combination with a precarious state of health having Determined me to attempt to retrieve both by a return to Europe I humbly solicit the indulgence of this Honorable Board to order me to be received as a private Passenger on board the Honorable English East India Company's Ship Lord Hawkesbury Captain Hamilton now on the point of sailing

I am Honorable Sirs
with great respect
Your most obedient
and very humble Servant
Gerasim Lebedeff

23th November
1797

লেবেডেফের স্বহস্তলিখিত একখানা আবেদনপত্রের প্রতিলিপি

★

এই পত্রে লেবেডেফ নিজের নামের বানান লিখেছেন—Gerasim Lebedeff ; কিন্তু 'Grammar of the pure and Mixed East Indian Dialects' (১৮০১ সালে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত) নামক স্বরচিত গ্রন্থে লেবেডেফ নিজের নামের বানান লিখেছেন—Herasim Lebedeff.

★

এক

—কৃষ্ণ ব্রজপুরী ছেড়ে মথুরায় চলে গেলেন।

সন্ধ্যার পর ছোট ঠাকুরমা গল্প বলছেন। কৃষ্ণের গল্প। কৃষ্ণের মথুরা যাবার গল্প।

অক্রুর রথ নিয়ে এসেছে। সেই রথে উঠেছেন কৃষ্ণ। কিন্তু ব্রজপুরীর কেউ কি কৃষ্ণকে যেতে দিতে চায়? চায় না, গাভীরা ঊর্ধ্বনেত্রে ব্যাকুল-ভাবে কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, রাখাল বালকেরা চোখের জলে আকুল। পাখীদের কাকলি বন্ধ। 'গোপাল আয় রে, গোপাল আয়' বলে ছুটে এসেছেন জননী যশোদা। ব্রজপুরীর মেয়েরা কেউ রথচক্র ধরেছে, কেউ অশ্বের বল্গা ধরেছে, রথের সামনে টান হয়ে শুয়ে আছে কেউ। কৃষ্ণের জন্যে সকলের অন্তরের টান, কৃষ্ণকে কেউ ব্রজপুরী ছেড়ে যেতে দিতে চায় না। গোপ-গোপিনীদের চোখের জলে ব্রজপুরীর পথ পিছল হয়ে উঠলো। কিন্তু নির্দয় অক্রুর কোন আর্তনাদে আর্দ্র হল না, কারও মুখের দিকে তাকাল না, কারও বুকের কান্না শুনল না। রথ চলে গেল। বেদনার পথ দিয়ে আনন্দময় দেশান্তরী হলেন। কৃষ্ণ ব্রজপুরী ছেড়ে মথুরায় চলে গেলেন।

বহুযুগের ওপারের এই বিদায় দৃশ্যের বর্ণনায় করুণ হয়ে উঠল একটি বালকের অন্তরাত্মা। বালকটির নাম গিরিশ। সে বলল—আবার কবে এলেন?

ছোট ঠাকুরমা নিষ্ঠুরের মত বললেন—আবার কবে এলেন কি রে! আর তিনি এলেন না।

বালকের দুই চোখে চিরকালের বেদনার ছায়া পড়ল। কৃষ্ণ আর ব্রজপুরীতে এলেন না?

—না।

গিরিশ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। ব্রজপুরীত্যাগী কৃষ্ণের গল্প শুনতে তার আর ইচ্ছে নেই। গল্পের আসর ছেড়ে সে কাঁদতে-কাঁদতে চলে গেল। তিনদিন সে আর ছোট ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনতে এল না।

গিরিশের বাবার নাম নীলকমল ঘোষ। বাগবাজারের বসুপাড়ায় বাড়ি।

ছেলেবেলা থেকে গিরিশের বদ্ধমূল বিশ্বাস, বাবাই তাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন; আর মা তাকে একেবারেই ভালবাসেন না।

তা বাবার কাছে গিরিশ অত্যধিক স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছে বটে। গিরিশের মুখ ম্লান হলে নীলকমলের মুখ অন্ধকার হয়ে ওঠে।

একদিন বিকেলবেলা আপিস থেকে ফিরে এসে নীলকমল দেখলেন, গিরিশ কাঁদছে। গিরিশ কাঁদে কেন?

গিরিশের জ্যাঠাইমা বললেন—কি জানি। তেষ্টা পেয়েছে বলছে, অথচ জল খাবে না। ভারি বেয়াড়া ছেলে!

নীলকমল ছেলেকে আদর করলেন। বললেন, তেষ্টা পেয়েছে গিরি? তবে জল খাচ্ছিস না কেন?

কাঁদতে-কাঁদতে গিরিশ বলল—জলের তেষ্টা নয় বাবা।

—তবে আবার কিসের তেষ্টা?

—শশার তেষ্টা।

সঙ্গে সঙ্গে নীলকমল চাকরকে ডেকে বললেন—ওরে, শিগগির গিয়ে বাজার থেকে শশা কিনে নিয়ে আয়।

কিন্তু তাতেও হবে না। গিরিশ বলল—আমার বাজারের শশার তেষ্টা নয় বাবা।

—তবে কিসের শশার তেষ্টা রে?

—খিড়কির বাগানের শশা।

এই শশাটি বাড়ির বিগ্রহ শ্রীধরকে দেবেন বলে গিরিশের জ্যাঠাইমা সঙ্কল্প করে রেখেছেন। তিনি বললেন—ওমা, সেই শশাটির জন্যে কান্না? ঠাকুরপো, ও-শশা তুমি ওকে দিও না। যা ধরবে একেবারে তাই। ও-শশাটি আমি শ্রীধরকে দেব বলে রেখেছি।

নীলকমল হাসলেন। বললেন—বড়বৌ, বালক যার জন্যে এমন করে কাঁদছে, ঠাকুর কি তা কখনও তৃপ্তির সঙ্গে খেতে পারবেন?

নীলকমল হুকুম করলেন—খিড়কির বাগান থেকে শশাটি তুলে নিয়ে আয়।

বাবা খুব ভালবাসেন। কিন্তু মা যে একেবারেই ভালবাসেন না। কাছে গেলে দুরদুর করে তাড়িয়ে দেন। কখনও কোথাও যদি গিরিশ কোন অবাচ্য-কুবাচ্য উচ্চারণ করেছে তো আর নিস্তার নেই। মা নানারকম গালাগাল করেন; তারপর গিরিশের মুখের মধ্যে গোবর পুরে দেন। মা কোলে নেন না, একটি মিষ্টি কথা বলেন না, ভালবাসেন না—গিরিশের এ-দুঃখের শেষ কোথায়?

কিন্তু এ-দুঃখের একদিন শেষ হল। ঘটনাচক্রে একদিন চিরকালের সত্য উদ্ঘাটিত হল। তখন গিরিশের বয়স প্রায় ন-বছর।

সেদিন গালগলা ফুলে বিষম জ্বর হয়েছে গিরিশের। আচ্ছন্ন অবস্থায় গিরিশ শুনল মায়ের কণ্ঠস্বর। মা ব্যাকুল হয়ে বাবাকে বলছেন—যেমন করে পার গিরিশকে বাঁচাও।

আশ্চর্য হয়ে বাবা বলছেন—তুমি তো গিরিশকে একেবারেই দেখতে পার না! গিরিশের জন্যে তুমি এমন করছ কেন?

মায়ের দুচোখ জলে ভরে উঠেছে। অশ্রুজড়িত কণ্ঠে তিনি বলছেন ...আমি রাক্ষুসী—এক ছেলে খেয়েছি। গিরিশ আমার অষ্টম গর্ভের সন্তান। পাছে আমার দৃষ্টিতে ওর কোন অমঙ্গল হয়, সেই জন্য আমি ওকে কাছে আসতে দিই না, সারাক্ষণ দুরদুর করি, কোনদিন কোলে নিই না, কখনও একটা মিষ্টি কথা বলি না। বাছা আমার কত কষ্ট পেয়েছে। আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

মায়ের প্রত্যেকটি কথা গিরিশের মর্মমূলে গিয়ে বিদ্ধ হল। ন-বছরের বালকের মন নির্ভুল বুঝতে পারল, অন্তহীন ঘৃণার আড়ালে মায়ের হৃদয়ে সন্তানের জন্যে কী গভীর ভালবাসা সঞ্চিত হয়ে আছে।

এগারো বছর বয়সে মাতৃহীন হয়েছে গিরিশ।

বাবার সঙ্গে একবার বজরায় চেপে নদীতে বেড়াতে গিয়েছে গিরিশ। নবদ্বীপের কাছাকাছি আসতেই প্রচণ্ড তুফান উঠল নদীতে। বজরা প্রায় ডুবে যাবার দাখিল। গিরিশ ভয়ে ভয়ে বাবার হাত ধরল।

সৌভাগ্যক্রমে বজরা বেঁচে গেল। নীলকমল তখন গিরিশকে বললেন —তুই আমার হাত ধরেছিলি যে! বজরা যদি ডুবত আমি কি তোকে বাঁচাতাম? আমার কাছে তোর প্রাণ বড় না আমার? তোকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে আমি নিজে বাঁচবার চেষ্টা করতাম।

বড় কঠিন শিক্ষা। জেনে রাখ, বিপদে ডুববার সময়ে হাত ধরবার কেউ নেই। মনে রেখ, তুমি অনন্তসহায়।

চোদ্দ বছর বয়সে পিতৃহীন হয়েছে গিরিশ।

বাবার মৃত্যুর বছরখানেক পরে গিরিশের বিয়ে হল। আর দুঃখের কথা, অকালে সেই স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। শৈশবে মাতৃহীন, কৈশোরে পিতৃহীন, যৌবনে বিপত্নীক হবার দুঃখ গিরিশ মর্মে-মর্মে জেনেছে।

দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে গিরিশ। আর তার মাসছয়েক পরেই বিসূচিকা হল গিরিশের। দারুণ রোগ। অসুখ কমবার কোন লক্ষণ নেই। দিনের পর দিন রোগ বেড়ে যাচ্ছে। বাড়তে-বাড়তে এমন হল যে, বাঁচবার তিলমাত্র আশা রইল না। রোগী অচৈতন্য।

রোগশয্যায় শুয়ে গিরিশ দেখল, মনের চোখে দেখল, এক করুণাময়ী মাতৃমূর্তি। পরনে লাল কস্তাপেড়ে শাড়ি, সিঁথিতে সিঁদুর, দুটি স্নেহকোমল চোখ। গিরিশের মুখে মহাপ্রসাদ দিলেন তিনি। বললেন—নাও, এই মহাপ্রসাদ খাও। এতেই তোমার অসুখ সেরে যাবে।

আস্তে-আস্তে আরোগ্য লাভ করল গিরিশ। তাই তো, এও হয়! এমন ঘটনাও ঘটে সংসারে!

এই মহাপ্রসাদের স্বাদ ইহজীবনে ভোলা গেল না। আর সেই করুণাময়ী মাতৃমূর্তি? এই ঘটনার দীর্ঘকাল বাদে রক্তমাংসের শরীরে তাঁর দেখা পাওয়া গেল জয়রামবাটিতে। কে? পরমহংসদেবের সহধর্মিণী সারদামণি।

কিন্তু সেসব তো অনেক পরের কথা। তার আগে গিরিশের লেখা-পড়ার সমাচার শুনি।

সমাচার আর কি, গিরিশ একাধিক ইস্কুলে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত পাইকপাড়া ইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছে, কিন্তু পাস করতে পারে নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ওই পর্যন্ত। তা বলে পড়াশোনা বন্ধ হয় নি। ঘরে বসে লেখাপড়া করেছে। কালে অপার অগাধ বিদ্যা অর্জন করেছে।

আবার নেশা আছে। যৌবনের আরম্ভ থেকেই গিরিশ মদ ধরেছে। সে-সময়ে গিরিশ স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল। পাড়ার একটা বয়াটে দলের নায়ক। ভুবড়িওয়ালা, সাপুড়ের সঙ্গে বাণ খেলে। কত কাণ্ড-কীর্তি করে!

সৎকর্মও করে বই কি অনেক।

দুপুরবেলা পুরুষ মানুষেরা আপিসে যায়, পাড়ায় ভণ্ড সন্ন্যাসীরা আসে তখন। বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে মেয়েদের ভয় দেখিয়ে ঠকিয়ে টাকাকড়ি কাপড়চোপড় আদায় করে নিয়ে যায়। এই অত্যাচারী ভণ্ড সন্ন্যাসীদের ধরে আচ্ছা করে শিক্ষা দাও। কে দেবে? গিরিশ আছে, গিরিশের দল আছে।

পাড়ায় কার অসুখ করেছে, পয়সার অভাবে সেবা-শুশ্রূষা হচ্ছে না, অষুধ-পথ্য জুটছে না। ভয় নেই। গিরিশ সদলে চাঁদা তুলেছে, অষুধ-পথ্য জোগাড় করেছে, আর্তের সেবা-শুশ্রূষার সুব্যবস্থা করেছে।

কে মরে পড়ে আছে, মৃতের সৎকার হচ্ছে না লোকাভাবে। গিরিশ দলবল নিয়ে দাহ করে এল।

পাড়ার একটা পুকুরে কে একজন ভদ্রলোক ডুবে মারা গিয়েছেন। আত্মীয়-স্বজন কেউ পুকুরে নেমে লাশ তুলতে রাজি হয় না। পুলিস এল। মুদ্দাফরাশ দিয়ে পুকুর থেকে লাশ তুলবার ব্যবস্থা করল। ভদ্রলোকের লাশ শেষে মুদ্দাফরাশ তুলবে? গিরিশ ঝাঁপিয়ে পড়লো পুকুরে, স্ফীত বিকৃত লাশ তুলে আনল।

আরেকদিন বিকেলবেলা গঙ্গাতীরে বেড়াতে গিয়েছে গিরিশ। হঠাৎ রসিক নিয়োগীর ঘাটে গঙ্গাযাত্রীদের ঘর থেকে একটি মুমূর্ষুর আর্তনাদ কানে এল। ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল গিরিশ। দেখল, একজন মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধ খাটে শুয়ে আছে, কাছাকাছি তার কোনও আত্মীয়-স্বজন নেই। শোনা গেল, এই বৃদ্ধের আপনজন বলতে ইহসংসারে কেউ নেই, দূর-সম্পর্কের আত্মীয়েরা বৃদ্ধকে এখানে ফেলে রেখে যে যার বাড়ি চলে গেছে। একটু জল চায়!

তাড়াতাড়ি গিরিশ বৃদ্ধের মুখে একটু গঙ্গাজল দিল। তারপর দুধ আনবার জন্যে বাড়ির দিকে ছুটল। কিন্তু বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি দুধ নিয়ে যাবার উপায় নেই, প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি বাইরে। বৃষ্টির বেগ একটু কমতেই গিরিশ দুধের বাটি নিয়ে ছুটল। বৃষ্টি একটু কমেছে বটে, কিন্তু তখন রাত্রি, ঘনপ্রস্থ অন্ধকার, পথ তখন জনশূন্য, আকাশে মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

যথাস্থানে এসে গিরিশ দেখল, ঘরের দরজা বন্ধ। আস্তে দরজায়

একটু ধাক্কা দিল, দরজা খুলল না। বৃদ্ধের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়েরা তাহলে এসে গেল নাকি? গিরিশ একটু ডাকাডাকি করল, কিন্তু বন্ধ দরজার ওপার থেকে কোন সাড়া এল না।

উপায়ান্তর না দেখে জোরে দরজায় ধাক্কা দিল গিরিশ, সঙ্গে সঙ্গে একখানা কঠিন ঠাণ্ডা শীর্ণ হাত সেই অন্ধকার ঘর থেকে এসে গিরিশের কাঁধের ওপর পড়ল। এ কী! বিদ্যুৎ চমকে উঠল, বিদ্যুতের আলোয় গিরিশ দেখল, সেই মুমূর্ষু বৃদ্ধ বিকৃত মুখে ঈষৎ বাঁকা হয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বৃদ্ধের হাতখানা ধরে তুলল গিরিশ। হ্যাঁ খানিকক্ষণ আগেই বৃদ্ধ ইহলোক থেকে চিরবিদায় নিয়েছে। হয়তো বিকারের ঘোরে খাট থেকে উঠে দরজার কাছে এসে দাঁড়ান অবস্থায়ই বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে।

অস্থিরপায়ে গিরিশ তক্ষুনি ছুটে বেরিয়ে এল।

কিন্তু যাই করুক, পাড়ার ভদ্রলোকদের কাছে গিরিশ বয়াটে। গিরিশের কাছে নানাভাবে উপকৃত পাড়ার ভদ্রলোকেরা। তবুও কিম্বা সেজন্যেই হয়ত গিরিশকে তারা পছন্দ করেন না।

গিরিশের কিশোরকালের একদিনের একটা ঘটনা বলি।

সেদিন ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে হাফ-আখড়াইয়ের বৈঠক। হাফ-আখড়াই শুনবার জন্যে গিরিশ সেখানে গিয়েছে। কিন্তু প্রচণ্ড ভিড়। গিরিশের সাধ্য কি, সেই ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢোকে। নিমন্ত্রিত গণ্যমান্য বড়মানুষেরা পর্যন্ত অতি কষ্টে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পাচ্ছেন।

এমন সময় মস্ত হুল্লোড়। আপনা থেকে ভিড় দ্বিখণ্ড হয়ে পথ করে দিল, ভিড়ের মধ্যে উল্লাস আর অভ্যর্থনা। কাকে অভ্যর্থনা? কে?

একজন খুব সাদাসিদে পোশাক পরা ভদ্রলোক। ইনি কে?

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। কবি। হাফ-আখড়াইতে গান বাঁধবার জন্যে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন। দুয়ারের কাছ থেকে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা হাত ধরে কবিকে সসম্মানে ভিতরে নিয়ে গেলেন। কবির প্রতি সেই সম্মান আর অভ্যর্থনার দৃশ্য গিরিশের প্রাণে একটি বাসনার বীজ বপন করে দিল। কবি হতে হবে। 'আমি কবি হব!'

কিন্তু এদিকে কাজকর্মের খবর কি? শুভ। মনিব গিরিশের ওপর মহাতুষ্ট।

একটা ঘটনা আছে এখানে।

তখন গিরিশ অ্যাটকিনসন সাহেবের আপিসে কাজ করে। অ্যাটকিনসন সাহেবের নীলের কারবার। আপিসের ছাদে প্রায়ই নীল শুকোতে দেওয়া হত। আপিস বন্ধ হবার আগে সব নীল আবার ছাদ থেকে গুদামে তুলে রাখার ব্যবস্থা।

সেদিন আকাশ অতি চমৎকার। বৃষ্টি আসার ক্ষীণতম সম্ভাবনাও নেই। সেদিন তাই আর নীল গুদামে চালান করা হল না, ছাদেই থেকে গেল। বৃষ্টি যখন আসবে না, তখন নীল এক রাত্তিরের জন্যে থাক ছাদে।

কিন্তু হঠাৎ রাত্রে আকাশ মেঘে ভরে গেল। নির্ঘাত প্রচণ্ড বৃষ্টি নামবে। গিরিশের মনে পড়ল, আপিসের ছাদে নীল পড়ে আছে। মনে হল বৃষ্টি নামলে সমস্ত নীল নষ্ট হয়ে যাবে, বিস্তর লোকসান হবে আপিসের।

তক্ষুনি গাড়িভাড়া করে গিরিশ ছুটলো আপিসের দিকে। আপিসের দারোয়ানদের ডাকল, কুলি জোগাড় করল দ্বিগুণ মজুরি দিয়ে, ছাদের সমস্ত নীল গুদামে তুলে দিয়ে তারপর বাড়ি এসে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোল।

অ্যাটকিনসন সাহেব খুব খুশী হয়েছেন গিরিশের কাজে। পরদিন আপিসে সাহেব লোহার সিন্ধুক খুলে গিরিশকে বললেন—এর ভেতর থেকে তিন আঁজলা টাকা তুলে নাও।

এই আপিসে বসেই কাজের ফাঁকে-ফাঁকে গিরিশ সেক্সপীয়ারের 'ম্যাকবেথে'র বাঙলা অনুবাদ প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছিল। আপিসের ডেস্কেই থাকত খাতাখানা। কিন্তু ওই আপিস ফেল হয়ে সমস্ত আসবাবপত্র যখন বিক্রি হয়ে যায়, সেই খাতাখানাও সেই সঙ্গে কোথায় যে চলে গেল তার আর কোনও কিনারা হল না।

১৮৬৭ সাল। দেখতে পাচ্ছি, কয়েকজন যুবক বাগবাজারে একটি শখের যাত্রার দল খুলেছে। হ্যাঁ গিরিশ আছে সে-দলে। সাব্যস্ত হল, অভিনীত হবে 'শর্মিষ্ঠা'। কিন্তু যাত্রার জন্যে নতুন কয়েকখানা গান লেখান দরকার। সে-গান লিখবে কে?

প্রিয়মাধব মল্লিক তখন বিখ্যাত গীতিকার। তাঁকেই গিয়ে ধরা হল কিন্তু পর-পর সাতদিন তাঁর কাছে হাঁটাহাঁটি করেও কোন ফল হল

না। শেষকালে গিরিশ বিরক্ত হয়ে বলল—এত হাঁটাহাঁটি পোষাবে না। যেমন পারি আমরা নিজেরাই গান বেঁধে নেব।

তা সে-রকমই হল।

শখের যাত্রা তো হল, কিন্তু গিরিশের অনেকদিনের প্রবল ইচ্ছা একটা থিয়েটার করে। ইচ্ছা থাকলে হবে কী, থিয়েটার তো আর যাত্রা নয়, থিয়েটার করতে অনেক টাকাকড়ি লাগে। টাকা কোথায়?

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গিরিশের বন্ধু। থিয়েটারের ব্যাপারে নগেন্দ্রনাথও টাকাকড়ির সমস্যার কথাই বলল—দৃশ্যপট পোশাক-পরিচ্ছদে বিস্তর খরচ পড়বে। সে-টাকা কি আমরা জোগাড় করতে পারব?

অনেক আলাপ-আলোচনার পর গিরিশ পরামর্শ দিল—দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র অভিনয় করা যাক। তাতে পোশাক-আশাকের হাঙ্গামা নেই। সাধারণ জামা-কাপড় পরেই দিব্যি 'সধবার একাদশী'র অভিনয় করা যাবে। দৃশ্যপট? ও একরকম জোগাড় হয়ে যাবে নিশ্চয়ই।

ভাল পরামর্শ। দলের সকলেই সায় দিল।

বাগবাজারে মুখুজ্জে পাড়ায় হরলাল মিত্রের লেনে অরুণচন্দ্র হালদারের বাড়িতে মহলা বসল। 'সধবার একাদশী'র মহলা চলতে লাগল মহানন্দে।

'সধবার একাদশী'র মহলা চলুক।

কিন্তু এখানে একবার বাঙলা নাট্যশালার দিকে তাকান দরকার। প্রথম বাঙলা নাট্যশালার জন্ম হয় কবে, কোথায়?

তখন গিরিশ কোথায়! গিরিশের জন্ম হয় ১৮৪৪ সালে। আর প্রথম বাঙলা নাট্যশালার জন্ম হয় ১৭৯৫ সালে। প্রথম বাঙলা নাট্যশালার জন্ম হয়েছিল এই কলকাতায়, ঠিকানা পঁচিশ-নম্বর ডুমতলা। ডুমতলাটা কোনখানে? যেখানে এখন এজরা স্ট্রীট।

সেই নাট্যশালায় বাঙালী অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনয় করেছেন। কিন্তু সেই নাট্যশালার কর্তা বাঙালী নন, এমন কি ভারতীয়ও নন। সুদূর রাশিয়ার মানুষ তিনি। নাম হেরাসিম লেবেডেফ। নানা দেশ ঘুরে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন।

দুখানা ইংরেজী নাটক বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন এই লেবেডেফ সাহেব। সম্ভবত একখানা নাটকের অভিনয় হয় নি; আরেকখানা নাটকের দুবার অভিনয় হল লেবেডেফের নাট্যশালায়। বলা বাহুল্য হবে না,

লেবেডেফকে এ-ব্যাপারে অকৃপণ সাহায্য করেছিলেন একজন বাঙ্গালী। তাঁর নাম গোলোকনাথ দাস।

তারপর লেবেডেফ বিলেত চলে গেলেন। তাঁর নাট্যশালাও গেল বন্ধ হয়ে।

দীর্ঘকাল কেটে গেল তারপরে। বাঙালীর কোন নাট্যশালা নেই। তখন পর্যন্ত বাঙালীর যাত্রা আছে, পাঁচালি আছে, কবি আছে, হাফ-আখড়াই প্রভৃতি আছে, কিন্তু না, বাঙালীর কোন নাট্যশালা নেই।

বাঙালীর প্রথম নাট্যশালা হল প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে, তাঁরই নারকেলডাঙার বাগানবাড়িতে, ১৮৩১ সালে। সেই নাট্যশালার নাম—হিন্দু থিয়েটার। কিন্তু সেখানেও কোন বাঙলা নাটকের অভিনয় হয় নি।

হিন্দু থিয়েটার হবার কিছুকাল পরের কথা। শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু নিজের বাড়িতে একটি নাট্যশালা খুললেন। বাঙলা নাটকের অভিনয় হল সেখানে। আর সেখানে বাঙালী স্ত্রীলোকেরাই স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় করলেন। বছরে চার-পাঁচটি করে বাঙলা নাটকের অভিনয় হত সেখানে। মনে রাখা দরকার সেখানেই বাঙালীর উদ্যোগে বাঙলা নাটকের প্রথম অভিনয় হয়েছে।

কোন্-কোন্ নাটকের অভিনয় হয়েছিল সেখানে, সঠিক বলা যায় না। নিঃসন্দেহে বলা যায়, 'বিদ্যাসুন্দরে'র অভিনয় হয়েছিল সেখানে।

নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালার অভিনয় সম্পর্কে যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন: 'প্রত্যেক দৃশ্যপট পরিবর্ত্তনের সঙ্গে একজন অভিনেতা সেই দৃশ্যের সংশ্লিষ্ট বিষয় ভারতচন্দ্র হইতে আবৃত্তি করিয়া দর্শকদিগকে শুনাইতেন। প্রত্যেক দৃশ্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দর্শকদিগকেও রঙ্গভূমিতে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে হইত। বকুলমূলে উপবিষ্ট সুন্দর বা মালিনীর গৃহ দেখিবার জন্য দর্শক-দিগকে স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র স্থানে যাইতে হইত। তথায় তাঁহাদিগের জন্য আসন প্রস্তুত থাকিত। ... নবীনবাবুর বাটীর অভিনয়কার্য্য দুই তিন বৎসর চলিয়াছিল এবং নবীন বাবু তজ্জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম ও অপর্য্যাপ্ত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। এদেশে, সে সময়ে, যাহা কিছু সম্ভবপর নবীনবাবু তাহার কোন বিষয়েই ত্রুটি করেন নাই।'

হ্যাঁ কৃত্রিম দৃশ্যপট ছাড়া, শোনা যায়, নবীনচন্দ্র নিজের বাড়ির পুকুর,

নিজের বাগানের গাছপালা অভিনয়কালে একেবারে বাস্তব দৃশ্যরচনার কাজে লাগিয়েছিলেন।

✓ তা এ-ব্যাপার বাঙলাদেশে একেবারে নতুন নয়। বহুযুগ আগের কথা। চৈতন্যদেব শান্তিপুরে ভাগীরথীতীরে 'দানলীলা'র অভিনয় করেছিলেন। তাতে স্বয়ং চৈতন্যদেব সেজেছিলেন শ্রীরাধিকা, অদ্বৈতাচার্য শ্রীকৃষ্ণ, নিত্যানন্দ বড়াইবুড়ি, গৌরীদাস সুবল, আর সখাসখী সেজেছিলেন শ্রীবাস, কমলাকান্ত এবং আরও কেউ কেউ। ভাগীরথী তীরে সত্যি-সত্যি গোরু এনে গোচারণের দৃশ্য দেখান হয়েছিলো। দুধদই লুণ্ঠনের দৃশ্যেও আসল বস্তুর অভাব হয় নি। নদীর ধারের একটা কদম্ব গাছকেও সেই অভিনয়ে কাজে লাগান হয়েছিল। একেবারে বাস্তব ব্যাপার। আর অভিনয় করতে করতে আত্মহারা হয়েছিলেন চৈতন্যদেব, অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দ; অচৈতন্য হয়ে জলে পড়ে গিয়েছিলেন তিনজনেই। কিছুক্ষণ বাদে অবশ্যি তাঁরা আবার আত্মস্থ হয়েছিলেন।

যাক। যা বলছিলাম। নবীনচন্দ্র বসুর নাট্যশালার কথা বলছিলাম। এখন যেখানে শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো, সেখানেই ছিল নবীনচন্দ্রের নাট্যশালা।

নবীনচন্দ্র বসুর পরে কিছুদিন শখের থিয়েটার চালিয়েছিলেন নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অতঃপর বাঙলা নাটকের অভিনয় দেখতে হলে চলে আসতে হবে ১৮৫৭ সালে, আশুতোষ দেবের (সাতুবাবুর) বাড়িতে। অভিনয়ের সকল উদ্যোগ-আয়োজন করেছেন সাতুবাবুর দৌহিত্রেরা। ৩০শে জানুআরী 'শকুন্তলা' প্রথমবার অভিনীত হল সেখানে, দ্বিতীয়বার হল ২২শে ফেব্রুআরী।

তারপর ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে নূতনবাজারে রামজয় বসাকের বাড়িতে কলকাতায় প্রথমবার অভিনীত হল রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটক। যতদূর জানি, 'কুলীন কুলসর্বস্ব'ই প্রথম বাঙলা সামাজিক নাটক। এই নাটকাভিনয়কে কেন্দ্র করে কলকাতায় সেদিন প্রবল উৎসাহ, প্রচণ্ড উত্তেজনা।

অল্পদিনের মধ্যেই 'কুলীন কুলসর্বস্ব' আরও দুবার অভিনীত হল কলকাতায়। দ্বিতীয়বার ওই রামজয় বসাকের বাড়িতেই, তৃতীয়বার বড়বাজারে গদাধর শেঠের বাড়িতে। সেই বড়বাজারের রঙ্গভূমিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও দর্শকের আসনে দেখতে পাচ্ছি।

চুঁচুড়ায়ও 'কুলীন কুলসর্বস্বে'র অভিনয় হল মহাসমারোহে। রূপচাঁদ পক্ষী গান বেঁধে দিলেন, তালিম দিলেন, নিজেও গেয়ে দিলেন একদিন। চুঁচুড়ার হাটে-বাজারে পথে ঘাটে নাটকের নটীর গান শোনা যেতে লাগল—অধিনীরে গুণমণি পড়েছে কি মনে হে?

কালীপ্রসন্ন সিংহের চেষ্টায় বিদ্যোৎসাহিণী-রঙ্গমঞ্চ হল ১৮৫৬ সালে। পরের বছর ১১ই এপ্রিল সেখানে 'বেণীসংহা'র হল, ২৪শে নভেম্বর 'বিক্রমোর্বশী' হল। এই দুই নাটকেই স্বয়ং কালীপ্রসন্ন সিংহ চমৎকার অভিনয় করলেন।

তারপর বেলগাছিয়া নাট্যশালা; প্রচুর টাকাকড়ি খরচ করে বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে পাইকপাড়ার রাজারা এই চমৎকার নাট্যশালাটি গড়ে তুললেন। ১৮৫৮ সালের ৩১শে জুলাই সেখানে প্রথম অভিনীত হল 'রত্নাবলী'। বিদূষকের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করলেন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। বিস্তর দেশী-বিদেশী ভদ্রলোক এই অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও প্রথম অভিনয় রাত্রে উপস্থিত ছিলেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রশংসা অবিলম্বে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। ছ-সাতবার সেখানে অভিনীত হল 'রত্নাবলী'।

এই 'রত্নাবলী' নাটকের রিহার্সাল দেখতে-দেখতেই একদিন মাইকেল মধুসূদন গৌরদাস বসাককে বললেন—ছাখ, কী দুঃখের কথা, এই একখানা নগণ্য নাটকের জন্যে রাজারা এত টাকাকড়ি খরচ করছেন।

গৌরদাস বসাক বললেন— নাটকখানা যে নগণ্য তা আমরাও জানি। কিন্তু উপায় কী। 'বিদ্যাসুন্দরে'র মত নাটক আমরা অভিনয় করি, এটা নিশ্চয়ই তোমার ইচ্ছে নয়। ভালো নাটক পেলে আমরা 'রত্নাবলী' অভিনয় করতাম না, কিন্তু বাঙলা ভাষায় ভালো নাটক কোথায়?

—বাঙলা ভাষায় ভালো নাটক? —মাইকেল মধুসূদন বললেন—আচ্ছা, আমি লিখব।

মাইকেল মধুসূদন কথা রাখলেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে লিখে ফেললেন 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মাইকেল মধুসূদনের প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'র প্রথম অভিনয় হল ১৮৫৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর। কয়েকবার

'শর্মিষ্ঠা'র অভিনয় হয়েছে বেলগাছিয়া নাট্যশালায়।

'শর্মিষ্ঠা'র অভিনয় দেখে হিন্দু কলেজের রামচন্দ্র মিত্র খুব খুশী। তিনি এসে মাইকেল মধুসূদনের হাত জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—মধু, সত্যি-সত্যি তোমার কৃতিত্ব অসাধারণ। চমৎকার হয়েছে মধু, চমৎকার।

'শর্মিষ্ঠা'য় মাধব্যের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। মস্ত অভিনেতা তিনি। সে-আমলে তাঁকে বলা হত বাঙলা থিয়েটারের গ্যারিক।

বাঙালীর প্রথম পাবলিক থিয়েটার হবার প্রায় এক যুগ আগে মাইকেল মধুসূদন কেশবচন্দ্রকে বলেছেনঃ আপনি আধুনিক বঙ্গদেশীয় নট-কুল শিরোমণি।

মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের অকপট বন্ধুত্ব। এই বন্ধুত্বের সংবাদ উত্তরকালের কাছে পৌঁছে দেবার ইচ্ছা করেছেন মাইকেল। কাগজে-কলমে মাইকেল মধুসূদন সে-ইচ্ছার কথা লিখে রেখেছেন। কেশবচন্দ্রকে লক্ষ্য করে মাইকেল মধুসূদন লিখেছেনঃ—আমার এই বাঞ্ছা যে, ভবিষ্যতে এ দেশীয় পণ্ডিতসম্প্রদায় জানতে পারেন যে, আপনার সদৃশ দর্শন-কাব্য বিশারদ একজন মহোদয় ব্যক্তি মাদৃশজনের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ্য প্রকাশ করিতেন।

'শর্মিষ্ঠা'র কথা হচ্ছিল। সন্দেহ নেই, 'শর্মিষ্ঠা'য় মাইকেল অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র খুশী হলেন। মাইকেলকে প্রহসন লিখতে অনুরোধ করলেন। মাইকেল সে-অনুরোধ রাখলেন; ১৮৫৯ সালেই দু-খানা প্রহসন লিখে ফেললেন—'একেই কি বলে সভ্যতা?' আর 'ভগ্ন শিবমন্দির'।

'ভগ্ন শিবমন্দির' নামটা রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের বোধকরি পছন্দ হল না। রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের কথায় মাইকেল ও-নাম বদলে দিলেন। ছিল 'ভগ্ন শিবমন্দির' হল 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'।

নামের কথা ছেড়ে কাজের কথায় আসি। ইংরেজী-পড়া মদখোর নববাবুদের —যাদের ইয়ং-বেঙ্গল বলা হয়—চরিত্রের অধঃপতনের জলজ্যান্ত কাহিনী আছে 'একেই কি বলে সভ্যতা'য়। আর 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'র প্রধান চরিত্রে একজন বৃদ্ধ—দেখতে-শুনতে গোঁড়া হিন্দু কিন্তু আসলে একটি পয়লা নম্বর লম্পট। প্রহসনে মাইকেল কাউকে তন্তুমাত্র দয়া করেন নি—না বৃদ্ধকে, না যুবককে।

দু-খানা প্রহসনেরই মহলা আরম্ভ হয়ে গেল।

কিন্তু কোত্থেকে কে জানে, কয়েকজন নববাবু খবর পেয়ে গেলেন, 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় নিষ্করুণভাবে তাদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে। তারা একজন মাতব্বরকে হাত করলেন। মাতব্বরবাবু এসে রাজাদের ধরে পড়লেন। কী? না, 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অভিনয় বন্ধ করুন। দয়া করে বন্ধ করুন।

রাজারা প্রথমে ও-কথা কানে নিতে চান নি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দায়ে পড়ে 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অভিনয় বন্ধ করে দিতে হল। বিরক্ত হবার মত ব্যাপার নিশ্চয়ই, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র বিরক্ত হলেন। তিনি সাব্যস্ত করলেন: একখানা প্রহসনের অভিনয় যখন বন্ধ হল তখন আরেকখানাও বন্ধ হোক; শুধু তাই কেন, বেলগাছিয়া নাট্যশালায় আর বাঙলা নাটকের অভিনয় করারই কোন দরকার নেই।

মাইকেল মধুসূদন সব খবর রাখেন না। তিনি বারংবার কেশবচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করেন—ব্যাপার কি? প্রহসন দু-খানার অভিনয়ের কতদূর হল? ও দু-খানার লেখা কি ভাল হয় নি?

কেশবচন্দ্র মাইকেলকে আসল কথা খুলে বললেন না। বললেন—একখানা প্রহসনে আপনি নববাবুদের দোষ ত্রুটি দেখিয়েছেন। আরেকখানায় দেখিয়েছেন বুড়ো হিন্দুদের দোষ-ত্রুটি। কিন্তু নববাবুরা যেমন বুড়ো হিন্দুরাও তেমনি রাজাদের পছন্দ করে। এই অবস্থায় কেমন করে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় আপনার প্রহসন দু-খানার অভিনয় করা যায়!

বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মাইকেলের একখানা প্রহসনেরও অভিনয় হল না।

তারপর 'পদ্মাবতী' নাটক লিখলেন মাইকেল। না, বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'পদ্মাবতী'র অভিনয় হয় নি।

মাইকেল 'কৃষ্ণকুমারী' নামে একখানা ট্র্যাজেডি লেখা আরম্ভ করেছেন ১৮৬০ সালের ৬ই আগস্ট, শেষ করেছেন ৭ই সেপ্টেম্বর। সকলেই জানেন, এই 'কৃষ্ণকুমারী'ই মাইকেলের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক। 'কৃষ্ণকুমারী'র ওপর মাইকেলের নিজেরও খুব বিশ্বাস। মাইকেল নিজেই সে-সময়ে বলেছেন: এই ট্র্যাজেডি-খানা যদি ব্যর্থ না হয় তো এখানা নিশ্চয়ই চিরকাল আমাদের ন্যাশন্যাল থিয়েটারের ফাউণ্ডেশন-স্টোন হয়ে থাকবে।

কিন্তু বেলগাছিয়া নাট্যশালায় কি 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয় হবে? মাইকেলের নিজের মনেই এ-সন্দেহ এসেছে। মাইকেল স্পষ্টভাষায় কেশব-

চন্দ্রকে জানিয়েছেন ঃ মনে রাখবেন, আমার প্রহসন দু-খানার ব্যাপারে একবার আপনারা আমাকে চূড়ান্ত কষ্ট দিয়েছেন ; এবারেও যদি সেরকম ঘটনা ঘটে তো আমি আর বাঙলায় কিছু করব না, হিব্রুতে আর চীনেভাষায় বই লিখব!

মাইকেলের সন্দেহই সত্য হল। বেলগাছিয়া নাট্যশালায় 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয় হল না। 'শর্মিষ্ঠা'র পর বেলগাছিয়া ন্যট্যশালায় আর কোন অভিনয়ই হল না।

১৮৬১ সালের ২৯শে মার্চ রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু হল। সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল বেলগাছিয়া নাট্যশালা। ক্ষীণায়ু হলেও বেলগাছিয়া নাট্যশালা মর্যাদার অধিকারী। মনে রাখা দরকার, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের একান্ত উৎসাহ না থাকলে কিছুতেই এই নাট্যশালার জন্ম হত না। এই দুজন মানুষের নামে মাইকেল খাঁটি কথা বলেছেন ঃ যদি ভারতবর্ষে নাটকের পুনরুত্থান হয়, তবে ভবিষ্যৎ যুগের লোকেরা এই দুজন উন্নতমনা পুরুষের কথা বিস্মৃত হবে না, এঁরাই আমাদের উদীয়মান জাতীয় নাট্যশালার প্রথম উৎসাহদাতা।

সেকালে অনেক শখের থিয়েটারের জন্ম হয়েছে। সেরকম কয়েকটি থিয়েটারের ইতিহাসের কাছে ঘুরে বেড়ালে মন্দ হয় না।

পাথুরেঘাটার ঠাকুরদের পুরনো বাড়ির দোতলার নাচঘরে একটি রঙ্গমঞ্চ বাঁধা হল। ১৮৫৯ সালে সেখানে অভিনীত হল 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক। সেখানে 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র দ্বিতীয়বার অভিনয় হল ১৮৬০ সালের ৭ই জুলাই।

মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গিল্যাণ্ডার্স হৌসের একজন কেরানী। 'মালবিকাগ্নিমিত্রে' তাঁর বিদূষকের ভূমিকা। তাঁর অভিনয় সম্পর্কে একজন প্রত্যক্ষদর্শী 'সোমপ্রকাশ পত্রিকায় মন্তব্য করলেন—'বিদূষককে সর্বোৎকৃষ্ট বলিতে হইবেক, তদীয় অঙ্গবিন্যাস ও বাক্‌চাতুরী দর্শনে দর্শকমাত্রেই পুলকিত হইয়াছিলেন ও প্রতিষ্ঠাসূচক ভূয়োভূয়ঃ করতালি দিয়াছিলেন।'

ওখানে স্টেজ-ম্যানেজার ছিলেন দীননাথ ঘোষ। প্রম্পটার ছিলেন শরৎচন্দ্র ঘোষ। তিনি স্টেজের ভিতর থেকে বায়া-তবলা বাজাতেন। চমৎকার পাখোয়াজ বাজাতে পারতেন ভদ্রলোক।

ঠাকুরবাড়িতে থিয়েটারের জন্যে কমিটিও একটি ছিল। তার সভ্য ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, কেশব গঙ্গোপাধ্যায়, দীননাথ ঘোষ।

সেই কমিটিই ঠিক করে দিত, কে কোন ভূমিকায় অভিনয় করবে।

কয়েকবছর পরে পাথুরেঘাটা রাজবাড়িতে একটি নতুন নাট্যশালা খুললেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। তার নাম পাথুরেঘাটা বঙ্গনাট্যালয়। সেখানে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হল ১৮৬৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর। দ্বিতীয়বার 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হল ১৮৬৬ সালের ৬ই জানুআরী। সেদিন রেওয়ার রাজা অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। তিনি দু-গাঁটরি কাশ্মীরী শাল ও একথাল মোহর এনে যতীন্দ্রমোহনকে বললেন—আপনি যদি কিছু মনে না করেন এগুলি আমি অভিনেতাদের মধ্যে বিতরণ করি।

যতীন্দ্রমোহন বললেন—ওকথা মনেও আনবেন না। ওরা সকলে আমারই মত ভদ্রলোক। ওরা কখনই এ-দান নেবেন না।

কিন্তু সত্যিই কি ওরা নিতেন না? হয়তো নিতেন, কিন্তু যতীন্দ্রমোহনের কথার ওপরে আর কথা চলে না। অল্পদিন বাদে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রাজা হলেন। সেই উপলক্ষে তাঁর কাছ থেকে অভিনেতারা প্রত্যেকে একেক জোড়া গঙ্গাজলে শাল উপহার পেলেন।

অনেক নাটক ও প্রহসন অভিনীত হয়েছে পাথুরেঘাটা বঙ্গনাট্যালয়ে। যথা—যেমন কর্ম তেমনি ফল, বুঝলে কি না, মালবিকাগ্নিমিত্র, চক্ষুদান, উভয়-সঙ্কট, রুক্মিণীহরণ, মালতীমাধব।

একবার বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক 'মালতীমাধব' দেখতে এসেছিলেন। 'মালতী মাধবে' মাধব সেজেছিলেন মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অভিনয় শেষ হয়েছে, এমন সময় যতীন্দ্রমোহন বললেন—পোশাক ছাড়বেন না। লাটসাহেব তলব দেবেন। কথা কইতে হলে খবরদার, 'স্যার' বলবেন না, মাই লর্ড বলবেন।

মাইকেল মধুসূদনও মহেন্দ্রনাথকে বারবার শিখিয়ে দিলেন—মাই লর্ড বলায় যেন ভুল না হয়।

কিন্তু লাটসাহেবের সামনে গিয়ে মহেন্দ্রনাথ সব গোলমাল করে ফেললেন।

লাটসাহেব জিজ্ঞেস করলেন—Were you the hero when I came to his residence?

কম্পিতকণ্ঠে মহেন্দ্রনাথ বলে ফেললেন—ইয়েস স্যার।

সঙ্গে-সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন বললেন—Yes, my Lord; there were two heroes, he was one of them.

এবার শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়্যাট্রিকাল সোসাইটিতে আসি। সেখানে

প্রথম অভিনীত হয় মাইকেল মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা ?'—১৮৬৫ সালের ১৮ই জুলাই। দ্বিতীয়বার সেখানে 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' অভিনীত হয় ১৮৬৫ সালের ২৯শে জুলাই। মাইকেল মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'ও এই নাট্যশালায় অভিনীত হয়েছিল। কিছুদিন শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটির এক্‌সিকিউটিভ কমিটির সভাপতি ছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ।

তারপর জোড়াসাঁকো নাট্যশালা ; এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার মূলে তিন-জনের নাম জড়িয়ে আছে—সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এখানে প্রথম অভিনীত হল মাইকেল মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'। তার কিছুদিন বাদে হল 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণ-কুমারী'তে সেজেছিলেন কৃষ্ণকুমারীর মাতা, 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় সেজেছিলেন সার্জন।

এই নাট্যশালায় রামনারায়ণ তর্করত্নের 'নব-নাটক' প্রথম অভিনীত হয় ১৮৬৭ সালের ৫ই জানুআরি। সেদিন রামনারায়ণ উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ান্তে তিনি মহানন্দে বললেন—যা—রা পলাট (Plot) নাই, পলাট নাই বলে, এখানে এসে একবার দেখে যাক।

এই নাট্যশালায় পর-পর ন-বার অভিনীত হয়েছিল 'নব-নাটক'। এখানে 'নব-নাটকে'র শেষ কিম্বা বলি, নবম অভিনয়ের তারিখ—২৩শে-ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৭ সাল। জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় 'নব-নাটকে'র অভিনয় নিয়ে সারা শহরে সাড়া পড়ে গেল।

অতি সুন্দর করে সাজান হয়েছিল রঙ্গমঞ্চ। দৃশ্যপটগুলিও হয়েছিল চমৎকার। তরুলতা আর তাতে জ্যান্ত জোনাকি আটা দিয়ে জুড়ে একটা বনের সীনকে তো সত্যিকারের বনের মত বানান হয়েছিল। এক-একটা জ্যান্ত জোনাকি জোগাড় করতে খরচ লেগেছিল দু-আনা।

নাটকের নায়ক গবেশবাবুর ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করেছিলেন অক্ষয় মজুমদার।

একটা ঘটনা আছে।

থিয়েটারের নাম-ডাক শুনে পথের মধ্যে একদিন একজন বৃদ্ধ অক্ষয় মজুমদারকে ধরে পড়লেন। বললেন—যে করে হোক আমাকে একখানা টিকিট জোগাড় করে দিতেই হবে।

কোনরকমে একখানা টিকিট জোগাড় করে দেওয়া গেল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক থিয়েটার দেখে গেলেন।

পরদিন সকালবেলা অক্ষয় মজুমদারের সঙ্গে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের রাস্তায় দেখা। বৃদ্ধ ভদ্রলোক তখন গঙ্গাস্নান সেরে ফিরছিলেন। অক্ষয় মজুমদার জিজ্ঞেস করলেন—কেমন দেখলেন থিয়েটার ?

অগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক একেবারে ফেটে পড়লেন —যা যা, পাপিষ্ঠ কোথাকার, সকালবেলা গঙ্গাস্নান করে তোর মুখদর্শন করতে হল। সরে যা, সরে যা, কথা কবি নে।

অযথা নানারকম কটুবাক্য শুনে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলেন অক্ষয় মজুমদার।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক থামলেন না। অক্ষয় মজুমদারকে বললেন—পাপিষ্ঠ, শেষটায় বউটাকে মেরে ফেললি, তোর নরকেও স্থান হবে না।

হা ঈশ্বর, এই কথা! বৃদ্ধ ভদ্রলোকের চোখে নাটকের নায়ক গবেশবাবু আর তার ভূমিকাভিনেতা অক্ষয় মজুমদার এক হয়ে আছে। রঙ্গমঞ্চের বাইরে স্পষ্ট দিবালোকেও তিনি অক্ষয় মজুমদারকেই জলজ্যান্ত গবেশবাবু ভেবেছেন।

তা উচ্চাঙ্গের অভিনেতা ছিলেন অক্ষয় মজুমদার। একটা বিশেষ ক্ষমতা ছিল তাঁর, অনেক নাটকছাড়া কথা তিনি বানিয়ে-মানিয়ে বলতে পারতেন।

'নব-নাটকের' গবেশবাবুর বড়বউ স্বামীকে বশ করার জন্যে 'ঔষধ' করেছে, গবেশবাবুর পেট ফুলে ঢাক হয়ে উঠেছে। দর্শকদের মধ্যে হয়ত ডাক্তার দ্বারিকানাথ গুপ্ত কিম্বা ডাক্তার বেলিসাহেব আছেন, এই দৃশ্যে গবেশবাবুরূপী অক্ষয় মজুমদার শরীরের যন্ত্রণায় কাতরকণ্ঠে বলে উঠতেন—শীগ গির দ্বারিকাবাবুকে কি বেলি সাহেবকে একবার ডেকে আন।

হাসির লহর পড়ে যেত। যে ডাক্তারের নাম বলা হল, তিনিও সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসতেন।

অক্ষয় মজুমদারকে একবার জিজ্ঞেস করা হল—অত লোকের সামনে বেহায়ামি করতে আপনার কি একটুও সঙ্কোচ হয় না ?

অক্ষয় মজুমদার জবাব দিলেন—আমার একটা মন্ত্র আছে। আমি অভিনয়-কালে দর্শকদের বানর বলে কল্পনা করে থাকি।

গবেশবাবুকে ছেড়ে নটীর কথায় আসি। 'নব-নাটকে' নটী সেজেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। পরম সুদর্শন চেহারার মানুষ ছিলেন তিনি। বাড়ির

84.642
JADAVPUR UNIVERSITY

মেয়েরাই ভেতর থেকে তাঁকে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিতেন। যেদিন নটী সাজতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সকাল থেকেই বাড়ির মেয়েরা কাজ আরম্ভ করে দিতেন—কেউ বিনুনি করছেন, কেউ চুল আঁচড়ে দিচ্ছেন গোলাপতেল দিয়ে। চমৎকার মানাতো জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে। পুরোদস্তুর নটী মনে হত। দেখে কে বলবে যে ইনি আসলে মেয়েমানুষ নন, পুরুষমানুষ।

থিয়েটার দেখতে এসে হাইকোর্টের জজ সীটনকার সাহেব একদিন ঢুকে পড়লেন সাজঘরে। 'Beg your pardon, জেনানা, জেনানা' বলতে-বলতে সেই মুহূর্তেই সাহেব বেরিয়ে এলেন সাজঘর থেকে। জেনানা কে? কেউ না, কেউ না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিখুঁত জেনানা সেজে বসে আছেন সাজঘরে।

'নব-নাটকে' ছোটবউ সেজেছিলেন অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায়, বড়বউ সেজেছিলেন সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।

পাশের বাড়ির চাটুজ্জে মশায় অত্যন্ত গোঁড়া। তিনি একদিন দেখলেন, এ-বাড়ির মেয়েরা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি সাংঘাতিক কাণ্ড! মান-সম্ভ্রম যে যায়! চাটুজ্জে মশায় রেগে গেলেন। বললেন—এ কী ব্যাপার, মেয়েরা বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আর তো মান থাকে না!

চাটুজ্জে মশায়কে বোঝান হল, ও সত্যি-সত্যি মেয়ে নয়, পুরুষমানুষ মেয়ে সেজেছেন। কিন্তু চাটুজ্জে মশায় সেকথা কানে তুললেন না, বললেন—আমি স্বচক্ষে দেখেছি মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে বাগানে।

স্বচক্ষে 'নব-নাটকে'র অভিনয় দেখবার নেমন্তন্ন পেলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। তখন পর্যন্ত কোন মঞ্চে অভিনয় করেন নি অর্ধেন্দুশেখর, যশ-খ্যাতির বিন্দুমাত্র নেই তাঁর। তাহলে কোন্ সুবাদে নেমন্তন্ন পেলেন তিনি? নেমন্তন্ন পেয়ে এসে কেমন অভিনয় দেখলেন?

অর্ধেন্দুশেখর বলেছেন ঃ 'আমি নব-নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। তখনও আমি থিয়েটারের কেহই নহি, থিয়েটারও আমার কিছুই নহে; সুতরাং তখন আমার নিমন্ত্রণ সে হিসাবে হয় নাই। তখন আমার প্রাণে অস্ফুটরূপে নাট্যরসবোধের সঞ্চার হইয়াছে, তাহাও কেহ জানিতেন না। বোধ হয়, আমিও তাহা ঠিক বুঝিতাম কি না সন্দেহ। ফলতঃ নাট্যরসজ্ঞ বলিয়া আমি নিমন্ত্রিত হই নাই। ... এই নাট্য-সম্প্রদায়ের অন্যতম উদ্যোক্তা শ্রীনাথ ঠাকুরের খুড়তুতো ভগ্নীর জ্যেষ্ঠা কন্যাকে আমি বিবাহ করিয়াছিলাম। এই আত্মীয়তার জন্যই আমি নিমন্ত্রিত হই।

'যথাসময়ে অভিনয় দেখিলাম। ··· এই নব-নাটকের অভিনয় দেখিয়া অভিনয়-সম্বন্ধে আমার আর যাহা কিছু দেখিবার, শুনিবার ও জানিবার ছিল, তাহা দেখা শুনা ও জানা হইয়া গেল। এই অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর ও মনোরম হইয়াছিল। সুসঙ্গত অভিনয়ের সহিত সুসঙ্গত দৃশ্যপটাদি থাকিলে অভিনয় কতটা হৃদয়স্পর্শী হয়, তাহা আমি এই অভিনয় দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। ··· এখানকার অতি সামান্য অংশের অভিনেতাটি পর্য্যন্ত অতি দক্ষতার সহিত প্রকৃত বস্তুর অনুকরণ করেন। ঢঙ্-ঢাঙ্, চাল-চলন, বলা-কহা, চলা-ফেরা, বসা-দাঁড়া, হাসা-কাঁদা, কিছুতেই কোন অভিনেতাকে কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয় নাই। যাহাকে দেখি, সে-ই যেন স্বীয় অভিনেতব্য বিষয়ে মূল প্রকৃত ব্যক্তি। একটা কিছুর নকল বা অভিনয় দেখিতে আমরা সাজিয়া গুজিয়া আসিয়া বসিয়াছি, আর আমাদের সম্মুখে পুতুল-নাচের মত রঙ্গীন পোষাকে সাজিয়া অভিনেতারা হাতমুখ নাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন, এরূপ ভাব একবারও মনে হয় নাই। অভিনেতব্য ব্যাপার ও অভিনয়গুলি এতটা মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল যে, আমরাও (দর্শকগণও) ঐ ব্যাপারের সহিত কোনরূপে লিপ্ত নই, এরূপ একটা স্বাতন্ত্র্য বোধ করিবার অবসর পাই নাই।···'

সে সময়ে মহোৎসাহে কলকাতার এখানে-ওখানে নাট্যাভিনয় হয়েছে—বৌবাজারে, গরাণহাটায়, ভবানীপুরে, কাঁসারীপাড়ায়, আড়পুলিতে, কয়লাঘাটায়।

বৌবাজারে অভিনয়ের আয়োজন করেছেন চুনিলাল বসু আর বলদেব ধর। মনোমোহন বসু বলদেব ধরের শ্বশুর মহাশয়ের বন্ধু। খুব চমৎকার গান বাঁধতে পারেন মনোমোহন। নাটকের জন্যে মনোমোহনকে গিয়ে ধরা হল। মনোমোহন কথা দিলেন, নতুন নাটক লিখে দেবেন।

নাটকের দিক তো হল, এবার মঞ্চ বেঁধে ফেলতে হয়। কোথায় মঞ্চ হবে? বিশ্বনাথ মতিলাল লেনে গোবিন্দচন্দ্র সরকারের বাড়ি; তিনি নিজের বাড়ির উঠোনটি ছেড়ে দিলেন, সেখানে রঙ্গমঞ্চ বাঁধা হল। সেখানে প্রথম অভিনয় হল ১৮৬৮ সালের গোড়ার দিকে। নাটকের নাম 'রামাভিষেক'। হ্যাঁ, মনোমোহন বসুর লেখা।

দলে-দলে অভিনয় দেখতে আসেন নিমন্ত্রিতেরা। অভিনয়-রাত্রে দর্শকদের জন্যে জলখাবার আর পান-তামাকের নিপুণ বন্দোবস্ত থাকে। সাজসজ্জার খুব

ঘটা। ওয়েলিংটন স্ট্রীট থেকে নাট্যশালা অবধি সারাপথ জুড়ে সুন্দর তোরণের পর তোরণ।

তা এই বৌবাজার বঙ্গ-নাট্যালয় চিরকাল গোবিন্দচন্দ্র সরকারের বাড়ির উঠোনে থাকে নি। ওখান থেকে ঠিকানা বদল করে চলে এসেছে পঁচিশ-নম্বর বিশ্বনাথ মতিলাল লেনে। সেখানে নতুন করে মঞ্চ বাঁধা হল। বড় বড় নারকেল গাছ কেটে এনে, তাতে মাটির প্রলেপ আর সাদা রঙ লাগিয়ে থাম তৈরী করা হল। একে-একে এখানে দু-খানা নতুন নাটকের অভিনয় হয়েছে—'সতী' আর 'হরিশ্চন্দ্র'। দু-খানাই মনোমোহন বসুর লেখা।

মাত্র দিনকয়েক হয়েছিল 'হরিশ্চন্দ্রে'র অভিনয়, কিন্তু 'সতী'র অভিনয় হয়েছিল দিনের পর দিন। বৌবাজার বঙ্গ-নাট্যালয়ে 'সতী'র প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৮৭৪ সালের ১৭ই জানুয়ারী, শেষ অভিনয়ের তারিখ ১৮৭৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল প্রতি শনিবার অভিনয় হয়েছে।

'সতী'র একখানা টিকিটের প্রতিলিপি ঃ

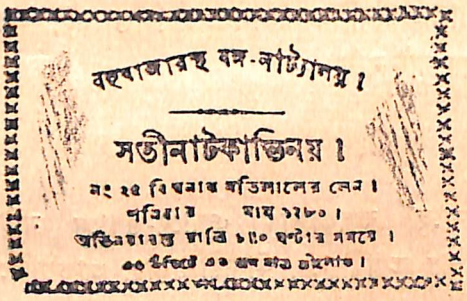

কিন্তু বৌবাজারের আগে কয়লাঘাটায় একটা জমজমাট অভিনয় হয়ে গেছে। ১৮৬৭ সালের ২রা নভেম্বর হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কয়লাঘাটার বাড়িতে প্রথম অভিনীত হয়েছে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কিছু কিছু বুঝি' নামে একখানা প্রহসন। এখানেই প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। এখানেই প্রথম স্টেজ-ম্যানেজার হয়েছেন ধর্মদাস সুর।

শুনতে পাই, এই 'কিছু কিছু বুঝি'র অভিনয় দেখেই মাইকেল মধুসূদন বলে উঠেছিলেন—মৃত্তিকে রে বাবা, মৃত্তিকে!

অর্থাৎ, এই অভিনয়ের তুলনায় আগের অন্য সমস্ত অভিনয় মাটি, একেবারে মাটি।

—ঃঃ০ঃঃ—

দুই

এবার বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারে আসি।

এই 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার'ই পরে নাম বদলে 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' হয়। কিন্তু সে তো পরের কথা।

১৮৬৮ সালে সপ্তমী পুজোর রাত্রে এই দল প্রথম অভিনয় করল দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'। অভিনয় হল বাগবাজারে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে। 'সধবার একাদশী'র দ্বিতীয় অভিনয় হল পরের কোজাগর পূর্ণিমার রাত্রে শ্যাম-পুকুরে নবীনচন্দ্র সরকারের বাড়িতে।

এই অভিনয়ের পর, শুনতে পাই, নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের একটু মনান্তর হয়ে গেল। অর্ধেন্দুশেখর বলেছেন ঃ 'এই অভিনয়ের পর নগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে গিরিশবাবুর মনান্তর হয়। সেই সূত্রে গিরিশবাবু আমাদের দল ছেড়েছিলেন। তবে এর পর যতবার অভিনয় হয়েছে, ততবারই তিনি আমাদের সঙ্গে গিয়ে নিমচাঁদের অংশ অভিনয় করে এসেছিলেন। তাঁর এই সহৃদয়তায় আমরা সকলে তাঁর কাছে বাধ্য ছিলাম।...'

'সধবার একাদশী'র চতুর্থ অভিনয় হলো ১৮৭০ সালের শ্রীপঞ্চমীর রাত্রে রায় রামপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাড়িতে। সেদিন কে কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন? নিমচাঁদ সেজেছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অটল সেজেছিলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনচন্দ্র সেজেছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, রামমাণিক্য সেজেছিলেন রাধামাধব কর, কাঞ্চন সেজেছিলেন নন্দলাল ঘোষ।

দীনবন্ধু মিত্র এই নাট্যাভিনয় দেখতে এসেছিলেন। জীবনচন্দ্রের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয় দেখে তিনি মুগ্ধ। নাটকছাড়া কাণ্ড করেছেন অর্ধেন্দুশেখর, জীবনচন্দ্ররূপে তিনি অটলকে লাথি মেরে চলে গেছেন। দীনবন্ধু তাতে রাগ করলেন না, অর্ধেন্দুশেখরকে বললেন—'ও Improvement on the author হয়েছে। আমি এবার 'সধবার একাদশী'র নূতন সংস্করণে লিখে দেবো, অটলকে লাথি মেরে গমন।'

সারদাচরণ মিত্র এই অভিনয় দেখেছিলেন তরুণ বয়সে। পরিণত বয়সে তিনি লিখেছিলেন ঃ 'সধবার একাদশী' পূর্বে পড়িয়াছিলাম; কিন্তু সেদিনের অভিনয় দেখিয়া, বিশেষত 'নিমচাঁদের অভিনয় দেখিয়া আমি আনন্দে আপ্লুত হইলাম। বয়োবৃদ্ধিবশত ক্রমশ অনেক জিনিষ ভুলিয়াছি, আরও কত ভুলিব, ইংরাজী, বাঙলা, সংস্কৃত, অনেক নাটক পড়িয়াছি, অধিকাংশের নামমাত্র স্মরণ আছে। কিন্তু সে রাত্রের নিমচাঁদের অভিনয় বোধ হয় কখন ভুলিব না।'

অন্যের কথা কি, স্বয়ং দীনবন্ধু মিত্র 'সধবার একাদশী' দেখে গিরিশচন্দ্রকে বললেন—তুমি না থাকলে এ-নাটক অভিনয় হত না। নিমচাঁদ যেন তোমার জন্যেই লেখা।

নিমচাঁদরূপী গিরিশচন্দ্রের নামে এখানে একটা মজার খবর আছে।

স্টেজে মদ্যপানের অভিনয় দেখাতে হলে সচরাচর কী করা হয়? আর কি, মদের বোতলে লাল জল ভরা থাকে, সেই ঠাণ্ডা জল খেয়ে মদ্যপানের ভান করতে হয় অভিনেতাকে। 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ প্রচণ্ড মাতাল। গিরিশচন্দ্র বললেন—রাত্তিরে বোতল-বোতল ঠাণ্ডা জল খেয়ে গলায় সর্দি বসে যাবে। আসল মদ না হলে চলবে কেন?

তা সেই আসলের ব্যবস্থাই হয়েছে।

আরও কয়েকবার 'সধবার একাদশী'র অভিনয় করেছে বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার।

'সধবার একাদশী'র বৃত্তান্ত শেষ হয়ে যাবার আগের একটা কথা এখানে বলা হয়ে যাক।

'যাক', অর্ধেন্দুশেখর বলেছেন, 'তারপর আমাদের বড় অর্থকষ্ট উপস্থিত হল, এমন হয়ে এল—দল বন্ধ হয়ে গেল। দল গেল বটে, কিন্তু নগেন্দ্রবাবুর বাড়ির আমাদের মজলিস ভাঙল না। এ সময়েও গিরিশবাবু আমাদের মধ্যে ছিলেন না অর্থাৎ আমরা তাঁকে আমাদের পরামর্শের মধ্যে পেতাম না। নগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে যে মনান্তর হয়েছিল, তাই নিয়ে তিনি আসতেন না, তবে দলের আর পাঁচজনের অনুরোধে ও বন্ধুত্বের সমাদর রেখে প্রয়োজনের সময় অভিনয়ও করতেন, আর যা যখন বলা যেত তাও করতেন।...'

তারপর 'লীলাবতী'র মহলার কথায় চলে আসি। 'লীলাবতী'র মহলার কথায় প্রথমেই গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা এসে যাচ্ছে। গোবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায় দলের একজন নতুন বন্ধু।

অত্যন্ত অমায়িক মানুষ এই গোবিন্দবাবু। অল্প কিছুদিনের মধ্যে এমন

বন্ধুত্ব হয়ে গেল যে দলের সকলেই গোবিন্দবাবুর একটা নতুন নাম রাখল—গোবে বাঙ্গাল। তা এই নামে গোবিন্দবাবুও মহাখুশী। 'গোবে অফ্ বেঙ্গল' বলে নিজেই তিনি পরিচয় দিতেন। একদিন তো তিনি মতিলালকে বললেন—আপনি যদি কোনদিন থিয়েটারের ব্যাপারে আমার নামটা ছাপেন, 'গোবিন্দ' না ছাপিয়ে 'গোবে অফ্ বেঙ্গল'ই ছাপাবেন কিন্তু!

বাগবাজারে গোবিন্দবাবুর শ্বশুরবাড়ি। সেখানেই এই থিয়েটারের দলের আখড়া বসল। গোড়ার দিকে গিরিশচন্দ্র সে-আখড়ায় আসেন নি। তার আর উপায় কি। গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়েই 'লীলাবতী'র মহলা চলতে লাগল। আখড়া-খরচ গোবিন্দবাবু চালাচ্ছেন।

মহলা তো একরকম চলেছে, কিন্তু অভিনয় হবে কেমন করে? অভিনয় করতে খরচ আছে—স্টেজের খরচ, পোশাকের খরচ, আরও সব কতরকম খরচ—সে-খরচ কে দেবে? কেউ দেবে না!

তখন কোথাও একটা স্টেজ ভাড়া করে টিকিট বেচে অভিনয় করার কথা উঠল। তাহলে হয়তো কিছু টাকার যোগাড় হতে পারে। তারপর কোথাও একটা স্থায়ী স্টেজ বাঁধবার চেষ্টা করা যাবে।

তা এ-কথা মন্দ নয়।

নগেন্দ্রনাথের বাড়িতে একদিন 'লীলাবতী'র ড্রেস-রিহার্সাল হয়ে গেল। এই ড্রেস-রিহার্সালের পরে গিরিশচন্দ্র আখড়ায় এসেছেন।

আখড়ায় এলেন বটে, কিন্তু গিরিশচন্দ্র কিছুতেই ভালো বাড়ি ভালো স্টেজ না করে টিকিট বেচে থিয়েটার করতে রাজী হলেন না। গিরিশচন্দ্র আরেকটা পরামর্শ দিলেন। বললেন—মাইকেলের কথামত সকলে পাঁচহাজার টাকা চাঁদা তোলবার চেষ্টা দেখ।

তা এ-পরামর্শও ভালো। চাঁদার খাতা তৈরি হয়ে গেল। কিসের জন্যে চাঁদা? না, সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্যে চাঁদা।

শহরের বড়মানুষদের কাছে গিয়ে চাঁদা চাওয়া দরকার। প্রথমেই যাওয়া হল যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছে। যতীন্দ্রমোহনের ভগ্নীপতি নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন সেখানে। চাঁদার কথা শুনে নবীনচন্দ্র বললেন—বাপু, তোমাদের বোধ হয় আমোদের পয়সার অভাব হয়েছে, সাধারণের জন্যে থিয়েটার হল আর না হল বড় বয়েই গেল, আর বোধ হয় তার কোন দরকারও নেই।

চাঁদার জন্যে প্রথম যে বড়মানুষের বাড়িতে যাওয়া হল, সেখানেই এই

সম্ভাষণ! আরও কয়েকজন বড়মানুষের বাড়িতে যাতায়াত করা হল, কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হল না। তা হলে আর বড়মানুষদের দুয়ারে গিয়ে কাজ নেই। বরং পাড়ার গেরস্থদের কাছে দু-পাঁচ টাকা করে চাঁদা আদায় করাই ভালো।

একটা কথা বলা হয় নি। কর্মকর্তারা নিজেরাও কুড়ি-পঁচিশ টাকা করে চাঁদা সই করেছেন এক-একজন।

কুড়িয়ে-বাড়িয়ে চাঁদা আদায় হল সাকল্যে আড়াইশো টাকা।

তখন যে-টাকা হাতে এসেছে, তাই নিয়েই কাজ আরম্ভ করা গেল। টাকা শেষ হল, কিন্তু কাজ শেষ হল না।

টাকা দরকার, টাকা দরকার। অর্ধেন্দুশেখর আবার একদিন বললেন—স্টেজ ভাড়া করে টিকিট বেচে থিয়েটার করে কিছু টাকা তোলার চেষ্টা করি।

ভালো বাড়ি ভালো স্টেজ না করে টিকিট বেচে থিয়েটার? না, গিরিশচন্দ্র তাহলে ওতে নেই। গিরিশচন্দ্র বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন।

ধর্মদাসের বাড়ির সামনে একটা ছাড়া-ভিটেয় মঞ্চ বেঁধে টিকিট বেচে থিয়েটার করা হবে, পরামর্শ করে এই ঠিক করা গেল।

ব্রজনাথ দেব গিরিশচন্দ্রের শালা। অনেকদিন আগে থেকেই ব্রজনাথ দেবের একটা স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ তৈরি করার ইচ্ছা হয়। ব্রজনাথ চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি। কিছু টাকাকড়ি যোগাড় করে রঙ্গমঞ্চের কাজ তিনি আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। সেই রঙ্গমঞ্চ তৈরি হচ্ছিল শ্যামপুকুরে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, পাটাতন অবধি তৈরি হতে-না-হতেই ব্রজনাথ অসুখে পড়লেন, রঙ্গমঞ্চের কাজ বন্ধ হয়ে গেল, স্টেজের কাঠকুটো সব পড়ে রইল। সব পড়ে মাটি হবার দশা।

এবার এই দলের প্রায় সকলে মিলে একদিন ব্রজনাথের কাছে গিয়ে নিজেদের দলের টিকিট বেচে মঞ্চ বেঁধে থিয়েটারের কথা বললেন তাঁকে। তাঁর স্টেজের কাঠকাঠরাগুলো চাইলেন। ব্রজনাথ আপত্তি করলেন না।

['লীলাবতী'র অভিনয়ের আগের এসব বিবরণের জন্য প্রধানত অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর স্মৃতিকথার উপর নির্ভর করেছি। আলোচ্য বিষয়ে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর স্মৃতিকথার সঙ্গে রাধামাধব করের স্মৃতিকথার মোটামুটি মিল আছে। রাধামাধবের স্মৃতিকথা থেকে জানা যাচ্ছে, দলের সকলে ব্রজনাথ দেবের কাছ থেকে স্টেজের মালপত্র প্রার্থনা করে নিয়ে আসে।

কিন্তু এ-ব্যাপারে সম্পূর্ণ উল্টোকথা বলছেন ধর্মদাস সুর। শেষশয্যায় শুয়ে ধর্মদাস 'আত্মজীবনী' লিখেছেন। সেই 'আত্মজীবনী' ছাপা হয়েছে ধর্মদাসের

মৃত্যুর পরে। ধর্মদাস 'আত্মজীবনী'তে লিখেছেন ঃ "গিরিশবাবুর শ্যালক ৺ব্রজেন্দ্র নাথ (যিনি অ্যাটকিনসন-এর বুককিপার ছিলেন) ব্যাপারিদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া একটি স্টেজ শ্যামপুকুরে তাঁহারই বাটীর নিকট আরম্ভ করেন। এই নির্ম্মাণ কার্য্যের সমস্তই আমার উপর ভার ছিল, কিন্তু অকালে আমার সুহৃদ্ ব্রজবাবুর কাল হওয়ায় উক্ত কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল ও ঐ প্ল্যাটফরম্ ইত্যাদি পড়িয়া মাটি হইতে লাগিল। তখন গিরিশবাবু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "যদি ঐ কাঠকুটো সব আমি তোমাদের দেওয়াইতে পারি, তোমরা স্টেজ ভাল করিয়া করিতে পারিবে কি ?" আমরা সকলে বলিলাম—অবশ্য পারিব। তখন তিনি তাঁহার অপর শ্যালককে (দ্বারকানাথ দেব) বলিয়া ঐ সমস্ত কাঠ আমাদের দেওয়াইয়া দিলেন।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ধর্মদাসের লেখা 'আত্মজীবনী' সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র মন্তব্য করেছেন ঃ 'তাঁহার লেখায় সমস্ত ঘটনাই বর্ণিত আছে, তবে রুগ্নাবস্থায় বহুদিনের কথা লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া দুই এক স্থলে ভ্রম হইয়াছে। যে যে স্থলে ভ্রম ঘটিয়াছে, তাহা তিনি জীবিত থাকিলে উভয়ে মিলিয়া সংশোধিত করিতে পারিতাম।...'

না, আলোচ্য বিষয়ে গিরিশচন্দ্র কিম্বা দলের আর-কেউ স্পষ্টাক্ষরে আর কিছুই বলেন নি।]

দলের প্রায় সকলেই একটা বলবার মত কাজ করেছেন তখন। নিজেরাই গভীর রাত্রে ওসব জিনিসপত্র শ্যামপুকুর থেকে বাগবাজারে ঘাড়ে করে নিয়ে এসেছেন। ঠিক এই সময়ে—

ঠিক এই সময়ের খানিক বৃত্তান্ত অর্ধেন্দুশেখরের মুখ থেকে শুনি ঃ 'ঠিক এই সময়ে একটা ইংরাজ নাবিক ভিক্ষা করতে আসে, তার নাম ম্যাকলীন।—তার থাকবার স্থান, খাবার উপায় ছিল না। ধর্মদাসবাবু তাকে আহার দিতে স্বীকার করেন। তারপর যৎসামান্য খরচ করে আমরা জমিটাকে ঘিরে নিয়েছিলাম বটে, কিন্তু লোকাভাবে টুকরো কাঠ চুরি যেতে লাগল দেখে, ওই সাহেবটাকে তার রক্ষক রাখা গেল। সে ধর্মদাসবাবুর বাড়িতে খেত আর সেই মাঠে পড়ে থাকত। তাকে দিয়ে আমরা কুলীমজুরের কাজও করিয়ে নিতেম। লোকটা জাহাজে থাকার জন্য অনেকগুলো রং প্রস্তুত করতে জানত। আমরা তাকে দিয়ে অল্প খরচে অনেকগুলো রং প্রস্তুত করিয়ে নিয়েছিলাম। ধর্মদাসবাবু আঁকতেন, ক্ষেত্রমোহন যোগাড় দিতেন আর সাহেব রং বেটে রং ফলিয়ে দিত। কিছুদিন

থাকতে থাকতে সাহেব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর নিয়োগীর কোচম্যান হয়ে গেল। লোকটার বস্ত্রাদি নেই দেখে কৃষ্ণকিশোরবাবু একসুট ইংরাজী পোশাক কিনে দিলেন, পোশাক পেয়ে একদিকে চলে গেল আর এল না।'

দৃশ্যপট আঁকা আর প্ল্যাটফর্ম তৈরির কাজ যখন অর্ধেক এগিয়েছে, এমন সময় খবর পাওয়া গেল, কে একজন উৎসাহী ভদ্রলোক এসব আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেবার চেষ্টায় আছে। এতজনের এত কষ্টের জিনিস একজনের অপকর্মে ভস্ম হয়ে যাবে!

তখন ধর্মদাসের পরামর্শে একদিন সমস্ত খুলে শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। রাজেন্দ্রনাথ এঁদের বাল্যবন্ধু। রাজেন্দ্র নাথের কাছে আশ্রয় মিলল, সাহায্য মিলল। রাজেন্দ্রনাথের বাড়ির উঠোনেই নাট্যমঞ্চ বাঁধা হতে লাগল। ঠিক হল থিয়েটার হবে, টিকিট হবে না।

ওদিকে ১৮৭২ সালের ৩০শে মার্চ চুঁচুড়ায় অভিনীত হল দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী'। এই অভিনয়ের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন দুজন স্বনামধন্য ব্যক্তি—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

সেই অভিনয়ের জন্যে 'লীলাবতী' নাটকের কিছু কিছু কাটা-জোড়া করলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র। তা নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র বলেছিলেন—একেকটি শব্দ কাটা হয়েছে, আর আমার শরীর থেকে রক্তপাত হয়েছে। তবে বঙ্কিম ভাই, আর অক্ষয় ছেলে, এদের ভালবাসি বলে, আমার শরীরে জ্বালা লাগে নি।

যা হোক, চুঁচুড়ায় 'লীলাবতী' অভিনয়ের খুব সুখ্যাতি হল। ভাটপাড়ার ভট্টাচার্যেরা অভিনয় দেখে খুশি হয়ে বললেন—যেমনটা শ্রোত ছেলাম, তেমনটাই দ্যাখলাম।

কিন্তু চুঁচুড়ার কাছে কি বাগবাজার হেরে যাবে? বাগবাজার কি পারবে না? দীনবন্ধু অর্ধেন্দুশেখরকে বললেন—তোমরা পারবে না।

নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দ, ধর্মদাস ও অর্ধেন্দুশেখর গেলেন গিরিশচন্দ্রের কাছে। অর্ধেন্দুশেখর গিরিশচন্দ্রকে বললেন—চুঁচুড়ার দলের কাছে হেরে যাব, তুমি কি বসে-বসে দেখবে?

না, তা হয় না। ওঁরা 'লীলাবতী' নিয়ে উঠে-পড়ে লাগলেন। পয়সার জোর নেই, সামান্য চাঁদার টাকায় কাজ চালাতে হচ্ছে। ওঁরা প্রথম 'লীলাবতী অভিনয় করলেন ১৮৭২ সালের ১১ই মে, শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়ির

উঠোনে। মুক্ত আকাশতলে দর্শকদের আসন পাতা হয়েছে। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টিতে সব কিছু ভিজে একাকার। তা সেই ভিজে চেয়ারে বসেই দর্শকেরা অভিনয় দেখলেন। 'লীলাবতী'তে হরবিলাস ও দাসীর ভূমিকা নিলেন অর্ধেন্দুশেখর, ক্ষীরোদবাসিনী সাজলেন রাধামাধব কর, ললিত-মোহনের ভূমিকা নিলেন গিরিশচন্দ্র, হেমচাঁদ সাজলেন নগেন্দ্রনাথ। পর-পর তিন শনিবার ওখানেই 'লীলাবতী' অভিনীত হল। এই অভিনয়ের সময় বাগবাজারের দলের নাম—শ্যামবাজার নাট্যসমাজ।

দীনবন্ধু মিত্র গিরিশচন্দ্রকে বললেন—তোমাদের অভিনয়ের সঙ্গে চুঁচুড়া-দলের তুলনাই হয় না। আমি চিঠি লিখবো, 'হুয়ো বঙ্কিম!'

'লীলাবতী' অভিনয়ের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল দিগ্বিদিকে। দলে-দলে মানুষ 'লীলাবতী' দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছে। সকলেই 'লীলাবতী' দেখতে ইচ্ছুক। কিন্তু সকলকে দেখানোর মত জায়গা কই!

দলের কর্তারা সকলে জানিয়ে দিয়েছেন—য়ুনিভার্সিটি সার্টিফিকেট না দেখালে আমরা টিকিট দেব না।

ইচ্ছা হলেই সব সময় উপায় হয় না। কারও কারও 'লীলাবতী' দেখার ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু উপায় হয় নি শেষ পর্যন্ত।

না, সকলে দেখতে পায় নি 'লীলাবতী'। যারা নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে, তারাই শুধু দেখতে পেয়েছে। অনিমন্ত্রিত যারা এসেছে, তারা কেউ-কেউ দেখতে পেয়েছে, কেউ-কেউ ফিরে গেছে হতাশ হয়ে।

'লীলাবতী'র সাফল্য দেখে দলের উৎসাহ বাড়ল। 'নীলদর্পণে'র মহলা আরম্ভ করা গেল। কিন্তু দলের কারওই এমন সঙ্গতি নেই যে, টাকাকড়ি খরচ করে সাড়ম্বরে থিয়েটার চালিয়ে যায়। থিয়েটারের সাজ-সরঞ্জাম কিনবার খরচ আছে, তা জোটে কোত্থেকে। পাড়ার লোকের কাছে কাহাতক চাঁদা চাওয়া যায়!

না, চেয়ে-চিন্তে আর নয়, এবার থেকে টিকিট বেচে থিয়েটার চালাতে হবে।

প্রস্তাব উঠল সেই রকম। টিকিট বেচে নাট্যশালা স্থায়ী করা হোক। নতুন নাট্যশালার নাম হোক—ন্যাশনাল থিয়েটার।

প্রস্তাবে রাজি হলেন অনেকেই। কিন্তু প্রবল আপত্তি তুললেন গিরিশচন্দ্র। এই নিয়ে মতভেদ হল। উত্তরকালে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন: 'ন্যাসানাল থিয়েটার নাম দিয়া, ন্যাসানাল থিয়েটারের উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম ব্যতীত, সাধারণের সম্মুখে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা আমার অমত ছিল। কারণ একেই তো

তখন বাঙ্গালীর নাম শুনিয়া ভিন্নজাতি মুখ বাঁকাইয়া যায়, এরূপ দৈন্য ন্যাসানাল থিয়েটারে দেখিলে কি না বলিবে—এই আমার আপত্তি। ন্যাসানাল থিয়েটার নামে অনেকেই বুঝিবে যে ইহা জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টায় ইহা স্থাপিত। কিন্তু কয়েকজন গৃহস্থ যুবা একত্র হইয়া ক্ষুদ্র সরঞ্জামে ন্যাসানাল থিয়েটার করিতেছে, ইহা বিসদৃশ জ্ঞান হইল। এই মতভেদ।'

হ্যাঁ, এই মতভেদ। গিরিশচন্দ্র বললেন—পেশাদার যদি হতে হয়, তবে এ রকমে হওয়া হবে না। একেবারে যদি ছাতুবাবুর মাঠে প্যাভিলিয়ন করতে পার, আমি রাজি আছি।

এ তো অসম্ভব কথা। বড় বাড়ি ও ভালো রঙ্গমঞ্চ করা অনেক টাকাকড়ির ব্যাপার। সে রকম সামর্থ্য যখন নেই, তখন যেমন সাধ্য তেমনি হবে।

তাই হল। সাব্যস্ত হল টিকিট বিক্রি করে থিয়েটার চালানো হবে। তখন গিরিশচন্দ্র দল ছেড়ে চলে গেলেন।

গিরিশচন্দ্র গেলেন, কিন্তু আর-সকলে তো রইলেন। 'নীলদর্পণে'র মহল' চলতে লাগল।

সেই মহলা হত ভুবনমোহন নিয়োগীর বাড়িতে। ভুবনমোহন তাঁর বাড়ির দোতলার হলঘর ও একটা কুঠুরী 'নীলদর্পণে'র মহলার জন্যে ছেড়ে দিলেন। একটি টেবিল-হারমোনিয়মও দিলেন তিনি। সন্ধ্যার আগে পুরনো খানসামা নবীন এসে একটা আলো জ্বেলে দিয়ে যায়, খানিকটা তামাক আর আগুনের জোগাড় রেখে যায়। 'নীলদর্পণে'র মহলা চলে পুরোদমে।

চিৎপুরে মধুসূদন সান্যালের বাড়ির উঠোনটি ভাড়া নেওয়া হল মাসিক চল্লিশ টাকায়। সেখানে স্টেজ তৈরি করা হল। 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের বিজ্ঞাপন দেওয়া হল।

এই ন্যাশনাল থিয়েটার। এখানে প্রথম অভিনীত হল 'নীলদর্পণ'—১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর। সেদিন টিকিট বিক্রি করে উপার্জন হল দুশো টাকা। ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয় রাত্রির কথা অর্ধেন্দুশেখরের মুখ থেকে শুনি ঃ 'কন্‌সার্ট বেজে উঠল। কন্‌সার্টে সেদিন কাশীদাস সান্ন্যাল হারমোনিয়ম, নিতাই ওস্তাদজী বেহালা, গৌরদাস বাবাজী বেহালা, বোসপাড়া নিবাসী সুবিখ্যাত বেহালা-বাদক রাজাবাবু বেহালা, আর শ্যামপুকুর নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ওরফে কাণা যোগে ঢোল বাজিয়েছিলেন। ... তাহাদের বাজনার ধুম দেখে কে ? ...

শ্রোতারা মোহিত হয়ে গেলেন, কিন্তু অভিনয়ে বড় বিলম্ব হতে লাগল আমরা মধ্যে মধ্যে বলতে লাগলাম—আমরা প্রস্তুত, আপনারা বন্ধ করুন। তখন তাঁরা মত্ত, কে সে কথা শোনে? সহরের অধিকাংশ গুণগ্রাহী বড়মানুষ এবং সঙ্গীতজ্ঞ লোক একস্থানে জড় হয়েছেন, বাহবা দিচ্ছেন, তাঁরা কি সে অবসরে সে মত্ততা সহজে কাটাতে পারেন? যাই হোক শেষে অভিনয় আরম্ভ হল। সুশৃঙ্খলে শেষও হল। দর্শকে কেঁদে কেটে সারা হয়ে গেল। সহস্রমুখে প্রশংসা বৃষ্টি হতে লাগল। আমরা আনন্দে প্রত্যেকে যেন ডবল ফুলে উঠলেম।'

১৮৭২ সালের ১২ই ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) 'অমৃত বাজার পত্রিকা' লিখেছে ঃ

'ন্যাসানাল থিয়েটার'

'নীলদর্পণ অভিনয়। —গত শনিবারে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। নাটকের অভিনয় কলিকাতা সহরে বা মফস্বলেও নূতন নহে। কিন্তু এ সেরূপ অভিনয় নহে। খোসপোষাকী বাবুদিগের বৈঠকী সকের অভিনয় নহে। সে সকলের স্থায়িত্ব অনেক অব্যবস্থিত চিত্তের প্রসাদের উপর নির্ভর করে, তাহাতে প্রায়ই সাধারণের মনোরঞ্জন হইবার সম্ভাবনা নাই। নীলদর্পণের অভিনেতৃগণ সমাজবদ্ধ হইয়া এই অভিনয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহারা টিকিট বিক্রয় করিতেছেন ও সেই অর্থে অভিনয়সমাজের উন্নতি ও পুষ্টি সাধন করিবেন মানস করিয়াছেন। আমরা একান্ত মনে তাঁহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি। এখন সকলে দেখিতে পারিবে অভিনয় ক্রিয়া চিরস্থায়িনী হইবে। মাছের তেলে মাছ ভাজা চলিবে, কাহারো খোসামোদ করিতে হইবে না। আর এরূপ অভিনয়সমাজ দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আর একটি মহৎ ফল ফলিবে। উপযুক্ত গ্রন্থকারগণ নাটক লিখিতে উৎসাহিত হইবেন, ভরসা অচিরাৎ আমরা দুই এক খানি ভাল নাটক পাঠ করিতে পারিব।

অভিনয় সুচারু হইয়াছিল। আমরা পরিতৃপ্ত হইয়াছি। প্রথমে সূত্রধর যখন গানের পর 'আমাকে অর্থলোভীই বলুক আর যে যা বলুক, আমি দর্শকবর্গের উৎসাহ পাইলেই কর্তব্যকর্ম্ম সাধনে পরাঙ্মুখ হইব না' এই বলিয়া কিঞ্চিৎ সদর্প, কাতর স্বরে নিজ মনোবেদনা নিবেদন করিলেন, তখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, বাস্তবিক তিনি অসারগ্রাহী অল্প বিবেচক লোক কর্তৃক কটুবাক্যে পীড়িত হইয়াছেন। কিন্তু বঙ্গ সাহিত্য সমাজ তাঁহাকে উৎসাহ দানে কখনই বিমুখ হইবে না। আমরা ভরসা করি, এই অভিনয়সমাজ সকল বৈরী বাক্য অবহেলা-

পূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধনে নিযুক্ত থাকিবেন।

নীলদর্পণ নাটক দেশপ্রসিদ্ধ। ইহার গল্পভাগ অনেকেই জানেন। কিন্তু একথাও বলিতে হয় যে গত শনিবারে নীলদর্পণের 'নবযৌবন' হইয়াছে। শ্বেতাঙ্গগণের পক্ষপাতত্ব ও অত্যাচার অনেকেই মধ্যে মধ্যে দেখিতেছেন কিন্তু তথাপি সেই সকল কার্য্য রঙ্গভূমিতে অভিনীত দেখিলে একরূপ অপরূপ মনোভাব মনোমধ্যে প্রকটিত হইতে থাকে। সংসারে নানা প্রকৃতির শঠ ও বিশ্বাসঘাতক লোক আছে, কিন্তু ইয়াগো চরিত্র রঙ্গভূমিতে দেখিয়া মনোমধ্যে ঘোরতর ঘৃণা জন্মে। নূতন ফৌজদারি কার্য্যবিধি আইনের ফলাফল বিচার অনেকেই করিয়া মনে মনে ক্রন্দন করিতেছেন, কিন্তু রঙ্গস্থলে যখন নবীনমাধব বলিলেন যে, 'আবার যে নূতন আইন চলিবে শুনিতেছি তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ' বাক্য কয়েকটী উচ্চারিত হইবামাত্রেই দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে যে কোলাহল উপস্থিত হইল, তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। কিন্তু আর অরণ্যে রোদনে ফল কি? আমরা অভিনয় সমালোচনে ফৌজদারী কার্য্যবিধির কথা পারিলাম। এমনি দুর্দ্দশাই হইয়াছে, সকল কথাতেই দুঃখের কান্না চক্ষে আইসে। যাহা হউক অভিনেতৃগণ সম্বন্ধে কিছু বলা বোধ হয় কর্তব্য হইতেছে। নীলদর্পণের গুণানুবাদ করিবার আবশ্যক নাই এবং দীনবন্ধু বাবু পরিচিত গ্রন্থকার, তদীয় প্রশংসাবাদও নিষ্প্রয়োজন।

আর একটি কথা বলিতে হইতেছে। নীলদর্পণ অভিনয়ের প্রকৃত স্থান কলিকাতা নহে। মফস্বলে যে কাণ্ড হইতেছে তাহা কলিকাতার লোকেরা প্রায়ই জানিতে পারেন না। যখন নীলকর সাহেবের পদাঘাতে গরিব রাইয়ত ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল তখন কলিকাতাবাসী দর্শক-মণ্ডলীর মধ্যে উচ্চৈস্বরে হাস্যধ্বনি উঠিল। কয়েকটি পল্লীগ্রামের ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন তখন তাঁহারা ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাহাতেই আমরা বলি যে, এই নীলদর্পণ একবার কৃষ্ণনগরে, যশোহর বা বহরমপুরে অভিনীত হইলে ভাল হয়। আমরা ঐ সকল জেলার ধনবান জমিদারগণকে অনুরোধ করি যে, তাঁহারা এই অভিনেতৃগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া একবার অভিনয় করাউন। আমরা চরিতার্থ হইব। নীলকর নিষ্পীড়ন আর নাই মনে করিয়া উপেক্ষা করিবেন না। মফস্বলে কি হইতেছে তাহা আর কি বলিব?

অভিনেতৃগণের মধ্যে আমরা তোরাপেরই সম্যক প্রশংসা করি। তেজস্বী, প্রভুভক্ত তোরাপের চরিত্র সুন্দর প্রদর্শিত হইয়াছিল। গোলোক বসু ও গোলোক

বসুর গৃহিণীর চরিত্র একজন কর্তৃকই অভিনীত হইয়াছিল। ইনি একটি পাকা লোক। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইনি গৃহিণীর চরিত্রে তেমন সুন্দর রূপ দেখাইতে পারেন নাই। সাবিত্রী ও রেবতী অতি উত্তম, সৈরিন্ধ্রী তত ভাল হয় নাই। কিন্তু তাঁহার রোদনস্বর অপূর্ব্ব বলিতে হইবে। সরলা অতি সুশীলা, প্রকৃত ছোট বৌই বটে। আদুরি—উত্তম। আর অধিক সমালোচনের প্রয়োজন নাই। সকলেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। অভিনয় ক্রিয়াও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। আমরা নিকটে বসিয়াছিলাম, দৃশ্য সকলের বর্ণচাতুর্য্য তত উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কোন দোষও দেখি নাই। কিন্তু সঙ্গীত ভাগে কেহই তৃপ্ত হন নাই। শুনিলাম এই ন্যাসানাল থিয়েটার কোন বড় মানুষের বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। এটি একটী সামান্য কথা নহে। দেশের একটী প্রকৃতির স্ফূর্তি পাইতে চলিল। এমন সকল কার্য্যের আমরা নিয়ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। অভিনয় সমাজ চিরস্থায়ী হউক এবং দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে থাকুক।'

১৮৭২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারে 'জামাই বারিকে'র অভিনয় হল। সেদিন আড়াইশো টাকার টিকিট বিক্রি হল। আবার 'নীলদর্পণে'র হল ২১শে ডিসেম্বর। সেদিন সাড়ে-চারশো টাকার টিকিট বিক্রি হল।

ন্যাশনাল থিয়েটারে দ্বিতীয়বার 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের আগের দিন 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা সম্পাদকীয় মন্তব্য করল: 'নীলদর্পণ' নাটক ইংরেজদের পক্ষে মানহানিকর; তাই মানহানিকর অংশ বাদ না দিলে এই নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া উচিত।

এ সম্পর্কে নাট্যশালার সেক্রেটারি জানালেন: এই নাটকের মানহানিকর অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে। ইংরেজ-চরিত্রের প্রতি আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। ইংরেজদের বিদ্রূপ করা আমাদের নাটকাভিনয়ের উদ্দেশ্য নয়। বাঙলা দেশের গ্রাম্য জীবনযাত্রার চিত্র দেখানো আমাদের এই অভিনয়ের উদ্দেশ্য।

এই অভিনয়রাত্রে পুলিসের ডেপুটি কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন—কেউ যেন মনে না করেন যে আমি দর্শক ছাড়া অন্য কোন ভাবে এখানে এসেছি।

অভিনয়ের শেষে থিয়েটারের পক্ষ থেকে একজন নিবেদন করলেন—এই নাটকে পল্লীগ্রামের বিষয় উত্তমরূপে বর্ণিত আছে। সেজন্যই আমরা এর অভিনয় করছি। কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি দ্বেষবশত এই

অভিনয় করা হয় নি।

এই অভিনয় সম্পর্কে ইংরেজীতে দু-খানা চিঠি বেরোল ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায়। চিঠি দু-খানা আগুন্ত নিন্দা-বিদ্রূপে পরিপূর্ণ। চিঠি দু-খানার ভাষা-ভঙ্গির মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে আছে অপরিসীম বিদ্বেষবোধ। কিন্তু চিঠির নীচে কারও নাম নেই। আড়াল থেকে কে এমন বাণ নিক্ষেপ করলেন? কে লিখলেন এমন চিঠি?

কেউ কেউ বললেন—নিশ্চয়ই ও-চিঠি গিরিশচন্দ্র লিখেছেন।

'নীলদর্পণ' অভিনয়ের কিছুদিন পরে গিরিশচন্দ্র এই অভিনয় সম্পর্কে একটি শ্লেষাত্মক গান বাধলেন। গিরিশচন্দ্র নিজেই পরে বলেছেন, গানের শ্লেষ এই—'স্থান-মাহাত্ম্যে হাড়ি শুঁড়ি পয়সা দে দেখে বাহার'।

আর আশ্চর্যকাণ্ড, এই গানটিতে যাঁদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হয়েছে তারা নিজেরাই বাগবাজারের ঘাটে বসে হাসতে-হাসতে সুর করে ওটি গাইতে লাগলেন মহোৎসাহে।

ন্যাশনাল থিয়েটারে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনীত হতে লাগল একের পর আরেক নাটক—সধবার একাদশী, নবীন তপস্বিনী, লীলাবতী। তারপর ১৮৭৩ সালের ১৭ই জানুয়ারী অভিনীত হল 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ও কয়েকটি পেণ্টোমাইম। সেদিনই দেখানো হল—মুস্তফী সাহেব-কা পাকা তামাশা। এই পাকা তামাশার একটু ইতিহাস আছে। দেবকার্সন নামে একজন সাহেব অপেরা-হাউসে 'Bengali Baboo' নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেন। দেবকার্সন বিজ্ঞাপন দিতেন —Dave Carson Sahib-ka pucka Tumasha; অর্ধেন্দুশেখরও সাহেব সেজে আমোদ করলেন 'মুস্তফী সাহেব-কা পাকা তামাশা'য়। তারপর থেকেই লোকে অর্ধেন্দুশেখরকে 'সাহেব' বলে জানে। হ্যাঁ সাহেব সেজে বেহালা হাতে গান গাইলেন অর্ধেন্দুশেখর। মজার গানটি এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

The merry christmas is at hand
Sherry champagne let us try
And how 'twill be a jolly land
When pegs begin to fly.

Oh what a cheerful eve
Let us all the high way cry
And how happily we shall live
When pegs begin to fly.

কবি নবীনচন্দ্র সেন একখানা চিঠিতে (২৩শে মার্চ, ১৯০৬ সাল) গিরিশচন্দ্রকে লিখেছেন : 'আমার বিশ্বাস রঙ্গালয়ের দায়ে নাটক লিখিয়া তোমার প্রতিভা পূর্ণ-স্ফূর্ত্তি হইতেছে না।'



রূপমুগ্ধ ভাবে গিরিশচন্দ্র



ঘৃণা-বিরক্তি ভাবাভিনয়ে গিরিশচন্দ্র

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : 'বাল্যে গিরিশচন্দ্র আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং তখন হইতেই আমি তাঁহার গুণমুগ্ধ। গিরিশচন্দ্র যে কেবল আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ মাত্র তাহা নহে, গিরিশচন্দ্র আমাদের পূজার্হ ছিলেন।'



'বিসর্জনে' জয়সিংহরূপে রবীন্দ্রনাথ

শিশিরকুমার ভাদুড়ী বলেছেন ঃ
রবীন্দ্রনাথই দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। ষ্টেজের ওপর হাত ও আঙুল নিয়ে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি। হাত ও আঙুলের ব্যবহারই সবচেয়ে শক্ত কাজ, এবং সেকাজে পূর্ণ দক্ষতা ছিল কবির।

★

★

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ স্ত্রৈণ স্বামী যেমন লোকের কাছে উপহাস পায়, নাটক তেমনি যদি অভিনয়ের অপেক্ষা করিয়া আপনাকে নানা দিকে খর্ব করে তবে সে'ও সেইরূপ উপহাসের যোগ্য হইয়া উঠে।

★



'বাল্মীকি প্রতিভায়' বাল্মীকিরূপে রবীন্দ্র

হাম বড়া সাব হ্যায় ডুনিয়ামে
None can be compared হামারা সাট—
Mr. Mastfee name হামারা
চাট্‌গাঁও মেরা আছে বিলাট—
Rom-ti-tom-ti-tom &c.

গর কি মালেক আদ্‌মি কি মালেক
Lord of all hy-ham—
নেই সক্তা নিগর্স বাট্ মেরা tolerate
চুনাম গলি মেরা ধাম—
Rom-ti &c.

Dirty Niggers I hate to see
বড়া ময়লা উঃ বাপ রে বাপ
Holway pills হাম কায়েঙ্গে রাট্‌কো
Health রাখ নে মেরা সাফ্
Rom ti-tom &c.

Coat পিনি Pantaloon পিনি, পিনি মোর trousers
Every two years new suits পিনি
Direct from Chandny Bazar—
Rom-ti-tom &c.

চিংড়ি fish and কাঁচা কেলা the only Hazree once I [eat]
চারপাই is my Palang Posh, Morah is my Royal [seat]
Rom-ti-tom &c.

Chorus—
I am a gentleman.

তারপর ন্যাশনাল থিয়েটারে আবার অভিনীত হল 'নবীন তপস্বিনী'। অতঃপর বিজ্ঞাপন দেওয়া হল—আগামী ২২শে জানুআরী 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' অভিনয় হবে।

এই সময়েই একটা গোলমাল বেঁধে গেল ন্যাশনাল থিয়েটারের কর্মকর্তাদের মধ্যে। গোলমালের কারণ টাকাকড়ি। টাকা-পয়সার হিসেবপত্র নাকি ঠিক নেই।

সালিশীর জন্যে কমিটি হল, বৈঠক বসল। কমিটিতে ছিলেন নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু, হেমন্তকুমার ঘোষ।

শেষপর্যন্ত গোলমাল মিটে গেল।

কয়েকদিন পরে ন্যাশনাল থিয়েটারের ডিরেক্টর হলেন শিশিরকুমার ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তারপর ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হল—'নব-নাটক', 'নয়শো রুপেয়া', 'জামাই-বারিক' ও 'ভারতমাতা'। এবার 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকাভিনয়ের পালা।

কিন্তু 'কৃষ্ণকুমারী'তে ভীমসিংহের ভূমিকা কে নেবেন? সাব্যস্ত হল, গিরিশচন্দ্রই ভীমসিংহ সাজবেন। কিন্তু বিজ্ঞাপনে গিরিশচন্দ্রের নাম থাকতে পারবে না। গিরিশচন্দ্র বিজ্ঞাপনে নাম দিতে রাজী নন। তাই হল। বিজ্ঞাপিত হল: ভীমসিংহ—By a distinguished amateur.

১৮৭৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী অভিনীত হল 'কৃষ্ণকুমারী'।

সেদিন মাইকেল মধুসূদন অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। অভিনয়ান্তে ভেতরে এসে মাইকেল খুব সুখ্যাতি করলেন গিরিশচন্দ্রের, নগেন্দ্রনাথের, অমৃতলালের, অর্ধেন্দুশেখরের। নগেন্দ্রনাথ 'বলেন্দ্রসিংহ' সেজেছিলেন, অর্ধেন্দু-শেখর সেজেছিলেন 'ধনদাস'। ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 'কৃষ্ণকুমারী' সেজেছিলেন। মাইকেল ক্ষেত্রমোহনকে কোলে তুলে নাচতে-নাচতে বললেন —Krishna Kumary you have done to perfection.

নাটোরের মহারাজা চন্দ্রনাথ ন্যাশনাল থিয়েটারের খুব পোষকতা করেছেন। এই 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের মহলার সময়েও তিনি উৎসাহিত করেছেন অভিনেতাদের। ভীমসিংহের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের রিহার্সাল দেখে মহারাজা চন্দ্রনাথ স্বহস্তে আপন রাজবেশ পরিয়ে দিয়েছেন গিরিশচন্দ্রকে, গিরিশচন্দ্রের কটিদেশে ঝুলিয়ে দিয়েছেন আপন তরবারি! 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে মদনিকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন অমৃতলাল বসু। মদনিকা সেজে অমৃতলাল রঙ্গমঞ্চে নেমেছেন, এদিকে সাজঘরে অপেক্ষা করছেন মহারাজা চন্দ্রনাথ। অভিনয় শেষে অমৃতলাল সাজঘরে এলেন। আর আশ্চর্য কাণ্ড, মহারাজা চন্দ্রনাথ অনায়াসে হাঁটু গেড়ে বসে অমৃতলালের পায়ের মোজা খুলে দিলেন।

অমৃতলালের সলজ্জ প্রতিবাদ মহারাজা কানে নিলেন না।

১৮৭৩ সালের ৮ই মার্চ ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হল—'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' আর কয়েকটি প্যাণ্টোমাইম।

অখণ্ড ন্যাশনাল থিয়েটারের এই শেষ অভিনয় রজনী। সেদিন অভিনয় শেষে নারীবেশে পাদপ্রদীপের পিছনে দাঁড়িয়ে বিহারীলাল বসু ('জ্যাঠা বেহারী') দর্শকদের উদ্দেশে একটি বিদায়-সঙ্গীত গাইলেন। গানটির প্রথম পংক্তি—কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়!

ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল। কেন বন্ধ হল? মূলে দুটি কারণ আছে—বৃষ্টি আর টাকাকড়ি।

আগেই বলা হয়েছে, সান্যাল বাড়ির উঠোনে অভিনয় করত ন্যাশনাল থিয়েটার। কিন্তু বর্ষাকাল এসে গিয়েছে, এখন আর সেখানে অভিনয় করা অসম্ভব। আরেক কারণ, টাকাকড়ি।

আশাতিরিক্ত অর্থোপার্জন করেছে ন্যাশনাল থিয়েটার। সন্দেহ নেই, অর্থই অনর্থের মূল। সংসারে অর্থলোভ নেই কার?

একদিন নগেন্দ্রনাথ বললেন—থিয়েটারের আয় থেকে আমাদের খরচ-পত্র দেওয়া হোক।

ভাল কথা। তাই হল। কিন্তু তাতেও সকলে সন্তুষ্ট হয় না। একজন দু-এক টাকা বেশী পেলে, আরেকজন অখুশি হয়।

এখন কী করা যায়।

নগেন্দ্রনাথ, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল আর ধর্মদাস। নগেন্দ্রনাথ বললেন—এস আমরা চারজনে স্বত্বাধিকারী হই।

কিন্তু সেকথায় ধর্মদাস আপত্তি তুললেন। বললেন—সকলেই খেটেছি—অন্য সকলকে চাকর বা আমাদের অধীন করব, তা কখনও হবে না। সকলে মিলে পরিশ্রম করে জিনিসটা করা গেছে, একা আমরা তা গ্রাস করি কেন?

দলাদলির ফলে শেষ পর্যন্ত যা হয়ে থাকে, ন্যাশনাল থিয়েটারেও তাই হল। দু-ভাগ হয়ে গেল ন্যাশনাল থিয়েটার।

একদলে গেলেন গিরিশচন্দ্র, ধর্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, গোপালচন্দ্র দাস, শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। স্টেজ আর সীন এই দলই পেল। আর গিরিশচন্দ্র আগের ন্যাশনাল থিয়েটারের

এই খণ্ডটিকেই 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে রেজিস্টারি করে নিলেন।

কিন্তু আরেক দল তা নির্বিবাদে মেনে নেবে কেন? আরেক দলে আছেন অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলবাবু, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রবাবু প্রভৃতি। তাঁরাও 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম নিয়ে বিজ্ঞাপন দিলেন যে, 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামধারী অন্য কোন দলের সঙ্গে তাঁদের বিন্দুমাত্র সংস্রব নেই।

শেষপর্যন্ত অবশ্য গিরিশচন্দ্র যে-দলে সেই দলেরই 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম বহাল রইল। অন্য দল নাম নিল—হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার। কিন্তু হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের কথা পরে হবে, আগে ন্যাশনাল থিয়েটারের কথা হোক।

১৮৭৩ সালের ২৯শে মার্চ এই ন্যাশনাল থিয়েটার প্রথম অভিনয় করল 'নীলদর্পণ'। অভিনয়ে অংশ নিলেন গিরিশচন্দ্র, মতিলাল সুর, অবিনাশচন্দ্র কর, মহেন্দ্রলাল বসু, রাধাগোবিন্দ কর এবং আরও কেউ কেউ। সেদিন সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রাধাগোবিন্দ কর, ডাকনাম গোবি। অমৃতলাল বসু তখন অন্য দলে; তিনি দু-টাকার টিকিট কেটে এই 'নীলদর্পণের' অভিনয় দেখে গেলেন। উত্তরকালে অমৃতলাল বলেছেন: 'সৈরিন্ধ্রী বেশে গোবিকে আমি ঈর্ষাকষায়িত লোচনে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার সুন্দর অভিনয় দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইলাম।'

ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের (ডাক্তার আর, জি, কর) নাম জানেন না, এমন বাঙালী নেই। কিন্তু অভিনেতা রাধাগোবিন্দ করের নাম ক-জন বাঙালী মনে করে রেখেছেন!

রাধাগোবিন্দ কর ডাক্তার দুর্গাদাস করের ছেলে। 'নীলদর্পণে'র সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে ডাক্তার দুর্গাদাস করের নাম।

দুর্গাদাস করের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল দীনবন্ধু মিত্রের। ঢাকার একটি ছাপাখানায় 'নীলদর্পণ' ছাপা হয়েছিল। তখন দুর্গাদাস ঢাকায় সরকারী ডাক্তার, দীনবন্ধু ঢাকায় ডাকঘরের ইনস্পেক্টর। প্রতিদিন রাত নটা-দশটা নাগাদ দীনবন্ধু চলে আসতেন দুর্গাদাসের বাড়িতে, ঘরের দরজা বন্ধ করে দুজনে মিলে 'নীলদর্পণে'র প্রুফ দেখতেন।

কথা হচ্ছিল ১৮৭৩ সালের ২৯শে মার্চ 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের। অভিনয় হয়েছে টাউন হলে, নেটিভ হাসপাতালের জন্যে সাহায্য-রজনী। একটা দরকারী কথা এখানে বলে রাখি, থিয়েটারে সাহায্য-রজনীর উদাহরণ এই প্রথম।

ন্যাশনাল থিয়েটার অতঃপর ৫ই এপ্রিল ওই টাউন-হলেই 'সধবার একাদশী' ও 'ভারতমাতা'র অভিনয় করেছে। সে-ও আরেক সাহায্য-রজনী।

তারপর টাউনহল থেকে স্টেজ খুলে এনে শোভাবাজারে রাজা রাধাকান্ত দেবের নাটমন্দিরে অভিনয় আরম্ভ করল ন্যাশনাল থিয়েটার। এই নাটমন্দিরে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম অভিনয়ের তারিখ ১৮৭৩ সালের ১২ই এপ্রিল। সেদিন অভিনীত হয়েছে 'কৃষ্ণকুমারী'। আর এই নাটমন্দিরে ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ অভিনয়ের তারিখ ১৮৭৩ সালের ১০ই মে। সেদিন অভিনীত হয়েছে 'কপালকুণ্ডলা'। মধ্যবর্তী সময়ে এই নাটমন্দিরে আরও কয়েকখানা নাটকাভিনয় করেছে ন্যাশনাল থিয়েটার।

এদিকে খবর পাওয়া গেল ঢাকায় গিয়ে অভিনয় দেখিয়ে আসর জমিয়ে ফেলেছে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার। তাহলে আর দেরি করা কোন কাজের কথা নয়। ন্যাশনাল থিয়েটারের দলও ঢাকায় গিয়ে উপস্থিত হল। বলা দরকার গিরিশচন্দ্র দলের সঙ্গে ঢাকায় যান নি। যা হোক সেখানে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের জয়জয়কার, এঁরা সুবিধা করতে পারলেন না। বরং অসুবিধায় পড়লেন। চার-পাঁচ রাত্রির বেশি সেখানে ন্যাশনাল থিয়েটারের দলকে অভিনয় করতে হয় নি। উপরন্তু, একাধিক অভিনেতা অসুস্থ হয়ে পড়লেন; এবং কাউকে না বলে-কয়ে ঢাকা থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন। কিছু ধার-দেনা হয়েছে বাজারে, ঢাকায় ন্যাশনাল থিয়েটারের কর্মকর্তারা একটু বিপদে পড়লেন বইকি।

ঢাকা থেকে দু-দলের কলকাতায় ফিরে আসার কিছুদিন পরের কথা। ১৮৭৩ সালের ৮ই জুলাই 'সুলভ সমাচার' মন্তব্য করেছেঃ 'কলিকাতা হইতে যাঁহারা ঢাকা নগরে অভিনয় করিতে গিয়াছিলেন, তথাকার সংবাদপত্র সকল তাঁহাদিগকে অতিশয় নিন্দা করিতেছেন। নাটকওয়ালারা সেখানে ৩।৪ শত টাকা ধার করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। পাওনাদারেরা তাঁহাদের ডেরাডাণ্ডা সকল আটকাইয়া রাখিয়াছে। ঢাকাপ্রকাশ বলেন, এইরূপ আচরণ দেখিয়া সে দেশের লোক কলিকাতার লোকদিগকে বোম্বেটে জুয়াচোর বলে।'

সে কি কথা! ঢাকায় ধার-দেনা করেছে ন্যাশনাল থিয়েটার, দুর্নাম কুড়িয়েছে ন্যাশনাল থিয়েটার। কিন্তু হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার তো ঢাকায় অভিনয় দেখিয়ে সুনাম করেছে।

হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের সভ্যেরা একখানা চিঠি লিখলেন 'সুলভ

সমাচারে'র সম্পাদককে। ১৮৭৩ সালের ২২শে জুলাই চিঠিখানা ছাপা হয়েছে 'সুলভ-সমাচারে'। তুলে দিচ্ছি ঃ

মান্যবর সুলভ সমাচার সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মহাশয়!

আপনার বিগত বারের 'সুলভ সমাচার' পাঠে দেখিলাম আপনি লিখিয়াছেন যে, কলিকাতা হইতে যে থিয়েটার ঢাকায় অভিনয় করিতে গিয়াছিলেন তাঁহারা ঢাকায় 'বোম্বেটিয়া', 'জুয়াচোর' ইত্যাদি নানাবিধ উপাধি গ্রহণান্তর ২।৩ শত টাকা বাজার দেনা করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। বাস্তবিক ইহা সত্য, কিন্তু ঢাকায় অভিনয়ার্থ দুই দল কলিকাতা হইতে যাইয়াছিল—১ম হিন্দু নেশেনাল থিয়েটার,—২য় নেশানেল থিয়েটার। মহাশয়! আপনি কলিকাতার থিয়েটার উল্লেখ করিয়া এই সমস্ত লিখিয়াছেন, কিন্তু ঢাকার সকল পত্রিকা পাঠেই অবগত হইতে পারিবেন "হিন্দু নেশেনাল থিয়েটর" অভিনয় করিয়া ঢাকাবাসীগণের মনোরঞ্জন করিয়া সগৌরবে কলিকাতায় আসিয়াছে। মহাশয় আপনি অনুগ্রহপুর্ব্বক "হিন্দু নেশেনাল থিয়েটারে"র কথা আপনার সুলভ সমাচারে লিখিয়া চির বাধিত করিবেন। আপনি যেরূপ লিখিয়াছেন ইহাতে আমাদেরও জনসমাজে মুখ দেখান ভার হইয়াছে। আমরা কোন দোষের দোষী নই তবে আমরা কেন বদ নামের ভাগী হই? আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন, করিবেন।

কলিকাতা
১লা শ্রাবণ ১২৮০

একান্ত বিনয়াবনত
হিন্দু নেঃ থিয়েটারের সভ্যগণ *

কিন্তু ভাগাভাগি হবার পরেই কি হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের দল সটান ঢাকায় চলে গিয়েছিল? না। আরম্ভে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের দল লিণ্ডসে

* এই ব্যাপারে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে' অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর অপ্রকাশিত বিবৃতির আশ্রয় নিয়েছেন। অপ্রকাশিত বিবৃতিতে অর্দ্ধেন্দুশেখর বলেছেন ঃ 'সেখানে তাঁহাদের [ন্যাশনাল থিয়েটারের] চার-পাঁচ রাত্রির অধিক অভিনয় করিতে হয় নাই এবং যে-সকল অভিনেতা গিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশ জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া কাহাকেও না জানাইয়া হঠাৎ কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। সুতরাং অধ্যক্ষেরা ঋণগ্রস্ত হওয়ায় আমাদের নিকট ষ্টেজ ও পোষাক রাখিয়া চলিয়া আসেন। আমরাই অগত্যা ঋণ পরিশোধে বাধ্য হইলাম।...'

এখানে উল্লেখযোগ্য, অর্দ্ধেন্দুশেখরের অপ্রকাশিত বিবৃতির সঙ্গে 'সুলভ সমাচার' থেকে আহৃত অংশটুকুর পুরোপুরি মিল নেই।

স্ট্রীটে অপেরা-হাউস ভাড়া নিয়ে অভিনয় দেখিয়েছে। সেখানে ১৮৭৩ সালের ৫ই-এপ্রিল হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার প্রথম অভিনয় করেছে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক ও কয়েকটি প্যাণ্টোমাইম। ওই অপেরা হাউসেই অতঃপর একাধিক নাটকাভিনয় করেছে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার। কিন্তু বেশীদিন চলল না সেখানে। তারপর খবর পাই হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের দল কালীপ্রসন্ন সিংহের একটা হল ভাড়া নিয়ে স্টেজের প্ল্যাটফর্ম বাঁধতে আরম্ভ করেছে।

১৮৭৩ সালের ২৬শে এপ্রিল হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার হাবড়া রেলওয়ে থিয়েটারে 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দেখাল। তারপর মে-মাসের গোড়ার দিকে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের দল ঢাকায় চলে গেল। এদের অভিনয় দেখে ঢাকা শহর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। কিন্তু সে কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

মাসখানেক ঢাকায় ছিল হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার। তারপর আবার কলকাতা।

কিছুদিন পরে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারের কয়েকজন অভিনেতা ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে একত্র হয়ে দু-বার অভিনয় করল। বিশেষ উপলক্ষ ছিল দু-বারই। প্রথমবার অভিনয় হল দীঘাপতিয়ার রাজকুমারের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে। দ্বিতীয়বার অভিনয় হল মাইকেল মধুসূদনের অপোগণ্ড সন্তানদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে।

তারপর দু-দলই—ন্যাশনাল আর হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার—কলকাতার বাইরে চলে গেল অভিনয় দেখাতে। ১৮৭৩ সালের শেষের দিকে দু-দলই আবার কলকাতায় ফিরে এল।

কিন্তু এখন থেকে আর 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' বলা যাবে না। নাম বদলে গিয়েছে। 'হিন্দু' হয়েছে 'গ্রেট'। 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' হয়েছে 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'।

মনে আছে, ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বরের কথা। সেদিন যে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রথম 'নীলদর্পণ' অভিনয় করেছিল, সেই ন্যাশনাল থিয়েটার এখন দ্বিখণ্ডিত। এক খণ্ডের নাম ন্যাশনাল থিয়েটার। আরেক খণ্ডের নাম গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। ১৮৭৩ সালের ৭ই ডিসেম্বর দু-দলই ভিন্নভাবে মহা-সমারোহে সাংবৎসরিক উৎসব করল।

এই সময়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের দল আবার ফিরে এল পুরনো বাড়িতে।

সাংবৎসরিক উৎসবের পর এখানে ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনয় হল ১৮৭৩ সালের ১৩ই ডিসেম্বর—'হেমলতা' নামে একখানা নাটক। ১৮৭৪ সালের ৩রা জানুয়ারী অভিনীত হল 'নীলদর্পণ'। ১৪ই ফেব্রুয়ারী 'মৃণালিনী'।

আর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার? কিন্তু গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে যাবার আগে আর দুটো থিয়েটারের নামে দু-চার কথা নিবেদন করে রাখি—বেঙ্গল থিয়েটার আর ওরিয়েন্টাল থিয়েটার।

১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে ওরিয়েন্টাল থিয়েটার খোলা হয়। কিন্তু তার কৃতিত্ব খুব বেশী নয়।

বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী বলা যায় বেঙ্গল থিয়েটারকে। বেঙ্গল থিয়েটারের ম্যানেজার শরৎচন্দ্র ঘোষ, অবৈতনিক সম্পাদক প্যারীমোহন রায়। বেঙ্গল থিয়েটারের ছিল নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ ও খোলার বাড়ি। (বেঙ্গল থিয়েটারের আগে কলকাতার আর কোন সাধারণ রঙ্গালয়ের নিজস্ব বাড়ি ছিল না।) আর, বাঙালীর সাধারণ রঙ্গালয়ের ইতিবৃত্তে দেখা যাচ্ছে (বেঙ্গল থিয়েটারেই সর্বপ্রথম অভিনেত্রী নেওয়া হয়।) বেঙ্গল থিয়েটারের আগে বাঙালীর সাধারণ রঙ্গালয়ে পুরুষেরাই স্ত্রীলোকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

শরৎচন্দ্র 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র জন্যে আগেই একটা কমিটি তৈরি করেছিলেন। সেই কমিটির সভ্য ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, উমেশচন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত সত্যব্রত সামাশ্রমী প্রভৃতি কয়েকজন গণ্যমান্য মানুষ।

মাইকেল মধুসূদন বেঙ্গল থিয়েটারকে পরামর্শ দিলেন—তোমরা স্ত্রীলোক নিয়ে থিয়েটার খোল। আমি তোমাদের জন্যে নাটক লিখে দেব। স্ত্রীলোক না নিলে কিছুতেই ভাল হবে না।

বিস্তর তর্ক-বিতর্ক হল এ-বিষয়ে। অনেকেই রাজী হলেন শেষ পর্যন্ত, কিন্তু বিদ্যাসাগর কিছুতেই এ-প্রস্তাবে সায় দিতে পারলেন না। বিদ্যাসাগর অতঃপর থিয়েটারের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখেন নি।

এই সূত্রে আরও আগের একটা ঘটনা চোখে পড়ছে। সে-সময়ে ভোলানাথ বসু বিদ্যাসাগরের স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। হঠাৎ একদিন বিদ্যাসাগর এসে সেই ক্লাসে ঢুকলেন। ভোলানাথকে বললেন—তোমার মত ছাত্রকে আমার স্কুলে রাখতে পারব না। তুমি চলে যাও।

ভোলানাথকে চলে যেতে হল। কিন্তু ভোলানাথের অপরাধ কী?

একটু আড়ালে গিয়ে বিদ্যাসাগর মাস্টার মশায়দের বললেন—ভোলা ঠাকুর-

বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর থিয়েটারে 'বিদ্যা' সেজেছিল, 'রত্নাবলী' যাত্রাতেও ও সখী সাজে।

যা বলছিলাম। বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনেত্রী নেবার কথা হচ্ছিল।

১৮৭৩ সালের ১৫ই-এপ্রিল 'সুলভ সমাচার' লিখেছে ঃ 'সিমলার কতকগুলি ভদ্র সন্তান "বেঙ্গল থিয়েটর" নাম দিয়া আর একটি থিয়েটর খুলিতেছেন। সাতু বাবুর বাটীর সম্মুখস্থ মাঠে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহারা এক প্রকাণ্ড ঘর তুলিয়াছেন। যে যে স্থানে পুরুষদিগকে মেয়ে সাজাইয়া অভিনয় করিতে হয়, সেই সেই খানে আসল একেবারে সত্যিকেরের মেয়ে মানুষ আনিয়া নাটক করিলে অনেক টাকা হবে এই লোভে পড়িয়া তাঁহারা কতকগুলি নটীর অনুসন্ধানে আছেন। শুনা গেল মাইকেল মধুসূদন ইঁহাদের নাকি পরামর্শদাতা। তিনি খৃষ্টীয়ান হইয়া বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া যদি এ-প্রকার সাংঘাতিক পরামর্শ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে বড় দুঃখের বিষয়। মেয়ে নটী আনিতে গেলে মন্দ স্ত্রীলোক আনিতেই হইবে, সুতরাং তাহা হইলে শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াবে। কিন্তু দেশের পক্ষে তাহা নিতান্ত অনিষ্টের হেতু হইবে। ভদ্র লোকের ছেলে হইয়া এরূপ জঘন্য ইচ্ছা মনে স্থান দেন ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। ইঁহাদের দলের কয়েক ব্যক্তি ইহার বিরোধী আছেন এই একটু সুখের বিষয়। যাহউক, আমরা অনুরোধ করিতেছি যেন এ প্রকার অন্যায় কার্য্যে তাঁহারা প্রবৃত্ত না হন। মাইকেলের দ্বারা যদি নীতিগর্ভ কোন নাটক লেখাইয়া তাহার অভিনয় করাইতে পারেন, তবেই সকল দিক রক্ষা পাইবে; তদ্ভিন্ন এখনকার কালে কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প।'

যে যাই বলুক, চারজন স্ত্রীলোককে অভিনেত্রী হিসেবে নেওয়া হল বেঙ্গল থিয়েটারে—জগত্তারিণী, গোলাপ, এলোকেশী ও শ্যামা।

১৮৭৩ সালের ১৬ই আগস্ট বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম নাটকাভিনয় হল। সেদিন হল 'শর্মিষ্ঠা'।

বেঙ্গল থিয়েটার পেশাদার অভিনেত্রী নিয়েছে, সেদিন তা নিয়ে গুঞ্জন উঠেছে। শুধু গুঞ্জন নয়, গঞ্জনাও সহ্য করতে হয়েছে বেঙ্গল থিয়েটারকে।

'ভারত-সংস্কারক' পত্রিকা লিখল ঃ 'এ-পর্য্যন্ত আমরা যাত্রা, নাচ, কীর্ত্তন, ঝুমুরেই কেবল বেশ্যাদিগকে দেখিতে পাইতাম, কিন্তু বিশিষ্ট বংশীয় ভদ্রলোক-দিগের সহিত প্রকাশ্য ভাবে বেশ্যাদিগের অভিনয় এই প্রথম দেখিলাম। ভদ্র সন্তানেরা আপনাদিগের মর্য্যাদা আপনারা রক্ষা করেন ইহাই বাঞ্ছনীয়।'

'মধ্যস্থ' পত্রিকা পরিষ্কার ব্যঙ্গের স্বরে মন্তব্য করলো ঃ

'বেঙ্গল থিয়েটরের অভিনয়। অথবা বিলাতী ধরণের মেয়ে যাত্রা! ... বিলাতে রঙ্গভূমিতে স্ত্রীর প্রকৃতি স্ত্রীর দ্বারাই প্রদর্শিত হয়। বঙ্গদেশে দাড়ি গোঁপধারী (হাজার কামাক!) জ্যেঠা ছেলেরা মেয়ে সাজিয়া কর্কশ স্বরে সুমধুর বামা-স্বরের কার্য্য করিতেছে। ইহা কি তাঁহাদের ন্যায় সমাজ-সংস্কারক সম্প্রদায়ের সহ্য হয়? ইহার প্রতিবিধান আশু কর্তব্য হইল। প্রতিবিধান আর কি, সত্যকার স্ত্রী লইয়া অভিনয়! রব উঠিল 'অভিনয় স্বভাবের প্রতিরূপ, পুরুষ দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতির প্রকৃতি প্রদর্শন স্বভাবের প্রতিরূপ না হইয়া স্বভাবের হত্যা করা হয়।' অতএব 'আন্ স্ত্রী!' ...

কিন্তু বোধ হয়, বঙ্গীয় কুলবতী কুল চিরকাল কঠিন নিয়মে অবরোধিতা থাকাতে নিতান্ত লাজুক ও মুখচোরা হওয়া সম্ভব বিবেচনায় নব-সংস্কারকগণ তাঁহাদিগকে অবহেলা করিয়াছেন। অর্থাৎ অযোগ্য ও অকর্ম্মণ্য ভাবিয়া অকুলবতী জগৎস্বামিনী বার-রমণী-তনয়াগণকে লইয়াই স্বভাবানুযায়ী উচ্চ অঙ্গের অভিনয় ব্যাপার সমাধা করিতেছেন। ইহাতে চতুর্দিকে তাঁহাদের নামে ধন্য ধন্য রব উঠিয়াছে। আমরাও ধন্য ধন্য লিখিলাম, বাস্তবিক তাহা ধন্য রব নয়, 'বাহবা' রব! ... লোকে কহিতেছে, এত দিনে রঙ্গপূর্ণ বঙ্গ আসরে যথার্থ মেয়ে যাত্রা একদল নামিয়াছে, এতদিনে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়া যাহারা যাহা অভিনয়ার্হ, তাহা সংসিদ্ধি দ্বারা যথার্থ আমোদ উৎপাদন করিবে—এত দিনে অভিনেতৃ বালক ও যুবকগণের মন সন্তৃপ্ত থাকিয়া সকল কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে রঙ্গভূমির পবিত্র ব্রতে ব্রতী হইবে—এতদিনে তাহাদের পিতা, মাতা, স্ত্রী প্রভৃতি পরিজনেরা নিশ্চিন্ত হইলেন—এত দিনে বারাঙ্গনাগণ প্রকাশ্যরূপে ভদ্র লোকের সঙ্গে ভদ্র সমাজে সমাধিকার প্রাপ্ত হইল—এত দিনে বঙ্গীয় দর্শকগণের দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় যথার্থ চরিতার্থ হইয়া সমাজের সাধারণ নীতি (কলিকাতার নব ড্রেনের জলের ন্যায়) সুপবিত্র নবগতিবিশিষ্ট হইয়া উঠিল!

অতঃপর ভাক্ত উন্নতির ভক্তগণের মনে মনে আরও কি অভিসন্ধি আছে, আমরা তাহাই দেখিবার আশায় স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। বাঁচিয়া থাকিলে আরও কত কি দেখিতে পাইব! কিন্তু এত অতি-সভ্যতার তেজ সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকা দায়!'

বেঙ্গল থিয়েটারের একপাশে কয়েকখানা খোলার ঘর বাঁধা হচ্ছে। উদ্দেশ্য

খোলার ঘরে বসে দর্শকেরা দরকার হলে জলযোগ-টলযোগ করবে। একদিন একজন ভদ্রলোক বেঙ্গল থিয়েটারের একজন কর্তাব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন—খোলার ঘরগুলো কি জন্যে হচ্ছে মশাই?

কর্তাব্যক্তি বললেন—দর্শকেরা বসে জলটল খাবে আর কি।

ভদ্রলোক বললেন—তবে যে শুনলাম ··· ?

—কী শুনলেন?

—শুনলাম আপনাদের অ্যাক্ট্রেসদের জন্যে আঁতুড়ঘর বেঁধে রাখা হচ্ছে!

বেঙ্গল থিয়েটারের একরাত্রের একটা মজার ঘটনা বলি।

সে-রাত্রে বেঙ্গল থিয়েটারে 'মৃণালিনী' অভিনীত হচ্ছে। পশুপতির ভূমিকায় অভিনয় করছেন কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

'মৃণালিনী'র চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যের এক জায়গায় আছে যে রাজপথ দিয়ে পশুপতিকে মহম্মদ আলী নিয়ে যাচ্ছেন, মহম্মদ আলীর সঙ্গে দু-জন মুসলমান সৈন্য, এমন সময় পশুপতি বলে উঠেছে—ও যে আমার গৃহ, মুসলমানেরা আগুন দিয়েছে—মনোরমা গৃহে আছে, ছাড়, ছাড়,—দুজন সৈন্য পশুপতিকে ধরে রাখবার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না, তাদের হাত ছাড়িয়ে পশুপতি ছুটে চলে গেল।

সেদিন এই দৃশ্যে হল কি, পশুপতিবেশী কিরণবাবু 'ছাড়, ছাড়' বলে এত চেষ্টা করছেন, কিন্তু কিছুতেই একজন সৈন্যের হাত ছাড়িয়ে ছুটে যেতে পারছেন না। সেই সৈন্যটি কিছুতেই পশুপতিকে ছাড়বে না; ভাবের ঘোরে থিয়েটারের সৈন্য একেবারে আসল সৈন্য হয়ে গেছে। কিরণবাবু বিস্তর চেষ্টা করলেন, কিন্তু নিষ্ফল। গত্যন্তর না দেখে কিরণবাবু ওই সৈন্যটিকে সজোরে আছড়ে ফেলে দিলেন স্টেজের উপর। সৈন্যের মুখ ছেঁচে গেল, নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। আর দর্শকেরা তো এই জীবন্ত দৃশ্য দেখে বিপুল বিক্রমে হাততালি দিয়ে উঠল।

দৃশ্যটি শেষ হবার পরে কিরণবাবু দেখলেন সৈন্যটির নাক দিয়ে তখনও রক্ত পড়ছে। কিরণবাবু বললেন—ছি-ছি, এমন আহাম্মক তুমি! ত্থাখ তো এখনও রক্ত পড়ছে।

সৈন্যটি হাতজোড় করল। বলল—আজ্ঞে আহাম্মক তো বলছেন, নাক দিয়ে রক্তও, পড়ছে বটে, কিন্তু আজকের প্লে কেমন জমিয়ে দিলুম, বলুন! কোনদিন এমন হাততালি পেয়েছেন?

বেঙ্গল থিয়েটারের একটা দুঃখের ঘটনা বলি।

বেঙ্গল থিয়েটার একবার সদলবলে একখানা গাড়ি রিজার্ভ করে চুয়াডাঙ্গা যায়। পথের মধ্যেই ঘটল এক বিষম দুর্ঘটনা।

কোন্ স্টেশন বলতে পারব না, উমিচাঁদ বাবু কয়েকজনের সঙ্গে দলের সকলের জন্যে খাবার আনতে নেমে গেলেন। উমিচাঁদ বাবু ম্যানেজার শরৎচন্দ্র ঘোষের আত্মীয়। জলখাবার, পাতা-টাতা নিয়ে উমিচাঁদ বাবু ছাড়া অন্য ক-জন ঠিকমত গাড়িতে এসে উঠলেন, কিন্তু উমিচাঁদ বাবুর দেরি হচ্ছে। গাড়ি প্রায় ছাড়ো-ছাড়ো হল, শরৎচন্দ্র গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন—ওহে উমিচাঁদ, শিগগির এস, শিগগির এস, গাড়ি যে ছাড়ল।

উমিচাঁদবাবু দৌড়ুতে-দৌড়ুতে এসে চলতি গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি চলতে লাগল জোরচাকায়। আর উমিচাঁদবাবু সটান শুয়ে পড়লেন। তাঁর শোবার ভঙ্গিটুকু ভারি বিষণ্ণ।

সকলেই ব্যস্ত হয়ে বললেন—সর্দিগরমি হয়েছে। জল দাও, জল দাও।

কিন্তু কোথায় জল। গাড়ির মধ্যে কারও কাছে একফোঁটা জল নেই। তাহলে উমিচাঁদ বাবুর মুখে এই অবস্থায় এক গণ্ডুষ জল পড়বে না?

প্রসিদ্ধা গায়িকা বনবিহারিণী (ভুনি) দলের সঙ্গে ছিলেন। উপায়ান্তর না দেখে বনবিহারিণী নিজের বুকের দুধ একটা ঝিনুকে করে এনে উমিচাঁদের মুখে দিলেন। কিন্তু কোথায় উমিচাঁদ। সেই মুহূর্তেই উমিচাঁদ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। শরৎচন্দ্র উমিচাঁদের নিষ্প্রাণ বুকে মুখ রেখে নাবালকের মত কেঁদে উঠলেন।

চারুবাবু শরৎচন্দ্রকে বললেন—শরৎ, থামো। যা হবার হয়েছে। এখন যদি রেলের লোক এ-ঘটনা জানতে পারে তো গাড়ি কেটে দেবে। এত লোকজন নিয়ে রাস্তার মধ্যিখানে আরেক বিপদ হবে।

শরৎচন্দ্র কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—আমি উমির মাকে গিয়ে কী বলব!

সন্ধ্যার সময় চুয়াডাঙ্গা পৌঁছন গেল। উমিচাঁদের মৃত্যুর ব্যাপারে সেখানকার স্টেশন মাস্টারকে বলা হল—এই আগের স্টেশনে ঘটনাটা ঘটেছে।

এই বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের নাম।

বিহারীলাল নাট্যরূপ দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র। তার অভিনয় হয়েছিল বেঙ্গল থিয়েটারে। স্বয়ং শরৎচন্দ্র জগৎসিংহের ভূমিকায়

অভিনয় করেছিলেন। জগৎসিংহরূপে শরৎচন্দ্র একেবারে জলজ্যান্ত ঘোড়ায় চড়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হতেন ; সে-দৃশ্য দেখে বিমুগ্ধ হত দর্শকেরা।

শরৎচন্দ্রের আগে আর কেউ রঙ্গমঞ্চে ঘোড়া বের করেন নি। এ-কৃতিত্ব শরৎচন্দ্রের ষোলআনা প্রাপ্য। বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্র একজন বিখ্যাত ঘোড়-সওয়ার ছিলেন। হয়ত রঙ্গমঞ্চে উঠে ঘোড়া দুরন্তপনা করছে, শরৎচন্দ্র গায়ে হাত দিলেই ঘোড়া শান্ত। নিজের একটা শখের টাট্টু ছিল শরৎচন্দ্রের। সেই টাট্টুতে চড়ে শরৎচন্দ্র বাড়ির একতলা থেকে সিঁড়ি ভেঙে তেতলায় ঠাকুরঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেন। শরৎচন্দ্রের দিদিমা ঠাকুরের প্রসাদী ফলমূল খেতে দিতেন টাট্টুটাকে।

জগৎসিংহের ভূমিকায় কেমন অভিনয় করতেন শরৎচন্দ্র ?

পরে গিরিশচন্দ্র ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্যে 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপ দিয়েছেন, নিজে অভিনয় করেছেন জগৎসিংহের ভূমিকায়। গিরিশচন্দ্র কিন্তু উত্তরকালে বলেছেন—জগৎসিংহ আমার চেয়ে শরৎবাবু ভাল করতেন।

বেঙ্গল থিয়েটার আর গিরিশচন্দ্রকে জড়িয়ে এক সময়ে একটা চমৎকার ঘটনা ঘটেছে।

সে সময়ে ভুবনমোহন নিয়োগী গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার চালাচ্ছেন। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে তখন শৃঙ্খলার নামগন্ধ নেই। গিরিশচন্দ্র সে সময়ে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে বড় একটা যেতেন না, কখনও-কখনও বেড়াতে যেতেন। শুধু গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে কেন, বেঙ্গল থিয়েটারেও কখনও-কখনও বেড়াতে-বেড়াতে যেতেন গিরিশচন্দ্র।

একদিন বেড়াতে-বেড়াতে তিনি গিয়েছেন বেঙ্গল থিয়েটারে। সেদিন সেখানে 'অশ্রুমতী' নাটকের অভিনয় হবার কথা। গিরিশচন্দ্রকে দেখে বেঙ্গল থিয়েটারের সকলের খুব আনন্দ হল। সকলে গিরিশচন্দ্রকে ধরে পড়লেন—আপনাকে আজ আমাদের থিয়েটারে 'অশ্রুমতী'তে প্রতাপসিংহ সাজতে হবে।

গিরিশচন্দ্র বললেন—সে কি কথা! এ-নাটকের আমি কিছুই জানি না, আজই আমি অভিনয় করব কি!

সেকথা কেউ শুনলেন না। সকলেই বললেন—রাণা প্রতাপের বিষয় তো আপনার জানা আছে। প্রম্পট্ শুনে অনায়াসে আপনি অভিনয় করে যেতে পারবেন। আমাদের স্টেজে প্রতাপসিংহের সাজে হঠাৎ আজ আপনাকে

দেখলে দর্শকেরা অবাক হয়ে যাবে। আজ আপনাকে যখন পেয়েছি, আমরা কিছুতে ছাড়ছি না।

অগত্যা গিরিশচন্দ্র রাজী হলেন। যথাসময়ে অভিনয় আরম্ভ হল। বেঙ্গল থিয়েটারে 'অশ্রুমতী'তে গিরিশচন্দ্র রাণা প্রতাপ সেজেছেন।

দুই অঙ্ক অভিনয় হয়ে যাবার পর গিরিশচন্দ্র টের পেলেন, 'অশ্রুমতী' নাটকে আছে রাণা প্রতাপের কন্যা অশ্রুমতী আকবরের পুত্র সেলিমের প্রেমে উন্মাদিনী। যে-মুহূর্তে টের পেলেন, আর কোন কথা নয়, গা থেকে রাণা-প্রতাপের পোশাকটা পর্যন্ত খুললেন না, থিয়েটার থেকে সটান বেরিয়ে গেলেন। কোথায় গেলেন ?

সত্যি, কোথায় গেলেন ? খোঁজ-খোঁজ পড়ে গেল চতুর্দিকে। কে একজন এসে খবর দিলেন—গিরিশচন্দ্র পীরুর হোটেলে বসে খাওয়া-দাওয়া করছেন!

খবর পেয়েই স্বয়ং থিয়েটারের ম্যানেজার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন পীরুর হোটেলে। গিরিশচন্দ্রকে বললেন—ব্যাপার কি মশায় ? আপনার সীন এসেছে, আর আপনি রাণা প্রতাপের পোশাক পরেই রাস্তায় বেরিয়ে এসেছেন ? খবর পাঠালেই তো হোটেল থেকে খাবার পাঠিয়ে দিত। চলুন, চলুন।

কিন্তু গিরিশচন্দ্র কিছুতেই আর বেঙ্গল থিয়েটারে গেলেন না। বললেন—আর আমি যাচ্ছি না। আমি কি আগে জানতাম, যে রাণা প্রতাপ আকবরের কুটুম্ব বলে মানসিংহের সঙ্গে একত্র আহার করতে রাজী হল না, সেই রাণা প্রতাপের মেয়ে সেলিমের জন্যে পাগল! আগে জানলে কি এ ঝকমারি করি। নিন, এই পোশাক নিন, অন্য কাউকে গিয়ে রাণা প্রতাপ সাজান।

আর কোন উপায় নেই যখন, রাণা প্রতাপের পোশাক নিয়ে ফিরে যেতে হল ম্যানেজারকে।

কী বলছিলাম যেন ? ও হ্যাঁ, বিহারীলালের কথা।

বিহারীলাল অত্যন্ত প্রিয়ভাষী, নিরহঙ্কার মানুষ। জীবনে কেউ কখনও ক্রুদ্ধ হতে দেখে নি বিহারীলালকে। সংসারে এমন অজাতশত্রু মানুষ দুর্লভ।

নাবালক বয়স থেকেই বিহারীলালের অভিনয়ের দিকে টান। এককালে শখের থিয়েটারে নানা ভূমিকায় সুচারু অভিনয় করেছেন বিহারীলাল।

ষোল বছর বয়সে বিহারীলাল চাকরিতে ঢোকেন—গ্লাডস্টোন ওয়াইলির আপিসে কেরানী। দু-বছর কেরানীগিরি করেছেন সেখানে। তারপর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ক্যাশিয়ার হয়েছেন ই, আই, রেলওয়ের ডিস্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের

আপিসে। তারপর তাঁকে রেলওয়ে মালগুদামের ইন্‌স্পেক্টর হয়ে এলাহাবাদ যেতে হল। কিছুদিন পরে কলকাতায় ফিরে এলেন বিহারীলাল। বাকি জীবন তাঁর রঙ্গালয়েই কেটেছে।

আরম্ভ থেকেই বেঙ্গল থিয়েটারে নট হিসেবে বিহারীলাল যুক্ত। কিছুকাল পরে বিহারীলাল বেঙ্গল থিয়েটারে নাট্যাধ্যক্ষ হলেন। আজীবন ছিলেন তিনি এই নাট্যাধ্যক্ষের আসনে। বিহারীলাল একাধারে নট, নাট্যাধ্যক্ষ, নাট্যকার।

শেষবয়সে তিনি আর বড় একটা অভিনয় করতেন না। কিন্তু থিয়েটারের অভিনয়ের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন তিনি। প্রত্যেক অভিনয় রাত্রে দর্শকদের মধ্যে গিয়ে বসতেন। যখনই দেখতেন অভিনয় তেমন জমছে না, দর্শকেরা ঝিমিয়ে পড়ছে, বিহারীলাল থিয়েটারের ভেতরে চলে আসতেন, দাঁড়াতেন গিয়ে উইংসের পাশে। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়রত অভিনেতাকে ফোকলা দাঁতে বলতেন—একটু রস দিয়ে বল বাবা, একটু গদগদ হয়ে বল।

একটা দরকারী খবর বলা হয় নি। ১৮৯০ সালের ৭ই জানুআরী প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টরের অভ্যর্থনার জন্যে গড়ের মাঠে মস্ত সায়ং-সমিতি হল। সেখানে 'শকুন্তলা'র নির্বাচিত দৃশ্যের অভিনয় দেখিয়ে বেঙ্গল থিয়েটার 'রয়াল' উপাধি পেল। রয়াল বেঙ্গল থিয়েটার হল।

বিহারীলালের মৃত্যুদিন—২০শে এপ্রিল, ১৯০১ সাল। বিহারীলালের মৃত্যুর পর রয়াল বেঙ্গল থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল। ও-বাড়িতে তারপর নানা দল থিয়েটার খুলেছে: অরোরা, ইউনিক, ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল, থেস্‌পিয়ান টেম্পল, প্রেসিডেন্সি প্রভৃতি। সেখান থেকে তারপর একদিন থিয়েটারের নামগন্ধটুকু পর্যন্ত মুছে গেল। সেখানে নতুন বাড়ি উঠল, বিডন স্ট্রীট পোস্টাপিস বসলো।

কিন্তু কথায়-কথায় বড় বেশি দূরে চলে এসেছি। এখন আবার পিছনে যেতে হবে। যেতে হবে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে। ১৮৭৩ সালে।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কি চুপচাপ বসে আছে? না। পূর্ণোদ্যমে কাজ হচ্ছে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে। একটা নতুন স্টেজ গড়ে তুলবার জন্যে কারও চেষ্টার অন্ত নেই। কিন্তু অর্ধেন্দুশেখর তখন কোথায়? তিনি তখন কলকাতায় ছিলেন না, দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। উত্তরকালে অমৃতলাল বসু বলেছেন: 'অর্ধেন্দু তখন কলিকাতায় ছিলেন না, নানা দেশ-বিদেশে মিশনরির মত ঘুরিতেছিলেন। একথা আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে চাই যে,

থিয়েটারের যদি কেহ কখনও মিশনরি হইয়া থাকেন তাহা হইলে একমাত্র অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি ভিন্ন আর কাহারও নাম করা যায় না। কলিকাতায় বসিয়া আমরা যখন নূতন স্টেজ করিবার কল্পনা করিতেছিলাম, অর্ধেন্দু তখন বঙ্গের বাহিরে অভিনয়-কলাকে জনসাধারণের আদরের সামগ্রী করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।'

যা হোক, বিডন স্ট্রীটে জমি ভাড়া নিয়ে একটা কাঠের বাড়ি নির্মাণ করা গেল। এই বাবদে বিস্তর পয়সা খরচ করেছেন ভুবনমোহন নিয়োগী। বিস্তর পরিশ্রম করেছেন ধর্মদাস সুর।

নাট্যশালা তো হল, কিন্তু মোটমাট কেমন হল? সেকালের 'সুলভ সমাচার' থেকে এক-টুকরো মন্তব্য তুলে দিচ্ছি: 'নাট্য-মন্দিরটি দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। বাঙ্গালীরা যে এরূপ অত্যুৎকৃষ্ট নাট্যমন্দির প্রস্তুত করিবেন, আমাদের এত আশা-ভরসা ছিল না। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটরের অধ্যক্ষগণ আমাদের সে-অভাব পূর্ণ করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন।'

সাব্যস্ত হল, এই নতুন নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হবে 'কাম্য-কানন'—১৮৭৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। কিন্তু প্রথম অভিনয় রাত্রেই নাট্যশালায় আগুন লাগল। অভিনয় বন্ধ করে দিতে হল। এই অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে 'ভারত-সংস্কারক' পত্রিকা মন্তব্য করল: 'একটি বিষয় দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইলাম যে যখন নাট্যশালায় অগ্নি লাগিল, ভদ্রবেশধারী কতকগুলি লোক মহানন্দে করতালি ও কোলাহলপূর্বক আপনাদিগের নীচতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। শুনিলাম, বেঙ্গল থিয়েটারের সভ্যগণ ইহার মধ্যে ছিলেন। হঠাৎ এ প্রকার আগুন লাগাতে অনেকের সন্দেহ হয় যে ইহা কোন বিপক্ষ পক্ষের কার্য্য, তাহারা গ্যাসের কল টিপিয়া আলোকের তেজ বৃদ্ধি করিয়া দিয়া এই কাণ্ড ঘটাইয়া থাকিবে।'

যা হোক, কর্তৃপক্ষ সেদিন দর্শকদের প্রতিশ্রুতি দিলেন যে আরেকদিন বিনামূল্যে অভিনয় দেখান হবে। সেই প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন কর্তৃপক্ষ। ১৮৭৪ সালের ১৮ই মার্চ দর্শকদের বিনামূল্যে 'নবীন তপস্বিনী'র অভিনয় দেখিয়েছেন।

'নবীন তপস্বিনী'র আগে একাধিক নাটকের অভিনয় হয়েছে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে। এখানে দুটি দরকারী কথা বলে রাখা ভাল। প্রথম কথা—গোড়ার

দিকে গিরিশচন্দ্র আর অর্ধেন্দুশেখর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের দলে ছিলেন না ; ওঁরা আসেন কিছুদিন পরে। দ্বিতীয় কথা—গোড়ার দিকে গ্রেট ন্যাশনালে স্ত্রী-চরিত্র অভিনয় করতেন পুরুষেরা ; পরে অভিনেত্রী নেওয়া হয়েছে।

অতঃপর ১৮৭৪ সালের ১৮ই এপ্রিল গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'হেমলতা' অভিনীত হল। আর, এই সময়েই ন্যাশনাল থিয়েটারের দল গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের দলের সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেল। ৩০শে মে অভিনীত হল 'কুলীনকন্যা বা কমলিনী'। তারপর ?

—ঃঃ০ঃঃ—

তিন

তারপর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার বেরিয়ে পড়ল মফস্বলে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার বহরমপুরে অভিনয় করল ১৮৭৪ সালের ২২শে জুন আর ২৫শে জুন (বাঙলা ১২৮১ সনের ৯ই আষাঢ় ও ১২ই আষাঢ়)। এই অভিনয় সম্পর্কে 'সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদককে লেখা একজন দর্শকের একখানা চিঠি এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

'আমাদিগের বাঙ্গালীর সকল কার্য্যের বাড়াবাড়ি। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে জাতীয় নাট্যশালা না থাকায় সকল সম্বাদপত্রে ও সাময়িক পত্রিকায় হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। কিছুকালের মধ্যে জাতীয় নাট্যশালা স্থাপিত হওয়াতে সে অভাব মোচন হইল এবং কতিপয় কৃতবিদ্য ব্যক্তির পরিদর্শনে ইহার কার্য্য প্রণালী কিছুকাল অতি সুনিয়মে চলিয়াছিল, তাহার পর লোকে 'থিয়েটার' একটি ব্যবসা বিবেচনা করাতে কলিকাতায় নানা দলের সৃষ্টি হইল এবং এই অবধিই পাপের স্রোত বৃদ্ধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অজাতশ্মশ্রু বিদ্যালয়ের বালকগণ পিতা মাতা ও আত্মীয়গণের তাড়না তুচ্ছ বোধ করিয়া বিদ্যালয় যমালয় বিবেচনায় পরিত্যাগ করতঃ থিয়েটরের দলে মিশিল এবং 'এয়ারকি' জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য স্থির করিয়া অকুতোভয়ে মদ্যপানে ও নানা কুক্রিয়ায় রত হইল। প্রথমে কলিকাতা সহরেই ইহার অবতারণা হয় পরে এই সকল দল মপস্বলে যাত্রার দলের ন্যায় অর্থোপার্জ্জনের জন্য গমন করাতে পাপ স্রোত ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সম্প্রতি গ্রেট ন্যাসানেল থিয়েটরের দল বহরমপুরে আগমন করিয়াছে। এই দল আসিবা মাত্র অলস ও অকর্ম্মণ্য বালকগণের মধ্যে একটা তুমুল কাণ্ড বাঁধিয়া উঠিল, তাহারা নটগণকে কলির প্রকৃত দেবতা বোধে নানামত উপাসনা আরম্ভ করিল কেহ বা বাজার সরকারের ভার, কেহ বা বিজ্ঞাপন বিতরণের ভার এবং কেহ বা 'গাঁয়ে না মানে আপনি মোড়লের' ন্যায় সর্ব্ব কর্ম্মে পরিদর্শনের ভার লইয়া রাত্রি দিন তাহাদের বাসায় গমনাগমন করিয়া অসৎ কর্ম্মে বিলক্ষণ পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে। পিতা মাতা গুরুজন কি করিবেন, তাঁহারা বিশেষ শাসন

করিলেই বালকেরা নটগণের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগের শ্রেণীভুক্ত হইয়া অমূল্য জীবনকে কলুষিত করিবে। নটগণ সকলকে বলিতেছেন যে তাঁহারা বঙ্গমাতার দুর্দ্দশা অপনীত করিতে নিতান্ত বদ্ধপরিকর, ইহাতে তাহারা সকল বাধাকে তুচ্ছ করে। স্কুল পরিত্যাগ করিয়া বালকগণের আহ্লাদের সীমা নাই, তাহারা গোঁপ কামাইয়া 'পাছা পেড়ে' কাপড় ও 'জলতরঙ্গ' মল পরিয়া দেশের উপকারে প্রবৃত্ত—আর পায় কে? উৎসাহ-দাতা ভুবনবাবু কল্পতরু, তিনি অজস্র অর্থ বৃষ্টি করিতেছেন, সুতরাং নটগণের আহার ব্যবহারের কোন কষ্ট না থাকায় ক্রমেই দলের পুষ্টি হইতেছে এবং নটগণ (Recruit) 'রিক্রুট' সৈন্য সংগ্রহের ন্যায় নানা কুহক মন্ত্রে বালক সংগ্রহ করিতেছেন; এদিগে সমাজের উন্নতি এই পর্য্যন্ত।

'গ্রেট ন্যাসানেল' প্রথম অভিনয় গত সোমবার ৯ই তারিখে এখানকার ষ্টেসন থিয়েটরে আরম্ভ হইয়াছে। ষ্টেসন থিয়েটর প্রকাশ্য নাট্যশালা নহে এখানকার সাহেব লোক উহা অতি যত্নসহকারে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার দোদুল্যমান চিত্রপট অতি সুন্দর তাহাও 'গ্রেট ন্যাসানেল' অভিনেতাগণ ব্যবহার করিতে পাইয়াছেন। প্রথম রাত্রে হেমলতা অভিনয় হয়। হেমলতা দীনবন্ধু বাবুর কমলে কামিনীর ছায়া মাত্র। কমলে কামিনী যদিও ভাল নাটক নহে, তথাপি উহার রচনা প্রণালী উৎকৃষ্ট হইয়াছে এবং কোন কোন স্থান যথার্থ বীররস উদ্দীপক কিন্তু হেমলতার রচনা ইহার নিকট কোন গুণেই লক্ষিত হয় না, তবে এখানি বাঙ্গালা অনেক দৃশ্য কাব্য হইতে ভাল হইয়াছে। ইহার নাট্যাভিনয় দেখিতে অতি অল্প মাত্র ব্যক্তি গিয়াছিলেন। হেমলতার অভিনয়ে মনে যত শোক উদ্রেক হউক বা না হউক অভিনেতা বালকটির অবস্থা মনে করিয়া আমাদিগের অশ্রু নির্গত হইয়াছিল! অভিনয় শেষ হইলে একটি যুবক নর্ত্তকী সাজিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া নাটকের বীররস সকল মনে স্থান পায় না আমাদিগকে হীনবল ভীরু বাঙ্গালি বলিয়াই বোধ হয়। 'হারুবতী পরিণয়' নাটক লেখক উপস্থিত ছিলেন, তিনি ম্যানেজার মহাশয়ের নিকট ১০৲ টাকা দিয়াও একটি স্ত্রীলোকের বসিবার আসন চাহিয়াছেন বোধকরি. তিনি তাহা পাইতেও পারেন। সম্পাদক মহাশয় ইনি দেশের হিতকর কতিপয় কমিটির মেম্বর অথচ বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষেও একটি পয়সা চাঁদা দেন নাই।

'দ্বিতীয়বার গত বৃহস্পতিবার ১২ই তারিখ রাত্রে কপালকুণ্ডলার অভিনয়

হইয়াছিল এ রাত্রেও দর্শক সংখ্যা অতি অল্প। যাঁহারা না গিয়াছিলেন তাঁহারা বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছেন কেন না এরূপ অভিনয় দেখিতে রাত্রি জাগরণ বৃথা কষ্ট এবং অর্থ ব্যয় করা অপব্যয় ভিন্ন নহে। কপালকুণ্ডলা বাঙ্গালা ভাষার একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার রচনা প্রণালী এবং গল্পটি আদ্যোপান্ত মধুর ও নির্দ্দোষ কিন্তু নাটকখানি তেমনি কদর্য্য হইয়াছে, এখানি মুদ্রিত হইলে বঙ্কিম বাবুর কাব্যের অপমান করা হইবেক। প্রথম গঙ্গাসাগর যাত্রা, নবকুমার ও তাহার দুটি সঙ্গী এবং দুটি নাবিক দৃষ্ট হইয়া যাত্রার দলের 'সং' মনে হইল, তাহারা যে সমুদ্র যাত্রার বিপদে পড়িয়াছে তাহা তাহাদিগের অভিনয়ে কিছুই বুঝা গেল না। নাবিকগণের মনের সুখে বিপদের সময় 'শারিগান' কখনই স্বাভাবিক নহে। নবকুমারের আদ্যোপান্ত অভিনয় কেবল মুখস্থ মাত্র, তাঁহার মুখে মনের ভাব ব্যক্ত হয় নাই। বঙ্কিম বাবুর আলুলায়িতকেশা চিরযোগিনী কপালকুণ্ডলাকে দেখিলে মনোমধ্যে শান্তি রসের উদয় হয়, কিন্তু অভিনয়ে শীর্ণ জরাজীর্ণ কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়া আমাদিগের বৃদ্ধ পিতামহীর গল্পের শঙ্খিনী বা পেত্নী বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং তাঁহার যখন মতিবিবি সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন তখন আমরা কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। কাপালিকের বেশ ভয়ঙ্কর কিছুই হয় নাই কিন্তু তাহার ও মন্দির রক্ষক পুরোহিতের অভিনয় ভাল হইয়াছিল। মতিবিবির অভিনয়ে তাহার গোঁপের চিহ্ন দেখা গিয়াছিল এবং তাঁহার স্বর কর্কশ কিন্তু বেশ মন্দ হয় নাই, অন্য সকল অভিনেতার বেশ পুরাতন জরাজীর্ণ। দুটি সংগীত হইয়াছিল তাহা প্রীতিকর নহে, এরূপ গান দুই একটি স্ব২ বন্ধুর নিকট গান করাই ভাল। প্রকাশ্য নাট্যশালায় ভাল শুনায় না। শেষ অঙ্কে কপালকুণ্ডলার জলে লম্ফপ্রদান স্বাভাবিক হয় নাই। অভিনয় শেষ হইলে আমরা অবাক হইয়া থাকিলাম এবং কি জন্য যে আমরা অর্থ দিয়া আসিয়াছি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ছিন্ন কদর্য্য চিত্রপট এবং নটগণের অভিনয় তদুপযুক্ত দৃষ্টে কাহার আহ্লাদ বোধ হয়? ম্যানেজার বাবু আমরা অসন্তুষ্ট হইয়াছি জানিতে পারিয়া 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল' প্রহসন অভিনয় করিয়াছিলেন। ইহার অভিনয় মন্দ হয় নাই কিন্তু সুধীর বাবুর গলা বড় কর্কশ ও মুনসফ বাবুর বেশ অস্বাভাবিক, সুমতি অনেক অশ্লীল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে কর্ণে হস্ত দিতে হয়, গ্রন্থে এ সকল কথা নাই। অভিনেতা বাবুরা অভিনয়ের অনেক আস্ফালন

করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যে কিছুই হইল না তাঁহারা কপালকুণ্ডলার অভিনয়ে শিব গড়িতে বানর গড়িয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা বলিতেছেন এবারে শীতকালে কতিপয় বেশ্যা ও যাত্রার দলের 'ছোকরা' রাখিয়া 'অপেরা' কোম্পানী খুলিবেন —তাহা খুলিতে পারেন, ভুবনবাবু ব্যয়ে কাতর নহেন কিন্তু ইহা অপেক্ষা অনেক সৎকার্য্যে ব্যয় করিলে তাঁহার অর্থব্যয় সার্থক হইত। কপালকুণ্ডলা অভিনয় হইবার সময় একজন দলভুক্ত টিকিট কালেক্টর বাবু কুরিয়ার ব্যাগ এবং চেইন গলায় দিয়া আস্তে ২ আসিয়া রঙ্গস্থানের নীচে টেকচাঁদ ঠাকুরের "টুপ ভুজঙ্গের" ন্যায় শয়ন করিলেন তৎপরে তাঁহাকে ধরিয়া অন্য ঘরে সমস্ত রাত্রের মত রাখিয়া আসিতে হইল। কেহ ২ বলিলেন ইনি Somnom-bulist ! একটি থিয়েটরের দলের অভিনেতা প্রথম শ্রেণীতে যে বেশে বসিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া অভিনয়ের একটি অঙ্গ বোধ হইল ইতি।'

মফস্বল থেকে কলকাতায় ফিরে এসে গ্রেট ন্যাশনালের দল আবার মহোৎসাহে নতুন অভিনয়ের আয়োজনে লেগে গেল। এতদিন গ্রেট ন্যাশনালে স্ত্রী-ভূমিকা পুরুষেরাই অভিনয় করেছে। কিন্তু এবার হাওয়া-বদল হল। পাঁচজন নতুন অভিনেত্রী ভর্তি হল দলে। সেই পাঁচজনের নাম—কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, হরিদাসী ও রাজকুমারী।

১৮৭৪ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর গ্রেট ন্যাশনালে অভিনীত হল 'সতী কি কলঙ্কিনী'। এই অভিনয়ের সময়ে গিরিশচন্দ্রের কিন্তু থিয়েটারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। আরেকটা কথা বলা দরকার এখানে। আগে ধর্মদাস সুর ম্যানেজার ছিলেন, এখন থেকে ম্যানেজার হলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ম্যানেজার বদলের মূলেও নাকি টাকাকড়ির গোলমাল!

২৬শে সেপ্টেম্বর আবার 'সতী কি কলঙ্কিনী' অভিনীত হল। ৩রা অক্টোবর 'পুরুবিক্রম'। ১০ই অক্টোবর 'সতী কি কলঙ্কিনী' ও 'ভারতে যবন'। তারপর পুজোর ছুটি। ৩১শে অক্টোবর 'ম্যাকবেথে'র বাঙলা অনুবাদ 'রুদ্রপাল' নামে গ্রেট ন্যাশনালে প্রথম অভিনীত হল। ১৪ই নভেম্বর ও ২১শে নভেম্বর 'আনন্দ কানন অথবা মদনের দিগ্বিজয়' ও 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'। 'আনন্দ কাননে' অর্দ্ধেন্দুশেখর একটি ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

অভিনয়ে সুখ্যাতি হলে কি হবে, গ্রেট ন্যাশনালে এবার ভাঙন ধরল। নগেন্দ্রনাথ একদিন ভুবনমোহনকে বললেন—তুমি একখানা এগ্রিমেণ্ট-

পত্রে আমাকে লিখে দাও যে যদি আমাকে কখনও ম্যানেজারের কাজ থেকে ছাড়িয়ে দাও তো আমাকে কুড়ি হাজার টাকা ড্যামেজ দেবে।

কিন্তু সেকথায় ভুবনমোহন রাজী হলেন না। তখন নগেন্দ্রনাথ কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে দল ছেড়ে চলে গেলেন। 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী' নাম দিয়ে এখানে-ওখানে নগেন্দ্রনাথের দল আলাদাভাবে থিয়েটার দেখাতে লাগল। 'গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী'তে ছিলেন অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন বর্মণ, যাদুমণি, কাদম্বিনী প্রভৃতি। শেষকালে গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী গিয়ে যুক্ত হল বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটারের নামে দু-চার কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

ওদিকে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের খবর কী? নগেন্দ্রনাথ চলে আসার পর সেখানে ম্যানেজার হলেন ধর্মদাস সুর। তারপর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ১৮৭৪ সালের ১২ই ডিসেম্বর অভিনীত হল 'শক্রসংহার' নাটক। এই নাটকেই একটি ছোট ভূমিকায় রঙ্গালয়ে প্রথম দেখা দিলেন বিনোদিনী—পরবর্তী কালের একজন প্রখ্যাত অভিনেত্রী। ১৯শে ডিসেম্বরও 'শক্রসংহার' হল। ২৬শে ডিসেম্বর 'বঙ্গের সুখাবসান'। ১৮৭৫ সালের ২রা জানুআরী 'শরৎ-সরোজিনী'। ৯ই জানুআরীও ওই 'শরৎ-সরোজিনী'।

১৮৭৫ সালের ৭ই ফেব্রুআরী 'সাধারণী' পত্রিকা টিপ্পনি করেছে ঃ 'কলিকাতার প্রথম আজব। শরৎ-সরোজিনী নাটকের অভিনয়। এবং সেই আজবের আজব—(Shooting in the Stage) অর্থাৎ রঙ্গভূমি মধ্যে বন্দুক ছোড়া। আজব কথা বটে। কেন না যখন বঙ্গভূমিতে বন্দুক শব্দ নাই, তখন রঙ্গভূমিতে থাকিলে আজব বই আর কি বলিতে পারি। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া রঙ্গভূমির অধ্যক্ষ কলিকাতার বাটি সমস্তের প্রাচীরে Shooting in the Stage এই কথাটির পর পঞ্চান্নটি আজব চিহ্ন দিয়া রাখিয়াছেন। কলিকাতার লোকের সুবিধা এই, এখন হইতে আর একতালা দেয়ালের চূণকাম করিতে হয় না।'

এই 'শরৎ-সরোজিনী'র সূত্রে গোলাপের কথা বিশেষ করে এসে যাচ্ছে। বেঙ্গল থিয়েটার প্রথম যে-চারজন স্ত্রীলোককে অভিনেত্রী বহাল করে, গোলাপ তাঁদের অন্যতমা। একদিন গোলাপ বেঙ্গল থিয়েটার ছেড়ে চলে এলেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে। 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকে সুকুমারী নামে একটি

চরিত্র আছে; সেই চরিত্রে অভিনয় করলেন গোলাপ। অভিনয় এমন নিখুঁত হল যে গোলাপের নামই হয়ে গেল সুকুমারী। হ্যাঁ, নাম বদল হল। ছিলেন গোলাপ, হলেন সুকুমারী।

'শরৎ-সরোজিনী' নাটকে আরেকটি ভূমিকায় অভিনয় করতেন গোষ্ঠবিহারী দত্ত নামে একজন ভদ্রলোক। প্রজাপতির নির্বন্ধ! সুকুমারীর সঙ্গে গোষ্ঠ-বিহারী দত্তের বিয়ে হয়ে গেল। তিন আইনে বিয়ে হল।

লোকে ছড়া কাটল ঃ

আমি সখের নারী সুকুমারী
আমরা স্ত্রী-পুরুষে এক্টো করি
দুনিয়ার লোক দেখে যা রে।

কিন্তু কে আর সুকুমারীর দেখা পাবে! রঙ্গমঞ্চের সংসার ছেড়ে সুকুমারী স্থান নিয়েছেন সংসারের রঙ্গমঞ্চে। সুকুমারী অভিনয় ছেড়ে দিয়েছেন। সুকুমারী দত্ত আর অভিনেত্রী নন, গৃহস্থবধূ।

তারপর গোষ্ঠবিহারী দত্ত একদিন জাহাজের খালাসী সেজে বিলেত চলে গেলেন। সুকুমারী দত্ত পড়লেন মহাবিপদে। তিনি তখন আর একাকিনী নন, শুধু গৃহস্থবধূ নন, তিনি তখন একটি কন্যার জননী। কেমন করে খাওয়া-পরা চলে!

সংসার ছেড়ে আর রঙ্গমঞ্চে আসতে চান নি সুকুমারী। কিন্তু স্বামী দেশান্তরী, অভাবের চূড়ান্ত, তাই উপায়ান্তর না দেখে বাধ্য হয়ে সুকুমারী দত্তকে আবার অভিনেত্রীরূপে রঙ্গমঞ্চে আসতে হয়েছিল। সেসব অনেক পরের কথা। আবার আগের কথায় ফিরে যাই।

ফিরে যাই ১৮৭৫ সালে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে।

১৮৭৫ সালের ১৬ই জানুআরী গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হল প্যাণ্টোমাইম ও রাসলীলা। ২০শে ফেব্রুআরী 'নগ-নলিনী'।

২৮শে ফেব্রুআরী হোলকার এসেছিলেন রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণের বাড়িতে। ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজা, বেথিয়ার মহারাজকুমার, ব্রহ্মরাজদূত প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও সেদিন উপস্থিত। এই উপলক্ষে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনেতারা অভিনয় করে দেখালেন—'যেমন কর্ম তেমনি ফল'। সে অভিনয় দেখে সকলেই খুব খুশী।

মার্চ মাসের শেষার্ধে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের একটা দল পশ্চিমের

দিকে অভিনয় করতে বেরিয়ে পড়ল ; আরেকটি দল গেল না, কলকাতায় অভিনয় দেখানোর জন্যে কলকাতায়ই থেকে গেল।

পশ্চিমের দিকে যে-দল ধর্মদাস সুরের নেতৃত্বে বেরিয়ে পড়ল সে-দলে ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর, অবিনাশ কর, কার্তিক পাল, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, বিনোদিনী প্রভৃতি। বিনোদিনীর মা আবার বিনোদিনীকে একা ছেড়ে দিতেন না। তিনিও চললেন দলের সঙ্গে।

প্রথমেই খুব সম্ভব দিল্লি। দিল্লিতে সাত-আট দিন অভিনয় হয়েছিল, কিন্তু তেমন জমেনি। দিল্লি থেকে লাহোর। সেখানেও দশ-বারদিন অভিনয় হয়েছিল। নাচ-গানের বই-ই বেশি, অর্ধেন্দুশেখরই জমজমাট করে রেখেছিলেন লাহোরের আসর। লাহোরে একটা কাণ্ড হয়েছিল বটে বিনোদিনীকে নিয়ে।

'সতী কি কলঙ্কিনী'তে রাধিকা সেজেছিল বিনোদিনী। সেই সাজে বিনোদিনীকে দেখে মুগ্ধ হলেন গোলাপ সিং। মস্ত বড়মানুষ, সবাই তাকে 'রাজা' বলে ডাকে। তার খেয়াল হল বিনোদিনীকে বিয়ে করে জাতে তুলে নেবেন। গোলাপ সিং সেই মর্মে প্রস্তাব করলেন।

শুনে তো বিনোদিনীর মা কেঁদে-কেটে অস্থির। তার ভয় হল, যদি গোলাপ সিং বিনোদিনীকে কেড়ে নেন।

ধর্মদাস সুর বিনোদিনীর মাকে অভয় দিলেন—না গো, ওরা ভদ্রলোক, ওরা অসৎ ব্যবহার করবে না। আর আমরাও শিগ্‌গির চলে যাচ্ছি, ভয় কি।

লাহোর থেকে মিরাট। মাত্র তিনদিন অভিনয় হল মিরাটে। তারপর আগ্রায়। আগ্রা থেকে লক্ষ্ণৌ। কিন্তু একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গেল। লক্ষ্ণৌ যাবার আগে আগ্রা থেকে উটের গাড়ি চেপে একবার বৃন্দাবনধামে গিয়ে গোবিনজী দর্শন করে আসার কথাটাও এখানে বলা উচিত। বৃন্দাবনের এত কাছে এসে গোবিনজী না দেখে যাবার কোন মানে হয় না। দলের সবাই তাই বলে। শ্রীবৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে একরাত্রি আগ্রায় বিশ্রাম নিয়ে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার গেল লক্ষ্ণৌ।

আগেই একজন লোক সেখানে গিয়ে দলের জন্যে বাসা ঠিক করে রেখেছে। কিন্তু আসল কাজের খবর কি? থিয়েটার হবে কোথায়? সেসব ঠিক আছে। ম্যানেজার ধর্মদাস সুর ছত্রমঞ্জিলে স্টেজ সাজিয়ে নিলেন। দিব্যি স্টেজ। ওই স্টেজে অভিনয় করবে কলকাতার বিখ্যাত গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। মস্ত বড় বাড়ির মধ্যে স্টেজ, চারদিকে গ্যাসের

আলো, প্রচণ্ড ভিড়, জমজমাট অভিনয়। প্রথমদিন অভিনীত হল 'লীলাবতী'। দ্বিতীয়দিন একখানা অপেরা। তৃতীয়দিন বিশ্রাম।

তারপর 'নীলদর্পণ' নাটক। 'নীলদর্পণ' বোধ করি সে-যাত্রা লক্ষ্ণৌতে একাধিকবার অভিনীত হয়েছে। কিন্তু একবারের কথাই বলি, একদিনের কথাই বলি। সেদিন 'নীলদর্পণ' অভিনয় আরম্ভ হয়েছে, শেষ হতে পারে নি।

সেদিন একেবারে লোকে লোকারণ্য। লক্ষ্ণৌয়ের এন্তার বড়লোক দেদার সাহেব এবং বিস্তর মেম এসেছেন 'নীলদর্পণ' দেখতে। সাহেব-মেমের সংখ্যাই সেদিন দর্শকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকেও নেমন্তন্ন করা হয়েছে। সামনের দিকে কেবল লালমুখ। প্রোগ্রামও ছাপান হয়েছিল ইংরেজীতে। সেই সঙ্গে 'নীলদর্পণে'র কাহিনীটিও মোটামুটি লিখে দেওয়া হয়েছিল। উডসাহেব সাজলেন অর্ধেন্দুশেখর, তোরাব মতিলাল সুর, এবং রোগসাহেব অবিনাশ কর। অবিনাশ করের চেহারা চমৎকার; তাঁর স্বভাবও একটু কাট-কাট মার-মার গোঁয়ার-গোবিন্দ গোছের। নীলকুঠির সেই নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচারী সাহেবের ভূমিকায় অবিনাশ কর অপরূপ। একেবারে ষোলআনা নিখুঁত রোগসাহেব।

যাক, অভিনয় তো আরম্ভ হল। ক্রমে-ক্রমে জমে উঠল নাটক। তারপর সেই দৃশ্য—যেখানে ক্ষেত্রমণি কাতর চিৎকার করছে রোগসাহেবের কাছে, 'ও সাহেব, তুমি আমার বাবা, মুই তোর মেয়ে, ছেড়ে দে আমায় ছেড়ে দে'··· তোরাব ছুটে এসে রোগসাহেবের গলা টিপে ধরে হাঁটুর গুঁতো দিয়ে কিল মারতে আরম্ভ করেছে···।

সঙ্গে-সঙ্গে কেলেঙ্কারি কাণ্ড। দর্শকদের আসন থেকে সাহেবেরা হইহই করে উঠে দাঁড়ালেন, পেছন থেকে ছুটে এসে সকলে জমায়েত হতে লাগলেন ফুট লাইটের কাছে। কতগুলো লালমুখো তলোয়ার সমেত লাফিয়ে পড়তে চায় স্টেজের উপর; তারা এমন উন্মত্ত যে আর-পাঁচজনে পর্যন্ত তাদের ধরে রাখতে পারে না।

ড্রপ ফেলে দেওয়া হল। কিন্তু তাতেই কি শেষরক্ষা হবে? এবার হয়তো সব যাবে, এবার নিশ্চয়ই ওরা এদের দলসুদ্ধ কেটে ফেলবে। সে এক বিশাল বিশৃঙ্খলা!

অবিলম্বে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কেল্লা থেকে একদল সৈন্য আনালেন। তখন অবস্থা শান্ত হল খানিকটা।

ম্যাজিস্ট্রেট অভিনয় বন্ধ করে দিলেন, ডেকে পাঠালেন ম্যানেজারকে।

ম্যানেজার ধর্মদাস সুর। পলকে কোথায় তিনি উধাও হলেন কে জানে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ডাকছেন, অথচ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাঁকে। আশ্চর্য, এটুকু সময়ের মধ্যে সুরমশাই নিখোঁজ হয়ে গেলেন কোথায়! অনেক খোঁজাখুঁজির পর ম্যানেজারকে পাওয়া গেল। তিনি পেছনদিকে স্টেজের নীচে চুপচাপ বসে আছেন। কার্তিক পাল ওখানেই তাঁকে ধরে টানাটানি আরম্ভ করলেন। কিন্তু টানাটানি করলে হবে কি, সুরমশাই অনড়। না, উনি উঠবেন না। অগত্যা অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার অবিনাশবাবু অর্ধেন্দুবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সামনে গেলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বললেন—এখানে আর অভিনয় করে কাজ নেই। পুলিস সঙ্গে দিচ্ছি, এখনই তাদের সঙ্গে ফিমেলদের বাসায় পাঠিয়ে দিন। আজ রাত্রে সেখানে পুলিস পাহারা দেবে। সাহেবেরা ভারি উত্তেজিত হয়েছে, এখানে আপনাদের থেকেই কাজ নেই।

দুর্গানাম জপতে-জপতে মেয়েরা তো গাড়িতে উঠলেন। মেয়েদের গাড়ির পিছে-পিছে দলের অনেক পুরুষ মানুষও এক্কাগাড়িতে এলেন। সীন-ড্রেস ইত্যাদি কিছুই এল না, সব পড়ে রইল অকুস্থলে, পুলিসের জিম্মায়।

সেই রাত্রে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অনেকের চোখেই ঘুম এল না সারারাত কাটল পরামর্শে। কখন, কেমন করে কলকাতায় ফেরা যায়!

পরদিন সকালে সটান স্টেশনে। কিন্তু সীন-ড্রেস ইত্যাদি যে ওখানে পড়ে রইল। ওগুলোর কী দশা হবে?

সে-কথায় ম্যানেজার ধর্মদাস সুর বললেন—আমি ওখানে আর যাচ্ছি না, সীন-ড্রেস থাক পড়ে।

লক্ষ্ণৌপ্রবাসী বাঙালীরা সেবার বিস্তর উপকার করেছেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের। ওই সীন-ড্রেস ইত্যাদি তারাই কুলি পাঠিয়ে আনিয়েছেন, বেঁধে-ছেদে ঠিকঠাক ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

মে মাসের মাঝামাঝি ওঁরা কলকাতায় ফিরে এলেন। আর তার কিছুকাল পরেই ধর্মদাস সুর ও কয়েকজন অভিনেতাকে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে যেতে হল। কেন?

ভুবনমোহন নিয়োগী গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের মালিক। তিনি বিরক্ত

হয়েছেন। তাঁর বিরক্তির সঙ্গত কারণ আছে বলে শুনতে পাই। পশ্চিমে অভিনয় দেখিয়ে তাঁরই থিয়েটারের একটি দল উপার্জন করে এনেছে প্রচুর অর্থ এবং নানাবিধ বহুমূল্য পুরস্কার। অথচ ভুবনমোহন পেয়েছেন তার যৎসামান্য অংশ। তা ছাড়া থিয়েটারের লোকসান ও হিসেবপত্রের গোলমালও আছে। ভুবনমোহন বিরক্ত হবেন বইকি!

ভুবনমোহন তখন থিয়েটার ইজারা দিলেন শ্যামপুকুরের কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ধর্মদাস সুর ও কয়েকজন অভিনেতা গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁরা গিয়ে 'দি নিউ এরিয়ান (লেট ন্যাশনাল) থিয়েটার' নাম নিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের মঞ্চে অভিনয় আরম্ভ করলেন।

কিন্তু থিয়েটারের দৌলতে কি দেশের ভালমানুষের ছেলেরা জাহান্নামে যাচ্ছে? কেউ-কেউ বললেন, যাচ্ছে। ১৮৭৫ সালের ৬ই জুলাই 'সুলভ-সমাচার' লিখেছে: 'দেশে থিয়েটারের আগমন হইয়া ভালমানুষের ছেলেদের বহিয়া যাইবার বড়ই সুবিধা হইয়াছে। কলিকাতা হইতে এ রোগ এখন মফস্বলে ঢুকিয়াছে। বাঁকিপুর, জামালপুর প্রভৃতি স্থানে আজ্ কাল্ থিয়েটারের বড় ধুম লাগিয়াছে। দেশের রীতি চরিত্রকে ভাল করিবার জন্য প্রথমে বিলাতে এই থিয়েটারের সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশের বাবুরা ইহার দ্বারা দেশটি ডুবাইবার পথ খুলিয়া দিতেছেন। লক্ষ্যশূন্য হইয়া কাজ করিবার পক্ষে বঙ্গদেশকে কেহ হারাইতে পারিবে না, এবং কেবল নকল করিতেই দেশটি চিরদিন মজবুত।'

এদিকে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'পদ্মিনী' অভিনীত হল ১৮৭৫ সালের ৭ই আগস্ট। 'শরৎ-সরোজিনী' হল ১৪ই আগস্ট। কিন্তু তখন থিয়েটারের নাম বদলে গেছে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হয়েছে দি ইণ্ডিয়ান (লেট গ্রেট) ন্যাশনাল থিয়েটার। সেখানে 'নীলদর্পণ' অভিনীত হল ২১শে আগস্ট। অমৃতলাল বসু এই সময়েই বেঙ্গল থিয়েটার ছেড়ে এখানে চলে আসেন।

তারপর ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটারে সুকুমারী দত্তের সাহায্যকল্পে ২৩শে আগস্ট অভিনীত হল 'অপূর্ব সতী'। ৪ঠা সেপ্টেম্বর 'ডাক্তারবাবু'। ২৫শে সেপ্টেম্বর 'কনকপদ্ম'। ৬ই নভেম্বর 'বৃত্রসংহার'।

ইতিমধ্যে ১৮৭৫ সালের ২৬শে অক্টোবর 'থিএটর ও কুচরিত্র নারী' হেডিং দিয়ে 'সুলভ সমাচার' মন্তব্য করেছে: 'কলিকাতায় থিএটর লইয়া এক বিষম হইয়া উঠিয়াছে। যত বখাটে ছেলে স্কুল হইতে পলাইয়া গিয়া

থিএটরের আকড়ায় মিশে, ভাল ছেলেদেরও কুমতি দেয়। কেউ নাপতিনী সাজিতেছে, কেউ বউ হইতেছে, কেউ কনসার্টে যোগ দিয়া ফ্লুট ফুঁকিতেছেন, এরূপ অবস্থায় বালকেরা যে শীঘ্র অধঃপাতে যায় তাহা বলা বাহুল্য। বিপদ যদি এখানে শেষ হইত তাহা হইলেও ভাল। ইহা অপেক্ষা আরও বিপদ ঘটিয়াছে। থিএটরের লোকেরা সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য এবং উপার্জ্জন লোভে বাজার হইতে স্ত্রীলোক ধরিয়া আনিয়া অভিনয় আরম্ভ করিয়াছে। এতদ্দ্বারা কি অল্প বয়স্ক কি অধিক বয়স্ক সকলের পক্ষেই কতদূর অনিষ্টের ভয় তাহা প্রকাশ করা অনাবশ্যক। একেত আমাদের দেশে সচ্চরিত্রের দিকে পুরুষদিগের তত দৃষ্টি নাই, তার উপরে এরূপ ব্যবহারে কয়জন লোক আপনার মনকে ভাল রাখিতে পারে? পাঠকদিগের প্রতি আমাদের এই নিবেদন তাঁহারা যেন যে সমস্ত থিএটরে স্ত্রী অভিনেতা আছে সেখানে না গমন করেন, গেলে পরে ভাল মন লইয়া ফিরিয়া আসা তাহাদিগের পক্ষে কঠিন হইবে। ...'

কিন্তু কৃষ্ণধনের আমলে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটারে লাভের অঙ্ক কী রকম হচ্ছে? কিছু না, কিছু না। সেদিকে অবস্থা অত্যন্ত কাহিল। থিয়েটারের ভাড়া পর্যন্ত দিয়ে ওঠা যাচ্ছে না।

ভুবনমোহন তখন অগত্যা থিয়েটারের ভার আবার নিজের হাতে তুলে নিলেন। এবার থিয়েটারের ডিরেক্টর হলেন উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার হলেন অমৃতলাল বসু। থিয়েটারের পূর্বনাম বহাল হল। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার আবার সেই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার হল।

১৮৭৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হল 'হীরকচূর্ণ'। গাইকোয়াড়ের সিংহাসন-চ্যুতি নিয়ে নাটকখানি লেখা। 'হীরকচূর্ণ' অমৃতলাল বসুর লেখা প্রথম নাটক। এই 'হীরকচূর্ণ' অভিনয়কালে প্রায় একটা বিপদের সূত্রপাত হয়েছিল; অবশ্যি অমৃতলাল বসুর উপস্থিত বুদ্ধির জোরে বিপদ ঘটে নি শেষ পর্যন্ত।

বিখ্যাত অভিনেতা যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। পি-ডব্লু-ডিতে কাজ করতেন তখন। 'হীরকচূর্ণ' নাটকেই প্রথম রঙ্গালয়ে রেলগাড়ি দেখান হয়, আর সেই রেলগাড়ি বানিয়েছিলেন যোগেন্দ্রনাথ মিত্র। পাছে আর কেউ স্টেজে রেলগাড়ি চালাতে গিয়ে ভণ্ডুল করে দেয়, সেজন্যে স্বয়ং যোগেন্দ্রনাথই ড্রাইভার সেজে রঙ্গমঞ্চে রেলগাড়ি চালাতেন। এই নতুনত্বে

সকলে মুগ্ধ। সকলেই যোগেন্দ্রনাথের প্রশংসা করলেন।

সেদিন স্টেজে একটা কাণ্ড হয়ে গেল এই রেলগাড়ি নিয়ে। অভিনয় আরম্ভ হয়েছে। যথাসময়ে রেলগাড়ি তো ধোঁয়া উড়িয়ে বাঁশি বাজিয়ে স্টেজে ঢুকল। ড্রাইভার সেজেছেন যোগেন্দ্রনাথ, গাইকোয়াড় সেজেছেন অর্ধেন্দুশেখর আর গার্ডসাহেব সেজেছেন অমৃতলাল।

হঠাৎ বিকল হয়ে গেল রেলগাড়ি। চলতে-চলতে হঠাৎ অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্টেজের উপর। যোগেন্দ্রনাথ চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখছেন না, কিন্তু রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে। এখনও হল না? তাহলে তো সমূহ বিপদ। দর্শকেরা অস্থির হয়ে উঠেছে, ওদের বুঝি আর ধৈর্য থাকে না।

তখন অমৃতলালের মাথায় ধাঁ করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি তো গার্ড সেজেছেন, তিনি একটা লাল নিশান ঘুরোতে আরম্ভ করে দিলেন। লাল নিশান মানে বিপদের সঙ্কেত। গার্ড লাল নিশান উড়িয়েছে, অতএব রেলগাড়ি আর চলবে না।

কল যে কখন বিকল হয়ে যাবে, কেউ বলতে পারে না। যন্ত্রের গোলমালে বিপদ হয়, তা একরকম। আর আরেকরকম হল নিজেদের ভুলত্রুটির ফলে বিপদে পড়া। সে রকম বিপদও হতে পারে। হতে পারে কি, হয়েছে। তাহলে একদিন 'বৃত্র-সংহার' অভিনয়ে যেতে হচ্ছে।

'বৃত্র-সংহার' অভিনয়েও যোগেন্দ্রনাথ কলের একটা কৌশল করেছিলেন।

'বৃত্র-সংহারে'র একটি দৃশ্যে আছে যে নিকবন্ধ নামে এক দৈত্য শূন্য থেকে নেমে এসে শচীদেবীকে কেশাকর্ষণ করে নিয়ে যাচ্ছে। কাদম্বিনী শচীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন। নিকবন্ধের ভূমিকা নিয়েছেন যোগেন্দ্রনাথ।

এই দৃশ্যে একটি চমকপ্রদ ব্যবস্থা করেছেন যোগেন্দ্রনাথ। কাদম্বিনীকে তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা। শেষকালে যেন একটা গণ্ডগোল না বাঁধে।

হ্যাঁ, নিকবন্ধবেশী যোগেন্দ্রনাথ শূন্য থেকেই নেমে আসবেন। আছে, আছে, কায়দা আছে। কলের কায়দা। যোগেন্দ্রনাথ কাদম্বিনীর ঘাড়ে ও কোমরে বেল্ট বেঁধে দুটি কড়া লাগিয়ে দিয়েছেন; আর নিজের পায়ে ও কোমরে হুক এঁটে রেখেছেন। যোগেন্দ্রনাথ কাদম্বিনীকে বুঝিয়ে বললেন— আমি মানে নিকবন্ধ যখন উপর থেকে নেমে আসবে, অভিনয় করবার সঙ্গে

সঙ্গে তুমি তখন হুকে কড়া লাগিয়ে দেবে।

নিকবন্ধ তো যথাসময়ে শূন্য থেকে নেমে এল। শূন্য থেকে দৈত্য নামছে, এই দৃশ্য দেখেই দর্শকেরা বিমুগ্ধ। হইহই কাণ্ড। এদিকে শচীবেশ-ধারিণী কাদম্বিনী আসল কাজটি ভুলে গেছেন। তিনি হুকে কড়া লাগান নি।

যোগেন্দ্রনাথ তো সেকথা জানেন না, তিনি ইশারা করলেন, কল চলল। শচীদেবীকে কেশাকর্ষণ করে শূন্যপথ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিকবন্ধ। একটু বাদেই কাদম্বিনীর খেয়াল হল, সর্বনাশ, হুকে তো কড়া লাগান হয় নি। যোগেন্দ্রনাথও বুঝলেন, সর্বনাশ, কাদম্বিনীর শরীরের সকল ভার তার দু-হাতে। যোগেন্দ্রনাথের হাতের মুঠো শিথিল হলেই কাদম্বিনী ছিটকে পড়ে যাবেন। প্রাণপণে যোগেন্দ্রনাথ শক্ত করে কাদম্বিনীর চুলের মুঠো ধরে রইলেন। যন্ত্রণায় কাদম্বিনী ঝুলন্ত অবস্থায় পরিত্রাহি চিৎকার করতে লাগলেন।

দর্শকেরা এত সব জানে না। তারা ভাবল, অভিনয় হচ্ছে বটে। চমৎকার। রঙ্গালয় ভরে উঠলো দর্শকবৃন্দের হাততালিতে।

ওদিকে দৃশ্য শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে থিয়েটারের লোকেরা গিয়ে কাদম্বিনীকে ধরে নামাল।

প্রসঙ্গত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পর্কে একটি সরস ঘটনা মনে এল। মনে যখন এল তখন না বলার কোন মানে হয় না।

একবার চোরবাগানে গোপাললাল মিত্রের বাড়িতে থিয়েটারের দল গিয়েছে 'নবীন তপস্বিনী' অভিনয় করতে। যোগেন্দ্রনাথ আছেন সে-দলে। যোগেন্দ্রনাথ একজন বাহকের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। মাথায় ঝাকড়া চুল, কাঁধে গামছা, গলায় মালা, মালকোচা আঁটা—যোগেন্দ্রনাথ একেবারে পুরোদস্তুর বাহক সেজেছেন।

চতুর্থ অঙ্কের ড্রপ পড়ে গেছে। কনসার্ট বাজছে। পঞ্চম অঙ্কের গোড়াতেই বাহকবেশী যোগেন্দ্রনাথকে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করতে হবে। ঠিক আছে।

থিয়েটারের ভিতরে একপাশে তামাকের সরঞ্জাম নিয়ে বসে আছে ও-বাড়ির একটি চাকর। সে সকলকে তামাক-টামাক সেজে দিচ্ছে। যোগেন্দ্রনাথ ভাবলেন, স্টেজে উঠবার আগে একছিলিম তামাক খেয়ে নি, একটু ফুর্তি আনি শরীরে। বললেন চাকরটিকে—ওরে, চট করে একছিলিম তামাক দে তো।

কে তামাকের হুকুম দিচ্ছে। চাকরের কাছে যোগেন্দ্রনাথ তখন আর বাবু নেই, যোগেন্দ্রনাথের নিখুঁত সাজপোশাক দেখে চাকরটি যোগেন্দ্রনাথকেও নিজের

সমগোত্র ভেবে বসে আছে। সেই চাকরটি মনে-মনে ভাবল, থিয়েটারের চাকর হয়ে লোকটা এমন বাবু হয়েছে যে আমাকে দিয়ে তামাক সাজিয়ে নিয়ে খেতে চায়!

চাকরটি যোগেন্দ্রনাথের মুখের ওপর বলল—বড় যে বাবু হয়েছিস! তুই নিজে তামাক সেজে খা না।

কথা শুনে যোগেন্দ্রনাথ রাগে ফেটে পড়লেন—কি, এত বড় আস্পদ্দা, আমাকে তুই তামাক সেজে খেতে বলিস? —চড় মারলেন চাকরটাকে। চাকরটিও গলাধাক্কা দিল যোগেন্দ্রনাথকে। যোগেন্দ্রনাথ কয়েক ঘা বসিয়ে দিলেন চাকরটির পিঠে। চাকরটি যোগেন্দ্রনাথের চুল ধরল মুঠো করে।

ততক্ষণে অন্যান্য অভিনেতারা অকুস্থলে এসে পড়েছেন। কী, হল কী?

এদিকে চাকরটি যোগেন্দ্রনাথের চুলে টান দিয়েছে মুঠো করে, আর সঙ্গে সঙ্গে যোগেন্দ্রনাথের মাথার পরচুলাটি চলে এসেছে চাকরটির মুঠোর মধ্যে। থিয়েটারের একজন বাবু চাকর সেজেছেন!!

সকলে সমস্বরে বলছে—যোগেনবাবু, ব্যাপার কী?

ব্যাপার বিশেষ কিছু না, চাকরটি তখন যোগেন্দ্রনাথের পা জড়িয়ে ধরে কাঁপতে কাঁপতে ক্ষমা চেয়ে যাচ্ছে।

ডালপালা ছেড়ে দিয়ে মূলকথায় আসি। ১৮৭৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হল 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'। ১৮৭৬ সালের ৮ই জানুআরী 'প্রকৃত বন্ধু'। তারপর তিন সপ্তাহে তিন দিনই—১৫ই জানুআরী, ২২শে জানুআরী, ২৯শে জানুআরী—অভিনীত হল 'সরোজিনী'। ৫ই ফেব্রুআরী 'বিদ্যাসুন্দর', ১২ই ফেব্রুআরীও তাই। ১৯শে ফেব্রুআরী আবার 'সরোজিনী' আর তার সঙ্গে একখানা প্রহসন 'গজদানন্দ ও যুবরাজ'।

'গজদানন্দ ও যুবরাজে'র পিছনে একটু চাঞ্চল্যকর ইতিহাস আছে। ১৮৭৬ সালের জানুআরী মাসে সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজরূপে কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁকে আহ্বান করে হাইকোর্টের উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় নিজের ভবানীপুরের বাড়িতে নিয়ে এলেন। সেই বাড়ির মহিলারা যুবরাজকে শাঁখ বাজিয়ে উলু দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। এই নিয়ে কলকাতায় তুমুল হইহল্লা। সেই হইহল্লারই একটি ফল গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের এই প্রহসন—গজদানন্দ ও যুবরাজ।

২৩শে ফেব্রুআরীও 'সতী কি কলঙ্কিনী'র সঙ্গে ওই প্রহসনখানা অভিনীত হল। কিন্তু ওদিকে পুলিসও ঘুমিয়ে নেই। একজন রাজভক্ত প্রজাকে ব্যঙ্গ করে

অপমান করা হচ্ছে, এই অভিযোগে 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' প্রহসনের অভিনয় বন্ধের হুকুম দিল পুলিস।

২৬শে ফেব্রুআরী অভিনীত হল 'কর্ণাটকুমার' ও 'হনুমান চরিত্র'।

'হনুমান চরিত্র' কী? না, নাম ছাড়া আর নতুন কিছু না। ও ওই 'গজদানন্দ ও যুবরাজকে'ই 'হনুমান চরিত্র' নাম দিয়ে অভিনয় করা হচ্ছে।

কিন্তু তাতে শেষরক্ষা হল না। পুলিসের হুকুমে 'কর্ণাটকুমার' ও 'হনুমান চরিত্রে'র অভিনয়ও বন্ধ করতে হল।

পুলিস! ঠিক আছে। ১লা মার্চ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হল 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক আর তার সঙ্গে পুলিসকে ব্যঙ্গ করে লেখা একখানা প্রহসন; প্রহসনখানার নাম—The police of pig and sheep.

ওদিকে সরকার বাহাদুরও উঠে-পড়ে লেগেছেন, নাট্যশালাকে মুঠোর মধ্যে আনতে হবে। এ-বিষয়ে বড়লাটের একখানা অর্ডিন্যান্স ২৯শে ফেব্রুআরী জারি করা হল, স্থির হল আইন করে সায়েস্তা রাখতে হবে নাট্যশালাকে।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ওসব গোলমেলে প্রহসনের লাইন ছেড়ে দিল। কিন্তু এরা ছাড়লেই কি পুলিস ছাড়বে?

৪ঠা মার্চ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'সতী কি কলঙ্কিনী'র অভিনয় হচ্ছে। সেই অভিনয়ের মধ্যেই পুলিসের ডেপুটি কমিশনার এসে থিয়েটার থেকে দশজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলেন। ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল বসু এবং আটজন অভিনেতা। কোন্ অপরাধে এদের গ্রেপ্তার করা হল, শুনি? হুঁ, অপরাধ গুরুতর; আগে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক অভিনীত হয়েছে না এখানে? হ্যাঁ। সেই নাটকখানা অশ্লীল।

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বিচারে আটজন অভিনেতা নিষ্কৃতি পেলেন, কিন্তু উপেন্দ্রনাথ আর অমৃতলালের একমাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ডের হুকুম হল।

কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে পরদিনই হাইকোর্টে আপীল করা হল। হাইকোর্টের বিচারে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' অশ্লীল প্রমাণিত হল না, উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল মুক্তি পেলেন।

১৮৭৬ সালের ২৮শে মার্চের 'সুলভ সমাচার' থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি: '... হাইকোর্টের জজ ফিয়ার এবং মার্কবি সাহেব 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকের মধ্যে কোন অশ্লীল কথা এবং তাহার অভিনয়ে কোন অশ্লীল প্রদর্শনের প্রমাণ না পাইয়া বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস এবং বাবু অমৃতলাল বসুকে

সম্পূর্ণ খালাস দিয়াছেন। আমরা আজকালের বাঙ্গালা নাটক পড়িতে কোন মতে রাজি নহি। এক আদালতের সাহেব পুস্তকখানিকে অশ্লীল বলিয়া মনে করিলেন, বাবু শ্যামাচরণ সরকার স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে এরূপ অভিনয় তিনি তাঁহার পরিবারদিগকে দেখাইতে পারেন না, তথাপি উপর আদালতের সাহেবেরা কিরূপে পুস্তকখানি অশ্লীল বিবেচনা করিলেন না ইহা জানিবার জন্য আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক টাকা ঘর হইতে দিয়া একখানি উক্ত নাটক ক্রয় করিয়া আনি। আমরা ইহার ভিতর যেরূপ অশ্লীল ভাব দেখিলাম তাহাতে ইহা কোন মতেই পাঠ্যের উপযুক্ত নহে। ইহার অভিনয় যে আর দূষণীয় সন্দেহ নাই। ইহার ভিতরে অশ্লীল কথা না থাকিতে পারে, কিন্তু কদর্য্য কথা কহাই যে কেবল অশ্লীল তাহা নহে। এক জন এমন নাচিতে পারে যে তাহা অশ্লীল, তাহাতে কথা নাই বলিয়া যে তাহা দণ্ডার্হ নহে এরূপ নয়। যাহাতে দুষ্ক্রিয়ার সমুদায় লক্ষণ প্রকাশ থাকে, এবং লোকের মনে কুভাব আনিয়া দেয় তাহাই অশ্লীল। কেহ কেহ বলিবেন পুস্তকের উদ্দেশ্য মহৎ, অর্থাৎ সাহেবদিগের অত্যাচার বর্ণন করা। সাহেবদের অত্যাচার বলিতে গেলে যে কুৎসিত জঘন্য ব্যাপার সকল খুলিয়া লিখিতে হইবে, ইহা অতি নীচ মনের কথা। ... আশ্চর্য্য এ দেশের লোকের মন যে, এ প্রকার নাটকের অভিনয়েও অনেকে কোন দোষ দেখিতে পান না! আমাদের মতে এ প্রকার পুস্তক গুলিকে পুড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য।'

কারও আবেদন-নিবেদনে কর্ণপাত না করে ১৮৭৬ সালের শেষের দিকে নাট্যাভিনয় সম্পর্কে সরকার একটি নতুন আইন করল। এই বছরের মার্চ মাসে কাউন্সিলে আইনের একটি খসড়া দাখিল করেছিলেন হবহাউস সাহেব। এই আইন-প্রসঙ্গে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' মন্তব্য করল: 'নাটক সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এ আইন বিধিবদ্ধ না হয় এই জন্য অনেকগুলি আবেদন প্রদত্ত হয়, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভাতে তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। যুবরাজ যদি এখানে না আগমন করিতেন তাহা হইলে হয়ত এ আইনটি বিধিবদ্ধ হইত না। এ আইনের উদ্দেশ্য মহৎ হইতে পারে, কিন্তু ইহা দ্বারা গভর্ণমেণ্ট আমাদের উপর আর একটী শাসন স্থাপন করিলেন। আমরা শাসনের প্রভাবে নির্জীব হইয়াছি। গবর্ণমেণ্ট যদি আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক সমুদয় কার্য্যের উপর পর পর এইরূপ শাসন স্থাপন করিতে থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় আর দীর্ঘকাল আমাদের এ আইনের অধীন থাকিয়া

ইংরাজ রাজার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে না। ভারতবর্ষবাসীরা এরূপ স্থানে গমন করিবে যেখানে আর ইংরাজ শাসনের ভ্রূকুটীতে তাহাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না।'

প্রসঙ্গসূত্রে ক্ষণেকের জন্যে ছেদ টেনে এবার আরও পিছনের দিকে চলে যাই, উপেন্দ্রনাথের বিষয়ে দু-চার কথা নিবেদন করি।

উপেন্দ্রনাথের বাবার নাম শ্রীনাথ দাস। হাইকোর্টের উকিল। শোনা যায়, বহুকাল আগে উপেন্দ্রনাথ একবার বাবার সঙ্গে বিবাদ করে মান্দ্রাজ যান। মান্দ্রাজ থেকে ফিরে এসে ইণ্ডিয়ান র‍্যাডিকাল লীগ নামে একটি সভা স্থাপন করেছিলেন উপেন্দ্রনাথ। তিনিই সভাপতি ছিলেন সে-সভার। এককালে কলকাতায় একজন নামকরা যুবক সংস্কারক ছিলেন উপেন্দ্রনাথ। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন উপেন্দ্রনাথ। শিবনাথ শাস্ত্রীও সংস্কৃত কলেজে পড়তেন। সেই সুবাদে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল দু-জনের। কতদিন শিবনাথ উপেন্দ্রনাথের বাড়িতে বসে উপেন্দ্রনাথের মুখে পাশ্চাত্য দর্শন ও সংস্কারের আলোচনা শুনেছেন।

অনেকদিন আগের কথা। কলেরা হয়ে কয়েকঘণ্টার মধ্যে উপেন্দ্রনাথের প্রথমা স্ত্রী মারা গেলেন। তারপর একদিন জনকয়েক বন্ধুর সঙ্গে উপেন্দ্রনাথ সংস্কৃত কলেজে এসে উপস্থিত। শিবনাথকে ক্লাস থেকে ডেকে পাঠান হল। শিবনাথ তখন এল-এ ক্লাসের ছাত্র।

সেদিন উপেন্দ্রনাথ শিবনাথকে বলেছিলেন—একটা খবর আছে। শুনে তুমি সুখী হবে।

—কী খবর ?

—আমি একটি বিধবাকে বিয়ে করতে যাচ্ছি।

উৎসাহিত হয়ে ওঠার মত খবর বইকি।

—কিন্তু মেয়েটির মামার বিয়েতে মত নেই। মামাই মেয়েটির অভিভাবক। মেয়ের মায়ের মত আছে। মেয়েটি ভবানীপুরে থাকে। চুরি করে আনতে হবে।

অত সব বিচার-বিবেচনা কে করে। আসল কথা, একটা বিধবা-বিবাহ হবে। উৎসাহের আতিশয্যে শিবনাথ দলের সঙ্গে ভিড়ে পড়লেন।

তিনজন যুবক একখানা গাড়ি নিয়ে ভবানীপুরের এক গলির মোড়ে এসে দাঁড়ালেন। বন্দোবস্ত হয়ে আছে, মেয়েটিকে তার দিদি দিনে-দুপুরে এই

গাড়িতে তুলে দিয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় কে। অনেকক্ষণ পরে খবর এল, মেয়েটি দিনের বেলায় আসতে পারবে না। সন্ধ্যার পর আবার আসতে হবে।

ওঁরা তিনজনেই গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন ইডেন গার্ডেনে। সেখানে গাছ-তলায় বসে দিব্যি খাওয়া হল—কলা আর পাউরুটি। সন্ধ্যার পরে গাড়ি নিয়ে এসে আবার দাঁড়ান গেল ভবানীপুরের সেই গলির মোড়ে। রাত প্রায় দশটা বেজে গেল। শেষ পর্যন্ত মেয়েটির দিদি মেয়েটিকে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি ছুটল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

কিন্তু গাড়ি এসে যে-বাড়ির সামনে থামল, সেই-বাড়ির দিকে তাকিয়ে শিবনাথ বিরক্ত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন—বিয়ে কবে হবে?

উপেন্দ্রনাথ বললেন—বিয়ে হবে কাল রাতে। আর সে-পর্যন্ত মেয়েটি এই বাড়িতেই থাকবে।

শিবনাথ ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—না, তা কিছুতেই হতে পারে না। এমন জানলে আমি এর মধ্যে আসতাম না। এই বাড়িতে পুরুষের দলে আর মাতালের মধ্যে এই মেয়েটিকে কিছুতেই রাখা চলে না।

বিস্তর তর্ক-বিতর্ক হল। শেষে উপেন্দ্রনাথ শিবনাথকে বললেন—তবে তুমি যেখানে পার মেয়েটিকে একরাত্রের জন্যে রেখে দিয়ে এস।

সেই রাত দুপুরে শিবনাথ মেয়েটিকে নিয়ে গেলেন গুরুচরণ মহলানবীশ মহাশয়ের বাড়িতে। সব শুনে গুরুচরণ মেয়েটিকে একরাত্রির জন্যে আশ্রয় দিলেন।

পরদিন বিয়ে।

মেয়েটিকে বিবাহসভায় নিয়ে আসবার ভার নিলেন শিবনাথ। আসবার পথে হল আরেক বিপদ।

একটা গাড়িতে মেয়েটিকে নিয়ে শিবনাথ আসছিলেন, এক ছোট গলির মধ্যে আরেক গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল। দুই গাড়িই আটকে গেল চাকায়-চাকায়। শিবনাথ গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। আরম্ভ করলেন চাকা ধরে টানাটানি।

ঘটনাস্থলে অতঃপর একদল মাতাল এসে উপস্থিত। দলের মধ্যে একজন আবার শিবনাথের চেনা।

মাতালদের প্রশ্ন—এ কি বাবা! রাস্তা আটকেছ কেন?

বৃত্তান্ত শুনে মাতালেরা কাজে লেগে গেল। গাড়ি ছাড়িয়ে দিতে হবে। কাঁধ দিয়ে পড়ল সকলে।

একজন মাতাল জিজ্ঞেস করল—Is there any gentle woman, বাবা ?

শিবনাথ বললেন—হ্যাঁ।

ব্যস, তারপরে আর কোন মাতাল গাড়ির দরজার কাছে যায় না। গাড়িতে gentle woman আছে!

ওরাই গাড়ি ছাড়িয়ে দিল। মেয়ের গাড়ি চাকরের সঙ্গে চলে গেল। শিবনাথ সঙ্গে যেতে পারলেন না। মাতালেরা তাঁকে ধরে পড়েছে—এত করে গাড়ি ছাড়ালাম বাবা, কিছু দিতে হবে।

সঙ্গে কিছু নেই, কেমন করে শিবনাথ ওদের কিছু দেবেন।

অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন শিবনাথ, বিবাহ সভায় যেতে বললেন ওদের, কিন্তু কিছুতেই ওরা রাজি হয় না। কিছু না পেলে ওরা শিবনাথের চাদর কেড়ে নেবে।

ও, শিবনাথের হঠাৎ মনে পড়ল, পকেটে একটা টাকা আছে। আধ-ঘণ্টা টানাটানির পর সেই টাকাটা দিয়ে ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন শিবনাথ।

যা হোক, বিয়ে তো হয়ে গেল।

বিয়ের পর শিবনাথ সবসময়েই উপেন্দ্রনাথ আর তাঁর নতুন সংসারের খোঁজ-খবর নিয়েছেন, দরকার হলে এটা-ওটা করে দিয়েছেন।

কিন্তু উপেন্দ্রনাথের স্বভাব-চরিত্র ভারি অদ্ভুত। যত্র-তত্র ঋণ করেন, শোধ করার নাম করেন না। বাড়ি ভাড়া করেন, ভাড়া না দিয়ে আবার রাতারাতি বাড়ি বদল করেন। এই রকম সব কাণ্ড।

তারপর ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র সস্ত্রীক উপেন্দ্রনাথকে কাশীতে নিয়ে যান। সেখানে লোকনাথ মৈত্রই ওদের খরচ-পত্র চালাতেন। সেখানেও উপেন্দ্রনাথ গোপনে ঋণ করে লোকনাথবাবুকে জড়িয়ে ফেলেছেন। এক বছরের বেশি কেটেছে কাশীতে। তারপর গুরুতর অসুখ নিয়ে উপেন্দ্রনাথ চলে এসেছেন কলকাতায়, সরাসরি শিবনাথের আশ্রয়ে।

শিবনাথের তখন চূড়ান্ত দুরবস্থা।

কিছুদিন আগে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন শিবনাথ।

শিবনাথের বাবা হরানন্দ ভট্টাচার্য বিদ্যাসাগরের প্রিয়পাত্র। অধর্মবিদ্বেষী, সত্যানুরাগী। শিবনাথ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন; অতএব শিবনাথের বাবা

শিবনাথকে ত্যাগ করেছেন। বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

কলকাতায় কলেজ স্কোয়ারের উত্তরে একটি গলিতে একজন ব্রাহ্মবন্ধুর সঙ্গে এক বাড়িতে থাকেন শিবনাথ। সম্বলের মধ্যে কলেজের স্কলারশিপ। কায়ক্লেশে দিন চলে।

বলা-কওয়া নেই, এই অবস্থায় উপেন্দ্রনাথ কাশী থেকে সটান এখানে চলে এলেন। সঙ্গে স্ত্রী, একটি শিশু। উপেন্দ্রনাথ গুরুতর অসুস্থ।

এসে পড়েছেন যখন, উপায় কি, সকলকে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন শিবনাথ। পাশের ঘরের বাসিন্দা ঘর খালি করে দিয়ে অন্যত্র চলে গেল। তা না হলে এঁদের থাকবার জায়গা কোথায়?

উপেন্দ্রনাথের চিকিৎসার জন্যে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করলেন শিবনাথ। শিবনাথকে খুব ভালবাসেন অন্নদাচরণ খাস্তগির। সেইজন্যেই পয়সা-কড়ি না নিয়ে তিনি উপেন্দ্রনাথের চিকিৎসা করছেন।

কিন্তু অসুখ গুরুতর। ক্রমেই অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে। উপেন্দ্রনাথের বাবার কথা মনে পড়ল। বাবাকে দেখার সাধ হল একবার।

সেই কথাই উপেন্দ্রনাথ শিবনাথকে বললেন—আমি বোধ হয় আর বেশিদিন বাঁচব না। যদি একবার বাবার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পার, বড় ভাল হয়।

কিন্তু শ্রীনাথ দাসের সঙ্গে শিবনাথের তো আলাপ-পরিচয় নেই। শিবনাথ কেমন করে তাঁর কাছে গিয়ে একটা জটিল অনুরোধ নিয়ে উপস্থিত হতে পারেন। শ্রীনাথ দাস উপেন্দ্রনাথের প্রতি বিষম বিরক্ত। কিন্তু তা বলে মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের প্রার্থনা কি তিনি পূর্ণ করবেন না?

ভেবেচিন্তে শিবনাথ একটা পন্থা আবিষ্কার করলেন। ভাবলেন, বিদ্যাসাগরের কথা। ভাবলেন, হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই বিদ্যাসাগরের কাছে গেলে এ-ব্যাপারে আর জটিলতার তন্তুমাত্র থাকবে না, সবকিছু জলের মত সহজ হয়ে যাবে।

শিবনাথ গেলেন বিদ্যাসাগরের কাছে। কিন্তু উপেন্দ্রনাথের নাম শুনেই তিনি বিমুখ হলেন। বললেন—যাকে দেখলে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জুতো মারতে ইচ্ছে করে তার হয়ে তুই আমাকে অনুরোধ করিস?

তবে আর উপায় কি। স্বয়ং বিদ্যাসাগর যখন বিরোধী, তখন আর কার সাধ্য উপেন্দ্রনাথের প্রার্থনা পূর্ণ করে।

শিবনাথ বললেন—তবে আমি যাই। কী আর করব। আপনি বিমুখ

হলেন, কে আর বাপ-বেটায় দেখা করিয়ে দেবে। উপেন্দ্রের শেষ অনুরোধটা রাখা গেল না।

শিবনাথ বিরসমুখে বিদায় নিতে উঠলেন। সেই বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বিদ্যাসাগর কী ভাবলেন, কে জানে। বললেন—যাস নে, বোস। মরণকালে বাপকে দেখতে চেয়েছে, শুভবুদ্ধি হয়েছে, এটাও ভাল। দেখি কিছু করতে পারি কি না।

একটুখানি ভেবে বললেন—কাল সকাল সাতটা-আটটার মধ্যে তার বাপকে তোর বাড়িতে নিয়ে যাব। তুই ঘরে থাকিস।

পরদিন সকাল সাতটায় বিদ্যাসাগর শ্রীনাথ দাসের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত। শ্রীনাথকে বললেন—তোমার গাড়ি জুততে বল দেখি, তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে।

শ্রীনাথ দাস বললেন—কোন জায়গায়?

বিদ্যাসাগর বললেন—আঃ, চল না! রাস্তায় বলব।

গাড়ি চলল। গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় এসেই বিদ্যাসাগর বললেন—কোথায় নিয়ে যাচ্ছি জান?

শ্রীনাথ দাস শুনতে লাগলেন—তোমার ছেলে উপেন অসুস্থ হয়ে কাশী থেকে এসে এক বন্ধুর বাসায় উঠেছে। খুব শক্ত অসুখ, বাঁচে কি না সন্দেহ। মৃত্যুশয্যায় পড়ে সে তোমাকে দেখতে চেয়েছে। তাই তার বন্ধুর অনুরোধে তোমাকে নিতে এসেছি।

উপেন্দ্রের নাম শুনেই শ্রীনাথ দাস জ্বলে উঠলেন। বললেন—কোচম্যান, গাড়ি ফেরাও।

সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যাসাগর বললেন—কোচম্যান, গাড়ি থামাও। আমি নামব।

গাড়ি থামল। বিদ্যাসাগর নামতে যাচ্ছেন, শ্রীনাথ দাস তাঁর হাত ধরলেন, বললেন—একি? তুমি নাম কেন?

বিদ্যাসাগর বললেন—ছেড়ে দাও আমাকে। তোমার সঙ্গে আমার এই শেষ বন্ধুতা। ছেলে যতই বিরাগভাজন হোক, মৃত্যুশয্যায় পড়ে সে বাবাকে দেখতে চেয়েছে, এখনও তুমি দেখা দিতে চাও না? কেমন বাপ হে তুমি?

মন্ত্রের ফল হল। শ্রীনাথ দাস শান্ত হলেন, বললেন—গাড়ি চালাও।

শ্রীনাথ দাস এলেন, ছেলেকে দেখলেন, ক্ষমা করলেন, চলে গেলেন, বিদ্যাসাগর গেলেন না। বিদ্যাসাগর শিবনাথের কাছে উপেন্দ্রনাথের নানারকম

খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন। টাকাকড়ির অবস্থা কি রকম? সেদিকে একেবারে ফাঁকা, কানাকড়িরও সম্বল নেই উপেন্দ্রনাথের।

বিদ্যাসাগরের দু-চোখ জলে ভরে উঠল। আগের দিন যার নাম শুনে দু-হাতে জুতো মারবার কথা বলেছিলেন, পরের দিন তার অবস্থা দেখে দু-চোখে কাঁদতে লাগলেন।

যাবার আগে বিদ্যাসাগর শিবনাথের হাতে দশটি টাকা দিয়ে বলে গেলেন—দেখিস, ওর স্ত্রী-পুত্র যেন না ক্লেশ পায়। টাকার অভাব হলে আমাকে বলিস। এত খরচ তুই কোত্থেকে জোগাবি?

আগে যা হবার তা হয়ে গেছে। এবার ১৮৭৬ সালে উপেন্দ্রনাথকে নিয়ে কী সংবাদ হয় দেখি। ১৮৭৬ সালের ২৮শে মার্চ 'সুলভ সমাচার' লিখেছে: 'ন্যাসেনল থিয়টরের ডাইরেক্টর বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস বারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত গমন করিবেন। এ ব্যক্তিকে যেন ভূতে ঘুরিয়া নিয়া বেড়াইতেছে। আমরা আশা করি ইনি শান্ত শিষ্ট হইয়া যাহাতে সংসারের কুশল হয় এরূপে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।'

উপেন্দ্রনাথ বিলেতে চলে গেলেন ১৮৭৬ সালের এপ্রিলে। অমৃতলাল বসু পুলিসে চাকরি নিয়ে আন্দামানে চলে গেলেন পরের এপ্রিলে। কিছুকাল পরে দু-জনেই আবার ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়, দু-জনেই আবার রঙ্গালয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সেসব কথা এখন নয়।

এখনও গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের পালা সাঙ্গ হয়ে যায় নি।

১৮৭৭ সালের প্রথমার্ধে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে যেসব নাটকাদির অভিনয় হয়েছে, তার থেকে কয়েকখানার নামোল্লেখ করি: পারিজাত হরণ বা দেব দুর্গতি; প্রণয় কানন বা প্রভাস মিলন; আদর্শ সতী; বিদ্যাসুন্দর; ধীবর ও দৈত্য; নবীন তপস্বিনী; ঠাকুরদাদা; সরোজিনী; সতী কি কলঙ্কিনী; কৃষ্ণকুমারী।

১৮৭৭ সালের ২৮শে জানুআরী 'সাধারণী' লিখেছে: 'কলিকাতা। গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার। বিগত শনিবার গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে পারিজাত হরণ বা দেব দুর্গতি নাট্যাভিনয় হইয়া গিয়াছে। নাট্যাভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা নন্দন কাননের দৃশ্যটি বড় চমৎকার হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, স্ত্রীলোকদিগের অভিনয়কালে জনৈক লম্পট ব্যক্তি স্ত্রীলোকদিগকে নানাবিধ অশ্লীল বাক্য প্রয়োগে দর্শক বৃন্দকে মহা

ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। উক্ত ব্যক্তির ঈদৃশ নীচাশয়তা দর্শনে থিয়েটার দলের জনৈক বাবু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে থিয়েটার হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যাইতে বলেন, তাহাতে উক্ত দুরাত্মা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অমনি দৌড়িয়া উপরোক্ত বাবুটির গণ্ড দেশে সজোরে এক ঘুষা মারে; দর্শক মণ্ডলী মধ্যে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া যায়। থিয়েটার কোম্পানির কতিপয় বাবু আসিয়া উক্ত নীচাশয়কে বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিয়া বিদায় করেন। ইহাকেই বলে "যেম্নি কর্ম্ম তেম্নি" ফল। পরিশেষে উপসংহার কালে আমার বক্তব্য এই যে, গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অধ্যক্ষেরা খুব সতর্ক হইবেন; ভবিষ্যতে যেন, এরূপ নরাধমেরা থিয়েটার গৃহে প্রবেশ করিতে না পায়।'

১৮৭৭ সালের ২১শে এপ্রিল গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে উৎসব হল। ১৮৭৭ সালের ২৩শে এপ্রিলের (সোমবার) 'সমাচার চন্দ্রিকা'র একটি সংবাদ থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছিঃ গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটরের পারিতোষিক দান রজনী। গত শনিবার উপরোক্ত রঙ্গশালায় আদর্শ সতী গীতাভিনয় হইয়া গিয়াছে। অভিনয়ের সমাপ্তিতে, রায় গিরিশচন্দ্র দাস বাহাদুর উক্ত কোম্পানির উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ ২৫০ টাকা মূল্যের যে ৩টী রৌপ্য পদক এবং ৬টী সুবর্ণ অঙ্গুরীয়ক দান করিয়াছিলেন, এবং আর একজন বাবু সোণার চুড়ি একটি রৌপ্য ঘড়ি, কয়েকটী আতরের শিশী, এবং কলিকাতার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক গ্রেট ন্যাশন্যালের অভিনেতৃদিগকে সম্মানসূচক সার্টিফিকেট প্রদান করিয়াছিলেন; তাহা সাধারণের সমক্ষে পারিতোষিক দান করা হয়। অধ্যক্ষের অনুমত্যানুসারে আর্য্যদর্শন সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাভূষণ, পারিতোষিক সভার সভাপতি হন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে নিচের লিখিত পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে:—

বাবু ভুবনমোহন নেউগী—অধ্যক্ষ
একটি রৌপ্য পদক
,, ধর্ম্মদাস সুর— ষ্টেজ মেনেজার
একটি রৌপ্য পদক
,, রামতারণ সান্ন্যাল— অপেরা মেং
একটি রৌপ্য পদক
,, মহেন্দ্রলাল বসু
একটি রৌপ্য ঘড়ি

এতদ্ব্যতীত ছয় জন স্ত্রী অভিনেতৃ ছয়টি সোণার অঙ্গুরীয়ক, শ্রীমতী নারায়ণী নামক যে অভিনেতা সাবিত্রীর অংশ অভিনয় করিয়াছিল, তাহাকে কোন বাবু এক জোড়া সোণার চুড়ি দিয়াছিলেন!

তৎপরে পারিতোষিক দান আরম্ভ হইলে সভাপতির অনুরোধ শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরিলাল মুখোপাধ্যায় ইংরাজীতে একটি সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন। গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটরে উক্ত রজনীতে যে সকল নীচাশয় দর্শক ছিল, তাহাদিগের আচরণ দেখিয়া অনেকেই অবাক হইয়াছেন। ঐ সকল দর্শকরা সভাপতিকে এরূপ হাস্যাস্পদ করিয়াছিল যে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীরা সভ্যতা সভ্যতা করিয়া বেড়ান, কিন্তু তাহাদিগের সভ্য হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে, সকল সভাতেই যদি এইরূপ হইবে, তবে আর কোন্ ভদ্রলোক কোন সভায় কি যোগ দিবেন? ...'

১৮৭৭ সালের ৪ঠা মে (শুক্রবার) 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখেছেঃ 'গ্রেট ন্যাশনেল থিয়েটর। গত বুধবার আদর্শ সতী, (গীতাভিনয়) ঠাকুরদাদা প্রহসন ও কুব্জ প্রহসনের অভিনয় হইয়াছিল। আদর্শ সতীর কথা ত আমাদিগকে আর কিছু বলিতে হইবে না। ঠাকুরদাদা প্রহসন তত ভাল হয় নাই, আমাদেরও কষ্টবোধ হওয়ায় আমরা ইহা ইচ্ছা পূর্ব্বক শুনি নাই। কুব্জ প্রহসন নিন্দার নহে।—আমরা গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটরের অধ্যক্ষকে অনুরোধ করি, এ সময় ভয়ানক গ্রীষ্ম পড়িয়াছে, যাহাতে রাত্রি ১২টার মধ্যে অভিনয় সমাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হইবেন।'

১৮৭৭ সালের ২৪শে মে (বৃহস্পতিবার) 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখেছেঃ 'গত বুধবার গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটরে কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে বলিতে হইবে, তবে কৃষ্ণকুমারীর অংশ যাহাকে অভিনয় করিতে দেওয়া হইয়াছিল, সে দেখিতে ততোধিক সুন্দরী নহে। কৃষ্ণকুমারী রাজকন্যা; তাহার ঐ রূপ কুৎসিত গঠন হইলে চলিবে কেন? যদি আর কখন কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় হয়, তাহা হইলে এই অংশটুকু যেন পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হয়।'

১৮৭৭ সালের ১৮ই জুন (সোমবার) 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখেছেঃ 'গত শনিবার গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটরে সরোজিনী নাটকের পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্ক কৃষ্ণকুমারী নাটকের পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় গর্ভাঙ্ক, শরৎ সরোজিনী নাটকের শেষ দৃশ্য এবং আদর্শ সতী গীতি নাট্যের চতুর্থ অঙ্কের অভিনয় হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা

শরৎ সরোজিনীর শেষ দৃশ্যটীতে আমরা অধিকতর প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম। শরৎ, সরোজিনী, এবং সুকুমারীর অভিনয় প্রশংসনীয় হইয়াছিল। সরোজিনী নাটকের চতুর্ভুজ, দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে রোষেনারার বলিদান দর্শকগণের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। কৃষ্ণকুমারী নাটকের পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কটীর অভিনয় দর্শনে পাষণ্ডেরও মন দ্রবীভূত হইয়া যায়। ফলে উপরোক্ত চারি খানি নাটকের নির্ব্বাচিত অংশগুলি মন্দ হয় নাই। আলোক দৃশ্য এবং পরিস্থান যেমন বরাবর হইয়া থাকে, তেমনই হইয়াছিল। এ সময় ভয়ানক গ্রীষ্ম পড়িয়াছে, এখন রাত্রি ২।৩ টা পর্য্যন্ত জাগরণ করিয়া অভিনয় দর্শন করা বড়ই কষ্টকর, দর্শকগণের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। তজ্জন্য আমরা অনুরোধ করি, আপাতত কিছু দিনের জন্য অভিনয় বন্ধ রাখিলে ভাল হয়।'

সেসময়ে দুটি মাত্র সাধারণ রঙ্গালয় কলকাতায়। গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার আর বেঙ্গল থিয়েটার। তুলনায় কোন্ থিয়েটারের অভিনয় বেশী ভাল হয়?

১৮৭৭ সালের ২৬শে মার্চের 'সমাচার চন্দ্রিকা' থেকে একটুখানি তুলে দিচ্ছিঃ 'গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটর কোম্পানি যেরূপ গীতাভিনয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, নাটকাভিনয়ে তদ্রুপ হয়েন নাই। বঙ্গ রঙ্গ-ভূমি যেরূপ নাটকাভিনয় করিতে পারেন তদ্রুপ গীতাভিনয় করিতে পারেন না। এটী স্বতঃসিদ্ধ; মনুষ্যে যেরূপ সকল গুণ সম্ভবে না, এ বিষয়েও তদ্রুপ।'

১৮৭৭ সালের ২৪শে মার্চ, শনিবার, বেঙ্গল থিয়েটার 'আলিবাবা ও চল্লিশ-জন তস্করে'র অভিনয় দেখাল। তাতে নাকি ব্যঙ্গ করা হয়েছে গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারকে। তা গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারও চুপ করে রইল না, পাল্টা একখানা প্যাণ্টোমাইম করল। ১৮৭৭ সালের ২রা এপ্রিলের (সোমবার) 'সমাচার চন্দ্রিকা' থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছিঃ গ্রেট ন্যাশন্যালের পেণ্টো-মাইম বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিকে লক্ষ্য করিয়া করা হইয়াছে। এ বিষয়ে আমরা গ্রেট ন্যাশন্যালকে দোষ দিতে পারি না। যেহেতু বিগত শনিবার বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি ন্যাশন্যালকে লক্ষ্য করিয়া আলীবাবা ও ৪০ জন তস্করের অভিনয় দেখাইয়া-ছিলেন। —মুকুরকে যেরূপ মুখ বিকৃতি করিয়া দেখাইবে সেইরূপ দেখিবে। গালি দিলে কে না গালি দেয়? যিনি দেন না তিনি বিশেষ ভদ্র লোক; গ্রেট ন্যাশন্যাল যদি না দিতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদিগকে বিশেষ ভদ্রলোক বলিতাম। আমরা উভয় দলকে অনুরোধ করিতেছি, আর অভদ্রতা-চরণে প্রয়োজন নাই, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। ইহাকেই বলে

"টিট ফর ট্যাট।"

১৮৭৭ সালের ১৬ই এপ্রিল একটা বলবার মত কাজ করেছে বেঙ্গল থিয়েটার। ১৮৭৭ সালের ২০শে এপ্রিল (শুক্রবার) 'সমাচার চন্দ্রিকা' লিখেছে ঃ 'গত সোমবার বঙ্গ রঙ্গ ভূমিতে কেবল মাত্র স্ত্রীলোকদিগের জন্য মৃণালিনীর অভিনয় হইয়াছিল। উক্ত দিবস পুরুষদিগের প্রবেশাধিকার ছিল না। আমরা শুনিলাম উক্ত রজনীতে ৫।৬ শত ভদ্র মহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা নাকি অভিনয় দর্শনে বিশেষ আহ্লাদিত হয়েন। আমরা ইচ্ছা করি বঙ্গ-রঙ্গভূমি মধ্যে মধ্যে এক একদিন স্ত্রীলোকদিগের জন্য অভিনয় করেন। আমরা আরো অনুরোধ করিতে পারি, যদি কোন ভদ্রলোক আপনার পরিবারদিগকে নাট্যাভিনয় দেখাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অনায়াসে এই রঙ্গশালায় পাঠাইতে পারেন। ভদ্র মহিলাগণ বাটীতে যে ভাবে থাকেন, এখানেও তদপেক্ষা কোন অংশে অপমানিত হইবেন না।'

এ তো ভালো কাজ। কিন্তু ১৮৭৭ সালের ১৬ই মে 'আয় ঘুরে আয় সোণার চাঁদ' নামে একখানা প্রহসনের অভিনয় দেখিয়ে বেঙ্গল থিয়েটার বোধ হয় খুব ভালো কাজ করে নি। ১৮৭৭ সালের ১৮ই মের (শুক্রবার) 'সমাচার চন্দ্রিকা' থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি ঃ 'গত বুধবার বেঙ্গল থিয়েটর অর্থাৎ বঙ্গ রঙ্গভূমিতে "সতী কি কলঙ্কিনী এবং আয় ঘুরে আয় সোণার চাঁদ" প্রহসনের অভিনয় হইয়াছিল। আমরা এই অভিনয় স্থলে উপস্থিত ছিলাম। সতী কি কলঙ্কিনীর অভিনয় মন্দ হয় নাই। কিন্তু আয় ঘুরে আয় সোণার চাঁদ প্রহসন খানি অতি জঘন্য। ইহার নামটী যেরূপ অশ্লীল, অভিনয়ও তদপেক্ষা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে। এই প্রহসন খানি গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটরকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করিয়া রচিত এবং অভিনীত হইয়াছে। এমন কি অভিনয় দর্শনে আমাদিগের বোধ হইল যে, ইহা স্পষ্টত গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটরের অধ্যক্ষ বাবু ভুবনমোহন নেউগীকে এবং উক্ত থিয়েটরের অভিনেতৃ-গণকে বিদ্রুপ এবং গালি দেওয়া হইতেছে। কোন্ ভদ্রলোক পরনিন্দা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন? সুতরাং ইহা যে উপস্থিত ভদ্র দর্শকগণের কষ্টপ্রদ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ফল কথা বলিতে কি, আমাদিগের এই অভিনয় দর্শনে ক্রোধের আবির্ভাব হইয়াছিল। কেন হইয়াছিল, তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই, পাঠকগণ বুঝিয়া লউন।

সে যাহা হউক, হবহাউস সাহেবের এত সাধের নাট্যাভিনয় আইন বিধিবদ্ধ

হইয়া কি হইল? যদি আইনানুযায়ী কার্য্যই হইল না, তবে এত আড়ম্বর করিয়া বিধিবদ্ধ করাইবার কি আবশ্যক ছিল? নাট্যাভিনয় আইনের একটি ধারায় লিখিত আছে, অশ্লীল, নিন্দাজনক অথবা অপবাদজনক কোন নাটক কিম্বা প্রহসনের অভিনয় করিলে নাট্যশালার অধ্যক্ষ, অভিনেতৃ এবং দর্শকগণ দণ্ডার্হ হইবেন। বঙ্গ রঙ্গভূমির অভিনীত "আয় ঘুরে আয় সোণার চাঁদ" প্রহসন খানি কি এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট নহে? আমরা আশ্চর্য্য হইলাম যে, পুলিসের অন্যতর সুযোগ্য ইন্সপেক্টর বাবু সর্ব্বানন্দ রায় তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি উপস্থিত থাকিয়া যে, এ প্রকার অশ্লীল প্রহসনের অভিনয় দেখিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিলেন, ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। যাহা হইক, অভিনীত পুস্তক পরীক্ষা করিবার জন্য যে একটি অফিস হইবার কথা ছিল তাহার কি হইল? নাট্যাভিনয় আইনে পুলিস কর্ম্মচারীদিগের উপর এরূপ ক্ষমতা দেওয়া আছে, যদি তাঁহারা বিবেচনা করেন যে অভিনীত বিষয় অশ্লীল অথবা অপবাদজনক তাহা হইলে তদ্দণ্ডে তাহারা অভিনয় বন্ধ করাইতে পারেন, এবং যদি নাট্যশালার অধ্যক্ষগণ তাহাদের কথা না শুনেন তাহা হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ধৃত করিতে পারেন। আমরা দুঃখিত হইলাম সর্ব্বানন্দ বাবুর সম্মুখে এরূপ জঘন্য অশ্লীল ও অপবাদজনক প্রহসনের অভিনয় হইল, তিনি তাহার অভিনয় বন্ধ করাইলেন না কেন?

পরিশেষে আমাদিগের নিবেদন কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ যেকালে নাট্যাভিনয় আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তখন যাহাতে তাহার আইনানুযায়ী কার্য্য হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করুন। এতদিন অভিনয়ের উপর কোন আইন ধারা ছিল না, সুতরাং আমরাও তদ্বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করি নাই। নাট্যাভিনয় আইনের বশবর্ত্তী হইয়া যদি নাট্যশালাদিগকে চলিতে হয়, তাহা হইলে অভিনীত পুস্তক পরীক্ষার্থ অফিস করা হউক, তাঁহারা যে পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন, তাহারই অভিনয় হইবে, এবং যে স্থলে কোন নাটক, গীতাভিনয় বা যাত্রার অভিনয় হইবে, এরূপ আজ্ঞা করিয়া দিউন। শেষে আমাদের বক্তব্য, বঙ্গ রঙ্গভূমি "আয় ঘুরে আয় সোণার চাঁদ" নামধেয় যে প্রহসনের অভিনয় করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে পুলিস কমিস্তনর একটু মনোযোগী হইবেন। আমরা মনে করিতাম বঙ্গ রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ ভদ্রলোক, কিন্তু তাঁহাদের আচার ব্যবহার দেখিয়া আমাদের অন্তর হইতে সে ভাবটুকু দূর হইয়াছে।'

এ-প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হয় নি। ১৮৭৭ সালের ২৪শে মে 'সমাচার

চন্দ্রিকা' আবার লিখেছেঃ 'গত বুধবার বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে পুনশ্চ আয় ঘুরে আয় সোণার চাঁদ প্রহসনের অভিনয় হইবার কথা ছিল, আমরা জানি না, তাহার অভিনয় হইয়াছিল কিনা। যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুলিস কি করিতেছেন? নাসারন্ধ্রে সরিষা তৈল দিয়া কি নিদ্রা যাইতেছেন? নাট্যাভিনয় আইন বিধিবদ্ধ হইয়া কি হইল? তাহার পরিণাম ফল কি এই?'

বেঙ্গল থিয়েটার ছেড়ে এবার গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের কথায় আসি। এতদিন গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার চালাচ্ছিলেন ভুবনমোহন নিয়োগী। শেষ পর্যন্ত ভুবনমোহন গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার ইজারা দিলেন গিরিশচন্দ্রকে। ১৮৭৭ সালের ৭ই আগস্টের 'সমাচার চন্দ্রিকা' থেকে তুলে দিচ্ছিঃ 'গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটরের অধ্যক্ষ বাবু ভুবনমোহন নেউগী তিন বৎসরের জন্য বাগবাজার নিবাসী বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষকে থিয়েটর বাটী ভাড়া দিয়াছেন।—গিরিশবাবু একজন উপযুক্ত লোক, বোধ হয় ইঁহার হস্তে থিয়েটরটী ভাল রূপে চলিবে।'

ইজারা নিয়ে গিরিশচন্দ্র গ্রেট ন্যাশন্যালের 'গ্রেট' ছেঁটে দিলেন। গিরিশ চন্দ্র আগের নাম বহাল করলেন—ন্যাশন্যাল থিয়েটার।

ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনয়ের জন্যে গিরিশচন্দ্র প্রথমেই বেছে নিলেন মাইকেলের মেঘনাদবধ। তার নাট্যরূপ দিলেন গিরিশচন্দ্র। মেঘনাদ ও রাম—এই দুই চরিত্রেই একা গিরিশচন্দ্র অভাবনীয় অভিনয় করলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা'র মন্তব্যের একাংশ উদ্ধার করিঃ 'বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মেঘনাদ ও রামের অংশ অভিনয় করেন। স্পষ্ট কথা বলিতে কি গিরিশ বাবুর মত অভিনেতা বোধ করি বঙ্গ নাট্যশালায় নাই।'

গিরিশচন্দ্রের এই দুই ভূমিকাভিনয় সম্পর্কে একদিন 'সাধারণী'তে যা প্রকাশিত হয়েছে তার কিয়দংশ তুলে দিচ্ছিঃ 'রামচন্দ্র এবং মেঘনাদ, এই দুই রূপে নাট্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ অভিনয় করেন। পাত্র-দ্বয়ের চরিত্র, কার্য্য এবং ভাব সমস্তই বিভিন্ন, সুতরাং একই ব্যক্তির দ্বিবিধ রূপ পরিগ্রহ কিছু বিসদৃশ্যতা হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অভিনয়-দক্ষতায়, তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতায়, এ দোষ দেখিয়াও আমরা মনে কিছু করিতে পারি নাই, দোষ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম এবং তাঁহার রামরূপের অভিনয়ে বারংবার আমাদের কঠোর চক্ষুও অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। লক্ষ্মণ যখন পূজাগারে প্রবেশ করেন, তখন

গিরিশচন্দ্রের মেঘনাদ-সম্ভব সৌম্যভাব দর্শনে আমরা মুগ্ধ হই; আবার তৎপরক্ষণেই যখন মেঘনাদ সহসা রোষকষায়িত নেত্রে বীরমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বক্ষ প্রসারণপূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিলেন, তখন গিরিশচন্দ্র অভিনয়-পটুতার চরম সীমা দেখাইলেন, তাঁহার সে ভাব অদ্ভুত, বিস্ময়কর! তাহাতে আমরা মুগ্ধেরও অধিক হইয়াছিলাম। ইংলণ্ডের প্রথিতনামা গ্যারিকের ক্ষমতার পরিচয় পুস্তকে পাঠ করিয়াছি, কিন্তু বঙ্গের গিরিশ অপেক্ষা কোনও গ্যারিক যে অধিকতর ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন, ইহা আমাদের ধারণা হয় না। গিরিশচন্দ্র দীর্ঘজীবী হউন, আর এইরূপে আমাদের সুখ বর্দ্ধন করিয়া সাধুবাদ গ্রহণ করিতে থাকুন। গিরিশ বঙ্গের অলঙ্কার।'

মাইকেলের 'মেঘনাদবধে'র পর নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' নিলেন গিরিশচন্দ্র। নাট্যরূপ দিলেন। অভিনয় করলেন ন্যাশন্যাল থিয়েটারে। গিরিশচন্দ্র 'পলাশীর যুদ্ধে' ক্লাইভ সাজলেন।

এই সময়েই বলতে হয় 'আগমনী', 'অকালবোধন' আর 'দোললীলা'র কথা। তিনখানাই গিরিশচন্দ্রের লেখা। তিনখানাই অভিনীত হল ন্যাশন্যাল থিয়েটারে।

অল্পদিনেই গিরিশচন্দ্রের ন্যাশনাল থিয়েটার আসর জমিয়ে ফেলল। ১৮৭৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর 'সাধারণী' লিখেছেঃ 'নব কলেবরে কলিকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটরের বেশ সুখ্যাতি হইয়াছে। বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও কেদারনাথ চৌধুরী উভয়েই এবিষয়ে যোগ্য ব্যক্তি; ইঁহাদের উপর এই রঙ্গভূমির তত্ত্বাবধানের ভার আছে, সুতরাং অভিনয় কার্য্য ভাল হইবারই কথা। তবে ভদ্রলোকে যে কতকগুলা বাজারের বেশ্যা লইয়া অধিকদিন কোন কার্য্য চালাইতে পারেন, সে বিশ্বাস আমাদের নাই; তাহাতেই বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে। বিলাতের মত আমাদের দেশের অভিনেত্রীগণ যতদিন না আপনাদের ইজ্জৎ বুঝিবে ততদিন আমাদের এ আশঙ্কা কিছুতেই অপগত হইবে না।'

এবার একটানে 'দুর্গেশনন্দিনী'তে চলে আসি। 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনয়-কালে একদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। জগৎসিংহরূপী গিরিশচন্দ্র স্টেজে পা পিছলে পড়ে গিয়ে গুরুতর আঘাত পেলেন, তাঁর বাঁ-হাতের কব্জি ভেঙে গেল। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে তিনমাস লেগে গেল। গিরিশচন্দ্রের

অভাবে দর্শকসংখ্যা কমে গেল। থিয়েটারের অবস্থা, বলা বাহুল্য, খারাপ হয়ে পড়ল।

কিন্তু এ-দুর্ঘটনার কিছুকাল আগেই গিরিশচন্দ্র ন্যাশন্যাল থিয়েটারের ইজারার স্বত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন। ছেড়ে দিয়েছিলেন ভাইয়ের কথায়। অতুলকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের ভাই। হাইকোর্টের উকিল।

অতুলকৃষ্ণ একদিন গিরিশচন্দ্রকে বললেন—মেজদাদা, তুমি দিনের বেলা আপিসে চাকরি কর, রাত্রে থিয়েটারে বই লেখা, রিহার্সাল দেওয়া, অভিনয় করা—এসব নিয়ে ব্যস্ত থাক। বিশ্বাসী ও সুযোগ্য ভেবে তুমি যাদের ওপর টিকেট বিক্রি, হিসেব রাখা ইত্যাদি থিয়েটারের নানা কাজের ভার দিয়েছ, তারা যে বরাবর হুঁশিয়ার হয়ে সব কাজ করবে তার প্রমাণ কী? এদের দোষেই ভুবনমোহনবাবু নানারকম দেনার দায়ে শেষ-পর্যন্ত থিয়েটার ভাড়া দিতে বাধ্য হয়েছেন। ভুবনমোহোনবাবুর দুরবস্থা দেখে আমার ভাবনা হচ্ছে। হয় তুমি থিয়েটার ছাড়, নয়ত এস আমরা পৃথক হয়ে যাই।

অনুগত ভাইয়ের মুখে এই কথা! গিরিশচন্দ্র বিস্মিত হলেন। বললেন—তুমি কি ভাবো থিয়েটারের আয়-ব্যয় ইত্যাদির দিকে আমার চোখ নেই? আর যেরকম বিক্রি হচ্ছে তাতে কি তোমার ধারণা, আমার লোকসান হবে?

অতুলকৃষ্ণের বদ্ধমূল বিশ্বাস, লোকসান হবে। সেই কথাই বললেন অতুলকৃষ্ণ—থিয়েটারের ভেতরের যা অবস্থা তাতে আমার বিশ্বাস থিয়েটার করে কারওই লোকসান বই লাভ হবে না।

'তোমার যদি এই বিশ্বাসই হয়',—গিরিশচন্দ্র নিরুপায়ের মত বললেন—'তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি তোমাকে বলছি, থিয়েটারের সংশ্রবে যতদিন থাকব আমি আর কখনও স্বত্বাধিকারী হবার চেষ্টা করব না।'

অতঃপর নানা হাতে গিয়েছে ন্যাশনাল থিয়েটার।

গিরিশচন্দ্রের পরে ন্যাশনাল থিয়েটারের ভার নিলেন দ্বারকানাথ দেব। কয়েকমাস পরে দ্বারকানাথ ছেড়ে দিলেন। এবার ভার নিলেন কেদারনাথ চৌধুরী। তারপর নিয়েছেন গোপীচাঁদ শেঠি।

গোপীচাঁদের আমলে ন্যশনাল থিয়েটারে যেসব পালার অভিনয় হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ ভাবে নাম করতে হয় 'কামিনী-কুঞ্জে'র।

'কামিনী-কুঞ্জে'র নায়ক অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করতেন

রামতারণ সান্যাল।

ওরা একবার সদলবলে বাঁকিপুরে গিয়েছেন অভিনয় করতে। সস্তায় ভাল মাখনের জন্যে বাঁকিপুর বিখ্যাত।

একটা কথা আগে এখানে বলে না নিলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। কার্তিক চন্দ্র পাল ন্যাশনাল থিয়েটারের ড্রেসার। কী কারণে কে জানে, তিনি সেবার দলের সঙ্গে বাঁকিপুরে যেতে পারেন নি। তার বদলে গিয়েছেন নবীনচন্দ্র পাল।

বাঁকিপুরে একদিন 'কামিনী-কুঞ্জ' হবে।

নবীনচন্দ্রকে রামতারণ সান্যাল বলে দিলেন—স্টেজে মাখন বেশি করে রেখে দিও। বুঝলে?

নবীনচন্দ্র বুঝেছে। বেশি করে মাখন রেখে দিয়েছে স্টেজে। অভিনয়কালে যথাস্থানে শ্রীকৃষ্ণবেশী রামতারণ মাখন খেতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু এ কি, মাখনের বদলে এগুলো কী! বিস্বাদ! মুখ পুড়ে গেল রামতারণবাবুর। রাগে স্থানকাল ভুলে গেলেন রামতারণবাবু। স্টেজের ওপরে শ্রীকৃষ্ণবেশেই তিনি নবীনচন্দ্রের উদ্দেশে শুয়োর-টুয়োর যা-নয় তাই বলে গালাগাল করতে লাগলেন।

দর্শকেরা উচ্চরোলে হেসে উঠল।

নবীনচন্দ্র বলল—আমাকে ওরকম গালাগাল করছেন কেন মিছেমিছি। এ তো আর সত্যি-সত্যি মাখন নয়। স্টেজে তো সব নকল করে দেখাতে হয়। সবেদা-টবেদা চুন-টুন মিলিয়ে মিশিয়ে আমি ঠিক স্টেজের মাখন বানিয়ে দিয়েছি। আমার দোষটা কোথায় হল বলুন!

এখন আর বলে কী হবে, কথাটা খেয়াল করে আগে নবীনচন্দ্রকে বুঝিয়ে দিলেই সব দিক নিটুট থাকত। আগে থাকতে না বলে দিলে নবীন চন্দ্রই বা কেমন করে জানবে যে শ্রীকৃষ্ণবেশী রামতারণবাবু স্টেজে বসেও আসল মাখন খেয়ে থাকেন।

হ্যাঁ, 'কামিনী-কুঞ্জে' নায়কের ভূমিকাভিনেতা রামতারণ সান্যাল। কিন্তু রামতারণকে অভিনেতা বললে কিছুই বলা হয় না। বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য রামতারণ সান্যাল। নানা গীতিনাট্যের সুরতাল-নৃত্যাদির শিক্ষাদাতা এই রামতারণ। তাঁর কৃতিত্বের প্রথম পরিচয় 'আদর্শ সতী'। বেশ নামডাক হয়েছিল 'আদর্শ সতী'র। যে-বেহারারা বাইরে প্ল্যাকার্ড লাগাত, তারা



বিনোদিনী

অমৃতলাল বসু লিখেছেন : বঙ্গীয় অভিনেত্রীদিগের মধ্যে বিনোদিনীর মত ললিতকলার সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইবার বা আপনার অভিনেয় ভূমিকার সহিত তন্ময় হইবার শক্তি সচরাচর দেখা যায় না।



অর্ধেন্দুশেখর

অমৃতলাল বসু লিখেছেন: হাস্যরসাবতার অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীকে কে না জানেন? . . . কবিবর গিরিশচন্দ্র সাধারণ-নাট্যশালা-স্থাপনের কতকটা বিরোধীই ছিলেন, সুতরাং একমাত্র এই অর্দ্ধেন্দুই ন্যাশানাল থিয়েটারের তৎকালীন সুদক্ষ অভিনেতাদিগকে শিক্ষাপরামর্শদানে প্রস্তুত করিয়া তুলেন।

থিয়েটারের ম্যানেজারকে এসে একেকদিন বলত—বাবু, বাবুলোক সব বলতা, 'আদর্শ সরস্বতী' দেনে।

'আদর্শ সতী' অভিনীত হয়েছিল, আরও পিছনের কথা, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে। 'আদর্শ সতী'তে রামতারণ সান্যাল সত্যবান সেজেছেন।

'আদর্শ সতী'র একটি দৃশ্যে—মৃত সত্যবান রঙ্গমঞ্চে পড়ে আছে আর স্বামীহীনা সাবিত্রী শোকসঙ্গীত গাইছে।

সেদিন নেপথ্যে যিনি হারমোনিয়ম বাজাচ্ছিলেন, তিনি হঠাৎ ভুল করে একটুখানি বেসুরে বাজিয়ে ফেললেন। তার থেকে মস্ত কেলেঙ্কারি।

বেসুরো হারমোনিয়ম শুনে রামতারণবাবুর আর সহ্য হল না; তিনি ভুলে গেলেন যে তখন তিনি রঙ্গমঞ্চে মৃত সত্যবান। স্থানকাল ভুলে গিয়ে রামতারণবাবু তন্মুহূর্তে রঙ্গমঞ্চ থেকে সটান ছুটে গেলেন নেপথ্যের দিকে, হারমোনিয়ম-বাজিয়ের দিকে। মৃত সত্যবান সক্রোধে আত্মহারা হয়ে রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে ছুটে যাচ্ছে, এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে দর্শকদের মধ্যে একটা হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল।

রামতারণবাবু কোনদিকে বিন্দুমাত্র দৃকপাত করলেন না। সটান গিয়ে হারমোনিয়ম-বাজিয়ের কৈফিয়ত তলব করলেন—গান বেসুরো হল কেন?

সেদিন ভিতরে অনেকেই বললেন—রামতারণবাবু, আজ এ কি একটা ছেলেমানুষি করলেন!

ভাবি, সঙ্গীতের জন্যে কী বিপুল ভালবাসা থাকলে একজন মানুষ এমন অপার ছেলেমানুষি করতে পারেন।

মনে রাখতে হবে, রামতারণ সান্যালের নৈপুণ্যে অনেক গীতিনাট্যে জমজমাট হয়েছে ন্যাশনাল থিয়েটার।

রামতারণ সান্যালকে ছেড়ে এখন গোপীচাঁদ শেঠির কাছে চলে আসি। তা গোপীচাঁদও দীর্ঘকাল ন্যাশনাল থিয়েটারের ভার রাখেন নি। গোপীচাঁদ শেঠি ন্যাশনাল থিয়েটারের ভার ছেড়ে দিয়েছেন অবিনাশচন্দ্র কর মশায়কে। তারপর আরও অনেকেই ন্যাশনাল থিয়েটারের ভার বয়েছেন—কেউ কয়েকমাস, কেউ একমাস, কেউ একসপ্তাহ।

ন্যাশনাল থিয়েটারের ভিতরের অবস্থা তো দেখতে পাচ্ছি যারপরনাই খারাপ। বাইরেও ন্যাশনাল থিয়েটারের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ।

১৮৭৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর 'সুলভ সমাচার' মন্তব্য করেছে:

'আমরা ন্যাশানাল থিয়েটরের বিরুদ্ধে পাঁচ ছয় খানি পত্র পাইয়াছি। ঢাকা চুঁচুড়া, বর্দ্ধমান, বাঁসবেড়ে, শ্রীরামপুর প্রভৃতি কয়েক স্থান হইতে পত্র আসিয়াছে। সকলেই এক বাক্যে তীব্র রকমে অভিযোগ করিয়াছেন। আমাদের পাঠকদের এ বিষয়ে আক্ষেপ করা বৃথা। আজ কাল লোকের রুচিই এই দিকে যাইতেছে। থিয়েটরের লোকেরা মন্দ স্ত্রীলোক লইয়া মদ খায় ও অভিনয়স্থলে মারামারি হুড়াহুড়ি করিয়া দক্ষ যজ্ঞের ব্যাপার করিয়া তুলে দেখিয়াও শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা তাহাতে উৎসাহ দিয়া থাকেন আমোদ করেন তখন আর এ দুরাচার কে নিবারণ করিবে? এখন আবার বাবুরা নিজের পরিবার লইয়া এই থিয়েটার করিয়া না বসেন এই আমাদের আশঙ্কা হইতেছে। আর দেশের লোকের নীতি ও পবিত্রতার উপর কি তেমন অনুরাগ আছে? কে ইহার প্রতিবাদ করিবে।'

জামালপুর থেকে 'সুলভ সমাচারে'র সম্পাদককে চিঠি লিখেছেন এক ভদ্রলোক। চিঠিখানা ছাপা হয়েছে ১৮৮০ সালের ২৮শে ফেব্রুআরীর 'সুলভ সমাচারে'। চিঠিখানা থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি ঃ

'কলিকাতা হইতে কয়েকটি যুবক, জন কতক বারবনিতা সমভিব্যাহারে এখানে আসিয়া উপস্থিত। "ন্যাসন্যাল থিয়েটারের অভিনয়" বলিয়া অত্রস্থ প্রায় সকলেই আনন্দে উন্মত্ত; এ সকল স্থানে সচরাচর কোন প্রকার আমোদ-জনক ঘটনা হয় না, সুতরাং সাধারণের পক্ষে থিয়েটার দেখার অভিলাষ নিতান্ত অন্যায় না হইলেও হইতে পারে। দুঃখের বিষয় গত শনিবারে কয়েকটী বারবনিতা দ্বারা "আদর্শ সতী" "সাবিত্রীর" অভিনয় হইল। যে সাবিত্রী পতিব্রতা ধর্ম্মের স্বাক্ষী ভূত, যাঁহার নাম সতী জগতে প্রশংসনীয়, তিনি কি না কয়েকটী অসতী নারীর দ্বারা রঙ্গভূমিতে অবতারিত হইলেন। কল্পনা হইলেও বোধ হয় এ প্রকার অভিনয়, সাধারণ লোকের না হউক, প্রত্যেক ভাবুক জ্ঞানবান ব্যক্তিমাত্রেরই ইচ্ছার নিতান্ত অননুমোদনীয়।...

ঐক্যতান বাদন যাহা হইয়াছিল, তাহা না হইলেই বরং ভাল হইত। সাধারণতঃ অভিনয় ভালই হয় নাই।...

সভ্য সমাজে কুরীতির আদর্শ, এক প্রকার জাতীয় কলঙ্ক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। থিয়েটারে যে ক্রমে ক্রমে দেশের বহুতর অহিত সাধন করিতেছে তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।'

কিন্তু ১৮৮০ সালের ৪ঠা জানুআরী নাট্যসমাজ সম্পর্কে একটা অসাধারণ উক্তি

করেছে 'সাধারণী' পত্রিকা ঃ 'বর্ত্তমান সময়ে নাট্যসমাজ মদ্যপানাদি বিবিধ দোষের প্রবর্ত্তক হইলেও অভিনয়ে অশেষবিধ অপূর্ণতা পরিলক্ষিত হইলেও আমরা ইহার পক্ষপাতী।'

যা হোক, শেষপর্যন্ত দেনার দায়ে নিলামে উঠল ন্যাশনাল থিয়েটার। অতঃপর ন্যাশনাল থিয়েটার কিনে নিলেন একজন মাড়োয়ারী। তাঁর নাম প্রতাপচাঁদ জহুরী।

—ঃঃ০ঃঃ—

চার

প্রতাপচাঁদ ঝানু ব্যবসাদার। তিনি বুঝলেন থিয়েটার ভাল ভাবে চালাতে হলে থিয়েটারের জন্যে একজন সুযোগ্য ম্যানেজার দরকার। গিরিশচন্দ্রকে দরকার।

গিরিশচন্দ্র তখন পার্কার কোম্পানির আপিসে বুক-কীপার। মাইনে পান দেড় শো টাকা।

গিরিশচন্দ্র এককথায় থিয়েটারে চাকরি নিতে রাজী হলেন না। বললেন—আমি আপিসে চাকরি করে আগে যেমন সন্ধ্যার পরে থিয়েটারে যেতাম, অভিনয় শেখাতাম, দরকার হলে অভিনয় করতাম, আপনার থিয়েটারেও তেমনি যাব, কাজ করব। সেজন্যে কারও থেকে কখনও টাকা নিই নি, আপনার থেকেও নেব না।

প্রতাপচাঁদ বললেন—না, না, বাবু, তা হবে না। একজনকে দিয়ে দু-কাজ ভাল হয় না। আপনাকে আপিসের চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমার থিয়েটারের সকল ভার নিতে হবে। আমি আপাতত আপনাকে এক শো টাকা মাইনে দেব। পরে থিয়েটারের মুনাফা বাড়লে আপনার মাইনেও বাড়বে।

পার্কার কোম্পানির দেড় শো টাকার চাকরি ছেড়ে এক শো টাকা মাইনেয় প্রতাপচাঁদের থিয়েটারের ম্যানেজার হয়ে এলেন গিরিশচন্দ্র। থিয়েটারকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্যে গিরিশচন্দ্র তখন যাঁদের নিয়ে এলেন তাঁদের কয়েক-জনের নাম লিখে রাখি ঃ ধর্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু), রামতারণ সান্যাল, অমৃতলাল মিত্র, নীলমাধব চক্রবর্তী, অতুলচন্দ্র মিত্র (বেড়োল), ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী, লক্ষ্মীমণি, নারায়ণী, বিনোদিনী, বনবিহারিণী।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'হামির' নামে একখানা ঐতিহাসিক নাটক নিয়ে গিরিশ চন্দ্র প্রতাপচাঁদের ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয় আরম্ভ করলেন। নাম ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র। কিন্তু তারপর? নতুন ভাল নাটক কোথায়?

নতুন ভাল নাটকের বড় অভাব। গিরিশচন্দ্র তখন ভাল নাটকের জন্যে থিয়েটারের হ্যাণ্ডবিলের নিচে বিজ্ঞাপন দিতে লাগলেন। পুরস্কার ঘোষণা করলেন নাটকের জন্যে।

ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্র নিজেই লিখে ফেলেছেন 'মায়াতরু' ও 'মোহিনী প্রতিমা' নামে দু-খানা গীতিনাট্য এবং 'আলাদিন' নামে একখানা পঞ্চরং। ও-তিনখানারই অভিনয় হয়ে গেল ন্যাশন্যাল থিয়েটারে। 'আলাদিনে' কুহকী সাজলেন গিরিশচন্দ্র।

কিন্তু নতুন ভাল নাটক কোথায়? বিজ্ঞাপন দিয়েও ভাল একখানা নতুন নাটক পাওয়া গেল না, গিরিশচন্দ্র নিজেই তখন নাটক লিখতে বসে গেলেন। শখ করে নয়, দায়ে পড়ে নাটক লেখা আরম্ভ করেছেন গিরিশচন্দ্র।

পর-পর কয়েকখানা নাটক, গীতিনাট্য ও ব্যঙ্গনাট্য লিখলেন গিরিশচন্দ্র: আনন্দ রহো, রাবণ বধ, সীতার বনবাস, অভিমন্যুবধ, লক্ষ্মণ বর্জন, সীতার বিবাহ, রামের বনবাস, সীতা হরণ, ব্রজ-বিহার, ভোট-মঙ্গল, মলিন-মালা, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস। সবগুলোর অভিনয় হল ন্যাশন্যাল থিয়েটারে।

গিরিশচন্দ্র কোন্-কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করেছেন? 'আনন্দ রহো'তে বেতাল, 'রাবণ বধ' 'সীতার বনবাস' আর 'লক্ষ্মণ বর্জনে' রাম, 'অভিমন্যু বধে' যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধন, 'সীতার বিবাহে' বিশ্বামিত্র, 'ভোট-মঙ্গলে' নাচওয়ালা, 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে' কীচক ও দুর্যোধন।

ইতিপূর্বে রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবী কঙ্কণ' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে গিরিশচন্দ্র তার অভিনয় করেছেন ন্যাশন্যাল থিয়েটারে। 'মাধবী কঙ্কণে' সাতটি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন গিরিশচন্দ্র।

প্রতাপচাঁদের বিষয়ে দু-একটা কথা বলা দরকার এখন।

'সীতার বনবাস' খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। 'সীতার বনবাসে' লবকুশের অভিনয় হত অতি চমৎকার। প্রতাপচাঁদ একদিন গিরিশচন্দ্রকে বললেন—বাবু, যব্ দোসরা কিতাব লিখগে, তব্ ফিন্ ওহি দুনো লেড়কা ছোড় দেও।

ন্যাশন্যাল থিয়েটারের একখানা ঘর নিয়ে থাকতেন বিধুমৌলি বাগচি। ভদ্রলোক অভিনয় করেন, তবলা বাজান। চমৎকার লোক। থিয়েটারের সকলেই বিধুমৌলিকে ভালবাসে।

কেন কে জানে, প্রতাপচাঁদ হঠাৎ একদিন সকালবেলা হুকুম দিলেন—অভিনয় বা রিহার্সাল শেষ হবার পরে কেউ আর থিয়েটারে থাকতে পারবে না।

যথা হুকুম। বিধুমৌলিবাবু অবাক্যব্যয়ে চলে গেলেন।

বিকেলবেলা অভিনেতারা এসে খবর শুনে তো হতভম্ব। তাঁরা যুক্তি-পরামর্শ করে সকলেই থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এলেন, খবর পাঠালেন গিরিশচন্দ্রকে।

সন্ধ্যার পর প্রতাপচাঁদ থিয়েটারে এসে দেখেন, থিয়েটার ফাঁকা, থিয়েটারে কোন অভিনেতা হাজির নেই। হন্তদন্ত হয়ে প্রতাপচাঁদ বাগবাজারে গিরিশ-চন্দ্রের বাড়িতে ছুটে এলেন। চাকরকে জিজ্ঞেস করলেন—বাবু ঘরমে হ্যায়?

প্রতাপচাঁদের গলা শুনে গিরিশচন্দ্র উপরের বৈঠকখানার জানালা থেকে মুখ বের করে বললেন—বাবু নেই হ্যায়।

বাবু নিজেই বলছেন, বাবু নেই!

প্রতাপচাঁদ বললেন—এ ক্যা বাৎ! আপ সাম্‌নে হ্যায়, আপ হাম-লোক্‌কো থিয়েটারকে ম্যানেজার হোকে কা বাতাতা হ্যায়?

গিরিশচন্দ্র বললেন—ঝুট বাৎ। হাম থিয়েটারকা ম্যানেজার নেহি হুঁ। হাম ম্যানেজার হোনেসে আপ হামারা সল্লা লেকে হামারা অ্যাক্‌টার বিধু-বাবুকো বাহার কর্‌তেঁ। আপ যাইয়ে। বাবু নেই হ্যায়।

প্রতাপচাঁদ অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন, নিজের দোষ স্বীকার করলেন, বিধুমৌলিকে সযত্নে থিয়েটারে রাখতে রাজি হলেন। তবে গিয়ে গিরিশচন্দ্র থিয়েটারে এলেন।

আসল কথা, প্রতাপচাঁদ বিষম কৃপণ। থিয়েটারে দিব্যি মুনাফা হচ্ছে, কিন্তু প্রতাপচাঁদ কিছুতেই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মাইনে বাড়াচ্ছেন না। গিরিশচন্দ্র বারংবার প্রতাপচাঁদকে অনুরোধ করেছেন, কিন্তু কে কার কথায় কান দেয়। অগত্যা গিরিশচন্দ্র প্রতাপচাঁদের থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। আরও অনেকেই তখন গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে প্রতাপচাঁদের থিয়েটার থেকে বেরিয়ে গেলেন।

গিরিশচন্দ্র চলে যাবার পর প্রতাপচাঁদের থিয়েটারের ম্যানেজার হলেন কেদারনাথ চৌধুরী। কেদারনাথের আমলেই প্রতাপচাঁদের থিয়েটারে বঙ্কিম-চন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র অভিনয় হয়েছে। কেদারনাথই 'আনন্দমঠে'র নাট্যরূপ দিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে'র অভিনয় দেখে গিয়েছেন একদিন, কিন্তু প্রশংসা করেন নি। বলেছেন—অভিনয় ভাল হয় নি।

সে-সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র দিশী থিয়েটারের ওপর খড়্গহস্ত। বলেছেন—থিয়েটার এখন ভদ্রলোকের যাবার যোগ্যস্থান নয়। কতগুলো অসভ্য ছোঁড়া আর বেশ্যা হা-হা করে হাসে—বড় ত্যক্ত হয়ে এসেছি।

তারপর স্টার থিয়েটার।

স্টার থিয়েটারের জন্ম হয়েছে গুমুখ রায়ের টাকায়। কিন্তু বিনোদিনীর আত্মত্যাগ ছাড়া কি স্টার থিয়েটারের জন্ম হত? হয়তো হত না। কিন্তু সে-কথা এখন নয়, সে-ইতিবৃত্ত বিনোদিনী-প্রসঙ্গে যথাসাধ্য বর্ণনা করা যাবে। আপাতত এটুকু বললেই যথেষ্ট, ১৮৮৩ সালের ২১শে জুলাই গিরিশচন্দ্রের 'দক্ষযজ্ঞ' নিয়ে স্টার থিয়েটারের যাত্রারম্ভ হল। 'দক্ষযজ্ঞে' দক্ষের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র অনবদ্য অভিনয় করলেন।

একদিনের একটা ঘটনা আছে এখানে।

দক্ষের কাছে যখন একেকজন দূতের এসে যজ্ঞধ্বংসের সংবাদ দেওয়ার কথা, তখন অনেক দূতই বিষম নার্ভাস হয়ে পড়ত। নার্ভাস হবারই কথা। দক্ষবেশী গিরিশচন্দ্রের সেই রক্তচক্ষু, ভীষণমূর্তি, নেপথ্যে 'হর হর হর' ধ্বনি, রঙ্গমঞ্চে মহারাজ দক্ষ 'শুনি ভীষণ হুঙ্কার' বলে চতুর্দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত করছেন, হেনকালে প্রথম দূতের প্রবেশ।

প্রথম দূতকে বলতে হবে:

মহারাজ, প্রাণ যদি চাও পলাও পলাও—
এলো এলো ব্রহ্মদৈত্য ভৈরব বেতাল

কিন্তু কে কী বলে। দক্ষরূপী গিরিশচন্দ্রকে দেখে তো প্রথম দূতের বুকের রক্ত শুকিয়ে গেছে। অর্ধস্ফুটস্বরে প্রথম দূত যা বলবার নয় তাই বলল—মহারাজ, এলো—এলো—একপাল—একপাল রাজা যুধিষ্ঠির—

হায়, প্রথম দূতের জন্যেই আজকের 'দক্ষযজ্ঞ' একেবারে বুঝি ভণ্ডুল হয়ে যায়। যা হবার তা তো হয়েছে, এখনও যদি সামলান যায়। প্রম্পটার তখন দূতকে ডাকতে লাগলেন—পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়।

প্রম্পটারের কথা দূত নির্ভুল শুনল। প্রম্পটারের সুরে সুর মিলিয়েই কিংকর্তব্যবিমূঢ় দূত দক্ষবেশী গিরিশচন্দ্রকে বলল—মহারাজ, পালিয়ে আয়, পালিয়ে আয়।

'দক্ষযজ্ঞে'র পরে স্টারের জন্যে আরও দু-খানা নাটক লিখলেন গিরিশচন্দ্র—

'ধ্রুবচরিত্র' আর 'নলদময়ন্তী'।

'নলদময়ন্তী'তে দময়ন্তীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বিনোদিনী। শুধু দময়ন্তী বলি কেন, দায়ে পড়ে একবার 'নলদময়ন্তী'তে বিনোদিনীকে একটি সখীর সাজেও মঞ্চে নামতে হয়েছে। তা নিয়ে এক কাণ্ড!

বিনোদিনী নিজেই সে-কাহিনী সবিস্তারে বলেছেন ঃ

'ষ্টার থিয়েটারে নল-দময়ন্তী অভিনয় হচ্ছে। তাতে একটি সরোবরেরর দৃশ্য ছিল, সরোবরে পদ্ম ফুটে রয়েছে ; মধ্যস্থলের পদ্মটী সব চেয়ে বড়, সেই পদ্মের মধ্য থেকে একজন কমলবাসিনী বের হতেন, বের হয়েই তিনি পা বাড়িয়ে আর একটী কম্পমান পদ্মে গিয়ে দাঁড়াতেন। এমনই ভাবে একে একে ছয় জন কমলবাসিনী বার হয়ে আসতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের গানও গাইতে হত। প্রত্যহ বেলা দশটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্য্যন্ত গিরিশবাবু নিজে দাঁড়িয়ে সখিদের শেখাতেন ; এই নৃত্যগীত অভ্যাস করতে গিরিশবাবুর কাছে তাদের যে কত গাল খেতে হয়েছিল!.....

আমি দময়ন্তী সেজে সাজঘর থেকে বেরিয়ে সবে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় দর্শকবৃন্দেরা খুব হাততালি দিয়ে উঠলেন। শুনলাম একজন সখি না আসায় সব গোলমাল হয়ে গেছে—সিন তুলতে দেরী হচ্ছে, তাই এই ঘন ঘন হাততালি। আর ত দেরী করা চলে না ; গিরিশবাবু এসে আমায় ধরলেন, "বিনোদ তোকে বেরুতে হবে।" আমি ত হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। সর্ব্বনাশ! সেই কম্পমান পদ্মের ওপর সখীদের দেখলেই যে ভয়ে আমার বুকটা দুড়দুড় করে উঠত ; আর আমাকেই কিনা সেই পদ্মের ওপর গিয়ে দাঁড়াতে হবে, আমি যে একদিনও অভ্যাস করি নি। এ ত দেখছি ভারি বিপদে পড়া গেল। তার ওপর আমি দময়ন্তী সেজে মাথার চুল সব ফিটফাট করে এসেছিলাম, ফুলের মুকুট পরে কমলবাসিনী সাজতে গেলে যে আমার সব চুল খারাপ হয়ে যাবে। তখনকার দিনে এত রকমের পরচুলো পাওয়া যেত না। আমায় কখনও পরচুল পরতে হয় নি। আমার নিজের চুলকে আপন ইচ্ছে মত তৈরী করে নিতাম। ভগবানের কৃপায় আমার চুলের খুব বাহার ছিল, আমার ঘন চুল এমন নরম ছিল যে যেমন ভাবে ইচ্ছে তাকে কুঁচকিয়ে ঘুরিয়ে নিতে পারতাম। তাই আমায় কখনও ধারকরা চুল পরতে হয় নি। তখনকার দিনে এই কেশ-প্রসাধনের জন্য আমার বেশ খ্যাতি ছিল। যাক সে কথা, গিরিশবাবু তো আমায়

আদর করে মিষ্টিকথা বলে সখি সাজিয়ে ঠেলে ঠুলে স্টেজে পাঠিয়ে দিলেন। একটা চলতি কথা আছে না, 'খোঁড়ার পা খালে পড়ে'; 'অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে।' আমার ঠিক তাই হল। যেমন ক্রেনে চড়ে ওপরে উঠতে আরম্ভ করেছি, অমনিই আমার এলো চুলের রাশি পাক খেয়ে দড়ির সঙ্গে জড়িয়ে গেল—আর চড়চড় করে চুল ছিঁড়তে আরম্ভ হল। আমার অর্দ্ধেক মুখ তখন পদ্ম থেকে বেরিয়েছে, নেমেও পড়তে পারি না ওদিকে চুল ছেঁড়ার সে কি জ্বালা! 'আরে চুল গেল চুল গেল' বলতে বলতে দাশুবাবু একখানা কাঁচি এনে তিন চার যায়গা কেটে আমার মাথাকে তো ছাড়িয়ে দিলেন।

ভেতরে এসে রাগে আমি ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলুম; আমি গোঁ ধরে বসলুম আমি আর সাজব না, কিছুতেই সাজব না।

তখন গিরিশবাবু এসে কেমন আদর করে পিঠে হাত বুলিয়ে, মিষ্টি মিষ্টি করে বুঝিয়ে বল্লেন, 'ও এমন কত হয়। তোর খানিকটা চুল নষ্ট হয়ে গেছে বলে তুই কাঁদছিস, আর জানিস বিলেতের বড় বড় অভিনেত্রীদের মধ্যে অনেকের মাথায় একেবারে চুলই থাকে না, মুখে একটা দাঁতও থাকে না। তুই চুলের জন্যে কাঁদবি কেন? একটা গল্প বলি শোন, গল্প শুনতে শুনতে পোষাকটা পরে নে।' এই বলে তিনি গল্প আরম্ভ করলেন, 'বিলেতের একজন খুব বড় অভিনেত্রী, অভিনয় শেষ করে বাড়ীতে ফিরে এসে প্রথমে পোষাকটা ছেড়ে ফেললেন, তারপর মাথার সেই কোঁকড়ান বাহারে পরচুলোর রাশ খুলে রাখলেন, তার দুপাটি দাঁতই বাঁধান ছিল, তা মুখ থেকে টেনে বার করলেন। তাঁর ৫।৬ বৎসরের একটা মেয়ে সেখানে দাঁড়িয়েছিল, সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখলে, তারপর তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তাঁর নাক ধরে টানাটানি করতে লাগল। তার ধারণা হয়েছিল, তার মার নাক-কানও বুঝি জোড়া দেওয়া।' আর কি রাগ থাকে, কোন রকমে হাসি চেপে আমি বললাম—"যান মশায় আমার সঙ্গে আর কথা বলবেন না।" এই বলে হাসতে হাসতে আমি স্টেজে গিয়ে নামলুম। তিনিও কাজ উদ্ধার করে দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেলেন।...'

আস্তে-আস্তে দিব্যি জমে উঠছিল স্টার থিয়েটার, এমন সময় আরেক কাণ্ড। গুমুখ রায় স্টার থিয়েটার আর চালাবেন না। উনি সাব্যস্ত করলেন, স্টার থিয়েটার বেচে দেবেন।

তাহলে এই স্টার থিয়েটারের দলের লোকজনের কী দশা হবে? মহা বিপত্তি। দলের সকলের হয়ে গিরিশচন্দ্র গুর্মুখ রায়ের সঙ্গে নানারকম কথাবার্তা বললেন। শেষপর্যন্ত গুর্মুখ রায় বললেন—থিয়েটারের জন্যে আমি বিস্তর টাকা খরচ করেছি। আপনারা আমাকে মাত্র এগার হাজার টাকা দিন, আমি থিয়েটার আপনাদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি।

গিরিশচন্দ্র দলের সকলকে ডেকে বললেন—কে টাকা আনবে আন। টাকা যে আনতে পারবে তাকেই থিয়েটারের মালিক করে দেব।

কয়েক হাজার টাকা জোগাড় করে নিয়ে এলেন অমৃতলাল মিত্র, হরিপ্রসাদ বসু আর দাসুচরণ নিয়োগী। বাকি টাকা ধার করে জোগাড় হল। ধার দিলেন জোড়াসাঁকোর কৃষ্ণধন দত্ত।

গিরিশচন্দ্র চারজনকে থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী করে দিলেন—অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, দাসুচরণ নিয়োগী আর হরিপ্রসাদ বসু। ইচ্ছা করলে গিরিশচন্দ্র নিজে কি স্বত্বাধিকারী হতে পারতেন না? পারতেন বইকি। কিন্তু কয়েক বছর আগে ছোটভাই অতুলকৃষ্ণকে কথা দিয়েছিলেন যে কখনও তিনি কোন থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হবার চেষ্টা করবেন না। গিরিশচন্দ্র সেকথা ভোলেন নি।

সগৌরবে স্টার থিয়েটার চলতে লাগল। স্টার থিয়েটারের তখন প্রবল প্রতাপ। গিরিশচন্দ্রের কয়েকখানা নাটক, পঞ্চরং ও গীতিনাট্যের অভিনয় হল স্টার থিয়েটারে ঃ কমলে কামিনী; বৃষকেতু; হীরার ফুল; শ্রীবৎস-চিন্তা; চৈতন্যলীলা; প্রহ্লাদ-চরিত্র; নিমাই-সন্ন্যাস; প্রভাস যজ্ঞ; বুদ্ধদেব চরিত; বিল্বমঙ্গল ঠাকুর; বেল্লিকবাজার; রূপ-সনাতন।

'কমলে কামিনী'তে শ্রীমন্তের ভূমিকায় অভিনয় করতেন বনবিহারিণী। কিছুদিন পরে পুরীতে বেড়াতে গিয়ে বনবিহারিণী প্রথম সমুদ্র দেখলেন। 'কমলে কামিনী'তে সমুদ্রের যেমন বর্ণনা আছে, চোখের সামনে জলজ্যান্ত তেমনি একটা সমুদ্র। গিরিশচন্দ্র বুঝি সমুদ্র দেখেই 'কমলে কামিনী'তে সমুদ্রের অমন সত্যসুন্দর বর্ণনা করেছেন।

কলকাতায় ফিরে এসে বনবিহারিণী সেই কথাই বললেন গিরিশচন্দ্রকে —আপনি 'কমলে কামিনী'তে যেমন সমুদ্রের বর্ণনা করেছেন, ঠিক তেমনি সমুদ্র দেখে এলাম।

গিরিশচন্দ্র কিন্তু সমুদ্র না দেখেই সমুদ্রের বর্ণনা করেছেন। গিরিশচন্দ্র

বনবিহারিণীকে বললেন—আমি এ-পর্যন্ত সমুদ্র দেখি নি। লোকের মুখে সমুদ্রের বর্ণনা শুনেছি, নানা বইয়ে সমুদ্রের বর্ণনা পড়েছি, সেই ভাবেই লিখেছি।

বনবিহারিণী কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না যে চর্মচক্ষে না দেখেও অমন দেখা যায়, লেখা যায়।

'বৃষকেতু' নাটকের একদিনের অভিনয়ের একটা মজার ঘটনা দেখা যাচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে, গিরিশচন্দ্রের ভাই হাইকোর্টের উকিল। তাঁর মুহুরীবাবু থাকেন গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে।

গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে থাকেন, এই সুবাদে থিয়েটারের বিস্তর মানুষজনের সঙ্গে মুহুরীবাবুর আলাপ-পরিচয়। রোজ সন্ধ্যার পর মুহুরীবাবু থিয়েটারে যান। দিনকয়েক এ রকম যাতায়াতের পর মুহুরীবাবু একদিন থিয়েটারের কর্মকর্তাদের ধরে বসলেন—আমাকে একটা পার্ট দিতে হবে।

ভাল কথা। মুহুরীবাবুকে একটা পার্ট দেওয়া গেল। 'বৃষকেতু' নাটকে একটি পাচক বামুনের পার্ট। 'বৃষকেতু'র তখন মহলা চলছে। পাচক বামুনের ভূমিকায় মুহুরীবাবুকে সাকুল্যে একলাইন কথা বলতে হবে—মহারাজ, হাঁড়ি নামিয়ে দেখি, মাংস নাই।

মুহুরীবাবুর তো সারাক্ষণের ধ্যানজ্ঞান ওই লাইনটি—মহারাজ, হাঁড়ি নামিয়ে দেখি, মাংস নাই। ওই লাইনটিই তিনি সব সময় আউড়ে যাচ্ছেন। একবার অমৃতলাল বসুকে গিয়ে বলেন—শুনুন তো আমার পার্টটা একবার। আরেক-বার অমৃতলাল মিত্রকে গিয়ে বলেন—দেখুন তো আমার বলার কোন দোষ হচ্ছে কি না।

সকলে একবাক্যে মেনে নিলেন—না, কোন দোষ হয় নি। চমৎকার হচ্ছে আপনার পার্ট। নিখুঁত হবে আপনার অভিনয়।

ড্রেস-রিহার্সালে মুহুরীবাবু এলেন না। খবর পাঠালেন—অমৃতবাবুকে ভাবতে বারণ করে দিয়ো, কাল গিয়ে একেবারে অভিনয় করব। আমার সব ঠিক হয়ে গেছে।

স্টেজে মেরে দিলেন মুহুরীবাবু। একটা অত্যন্ত গুরুগম্ভীর দৃশ্যে পাচকবেশী মুহুরীবাবু—কেলেঙ্কারি কাণ্ড—বললেন—মহারাজ, মাংস নামিয়ে দেখি, হাঁড়ি নাই।

যা বলছিলাম। স্টার থিয়েটারের তখন প্রবল প্রতাপ। দেখতে-দেখতে তিন বছর কেটে গেল। তারপর 'রূপ সনাতন' নাটক অভিনয়কালে স্টার থিয়েটারে যা ঘটল তাকে এককথায় বিপ্লব বলা চলে।

গোপাললাল শীলের খেয়াল হল, থিয়েটার খুলবেন। গোপাললাল মতিলাল শীলের নাতি। শুনতে পাই, গোপাললালের এই থিয়েটারের খেয়ালের মূলে একটু অন্তর্জ্বালার ইতিহাস আছে। গোপাললালের শরীর গৌরবর্ণ ছিল না। তা নিয়ে স্টার থিয়েটারের কোন অভিনেত্রী বুঝি গানে কি ইশারায় গোপাললালকে একটু ঠাট্টা করেছে। গোপাললাল অতএব সাব্যস্ত করেছেন, উনি থিয়েটার খুলবেন। টাকা? গোপাললালের টাকার ভাবনা নেই।

স্টার থিয়েটারের জমি কিনে ফেললেন গোপাললাল। থিয়েটারের বাড়ি সরিয়ে নেবার নোটিস দিলেন স্টারের স্বত্বাধিকারীদের।

বাড়ি বদল করা সহজ কথা নয়। মহা সমস্যার কথা।

গিরিশচন্দ্রের পরামর্শে স্টারের স্বত্বাধিকারীরা তখন স্টার থিয়েটারের বাড়িখানা বেচে দিলেন গোপাললালের কাছে তিরিশ হাজার টাকায়। কিন্তু স্টার থিয়েটারের নাম—ইংরেজীতে যাকে গুড-উইল বলে—হাতছাড়া করা হল না। স্টার থিয়েটারের দল হাতিবাগানে জমি কিনে নতুন করে স্টার থিয়েটার খুলবার আয়োজন করতে লাগল।

গোপাললালের নতুন থিয়েটারের নাম হল—এমারেল্ড থিয়েটার। আলাদা ডায়নামো বসিয়ে এমারেল্ড থিয়েটারের বাইরে-ভেতরে চমৎকার ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা হল। বাঙলা থিয়েটারে এরকম ব্যবস্থা এই প্রথম। এমারেল্ড থিয়েটারের ম্যানেজার হয়ে এলেন কেদারনাথ চৌধুরী।

কিন্তু এমারেল্ড থিয়েটার জমজমাট হচ্ছে না।

কেউ-কেউ তখন গোপাললালকে বললেন—থিয়েটারে যদি ফুল ফোটাতে চান তো গিরিশবাবুকে নিয়ে আসুন। এ যে আপনার শিবহীন যজ্ঞ হচ্ছে মশাই।

গোপাললাল আবার উঠে-পড়ে লাগলেন। লোক পাঠালেন গিরিশচন্দ্রের কাছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র এমারেল্ডে যেতে রাজি হলেন না। তা বলে গোপাললাল হাল ছাড়লেন না। তিনি আবার প্রস্তাব পাঠালেন, গিরিশচন্দ্র এসে এমারেল্ড থিয়েটারের ম্যানেজার হোন; সেজন্যে গোপাললাল গিরিশ-চন্দ্রকে বিশ হাজার টাকা বোনাস দেবেন, আর মাইনে দেবেন সাড়ে তিনশ টাকা।

গিরিশচন্দ্র যদি এ-প্রস্তাবে রাজি হয়ে এমারেল্ডে না আসেন? তাহলে নিশ্চিন্ত থাকুন, ধনকুবের গোপাললাল স্টার থিয়েটারের শত্রুতা করতে তিলতম ত্রুটি করবেন না।

স্টার থিয়েটার তবু গিরিশচন্দ্রকে ছাড়তে রাজি হয় না। বলে—আপনি থাকলে কোন শত্রুতায়ই আমরা পরাস্ত হব না। আপনি থাকলে সব ক্ষতি পূর্ণ হবে।

গিরিশচন্দ্র শিষ্যদের বুঝিয়ে বললেন—বোনাসের টাকায় হাতিবাগানে নতুন স্টার থিয়েটারের বাড়ি তৈরির বিস্তর সুবিধা হবে। আমি গোপাললালের থিয়েটারেই ম্যানেজার হয়ে যাচ্ছি।

তাই হল। পাঁচবছরের চুক্তিতে এমারেল্ড থিয়েটারে ম্যানেজার হয়ে গেলেন গিরিশচন্দ্র। বোনাসের টাকা থেকে ষোলহাজার টাকা তিনি দিয়ে গেলেন হাতিবাগানে নতুন স্টার থিয়েটার গড়ে তুলবার জন্যে। রঙ্গালয়ের জন্যে গিরিশচন্দ্রের এই নিঃস্বার্থ দানের কথা অবিস্মরণীয় অক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য।

গিরিশচন্দ্র স্বত্বাধিকারীদের বলে গেলেন—ভদ্রলোকের ছেলেরা এই থিয়েটারের কাজ করতে এসে কী রকম লাঞ্ছিত হয় তোমরা ভালরকমই জান। আমার একটি অনুরোধ রেখ, তোমাদের আশ্রয়ে যেন কোন ভদ্রসন্তান লাঞ্ছিত না হয়।

গিরিশচন্দ্র চলে গেলেন এমারেল্ড থিয়েটারে। এমারেল্ডের জন্যে দু-খানা নাটক লিখলেন গিরিশচন্দ্র—পূর্ণচন্দ্র, বিষাদ। এক 'পূর্ণচন্দ্রে'র দৌলতেই, শুনতে পাই, গোপাললালের বিশহাজার টাকার বেশি আদায় হয়ে গেল। 'বিষাদে'রও খুব সুন্দর অভিনয় হল।

ইতিমধ্যে নতুন স্টার থিয়েটার খোলা হয়েছে। সেখানে প্রথম অভিনীত হয়েছে 'নসীরাম'। এখানে একটা ঘটনা আছে। 'নসীরাম' গিরিশচন্দ্রের লেখা, কিন্তু তখন সে-সংবাদ বিজ্ঞাপিত হয় নি। স্টার থিয়েটারের জন্যে গোপনে 'নসীরাম' লিখে দিয়েছেন গিরিশচন্দ্র। গিরিশচন্দ্র সেসময়ে গোপাললালের এমারেল্ড থিয়েটারের ম্যানেজার; তাই খোলাখুলি ভাবে তাঁর স্টার থিয়েটারকে নাটক লিখে দেবার অসুবিধা আছে। অতএব কৌশল করতে হল। গোপাল-লাল যাতে টের না পান সেজন্যে খালধারে খোলার ঘর ভাড়া নিয়ে লালপেড়ে শাড়িপরা মেয়েমানুষ সেজে এসে গভীররাত্রে গোপনে 'নসীরাম' লিখে দিয়েছেন গিরিশচন্দ্র।

স্টারের কথা থাক। এমারেল্ডের কথা হোক।

তারপর, কে জানে কেন, গোপাললালের নাট্যশালার শখ মিটে গেল। গোপাললাল এমারেল্ড থিয়েটার ইজারা দিয়ে দিলেন। ইজারা নিলেন

মতিলাল সুর, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, হরিভূষণ ভট্টাচার্য আর ব্রজলাল মিত্র। এই চারজনই অতঃপর এমারেল্ডের কর্তা হলেন।

গিরিশচন্দ্রের নতুন কর্তাদের সঙ্গে কোন চুক্তি নেই, অতএব তিনি এই সুযোগে এমারেল্ড ছেড়ে স্টারে চলে এলেন। স্টারে এসে তিনি পর-পর লিখলেন: প্রফুল্ল; হারানিধি; চণ্ড; মলিনা-বিকাশ; মহাপূজা। সব ক-খানার অভিনয় হল।

গিরিশচন্দ্রের 'মলিনা-বিকাশ' আর অমৃতলালের 'বাঞ্ছারাম' একসঙ্গে প্রথম অভিনীত হয়েছে স্টার থিয়েটারে। কিন্তু সেসময়ে স্টার থিয়েটারের খুব সুনাম নেই। 'স্টার-থিয়েটারের ভয়ানক দুর্নাম' হেডিং দিয়ে ১৮৯০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর 'অনুসন্ধান' লিখেছে:

'থিয়েটারের বাজারে 'ষ্টার-থিয়েটারের' প্রতিই আমরা অনেক আশা-ভরসা করিয়াছিলাম; উহাঁদের দ্বারাই নট-নাট্যেরও অনেকটা সংস্কার হইবে, ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু এত দিনে, এখন বুঝিতেছি, আমাদের সে আশা মিটিল না। এখন দেখিতেছি, যাও ছিল, তাও বুঝি আর থাকে না। শুধু বাড়ীটার বাহারে আসে যায় কি! লোকজন চাই—প্রকৃত নাটক-প্রহসন চাই! নহিলে, ভূয়া আড়ম্বরে কয় দিন টিকিবে? প্রথম উদ্যমে ষ্টার-থিয়েটারের যে অবস্থা দেখিয়াছিলাম, এখনকার অবস্থা দেখিয়া তাহার সহিত তুলনা করিলে, বাস্তবিকই কান্না আসে। একা গিরিশ এখন আর ক'দিক রাখিবেন? অভিনয় করিবেন, না সং সাজিবেন, না নাটক লিখিবেন? বিধি নিগ্রহে বাস্তবিকই 'ষ্টার-থিয়েটার' এখন এইরূপ বিপদস্থ!...

সেদিনও তাই 'মলিনা-বিকাশ' ও 'বাঞ্ছারাম' দেখিতে গিয়া, আমাদিগকে বড়ই দুঃখিত হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। একে পুস্তক দু'খানি তো কিছুই নহে—তাহার উপর আবার অভিনেতা-অভিনেত্রীরও অভাব! সুতরাং কিছুই যেন জমিল না! রুচি-দোষে, অভিনয়-দোষে, সকল রকমেই অভিনয় না দেখিবারই যোগ্য। যাহা হউক, থিয়েটার-কোম্পানি শীঘ্র এরূপ অভিনয় পরিবর্ত্তন করিয়া, অন্য ভাল ভাল পুস্তকের অভিনয় করুন। নহিলে বদনাম বাড়িবে যে! বদনামে কি দর্শক জুটে?

আর সেও যা' হউক, অভিনয় চিরদিন সমান নাও হইতে পারে—ভালমন্দ দু'দিকই তো আছে! কিন্তু তাই বলিয়া, মন্দকে মন্দ বলিলে এ সময় লোকের উপর চটাটাও থিয়েটার-কোম্পানির কিন্তু ভাল হইতেছে না।

'বিষ নাই কুলোপানা চক্র' ধরিলে চলিবে কেন? এ-দুঃসময়ে তাঁহাদের এখন শিষ্ট-শান্তের মত চলা কর্ত্তব্য। এ কথাটায় অনেকে অনেকরূপ মনে করিতে পারেন; করিবারও কথা। কিন্তু বাস্তবিকই যে এরূপ ঘটনা ষ্টার-থিয়েটারে প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে! অধিক দিনের কথা নয়, এই সেদিনও—গত পূর্ব্ব-শনিবারও, প্রসিদ্ধ 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রের প্রতিনিধি বাবু বিপিনবিহারী বড়ালকে থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ আপনার কম্পাউণ্ডে পাইয়া অপমানিত করিয়াছেন। আমাদের আফিসে আসিয়া বিপিনবাবু সে সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলেন, তাহা তো আর প্রকাশ করিতে পারি না! তবে তাঁহার অপরাধ, আজকালকার অভিনয় খারাপ হইতেছে, এই কথা 'ষ্টেটস্‌ম্যানে' লেখা হইয়াছিল। তা বাপু, অত চটিলে চলিবে কেন? ভালকে ভাল, মন্দকে মন্দ যদি না বলিতে হয়, তবে সংবাদপত্র কেন? যাঁহারা তাহা পারেন, তাঁহারা করুন। আমরা কিন্তু সেরূপ পারি না। আপনারা হাজার খোসামুদিই করুন, খোসামুদির বশীভূত হইয়া, আমরা কিন্তু সেটি পারিবই না। এবং চোখ রাঙাইলেও, বোধ হয়, সত্য বলিতে কুণ্ঠিত হইব না। বিশেষতঃ যতক্ষণ দোষটার স্খালন করিতে না পারা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার চেষ্টা পাওয়াটাও কি প্রকৃত বন্ধুর কাজ নয়? তাই আমরা এবারও ষ্টার-সম্বন্ধে আরও গুটিকতক কথা বলিব—রাগিয়া হেলায় না উড়াইয়া, কথা কয়টা বন্ধুভাবে শুনিয়া, তদনুযায়ী কাজ করিলে, অবশ্য তাঁহাদেরই মঙ্গল। কিন্তু বিপথোন্মুখ, উপদেশে ফিরিবে কি?

এই ধরুন, ষ্টার-থিয়েটারের স্ত্রীলোকদিগের বসিবার আসন-সম্বন্ধে কতই কলঙ্ক-কেলেঙ্কারীর কথা উঠিয়াছে। বেশ্যার সহিত ভদ্র-ঘরের মেয়েছেলেদিগকে একত্রে বসিবার আসন দেওয়া, সে সব বেশ্যাকে আবার সেই ক্ষেত্রে মদ না কি খাইতে দেওয়া—এসব কথা শুনিলে কি আর ভদ্রলোকের ঘরের স্ত্রী-কন্যা অভিনয় দেখিতে যাইবেন? সুতরাং যখন এ কথাটা উঠিয়াছে, তখন যাহাতে তাহার সংস্কার হয়, কোম্পানির এরূপ করা উচিত। বিশেষতঃ এ সকল কথা কেবল আমরাই যে বলিতেছি, তাহাও তো নহে—এখন ত আর এ সকল কথা জানিতে কাহারও বাকী নাই। ষ্টারের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া আমরা যদিও সকল প্রকাশ নাও করিতে পারি; কিন্তু 'নবযুগ', 'Saturday Herald' 'Statesman' প্রভৃতি সংবাদপত্রেও যখন, বিশিষ্ট প্রমাণ পাইয়া, এই সকল কথা বাহির হইতেছে, তখনও কি ইহার একটা পরিবর্ত্তন করা উচিত নয়?

অবশ্য আমরা ষ্টার-সম্বন্ধে আরও যে সব গুরুতর অভিযোগ পাইতেছি, তাহা নাও প্রকাশ করিতে পারি—বন্ধুভাবে নির্জ্জনে তাঁহাদিগকে বলিয়াও প্রতিকারের চেষ্টা পাইতেছি; কিন্তু অন্য সকলে শুনিবে কেন? আপনাদের বন্দোবস্তের ত্রুটী আছে; থাকুক! কিন্তু তাই বলিয়া মদ খাওয়ার গণ্ডা নয়েক পয়সা ঘুস খাইয়া একজন আট আনার দর্শককে দুই টাকার আসনে আনিয়া বসাইলে কি লোকে সন্তুষ্ট হয়? তার পর ধরুন, সেদিন স্ত্রীলোকের আসনে বসিয়া একটা স্ত্রীলোক অপর একটা স্ত্রীলোকের গায়ে বমি করিয়া দিয়াছিল বলিয়া যে বাজার-গুজব, সেটাও তো আর সহরে রাষ্ট্র হইতে বাকী নাই? সুতরাং কোন্ মুখে থাবা দিবেন? যাহা হউক, এখনও কোম্পানির উচিত যে, প্রকাশ্যতঃ সকলের নিকট এ সকল অপরাধের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তন করা। আর, যদি তাই করেন, তবেই আবার আমাদের ও ভদ্রলোকমাত্রেরই সহানুভূতি পাইবেন। নহিলে এ দুর্নামে ষ্টারের অধঃপতনই হইতে চলিল। এ সকল জানিয়া-শুনিয়া কোন্ ভদ্রলোক বা কোন্ ভদ্র-পরিবার আর থিয়েটারে যাইতে অগ্রসর হইবেন?'

বাইরে যখন এই অবস্থা, তখন থিয়েটারের ভেতরেও নিশ্চয়ই কোথাও একটা ছন্দপতন আছে। সত্যিই তাই। অল্পকালের মধ্যেই স্টারের স্বত্বাধিকারীদের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের মনোমালিন্য আরম্ভ হয়ে গেল। হয়ত তাঁরা ভাবলেন, গিরিশচন্দ্রের সাহায্য এখন আর তত মূল্যবান নয়, গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিলেও স্টার এখন সসম্মানে চলতে পারে। কেন, গিরিশচন্দ্র বিহনে 'সরলা' 'তাজ্জব ব্যাপার' অভিনয় করে স্টার থিয়েটার কি সুনাম পায় নি? পেয়েছে বইকি।

গিরিশচন্দ্র দু-খানা নাটক লিখলেন—মুকুল-মুঞ্জরা, আবুহোসেন। এই নাটক দু-খানার স্টার থিয়েটারে অভিনয় তো হলই না, উপরন্তু এই নাটক দু-খানা পড়ে স্টারের কর্তৃপক্ষ মন্তব্য করলেন—গিরিশবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

তা একাধিক সাংসারিক শোকে গিরিশচন্দ্রের তখন সত্যি-সত্যি উন্মাদ হবার দশা। ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্রের দুটি কন্যার মৃত্যু হয়েছে, দ্বিতীয়া পত্নীর মৃত্যু হয়েছে, শিশুপুত্রটি রোগশয্যায়। নিয়মিতভাবে থিয়েটারে আসতে পারেন না গিরিশচন্দ্র। তার ওপরে এই সময়ে নিজেও গিরিশচন্দ্র কঠিন অসুখে পড়লেন। সবেমাত্র সুস্থ হয়ে উঠেছেন, এমন সময়, বলা-কওয়া নেই, স্টার থিয়েটার বরখাস্ত করে দিল গিরিশচন্দ্রকে। বরখাস্তের চিঠি এসে গিয়েছে।

যা হবার হয়েছে, ডাক্তারের পরামর্শে গিরিশচন্দ্র তারপর রোগা ছেলেকে নিয়ে হাওয়া-বদল করতে মধুপুর চলে গেলেন।

গিরিশচন্দ্র স্টার থেকে বরখাস্ত হয়ে গেলেন। তার ফলে হল আরেক কাণ্ড, হঠাৎ একদিন স্টার ছেড়ে চলে গেলেন নীলমাধব চক্রবর্তী, অঘোরনাথ পাঠক, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, শরৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু), দানীবাবু, প্রমদা সুন্দরী, মানদাসুন্দরী প্রভৃতি বহু অভিনেতা-অভিনেত্রী। স্টার একটু অসুবিধায় পড়ল বইকি। 'সীতার বনবাস' অভিনয় হবে, যবনিকা তুলবার আগে দেখা গেল অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর দেখা নেই। সেদিন, শুনতে পাই, দায়ে পড়ে স্টেজ-ম্যানেজার দাশুচরণ নিয়োগীকে পর্যন্ত অভিনয় করতে হয়েছে।

ওদিকে নীলমাধব চক্রবর্তী, অঘোরনাথ পাঠক ও প্রবোধচন্দ্র ঘোষ 'বীণা' রঙ্গমঞ্চ ভাড়া নিয়ে নতুন একটা থিয়েটার খুলে ফেললেন—সিটি থিয়েটার। সেখানে অভিনীত হল বিল্বমঙ্গল, বুদ্ধদেব-চরিত, মলিনা-বিকাশ, বেল্লিকবাজার প্রভৃতি নাটক।

ওসব নাটক যদিও গিরিশচন্দ্রের লেখা, কিন্তু ওগুলোর অভিনয়-স্বত্ব স্টার থিয়েটারের; অতএব স্টার থিয়েটার গিরিশচন্দ্র আর সিটি থিয়েটারের নামে মামলা করল।

মামলার খবর পেয়ে গিরিশচন্দ্র তাড়াতাড়ি মধুপুর থেকে কলকাতায় চলে এলেন। দিনকয়েক পরেই শিশুপুত্রটি মারা গেল। আর স্টারের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের একটা আপোস-নিষ্পত্তি হয়ে গেল, স্টার গিরিশচন্দ্রের নামে মামলা তুলে নিল।

সিটি থিয়েটারের নামেও স্টারের নালিশ টেকে নি। আদালত রায় দিয়েছে—বাজারে চলতি ছাপান নাটকের অভিনয় সব থিয়েটারেই হতে পারে।

স্টার থিয়েটার তারপর রাজকৃষ্ণ রায়কে নাট্যকার হিসেবে নিয়ে আসে। ১৮৯১ সালের কথা। কিন্তু রাজকৃষ্ণ রায়ের কথা এখন থাক।

তারপর গিরিশচন্দ্রকে দেখা যাচ্ছে মিনার্ভা থিয়েটারে। মিনার্ভার মালিক নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়। ইনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র। ১৮৯৩ সালের ২৮শে জানুআরি গিরিশচন্দ্রের 'ম্যাকবেথ' নাট্যানুবাদ নিয়ে মিনার্ভা থিয়েটার খোলা হল। 'ম্যাকবেথে'র যাবতীয় দৃশ্যপট এঁকে দিলেন উইলিয়ার্ড সাহেব। সাজ-সজ্জা করে দিলেন পিম সাহেব।

গিরিশচন্দ্র 'ম্যাকবেথে' নামভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। অভিনয় চমৎকার

হল। গুণগ্রাহীরা মিনার্ভার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 'ম্যাকবেথ' জনসাধারণের হৃদয় জয় করতে পারল না। মাত্র কয়েকরাত্রি অভিনয়ের পর 'ম্যাকবেথ' বন্ধ করে দিতে হল।

সেসময়ে গিরিশচন্দ্র আক্ষেপ করে বলেছেন—নাটক বুঝবার সাধারণ দর্শক এখনও বাংলায় তৈরি হয় নি। নাটক দেখবার যোগ্য হতে এখনও এদের বহু বছর লাগবে।

তারপর মিনার্ভায় একের পর এক অভিনীত হল—মুকুলমুঞ্জরা, আবু হোসেন, সপ্তমীতে বিসর্জন, জনা, বড়দিনের বখশিশ, স্বপ্নের ফুল, সভ্যতার পাণ্ডা, করমেতি বাই, ফণির মণি, পাঁচ কনে। সব গিরিশচন্দ্রের লেখা। 'মুকুলমুঞ্জরা' আর 'আবুহোসেন' পড়ে স্টারের কর্তারা বলেছিলেন—গিরিশবাবুর মাথা খারাপ হয়েছে। কিন্তু শুধু ও-দুখানার অভিনয়েই মিনার্ভা থিয়েটার লাখটাকার ওপর আয় করেছে।

ওসব তো গেল নতুন নাটক। ওসব ছাড়া অনেক পুরনো নাটকেরও পুনরভিনয় হয়েছে মিনার্ভায়ঃ সধবার একাদশী, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, দক্ষযজ্ঞ, পলাশীর যুদ্ধ, মেঘনাদবধ, প্রফুল্ল প্রভৃতি।

মিনার্ভায় 'প্রফুল্ল'র অভিনয়ের আগে গিরিশচন্দ্র ঠিক করলেন 'প্রফুল্লে' মহেন্দ্র বসু যোগেশ সাজবেন, চুনীলাল দেব রমেশ, আর দানীবাবু সুরেশ।

কয়েক বছর আগে স্টারে প্রথম মহাসমারোহে এই 'প্রফুল্ল'র অভিনয় হয়েছে, খুব নামডাক হয়েছে। স্টারে যোগেশের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অমৃতলাল মিত্র। গিরিশচন্দ্র তখন স্টারে; যোগেশের ভূমিকা তিনিই শিখিয়েছেন অমৃতলালকে। এই ভূমিকায় অমৃতলাল অসামান্য খ্যাতি পেয়েছেন।

এবার গিরিশচন্দ্র মহেন্দ্রলালকে একেবারে আরেকরকম করে যোগেশের ভূমিকা শেখাতে লাগলেন। এ যোগেশ সে যোগেশ নয়। এ ছবি আরেক রকম, নতুন রকম।

মিনার্ভা থিয়েটার 'প্রফুল্ল' করবে, স্টার থিয়েটার সাব্যস্ত করল, একই সময়ে স্টারেও আবার 'প্রফুল্ল' হবে। গিরিশচন্দ্রের উদ্দেশে স্টার সদর্পে ঘোষণা করল—তোমার শিক্ষিত-বিদ্যা দেখাব তোমায়।

দেখা যাক, এই প্রতিযোগিতার ফল কী রকম দাঁড়ায়।

মিনার্ভায় 'প্রফুল্ল'র মহলা চলছে, যোগেশের ভূমিকায় মহলা দিচ্ছেন মহেন্দ্রলাল। মহেন্দ্রলাল একদিন গিরিশচন্দ্রকে বললেন—দেখুন, এই যোগেশের

পার্টে সব দৃশ্যেই বোধ হয় আপনি যেমন শিখিয়ে দিচ্ছেন তেমনি অভিনয় করতে পারব, কিন্তু 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল' আপনার মুখে যেমন শুনছি তেমনটি বা তার কাছাকাছিও আমি কিছুতেই পেরে উঠব না। প্রতিযোগিতায় কি শেষকালে বুড়োবয়সে অমৃতের কাছে হেরে যাব? এ-পার্টে তার খুব সুনাম।

কথায় যুক্তি আছে। এ কথা এক কথায় উড়িয়ে দেবার নয়।

দলের সকলেই গিরিশচন্দ্রকে যোগেশের ভূমিকা নিতে অনুরোধ করল। সকলের অনুরোধে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে গিরিশচন্দ্রকে যোগেশের ভূমিকা নিতে হল। গিরিশচন্দ্র বললেন—আমাকে নিজের বিরুদ্ধে অস্ত্র প্রয়োগ করতে হবে। যোগেশের ভূমিকায় যা শেখানোর, অমৃতকে তা শিখিয়ে দিয়েছি। এখন কী নতুন ছবি দেব, তাই ভাবছি।

কিন্তু, ভাবুন, গিরিশচন্দ্র যদি এবার জয়ী না হন? যদি পরাজিত হন অমৃতলালের কাছে? হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই তাতে কিছু যায় আসে না। শিষ্যের কাছে পরাজয়ে গুরুর কোন লজ্জা নেই। শিষ্যের কাছে পরাজয়ই তো গুরুর কাম্য।

আর, অমৃতলাল যদি পরাজিত হন গিরিশচন্দ্রের কাছে? তাতেও কোন অগৌরব নেই। সে সময়ে অমৃতলাল নিজেই বলেছেন—যদি হারি গুরুর কাছেই তো হারব, তাতে সম্মানই বেশি।

একই সময়ে কাছাকাছি দুই থিয়েটারে একই 'প্রফুল্ল'র অভিনয় আরম্ভ হল। মিনার্ভায় যোগেশ গিরিশচন্দ্র, স্টারে যোগেশ অমৃতলাল মিত্র। গুরু আর শিষ্য!

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই দুই অভিনয়ের একটি অনবদ্য তুলনামূলক সমালোচনা করেছেন:

'গুরু-শিষ্যের যুদ্ধ, কে হারে, কে জিনে? দুই থিয়েটারেই পূর্ব্ব হইতে টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হইল। পুনরভিনয়ের প্রথম রাত্রিতে দুই থিয়েটারেই জনসমুদ্র। আবার দ্বিতীয় রজনীতে যাঁহারা ষ্টারের দর্শক তাঁহারা আসিলেন মিনার্ভায়; মিনার্ভার দর্শক গেলেন ষ্টারে। আমরাও দল বাঁধিয়া প্রথম রাত্রিতে গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখিয়া দ্বিতীয় রজনীতে ষ্টারে গিয়াছিলাম, এবং তাহার জন্য চারি পাঁচ দিন পূর্ব্ব হইতেই টিকিট সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইয়াছিল। অভিনয়ে প্রত্যেক ভূমিকার তুলনায় সমালোচনা করিব না।

শুধু যোগেশের কথাই বলিব, দর্শক হিসাবেই বলিব।

'প্রথম রাত্রে গিরিশচন্দ্রের যোগেশ দেখিয়া যোগেশের এমন একটা ছাপ আমাদের মনে বসিয়া গিয়াছিল যে, অমৃতলালের যোগেশ ইহার পূর্ব্বে আমাদের খুব ভাল লাগিলেও তাঁহার এবারের যোগেশ সেখানে স্থান পাইল না। অমৃতলালের ছবি গিরিশবাবু একেবারে বদলাইয়া দিলেন। অমৃতলালের কণ্ঠস্বরে এমন একটা মাধুর্য্য ছিল—যাহা তাঁহার কণ্ঠেই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত, এবং সত্যই সেটী তাঁহার স্বাভাবিক সম্পদই ছিল। তাহা নিতান্তই অননুকরণীয়। গিরিশচন্দ্র যে অভিনয় করিলেন তাহাতে কোনও সুরের সংস্পর্শ তো ছিল না, কিন্তু তথাপি তাহা অমৃতলালের অপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ও মর্ম্মভেদী হইয়াছিল। কথার প্রত্যেক ভঙ্গীতে চাল চলনে, ভাবের অভিব্যক্তিতে, বয়সে, আকারে, গাম্ভীর্য্যে, গিরিশচন্দ্রের যোগেশের পার্শ্বে অমৃতলালের যোগেশ হীনপ্রভ হইয়া পড়িল। মনে হইল একজন যেন যথার্থই যোগেশ, আর একজন যেন যোগেশ সাজিয়াছেন; লিখিয়া আলোচনা করিয়া দুই অভিনেতার অভিনয়ের পার্থক্য কি তাহা ঠিক বোঝানো যায় না। কণ্ঠস্বর তো বর্ণনায় ফোটে না। "একটা পয়সা দাও না"—ভিখারী যোগেশের এ উক্তি, এই হাত পাতিবার সময় তাঁহার মুখভঙ্গী, এ তো আর কালি কলমের সাহায্যে আঁকিয়া দেখানো যায় না। গিরিশচন্দ্র যোগেশ সাজিয়া যে দৃশ্যেই রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইতেন, মনে হইত যেন একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহ রঙ্গমঞ্চের উপর দিয়া খেলিয়া চলিয়া গেল! সে অভিনয়ের অপূর্ব্বত্ব ও বিশেষত্ব বিচার করিয়া বুঝিবার সামর্থ্য তখন ছিল না। সে অভিনয়ের সৌন্দর্য্য দেখিয়া বাহবা দিবার অবসরও তখন থাকিত না। দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির বিচার করিবার স্পৃহা তখন কোথায় আত্মগোপন করিত, তাহা দর্শক বুঝিতেও পারিতেন না। শুধু মনে হইত রঙ্গমঞ্চের উপর কি যেন কি একটা হইয়া গেল,—যাহা দেখিতে দেখিতে হৃদয়ের স্পন্দন আপনি দ্রুততর তালে নাচিয়াছে, সহজ নিঃশ্বাস মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হইয়াছে, কণ্ঠ কখন রুদ্ধ হইয়াছে, চক্ষে অবিরল জলধারা, জ্ঞান ও চৈতন্য যেন কোন অজ্ঞাত রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে! যেন যোগেশ, সকল দর্শকেরই অতি প্রিয় যোগেশ—সকলের প্রাণে একটা হাহাকার তুলিয়া দুর্দ্দশার নিম্নতম স্তরে ক্রমশঃ ধাপে ধাপে নামিয়া যাইতেছে। জ্ঞানদার মৃত্যুদৃশ্যে "মরচো মরো, আমিই তোমায় লাথি মেরে, মেরে ফেলেছি," সমস্ত বিয়োগান্ত

নাটক যেন এই কয়টী অক্ষরের ছাঁদে মূর্ত্তি লইয়া দর্শকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত। তারপর "আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল" এই কথার মধ্যে শোকের সে প্রবাহ কোথায় লুকাইয়া ছিল! শুষ্ক অন্তর্ভেদী স্বর, মমতার সমুদ্র শুকাইয়া গিয়াছে, পড়িয়া আছে উত্তপ্ত বালুকারাশি, তাহাকে নিংড়াইলেও আর এক ফোঁটা জল পাওয়া যায় না! হৃদয় অকরুণার মাঝে করুণার ফল্গু এমনভাবে কেমন করিয়া লুকাইয়া রাখিতে পারে, তাহা যিনি গিরিশচন্দ্রের যোগেশ দেখেন নাই, তিনি বুঝিতে পারিবেন না। আমার সাধ্যও নাই যে তাহার কণামাত্র আভাস পাঠককে দিই। গিরিশচন্দ্রের এ অভিনয়ে একটা বিরাট অনুভূতির বিকাশ আছে। ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন, কর্ম্মবীর, স্নেহপরায়ণ, ইংরাজী শিক্ষিত, ইংরাজী সভ্যতায় গঠিত মদ্যপের চূড়ান্ত পরিণামের সে ভয়োদ্দীপনকারী মূর্ত্তি সহানুভূতির কোমল প্রলেপে মমত্বপূর্ণ যে জটীল চিত্র অভিনয়ে জীবন্ত দেখিয়াছি তাহা মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত মনে থাকিবে। এ বিচিত্র অভিনয়-প্রবাহে অমৃতলাল ডুবিয়া গেলেন। কিন্তু ইহা অমৃতলালের গৌরব; কারণ গিরিশচন্দ্রের কথা ছাড়িয়া দিলে এ পর্য্যন্ত অমৃতলালের মত যোগেশ আর দ্বিতীয় দেখি নাই। ...'

কিন্তু এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সকলেই কি গিরিশচন্দ্রকে জয়মাল্য দিয়েছেন? না। কেউ-কেউ বললেন—অমৃতলালই শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছেন।

সে-প্রশংসায় অমৃতলাল বিন্দুমাত্র গর্বিত হন নি। কেউ সামনাসামনি সেরকম প্রশংসার কথা শোনালে অমৃতলাল তাকে সবিনয়ে বলেছেন—'ওকথা মুখে আনবেন না, মশাই। আমি তাঁকে প্রণাম করে রঙ্গমঞ্চে উঠি।

—ঃঃ০ঃঃ—

পাঁচ

সে-সময়ে মিনার্ভা থিয়েটার বিস্তর আয় করেছে। কিন্তু আয় যতই হোক, নাগেন্দ্রভূষণ অপব্যয়ে নিপুণ। নাগেন্দ্রভূষণ যে কী রকম বেহিসেবী ছিলেন, তার নমুনা হিসেবে ছোট্ট একটা গল্প বলা যেতে পারে এখানে।

একরাত্রে মিনার্ভায় অভিনয় চলেছে, নাগেন্দ্রভূষণ সটান টিকিট ঘরে এসে ঢুকলেন। টিকিটবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন—আজ বিক্রি কেমন?

প্রশ্ন করলেন, কিন্তু খোদকর্তা উত্তরের জন্যে কণামাত্র অপেক্ষা করলেন না। বাক্স থেকে দু-মুঠো টাকা-পয়সা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

মোটমাট কত টাকা নিলেন খোদকর্তা, টিকিটবাবু হিসেব মেলাবে কেমন করে?

ও একরকম হয়ে যাবে'খন। তাই হল। টিকিট বিক্রির সঙ্গে টাকা মিলিয়ে দেখা গেল, সাকুল্যে ১৬২৷৷০ কম হচ্ছে। অগত্যা টিকিটবাবু হিসেবের খাতায় লিখল, খোদ—দুই মুঠো—১৬২৷৷০ আনা।

আসল কথা নাগেন্দ্রভূষণ ছন্দ বজায় রেখে চলতে পারলেন না। ফল যা হবার, দিনে দিনে নাগেন্দ্রভূষণের ঋণের ভার বাড়তে লাগল। গিরিশচন্দ্র সুপরামর্শ দিলেন, নাগেন্দ্রভূষণ তাতে ঠিকমত কান দিলেন না। অগত্যা গিরিশচন্দ্র একদিন মিনার্ভা থিয়েটার ছেড়ে দিলেন।

খবর পেয়ে স্টার থিয়েটারের কর্তারা আর দেরি করলেন না, গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে চলে এলেন, গিরিশচন্দ্রকে স্টারের নাট্যাচার্য করে নিয়ে গেলেন। এবার স্টারে এসে গিরিশচন্দ্র লিখলেন 'কালাপাহাড়,' 'হীরক জুবিলী', 'পারস্য-প্রসূন', 'মায়াবসান'। গিরিশচন্দ্র 'কালাপাহাড়ে' চিন্তামণি সাজলেন, 'মায়াবসানে' কালীকিঙ্কর সাজলেন।

প্রথম-প্রথম স্টার থিয়েটার গিরিশচন্দ্রকে শ্রদ্ধাভক্তি দেখাতে কার্পণ্য করে নি, কিন্তু তারপরে, কে জানে কেন, স্রোতের মোড় ঘুরে গেল। এমন কি, গিরিশচন্দ্রকে বাড়ি থেকে থিয়েটারে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়িও আসে না

নিয়মিত। তা এভাবে বরাবর চলতে পারে না। চলতে পারে না, এবং চলল না। গিরিশচন্দ্র স্টার ছেড়ে দিলেন।

আবার এই সময়েই কলকাতায় প্রথম প্লেগ দেখা দিয়েছে। প্লেগের ভয়ে কলকাতার মানুষজন ঊর্ধ্বশ্বাসে দিগ্বিদিকে পালাচ্ছে, ব্যবসা-বাণিজ্য বলতে গেলে নামমাত্র আছে, সারা শহর তোলপাড়। ধুন্ধুমার কাণ্ড কলকাতায়। কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন গিরিশচন্দ্র। তিনহাজার টাকা বোনাস পেয়ে চলে গেলেন রামপুর-বোয়ালিয়ায় একটা নতুন থিয়েটারে। কিন্তু সে থিয়েটারের আয়ু আর কদ্দিন!

রামপুর বোয়ালিয়ার থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল, এদিকে কলকাতায় প্লেগের ভয়ও অনেকখানি কমে গেল। ১৮৯৮ সালের মাঝামাঝি তখন। গিরিশচন্দ্র কলকাতায় চলে এলেন।

তারপর ক্লাসিক থিয়েটার। অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ক্লাসিকের কর্তা। তিনি সমাদর করে গিরিশচন্দ্রকে ক্লাসিকে নিয়ে এলেন। ক্লাসিকে অভিনয়ের জন্যে গিরিশচন্দ্রের প্রথম রচনা একখানা গীতিনাট্য, নাম 'দেলদার'। কিন্তু কিছু-কাল পরে অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের বিবাদ হল, গিরিশচন্দ্রকে ক্লাসিক ছেড়ে চলে যেতে হল। কেন অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবাদ হল, কেন গিরিশচন্দ্রকে ক্লাসিক ছেড়ে চলে যেতে হল? সেসব কথা এখন নয়, এখানে নয়।

ক্লাসিক ছেড়ে আবার মিনার্ভায় এলেন গিরিশচন্দ্র।

১৮৯৬ সালে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, মনে আছে। গিরিশচন্দ্র চলে যাবার পর মিনার্ভা খুব সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকে নি। অনেক ঝড়-ঝাপটা গেছে মিনার্ভার ওপর দিয়ে। শেষপর্যন্ত মিনার্ভার কর্তা হলেন নরেন্দ্রনাথ সরকার। নরেন্দ্রনাথ শ্রীপুরের জমিদার, খুব অল্প বয়স। যে-সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তখন মহেন্দ্রকুমার মিত্র নরেন্দ্রনাথের বিষয়-সম্পত্তির ম্যানেজার। মহেন্দ্রকুমারের পরামর্শ শুনেই নরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে মিনার্ভায় নিয়ে এসেছেন।

গিরিশচন্দ্র এবার মিনার্ভার জন্যে সাকুল্যে নতুন দু-খানা গীতিনাট্য লিখলেন ঃ 'মণিহরণ' আর 'নন্দদুলাল'।

'মণিহরণ' রচনার পিছনে একটু ইতিহাস আছে।

সেদিন রবিবার। 'প্রফুল্ল' অভিনীত হবে। গিরিশচন্দ্র যোগেশ সাজবেন।

মিনার্ভা থিয়েটারের ব্যাণ্ড-মাস্টার নন্তিবাবুর কথায় গিরিশচন্দ্র নতুন একখানা গীতিনাট্য লিখে দিতে রাজী হলেন। আজই লিখে দেবেন। গিরিশচন্দ্র বললেন—আচ্ছা,—দেবগুরু প্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী—কাগজ-কলম নিয়ে এস, ঠাকুরের কৃপায় আমি আজই বই লিখে দিচ্ছি।

কাগজ কলম নিয়ে একজন বসে গেলেন। যোগেশের সাজে গিরিশচন্দ্র একেকবার মঞ্চে নেমে অভিনয় করে আসেন, আর অভিনয়ের ফাঁকে-ফাঁকে ভেতরে বসে মুখে-মুখে 'মণিহরণ' গীতিনাট্যখানা রচনা করে যান। সেদিন 'প্রফুল্ল'র অভিনয় শেষ হবার পর গিরিশচন্দ্র স্টেজে বসে 'মণিহরণে'র আটাশখানা গান বেঁধে দিলেন।

'মণিহরণ' শেষ করে গিরিশচন্দ্র চুনীলাল দেবকে বললেন—ইচ্ছা কর তো আজই আরেকখানা নকসা লিখে দিতে পারি।

তা এতে অনিচ্ছার কিছু নেই। গিরিশচন্দ্র সেই রাত্রেই সেখানে বসে 'Charitable Dispensary' নামে আরেকখানা পঞ্চরং লিখে দিলেন। দুঃখের কথা, 'Charitable Dispensary'র পাণ্ডুলিপিখানা থিয়েটার থেকেই হারিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু মিনার্ভায় বেশিদিন থাকতে পারলেন না গিরিশচন্দ্র। নরেন্দ্রনাথের আশা ছিল যে তাঁর লেখা নাটকের অভিনয় হবে, তিনিই শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করবেন, নট-নাট্যকার হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়বে, কিন্তু সেসব হচ্ছে কই? সেদিক থেকে নরেন্দ্রনাথের জন্যে গিরিশচন্দ্র কী করলেন?

গিরিশচন্দ্র অবশ্য নরেন্দ্রনাথকে ভরসা দিয়েছেন—তুমি কিছুদিন অপেক্ষা কর। ক্লাসিকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আগে মিনার্ভার নামডাক হোক, তারপর আমি তোমাকে তৈরি করে দেব।

গিরিশচন্দ্রের এই ভরসার ওপর নরেন্দ্রনাথ বেশিদিন নির্ভর করে থাকতে পারলেন না। উপরন্তু, পাঁচরকম কুমন্ত্রণা দেবার বান্ধব জুটে গেল নরেন্দ্রনাথের। কার কথা শুনে কে জানে, নরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে সমস্ত চুক্তি বাতিল করে দিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ অতঃপর একদিন গিরিশচন্দ্রের কাছে এসে উপস্থিত। পুরনো বিবাদ ভুলতে হল। অমরেন্দ্রনাথের অনুরোধে গিরিশচন্দ্র আবার ক্লাসিকে এলেন। তখন অবশ্য অমরেন্দ্রনাথ বিজ্ঞাপন দিয়েছেন:

'নাট্যামোদী সুধীবৃন্দকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, নটকুলচূড়ামণি

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত, আমাদের সকল বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় যে কয়েকটী স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে, সকলগুলিরই সৃষ্টিকর্ত্তা—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র! প্রায় সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীই—'গিরিশচন্দ্রে'র শিক্ষায় গৌরবান্বিত! তাহার মধ্যে আমিও একজন। গিরিশ বাবুর সহিত বিবাদ করিয়া, নিতান্তই ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছিলাম। —বড়ই সুখের বিষয়, সমস্ত মনোমালিন্য অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়া, তাঁহার স্নেহময় কোলে আবার তিনি টানিয়া লইয়াছেন। গিরিশ-বাবুর কোনও থিয়েটারের সহিত, এখন কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই। তাঁহার সমস্ত নূতন নূতন নাটক, গীতিনাট্য ও পঞ্চরং এখন 'ক্লাসিকে' অভিনীত হইবে। 'ক্লাসিক থিয়েটার' ব্যতীত অপর কোনও রঙ্গমঞ্চের সহিত গিরিশ-বাবুর কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। শ্রীযুক্ত 'গিরিশচন্দ্র' এখন 'ক্লাসিকের'! নিবেদনমিতি।'

এবার ক্লাসিকে এসে গিরিশচন্দ্র লিখলেন ঃ 'অশ্রুধারা', 'মনের মতন', 'অভিশাপ', 'শান্তি', 'ভ্রান্তি', 'আয়না' ও 'সৎনাম'। নিজের লেখা এই সাতখানা বইয়ের মধ্যে একমাত্র 'ভ্রান্তি' ছাড়া আর কোন বইয়ে গিরিশচন্দ্র কোনও ভূমিকা নেন নি। 'ভ্রান্তি'তে গিরিশচন্দ্র নিয়েছেন রঙ্গলালের ভূমিকা।

ও, 'অভিশাপে'র সূত্রে একটা বলবার মত খবর আছে। 'অভিশাপ' একখানা গীতিনাট্য; তাতে নাচ শিখিয়েছেন কুসুমকুমারী। বাঙলা থিয়েটারে সেই প্রথম একজন মেয়েমানুষ নাচ শিখিয়েছেন।

ওদিকে মিনার্ভা থিয়েটার আস্তে-আস্তে ডুবে যেতে লাগল। অনেক অদল-বদল হল মিনার্ভায়। অনেক ঘোরপ্যাঁচের পর শেষপর্যন্ত মিনার্ভা ইজারা পেলেন মনোমোহন পাঁড়ে। কথা হল, এখন থেকে চুনীলাল দেব মিনার্ভা চালাবেন, এবং ভাড়াবাবদ মনোমোহনকে মাসিক সাড়ে-সাতশো টাকা দেবেন।

চুনীলাল অক্লান্ত পরিশ্রমে মিনার্ভাকে নতুন করে গড়ে তুলতে লাগলেন।

মিনার্ভা থিয়েটারে দর্শকদের ভিড় বাড়ানোর জন্যে চুনীলাল একটা নতুন ব্যবস্থা করলেন। চুনীলাল ঠিক করলেন, মিনার্ভা থিয়েটারে দর্শকদের উপহার বিলানো হবে।

বাঙলা থিয়েটারে উপহারের ব্যবস্থা এই কিন্তু নতুন নয়। বহুকাল আগে ন্যাশনাল থিয়েটার উপহারের ব্যবস্থা করেছিল—আংটি, ইয়ারিং, আয়না, রুমাল, সাবান, এসেন্স প্রভৃতি। আংটি, ইয়ারিং, নাকছাবি প্রভৃতি উপহার দিয়ে

কিছুকাল দর্শক টানবার চেষ্টা করেছে এমারেল্ড থিয়েটার। এককালে লটারি করে উপহার দিয়েছে ন্যাশনাল থিয়েটার; উপহারের আশ্চর্য বস্তুগুলি—যথা, একটা ছাতা, বড়-বড় দুটো বিলিতী কুমড়ো, এককাঁদি কলা, এক বস্তা কয়লা—পাদপ্রদীপের সামনে সাজান থাকত। থাক।

বলতে গিয়েছিলাম যে চুনীলাল সাব্যস্ত করলেন, মিনার্ভায় দর্শকদের বই উপহার দেবেন। অদ্ভুত ব্যবস্থা, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই ব্যবস্থায় ফল হল অত্যদ্ভুত। প্রথম উপহার দেওয়া হল—'অতুল-গ্রন্থাবলী'। সেদিন মিনার্ভায় তিলধারণের স্থান রইল না, উপহারের লোভে প্রচুর টিকিট বিক্রি হয়ে গেল, বিস্তর দর্শক স্থানাভাবে ফিরে যেতে বাধ্য হল, বিডন স্ট্রীটে তুমুল কাণ্ড।

সেসময়ে ক্লাসিক খুব নামজাদা থিয়েটার। কিন্তু এই নতুন ব্যবস্থায় মিনার্ভায় ভিড় বাড়তে লাগল, ক্লাসিকে ভিড় কমতে লাগল। ক্লাসিকে বিক্রি কমছে, মিনার্ভায় বিক্রি বাড়ছে।

বই উপহারের লোভে এই কাণ্ড হচ্ছে তো? তাহলে আর কথা নেই, ক্লাসিকও উপহার দিতে কসুর করবে না। মিনার্ভার উপহারের উপর টেক্কা দেবে ক্লাসিকের উপহার। ক্লাসিকের কর্তা অমরেন্দ্রনাথ অবিলম্বে তিনগুণ খরচা করে মাইকেল মধুসূদনের গ্রন্থাবলী ছাপিয়ে এনে ক্লাসিকে উপহার দেবার ব্যবস্থা পাকা করে ফেললেন।

মিনার্ভা আর ক্লাসিক—দুই থিয়েটারই দর্শকদের বিপুল বিক্রমে বই উপহার দিতে লাগল। দর্শকেরা থিয়েটার দেখতে এসে উপহার পেতে লাগলেন—অতুল-গ্রন্থাবলী, মাইকেল-গ্রন্থাবলী, কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানা বই, পর্যন্ত শব্দকল্পদ্রুম। মিনার্ভা আর ক্লাসিক—বই উপহারের প্রতিযোগিতা চলল দুই থিয়েটারের মধ্যে। সেই প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হল ক্লাসিক। বিজয়ী হল মিনার্ভা।

চুনীলালের জন্যেই ভাগ্যের প্রসন্ন মুখ দেখল মিনার্ভা। অল্পকালের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে, ক্লাসিক দুর্দশার চূড়ায় এসে পৌঁছেছে। ইতিমধ্যে চুনীলাল গিরিশচন্দ্রকে মিনার্ভায় নিয়ে এলেন। মনোমোহন পাঁড়েও খুব পরিশ্রম করতে লাগলেন থিয়েটারের জন্যে। মহলা বাদে থিয়েটারের যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশোনার ভার মনোমোহনের। সে-বাবদে অবশ্যি তাঁর একটা কমিশন পাওনা হচ্ছে।

কিন্তু চুনীলালের সঙ্গে মনোমোহনের সদ্ভাব বজায় রইল না। কি একটা

তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে দুজনে বিবাদ হয়ে গেল, নগদ মাত্র একহাজার টাকা নিয়ে চুনীলালকে তাই মিনার্ভা ছেড়ে যেতে হল। মনোমোহন মনে-মনে ভাবলেন, মিনার্ভা থিয়েটার তিনি ভাড়া দিয়ে দেবেন।

মহেন্দ্রকুমার মিত্র তখন মনোমোহনকে বললেন—থিয়েটার ভাড়া দিতে চাও কেন? আমার কথায় বিশ্বাস কর, স্বয়ং থিয়েটার চালাও, লোকসান হবে না।

মহেন্দ্রকুমারের বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর মনোমোহনের বিপুল বিশ্বাস। মনোমোহন মহেন্দ্রকুমারকে বললেন—তুমি যদি বখরা নিয়ে আমার সঙ্গে কাজ কর, তাহলে আমি থিয়েটার চালাতে রাজী আছি।

মহেন্দ্রকুমার রাজী হলেন। ঠিক হল, ওয়ার্কিং-পার্টনার হিসেবে মহেন্দ্রকুমার লাভের এক-তৃতীয়াংশ পাবেন। আর এবার মিনার্ভার ম্যানেজার বহাল হলেন অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

তারপর ১৯০৫ সালের ৪ঠা মার্চ গিরিশচন্দ্রের 'হর-গৌরী'র প্রথম অভিনয় হল মিনার্ভায়। হরের ভূমিকায় প্রথম অভিনয় করলেন তারকনাথ পালিত; কিন্তু সে-ভূমিকাভিনয় তেমন নিপুণ হল না বলে গিরিশচন্দ্র নিজেই কয়েক-রাত্রি হরের ভূমিকায় দেখা দিলেন।

মাসখানেক বাদে ৮ই এপ্রিল গিরিশচন্দ্রের 'বলিদানে'র প্রথম অভিনয় হল মিনার্ভায়। সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় হল।

অমৃতলাল বসু একদিন 'বলিদান' দেখতে এলেন। অভিনয় দেখে বললেন—সেকালের 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের পরে এরকম নিখুঁত অভিনয় আমি আর দেখি নি।

অভিনয়ান্তে অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রকে বললেন—মশায়, এমন powerful নাটক লেখা আপনার দ্বারাই সম্ভব। ম্যারেজ-প্রবলেম নিয়ে আমি একটা ফার্স করেছি, আপনি তাই নিয়ে এত বড় একটা ট্রাজেডি করলেন!

গিরিশচন্দ্র বললেন—এসব নাটক তো আমার লিখবার কথা নয়। মনে করেছিলাম শেষবয়সে দু-চারখানা ভাল নাটক লিখে রেখে যাব, তা বুড়ো বয়সেও এই নর্দামা ঘাঁটতে হচ্ছে। এসব রিয়্যালিষ্টিক বিষয় নিয়ে নাটক লেখা আর নর্দামা ঘাঁটা এক।

'বলিদান' দেখে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একদিন বললেন—যদি 'বলিদানে'র মত সামাজিক নাটক লিখতে পারি, তবেই সামাজিক নাটক লিখব।

'বলিদানের পর 'রাণা প্রতাপ' অভিনীত হল মিনার্ভায়। 'রাণা প্রতাপ' লিখেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

'রাণা প্রতাপ' দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক নাটক। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম ঐতিহাসিক নাটকের নাম 'তারাবাঈ'। বেঙ্গল-থিয়েটারের মঞ্চে ইউনিক নামে একটি থিয়েটারের দল 'তারাবাঈ'য়ের অভিনয় করেছিল। সেই 'তারাবাঈ' নাটকাভিনয়ের সুখ্যাতি হয়েছিল, কিন্তু যে-ছন্দে 'তারাবাঈ' রচিত সে-ছন্দ সকল দর্শকের পছন্দ হয় নি। কোন কোন দর্শক সেসময়ে যবনিকা পড়লে নিজেদের মধ্যে 'তারাবাঈ'য়ের ছন্দ নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত। একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

যবনিকা পড়লে একজন দর্শক বলল—কোথা যাইতেছ?

আরেকজন উত্তর দিল—খাইবারে জল; তুমি যাবে?

প্রথমজন বলল—নহে বন্ধু।

দ্বিতীয়জন বলল—উত্তম; আমি তবে আসি।

দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক নাটক 'রাণা প্রতাপ'। প্রথম অভিনীত হয় স্টার থিয়েটারে। কিন্তু 'রাণা প্রতাপে'র প্রথম অভিনয়-রজনীতেই দ্বিজেন্দ্রলাল স্টারের ওপর বিরূপ হলেন। অবিলম্বে দ্বিজেন্দ্রলাল মিনার্ভার মহেন্দ্রকুমারকে ধরলেন—মিনার্ভায় 'রাণা প্রতাপ' অভিনয় করতে হবে।

মহেন্দ্রকুমার রাজী হলেন। সাব্যস্ত হল, স্টারে 'রাণা প্রতাপে'র দ্বিতীয় অভিনয়-রজনীতেই মিনার্ভায় 'রাণা প্রতাপে'র প্রথম অভিনয়-রজনী হবে। 'রাণা প্রতাপে'র মত অতবড় একখানা নাটকাভিনয়ের আগে মিনার্ভা তাহলে রিহার্সালের জন্যে মাত্র পাঁচদিন সময় পাচ্ছে।

এই পাঁচদিনে মিনার্ভার অধিকাংশ অভিনেতা-অভিনেত্রীই বাড়ি যায় নি। সোমবার রিহার্সাল আরম্ভ হল। প্রথম রিহার্সালের আসরে দেখতে পাচ্ছি গিরিশচন্দ্র আছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল আছেন, অর্ধেন্দুশেখর আছেন। ডাইনে-বামে অভিনেতারা বসে আছেন, অদূরে বসে আছেন অভিনেত্রীরা। প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর হাতে একেকখানা 'রাণা প্রতাপ'। মহলাস্থল জমজমাট, কিন্তু নিঃশব্দ।

গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালকে বললেন—রিহার্সাল তবে আপনিই আরম্ভ করুন। আপনার লেখা, আপনি পড়ে দিন।

দ্বিজেন্দ্রলাল বললেন—সে কি কথা! যেখানে আপনি ও অর্ধেন্দুশেখর

আছেন, সেখানে আমি কি রিহার্সাল দেব? আপনিই রিহার্সাল দিন, আমি বরং শুনি।

প্রথম রিহার্সাল দেখে-শুনে দ্বিজেন্দ্রলাল বললেন—চমৎকার হবে।

কিন্তু 'রাণা প্রতাপে'র বিক্রি মোটেই আশাবর্ধক নয়।

একটা দরকারী কথা বলা হয় নি। নিজের হাতে বই লিখবার অভ্যাস ছিল না গিরিশচন্দ্রের। তিনি মুখে-মুখে বলে যেতেন, আর-কেউ শুনে-শুনে লিখে নিতেন। অনেকেই গিরিশচন্দ্রের শ্রুতলেখকের কাজ করেছেন। কয়েকজনের নাম করি—অমৃতলাল বসু, কেদারনাথ চৌধুরী, অমৃতলাল মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ বসু, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। গিরিশচন্দ্রের জীবনের শেষ চোদ্দবছর অবিনাশচন্দ্রই গিরিশচন্দ্রের শ্রুতলেখক ছিলেন।

'সিরাজদ্দৌলা' রচনাকালে গিরিশচন্দ্রের শ্রুতলেখক ছিলেন অবিনাশচন্দ্র। সেই সময়েই আবার 'বলিদান' নাটকখানা ছাপানো হচ্ছে, তার তত্ত্ব-তলাশ করতেও অবিনাশচন্দ্রকেই ছাপাখানায় যেতে হয়। একেকদিন ছাপাখানা থেকে কাজ মিটিয়ে ফিরতে দেরি হয়ে যায়। গিরিশচন্দ্র তখন মহাবিরক্ত হতেন। অবিনাশচন্দ্রকে বলতেন—বই ছাপা হতে দেরি হলে কোন ক্ষতি নেই, ছাপা বরং এখন বন্ধ থাক। তুমি সব কাজ ছেড়ে আগে 'সিরাজদ্দৌলা' শেষ কর। যতদিন 'সিরাজদ্দৌলা' শেষ না হচ্ছে, আমি কিছুতেই সুস্থির হতে পারছি না। আমার ঘাড়ে যেন ভূত চেপে আছে।

'সিরাজদ্দৌলা' লেখা শেষ হল। তারপর অভিনয়ের ব্যবস্থা। সিরাজের ভূমিকা প্রথম দেওয়া হল অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে। মনোমোহন পাঁড়ের ইচ্ছা যে অপরেশচন্দ্রই সিরাজের ভূমিকায় অভিনয় করেন। কিন্তু গিরিশ-চন্দ্রের ইচ্ছা যে দানীবাবু সিরাজ সাজেন।

মনোমোহন মিনার্ভার কর্তা; গিরিশচন্দ্র মিনার্ভার নাট্যাচার্য। দু-জনের দু-রকম ইচ্ছা!

অপরেশচন্দ্র দেখলেন, অবস্থা জটিল। অপরেশচন্দ্র অতএব একদিন মনোমোহনবাবুকে কোন কথা না বলে সিরাজের পার্টটি গিরিশচন্দ্রের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে এলেন। 'সিরাজদ্দৌলা'র অভিনয় আরম্ভ হবার কিছুদিন আগেই মিনার্ভা ছেড়ে চলে গেলেন অপরেশচন্দ্র।

১৯০৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর 'সিরাজদ্দৌলা'র প্রথম অভিনয় হল মিনার্ভায়। গিরিশচন্দ্র করিমচাচার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। অসাধারণ জনপ্রিয় হল

'সিরাজদ্দৌলা'।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক একদিন 'সিরাজদ্দৌলা' দেখতে মিনার্ভায় এলেন। তিনি রয়্যাল-বক্সে ঢুকতেই সেদিনের দর্শকদের সমবেতকণ্ঠে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিত হয়ে উঠল। গিরিশচন্দ্র তখন করিমচাচারূপে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়মগ্ন; সেই অবস্থায়ই তিনি নতজানু হয়ে লোকমান্যকে অভিনন্দন জানালেন।

এসবের কিছুদিন আগে হাইকোর্ট থেকে মিনার্ভা থিয়েটার নিলামে উঠেছে এবং মনোমোহন পাঁড়ে সেখান থেকে মিনার্ভা থিয়েটার কিনে ফেলেছেন। তাতে যে-টাকা ব্যয় হল, এক 'সিরাজদ্দৌলা'র দৌলতেই তা আয় হয়ে গেল।

সেবার বড়দিনে মিনার্ভায় অভিনয়ের জন্যে গিরিশচন্দ্র লিখে দিলেন 'বাসর'। কিন্তু 'বাসর' তেমন জমলো না।

তারপর গিরিশচন্দ্র নতুন করে 'দুর্গেশনন্দিনী'র নাট্যরূপ দিলেন। মিনার্ভায় এই 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম অভিনয় হল ১৯০৬ সালের ১৫ই ফেব্রুআরি। গিরিশচন্দ্র বীরেন্দ্রসিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

রচনাকালে নাটকের বিষয়বস্তু ও চরিত্রের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যেতেন গিরিশচন্দ্র। 'মীরকাসিম' যখন লেখা হচ্ছে, তখন একদিন স্বামী সারদানন্দ দেখা করতে এলেন গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে। গিরিশচন্দ্র সারদানন্দকে দেখে মহাখুশী। জিজ্ঞেস করলেন—কি হে, মঠ থেকে কবে এলে?

সারদানন্দ বললেন—তিনদিন হল কলকাতায় এসেছি।

গিরিশচন্দ্র বললেন—তিনদিন কলকাতায় এসেছ, আর আজ এখানে এলে! কলকাতায় যে-কদিন থাক, রোজ একবার করে এস। তোমাদের দেখলে থাকি ভাল। অনেকদিন ধরে ঠাকুরের কথা হয় নি, একটু recreation আবশ্যক হয়েছে। 'মীরকাসিম' নাটক লিখছি, কেবল ষড়যন্ত্র—কেবল ষড়যন্ত্র! প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। ঘুমুলে স্বপ্ন দেখি, মীরকাসিম মুখের কাছে এসে একগাল দাড়ি নাড়ছে।

'সিরাজদ্দৌলা'র পর থেকেই গিরিশচন্দ্রের শরীরে ভাঙনের কাজ শুরু হয়ে যায়। হেমন্তকালের আরম্ভে হাঁপানির আক্রমণ হয়, শীতকালে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে থাকেন, বসন্তকালের শেষাংশে আবার সুস্থ হন। পান-তামাক খুব ভালোবাসতেন, কিন্তু রোগের প্রকোপে পান-তামাক ছেড়ে দিতে হল। কথায়-কথায় গিরিশচন্দ্র একদিন সহাস্যমুখে বললেন—ছাখো, অকৃতজ্ঞ দেহটার

ওপর আর আমার কোনই মমতা নেই। এই দেহের পুষ্টির জন্যে কত উপাদেয় আহার দিয়েছি, কত যত্নে ওকে সাজিয়েছি-গুছিয়েছি, কিন্তু এই দেহই পরম যত্নে হাঁপানিকে ডেকে এনে আশ্রয় দিয়েছে।

মিনার্ভায় 'মীরকাসিম' প্রথম অভিনীত হল ১৯০৬ সালের ১০ই জুন। মীরজাফরের ভূমিকায় স্বয়ং গিরিশচন্দ্র।

তার অল্প কিছুকাল পরে, শরৎকালের মাঝামাঝি, গিরিশচন্দ্র আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হাঁপানির অসুখ। তারপর যত শীত পড়ে, অসুখের তেজ তত বাড়ে। রোগের যন্ত্রণায় ঘরের মধ্যে ছটফট করছেন, এমন সময় একদিন মিনার্ভার মহেন্দ্রকুমার এসে দুঃখ করে বললেন—মশাই, সব থিয়েটারেই বড়দিনে নতুন বই হচ্ছে, আপনি অসুস্থ, আমরাই কিছু করতে পারলাম না।

গিরিশচন্দ্র অভয় দিলেন। বললেন—ভাববেন না মহেন্দ্রবাবু, যা-হোক কিছু একটা করে দেব।

তাই হল। গিরিশচন্দ্র 'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা' নামে একখানা প্রহসন তৈরি করে দিলেন। বড়দিনে মিনার্ভায় 'য্যায়সা-কা-ত্যায়সা'র অভিনয় হল।

তারপর 'ছত্রপতি শিবাজী'। এই নাটক রচনা সাঙ্গ করে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয়ের জন্যে রিহার্সাল আরম্ভ করে দিলেন। ১৯০৭ সালের কথা। তিন অঙ্ক পর্যন্ত রিহার্সাল দেওয়া হল, কিন্তু তারপরেই একটা চমকপ্রদ কাণ্ড ঘটল।

বছর দুয়েক আগের একদিন। সেদিন মিনার্ভায় 'প্রফুল্ল' অভিনীত হচ্ছিল। প্রচণ্ড বিক্রি; মিনার্ভা দর্শকে ভর্তি।

অভিনয়ের অবসরে থিয়েটারের অন্দরে দু-চারজন অভিনেতার সঙ্গে গিরিশচন্দ্র বসেছিলেন। কে একজন ভদ্রলোক হঠাৎ সেখানে এসে গিরিশচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন—উঃ, কী বিক্রি!

ভদ্রলোক চলে যাবার পর গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—বাবুটি কে?

অকুস্থলে অপরেশচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। বললেন—ওঁর নাম শরৎকুমার রায়। মনোমোহনবাবুর বিশেষ বন্ধু।

গিরিশচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন—বন্ধুত্ব আর বেশিদিন থাকবে না।

—কেন, বন্ধুত্ব থাকবে না কেন?

গিরিশচন্দ্র ব্যাখ্যা করে বললেন—শুনলে না ওঁর কথা, কী ভাবে বললেন—উঃ, কী বিক্রি! এই বিক্রি দেখে ওঁর আনন্দ হয় নি। লোভ

আর হিংসে হয়েছে। দেখে নিও, ইনি এককালে থিয়েটার করবেন, তখন আর বন্ধুত্ব থাকবে না।

দেখি শরৎকুমার সত্যি-সত্যি কোনদিন থিয়েটার করেন কি না।

এমারেল্ড থিয়েটার উঠে যাবার পর সেই বাড়িতেই ক্লাসিক থিয়েটার খোলা হয়। দীর্ঘকাল ক্লাসিক সগৌরবে চলেছিল, তারপর একদিন বন্ধ হয়ে গেল। অতঃপর সেই বাড়ি নিলামে উঠল।

সম্প্রতি শরৎকুমার রায় একলক্ষ আট হাজার টাকায় সেই বাড়ি কিনেছেন। শরৎকুমার সেখানে নতুন থিয়েটার খুলছেন—কোহিনুর থিয়েটার।

কোহিনুর সম্পর্কে পরামর্শের জন্যে কোহিনুরের পক্ষ থেকে প্রথমেই যাওয়া হল অমৃতলাল বসুর কাছে। অমৃতলাল বসু তখন স্টারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী। তিনি বললেন—অন্যদল থেকে অভিনেতা-অভিনেত্রী ভাঙিয়ে এন না। নতুন লোক নিয়ে শিখিয়ে-পড়িয়ে দল তৈরি কর।

এ-প্রস্তাবে আপত্তি নেই যদি অমৃতলাল বসু নিজে আচার্য হয়ে নতুন দল তৈরির ভার নিতে রাজি হন।

অমৃতলাল বসু ভেবে-চিন্তে বললেন—ছ-মাস পরে আমি কোহিনুরে যেতে রাজি আছি।

কিন্তু ছ-মাস অপেক্ষা করা যাবে না। অতএব অন্য পথ দেখতে হল।

প্রসন্নকুমার রায় হাইকোর্টের উকিল, কুড়ুলগাছির জমিদার। শরৎকুমার প্রসন্নকুমারের বড় ছেলে। প্রসন্নকুমার একদিন শরৎকুমারকে বললেন—যদি ভাল করে থিয়েটার করতে চাও তো যেমন করে পার গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে এস।

গিরিশচন্দ্রের কাছে যাওয়া হল। তিনি বললেন—একা গিয়ে নতুন করে দল গড়বার মত স্বাস্থ্য ও বয়স আমার নেই। তা ছাড়া সেরকম নতুন দল গড়তে সময়ও লাগবে প্রায় এক বছর—সে-খরচও বড় কম নয়। তার চেয়ে তোমরা অন্য সব থিয়েটার থেকে বেছে-বেছে লোক ভাঙিয়ে আন। আর, আমি একা গেলেও, আমার হাতে কোন বই মজুদ নেই, আমার 'ছত্রপতি শিবাজী' মিনার্ভায় রিহার্সালে পড়েছে, সে-বই ফিরিয়ে নেবার উপায় নেই।

তাহলে কোহিনুরের জন্যে সর্বাগ্রে একখানা নতুন নাটক দরকার। কিন্তু নাট্যকার কোথায়? কোহিনুরের অবিলম্বে একজন উপযুক্ত নাট্যকার

চাই! অতএব, স্টার থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে ভাঙিয়ে আনা হল। শরৎকুমার আপন থিয়েটারের জন্যে একাধিক প্রখ্যাত অভিনেতা অভিনেত্রীকে কোহিনুরে নিয়ে এলেন।

মিনার্ভা থেকে গিরিশচন্দ্রকে কোহিনুরে ভাঙিয়ে নিয়ে আসবার ব্যাপারে ক্ষেত্রমোহন মিত্র আর অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে একদিন যা করতে হয়েছে তা একটা বলবার মত বস্তু।

মিনার্ভা কিছুতেই গিরিশচন্দ্রকে ছাড়তে চায় না। ওদিকে স্টার থিয়েটারও তখন গিরিশচন্দ্রকে আপন দলে পাবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। কোহিনুরেরও লক্ষ্য গিরিশচন্দ্র।

একদিন কোহিনুরের পক্ষ থেকে অপরেশচন্দ্র আর ক্ষেত্রমোহন গিরিশ-চন্দ্রের বাড়িতে গেলেন। গিয়ে দেখেন, মিনার্ভার মহেন্দ্রকুমার আসর জাঁকিয়ে বসে আছেন। মহেন্দ্রকুমারকে দেখে অপরেশচন্দ্র আর ক্ষেত্রমোহন ঘরে ঢুকলেন না। কোহিনুরের ব্যাপারে তাঁরা নিরিবিলি কথা বলতে চান কিন্তু মহেন্দ্রকুমারের সামনে সেটা কেমন করে বলা যায়! অতএব, অপরেশ-চন্দ্র আর ক্ষেত্রমোহন উপরে উঠবার সিঁড়ির পাশের ছাড়া গোয়ালঘরে লুকিয়ে রইলেন। নজর রাখতে লাগলেন, কতক্ষণে মহেন্দ্রকুমার বিদায় নেন, কতক্ষণে গিরিশচন্দ্রকে একলা পাওয়া যায়।

অনেকক্ষণ বাদে মহেন্দ্রকুমার চলে গেলেন। কিন্তু মহেন্দ্রকুমারের বিদায়ের পরক্ষণেই স্টারের হরিবাবু এলেন গিরিশচন্দ্রের কাছে।

কে জানে, আজ রাত্রে কতক্ষণে গিরিশচন্দ্রকে একলা পাওয়া যাবে।

সেই নিস্পন্দ গোয়ালঘরের মধ্যে রাত গভীর হয়ে উঠল। অপরেশচন্দ্র আর ক্ষেত্রমোহনকে অস্থির করে তুলল বাগবাজারের মশা।

শেষপর্যন্ত কোহিনুরেরই জয় হল। গিরিশচন্দ্র মিনার্ভাতেও থাকলেন না, স্টারেও গেলেন না। দশ হাজার টাকা বোনাস আর পাঁচশো টাকা মাইনেয় গিরিশচন্দ্র কোহিনুরে এলেন।

কিন্তু কোহিনুরের দুর্ভাগ্য! পুরোপুরি ছ-মাসও কাটল না, শরৎকুমার মারা গেলেন। গিরিশচন্দ্র অসুস্থ। কোহিনুরে শ্রী রইল না, শৃঙ্খলা রইল না। কোহিনুরের মালিক তখন শিশিরকুমার রায়। ইনি শরৎকুমারের ভাই।

শিশিরকুমার গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলতে পারলেন না। গিরিশচন্দ্র কোহিনুর ছাড়লেন। মহেন্দ্রকুমার মিত্র আবার গিরিশচন্দ্রকে

সযত্নে মিনার্ভায় নিয়ে এলেন।

এবার মিনার্ভায় এসে গিরিশচন্দ্র প্রথম যে-নাটকখানা রচনা করলেন, তার নাম 'শাস্তি কি শান্তি ?'—বিষয়বস্তু, বিধবাবিবাহ।

অন্যান্যবারের মত এবারেও হেমন্তকালের আরম্ভে গিরিশচন্দ্র হাঁপানিতে আক্রান্ত হলেন। সারা শীতকাল কষ্ট পেলেন এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে। কিন্তু পরের বছর গিরিশচন্দ্র সাবধান হয়ে রইলেন। চিকিৎসকের পরামর্শে আশ্বিনমাসেই কাশীতে চলে গেলেন, পুরো শীতকালটা কাটালেন সেখানে। চমৎকার ফল পাওয়া গেল। হাঁপানি হল না সেবারে। পরের বছরও সেই ব্যবস্থাই করলেন, সুফল পেলেন।

কিন্তু 'শাস্তি কি শান্তি ?'র পরে কি গিরিশচন্দ্র আর কোন নাটক রচনা করেন নি ? করেছেন বইকি। তিনখানা নাটক রচনা করেছেন—শঙ্করাচার্য্য, অশোক, তপোবল। গিরিশচন্দ্র দ্বিতীয়বার কাশী থেকে কলকাতায় ফিরে আসার মাসকয়েক পরে মিনার্ভা থিয়েটারের বিধি-ব্যবস্থার অনেকখানি অদল-বদল হয়ে গেল। এতকাল মনোমোহন পাঁড়ে মিনার্ভার মালিক ছিলেন, মহেন্দ্রকুমার মিত্র ছিলেন ওয়ার্কিং-পার্টনার। এবার মহেন্দ্রকুমার মনোমোহনকে বাইশহাজার টাকা দিয়ে মিনার্ভার এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হলেন। বাকি দুই-তৃতীয়াংশের অংশীদার রইলেন স্বয়ং মনোমোহন।

কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে মনোমোহনকে এখন কিছুকাল কাশীধামে গিয়ে থাকতে হবে। তাই মনোমোহন মিনার্ভার তাঁর দুই-তৃতীয়াংশ দশবছরের জন্যে ইজারা দিয়ে দিলেন মহেন্দ্রকুমারকে। সাব্যস্ত হল, ওই দুই-তৃতীয়াংশের বাবদে মহেন্দ্রকুমার মনোমোহনকে মাসিক আঠারো শো টাকা দেবেন।

আসল কথা, মহেন্দ্রকুমারই এখন মিনার্ভার সর্বেসর্বা।

তারপর একটানে ১৯১১ সালের ১৫ই জুলাইয়ের মিনার্ভা থিয়েটারে চলে আসি। সেদিন মিনার্ভায় 'বলিদান' অভিনীত হবে। আগেই বিজ্ঞাপিত হয়েছে, সেদিন 'বলিদানে' করুণাময় সাজবেন গিরিশচন্দ্র।

সেদিন সন্ধ্যার পর থেকেই বৃষ্টি পড়ছে কলকাতায়। তখন পর্যন্ত মিনার্ভায় দর্শকের সংখ্যা নগণ্য, বোধ হয় পঞ্চাশ টাকার বেশি টিকিট বিক্রি হয় নি। বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে।

মহেন্দ্রকুমার গিরিশচন্দ্রকে বললেন—এই দুর্যোগ, সামান্য কজন লোক এসেছে, আজ আর আপনার অভিনয় করে ঠাণ্ডা লাগিয়ে স্বাস্থ্যভঙ্গ করার

দরকার নেই।

গিরিশচন্দ্র করুণাময় সাজবেন! সেই নিদারুণ বৃষ্টিপাতের রাত্রেও আস্তে-আস্তে দর্শকসংখ্যা বাড়ল, প্রায় চারশো টাকার টিকিট বিক্রি হল।

গিরিশচন্দ্র মহেন্দ্রকুমারকে বললেন—এই ভীষণ দুর্যোগে মুষলধারে বৃষ্টি উপেক্ষা করে যারা আমার অভিনয় দেখতে এসেছেন, আমি তাদের বঞ্চিত করব না। এতে যদি স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় তো তার আর উপায় কি।

সেরাত্রেও করুণাময়ের ভূমিকাভিনয়ে যথারীতি একাধিকবার খালি গায়ে রঙ্গমঞ্চে আসতে হল গিরিশচন্দ্রকে। রাত্রে ঠাণ্ডা লাগল; পরদিনই অসুস্থ হলেন গিরিশচন্দ্র। এ-জীবনে আর সুস্থ হলেন না।

তারপর একদিন এল শেষের দিন, শেষের রাত। মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেল। রাত একটা বেজে কুড়ি মিনিট, বাঙলা ১৩১৮ সনের ২৫শে মাঘ; ইংরেজী হিসেবে ১৯১২ সালের ৯ই ফেব্রুআরি; গিরিশচন্দ্র শেষ নিশ্বাস ফেললেন। ঘরের মধ্যে মৃত্যু। ঘরের বাইরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, অন্ধকার, বিন্দু-বিন্দু বৃষ্টি।

গিরিশচন্দ্র বলেছেন: সংসার বৃহৎ রঙ্গালয়, নাট্যরঙ্গালয় তারই ক্ষুদ্র অনুকৃতি।

কথাটি সুন্দর। তবুও কিম্বা সেজন্যেই সত্য। এবং এ-সত্যও অনেকেই মেনে নিয়েছেন যে গিরিশচন্দ্রই বাঙলা নাট্যশালার জনক। একজন তো স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন, বাঙলা নাট্যশালার খুড়ো-জ্যেঠা আর কেউ কোনদিন ছিল না; বাঙলা নাট্যশালার পিতৃত্বের গৌরবের অধিকারী একা গিরিশচন্দ্রই।

আর গিরিশচন্দ্র নমস্কার করেছেন দীনবন্ধুকে। দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র বলেছেন, রঙ্গালয়-স্রষ্টা। দীনবন্ধুর মৃত্যুর অনেকদিন পরে গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুর উদ্দেশে লিখেছেন: 'বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। আমি সেই রঙ্গালয় আশ্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, মহাশয় আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন। শুনিয়াছি, শ্রদ্ধা—সকল উচ্চ স্থানেই যায়। মহাশয় যে উচ্চস্থানে যেরূপ উচ্চ কার্য্যেই থাকুন, আমার শ্রদ্ধা আপনার চরণ স্পর্শ করিবে—এই আমার বিশ্বাস। যে সময়ে 'সধবার একাদশী' অভিনয় হয় সেই সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত; কারণ, পরিচ্ছদ প্রভৃতির যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্ব্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 'সধবার

একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেই জন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া 'ন্যাসানাল থিয়েটার' স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয়-স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।'

গিরিশচন্দ্র পুঙ্খানুপুঙ্খ করে দেখেছেন নানা বস্তু, নানা দৃশ্য। হয়ত গঙ্গার ধারে খানিকটা বেড়িয়ে বাড়ির দিকে একা-একা ফিরে আসছেন, চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে, মন দেখে যাচ্ছে বিশ্বসংসার।

বুড়ো ভটচায্যি মশাই খড়ম পায়ে দিয়ে ঘটি থেকে তুলসী গাছে জল দিচ্ছেন, আবার হাত-পা নেড়ে চোখ-মুখ ঘুরিয়ে কাকে বকুনি দিচ্ছেন। ধামার চাল দু-হাতে তুলে মুদী চুড়োপানা করে রাখছে, দোকানের মালপত্র একেক করে সাজিয়ে রাখছে, দাঁড়িপাল্লা ঝাড়ছে, একটার ওপর আরেকটা চাপিয়ে ঘুরিয়ে পাতার ওপর ডাণ্ডিটা কাত করে রাখছে। ফুলুরির দোকানে পাশার আড্ডা বসেছে। আড্ডায় সাতরকম কথাবার্তা, একেকটা পাশার দান পড়ে আর কারও মুখে ফুর্তির ঢেউ ওঠে, কারও মুখে বিরসের ছায়া। আসলে সব কিছুর মধ্যেই রস আছে, ছন্দ আছে, সবকিছুর থেকেই নিয়ে যাবার মত ঐশ্বর্য আছে। যা নেবার, গিরিশচন্দ্র মনের মধ্যে সঞ্চয় করে নিয়ে এসেছেন।

গিরিশচন্দ্রের বাড়ির ছাদে একদিন মাদুর পেতে বসে কয়েকজন আসর জমিয়েছেন। বাড়ির পশ্চিম দিকের ফাঁকা মাঠে একটা খচমচে গান-বাজনার হুল্লোড় উঠল। ব্যাপার সাংঘাতিক কিছু নয়, রাস্তার খোয়াপেটা একদল উড়ে ওখানে যাত্রা গান লাগিয়ে দিয়েছে। ছাদের ওপরে যারা আসর জমিয়েছিলেন, উড়েদের গান-বাজনার খচমচানিতে তারা বিরক্ত হলেন, গাল-মন্দ করতে লাগলেন।

কিন্তু গিরিশচন্দ্র হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। পশ্চিমদিকের গোল থামের ওপর গালে হাত রেখে তিনি বিভোর হয়ে উড়েদের যাত্রা দেখতে লাগলেন। ছাদে কে এল, কে গেল, কে কী বলছে—সেদিকে গিরিশচন্দ্রের চোখ নেই, কান নেই, মন নেই। তন্ময় হয়ে ঘণ্টাখানেক তিনি উড়েদের যাত্রা দেখলেন। তারপর ফিরে এসে মাদুরে বসলেন। বসলেন বটে, কিন্তু মন পড়ে আছে অন্য রাজ্যে। কী ভাবছেন, কে জানে।

গিরিশচন্দ্রের কাছে কোন বস্তু তুচ্ছ নয়, কোন দৃশ্য নগণ্য নয়। পরম

শ্রদ্ধায় সব কিছু তিনি দেখার মত করে দেখছেন। কেননা, সব কিছুর মধ্যে অনেক কিছু জানবার জিনিস আছে, শেখবার জিনিস আছে। এক সময়ে সেসব জিনিস কোন-না-কোন বিশেষ কাজে লাগে।

এখানেই গিরিশচন্দ্রের বিশেষত্ব।

গিরিশচন্দ্রের মহলার পদ্ধতি নতুন রকম। অভিনয় শেখানোর আগে প্রায়ই তিনি নিজের লেখা নতুন নাটক একদিন আদ্যন্ত পড়ে শোনাতেন।

কারা শুনতেন? থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী, অভিনেতা, অভিনেত্রী, স্টেজ ম্যানেজার, ড্রেসার, শিফটার—এককথায় থিয়েটারের সকলেই শুনতেন। গিরিশচন্দ্রের পড়বার গুণে নাটকের সব চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠত।

পড়া শেষ হলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন—কেমন লাগল?

কিন্তু পণ্ডিত-মূর্খে কোন তফাত না রেখে তিনি এরকম মতামত নেন কেন? মূর্খের কথার দাম কী? মূর্খে কি নাটক বোঝে?

গিরিশচন্দ্র বলেছেন—ছাখ, পূর্ণচন্দ্র উঠলে পণ্ডিতেরও আনন্দ হয়, মূর্খেরও আনন্দ হয়। আমি শুধু পণ্ডিতের ও শিক্ষিতের জন্যে নাটক লিখি না, সকলের জন্যে লিখি।

তা বলে জীবনে একছত্র লেখাপড়া শেখে নি, থিয়েটারের সামান্য একজন শিফটার অর্থাৎ দৃশ্যবাহক—তার মন্তব্যও গিরিশচন্দ্র উপেক্ষা করবেন না? তার মতামতেরও দাম দেবেন?

গিরিশচন্দ্র বলেছেন—ওর মতামতেরও অল্পবিস্তর দাম আছে আমি মনে করি। ওর মতই একজন দর্শক যদি এই নাটক দেখতে আসে, সে যেন মনে না করে যে তার পয়সা-খরচ ও রাতজাগা বৃথা হয়েছে।

সকলের মতামত বিশেষ বিবেচনা করে দেখতেন গিরিশচন্দ্র। তারপর দরকার হলে নাটকে অদল-বদল করতেন।

বিবেচনা করে নাটকে অদল-বদল করতেন। বিবেচনা করে অভিনয় শেখাতেন। যাকে যেমন মানায় তাকে তেমনি করে শেখাতেন। অবিনাশ-চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন:

'কোন নূতন নাটকের শিক্ষাদানের পূর্ব্বে তিনি অনেক সময়েই সমগ্র নাটকখানি সমবেত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সম্মুখে পাঠ করিতেন। এই পাঠের সময় শ্রোতারা নাটকীয় সকল চরিত্রের ছবি, রূপ ও কল্পনা —জীবন্ত ছবির মত দেখিতে পাইত। চরিত্রগত রস, চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—সমগ্র নাটকের উপর প্রত্যেক চরিত্রের প্রভাব অভিনেতৃদিগের সহজেই

বোধগম্য হইত। যেমন কোন যন্ত্রের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক অংশেরই কার্য্যকারিতা আছে, তেমনি নাটকীয় Plotএ ছোট বড় সকল চরিত্রেরই প্রয়োজনীয়তা থাকে। সমগ্র নাটক প্রণিধান না করিলে, তাহা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

তাহার পর গিরিশচন্দ্র প্রত্যেক চরিত্রের বিশেষতঃ নাটকীয় বড় বড় চরিত্রের অভিনয় কিরূপ হইবে, তাহা অনেকটা শিক্ষার্থীদিগের স্বাভাবিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই শিখাইতেন। যাঁহার কণ্ঠে যে ভাবে বলিলে সহজে দর্শকের ও অভিনেতার হৃদয়গ্রাহী হয়, অঙ্গ-ভঙ্গি বা ভাবের অভিব্যক্তি—কোন্ অভিনেতার অঙ্গভঙ্গি, মুখ ও নয়নের ভঙ্গিতে সুন্দর হয়—সুপরিস্ফুট হয়—সেই দিকে তাঁহার খরদৃষ্টি থাকিত, অর্থাৎ অভিনয়কলা বিকাশে যাঁহার যতটুকু শক্তি বা সামর্থ্য—তাহার সেই শক্তি ও সামর্থ্যের যাহাতে অনুশীলনের দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিতেন। কাহারও মৌলিকতা (originality) নষ্ট করিয়া কেবল মাত্র অনুকরণ-পটু করিতে তিনি চাহিতেন না। উদাহরণ দিয়া বলি,—'জগৎসিংহ' শিখাইতেছেন কি 'আয়েষা' শিখাইতেছেন—তিনি আগে এই চরিত্রদ্বয়ের যত প্রকার interpretation হইতে পারে, দৃশ্যের পর দৃশ্যে অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে নিজে সেই ভাবে অভিনয় করিয়া দেখাইয়া দিতেন। পরে তাঁহাদের বলিতেন, "এই বিভিন্নভাবের অভিব্যক্তির মধ্যে কোনটা কাহার ভাল লাগিল?" যেরূপ উত্তর পাইতেন, শিক্ষাকার্য্য সেইরূপ ভাবেই চলিত। ...

শিক্ষাদান কালে যেমন, তেমনি আবার নাটক লিখিবার সময়েও গিরিশচন্দ্র নিজ দলের প্রধান প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের আবৃত্তি ও অভিনয় করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নাটকের ভাব ও ভাষা রচনা করিতেন। এই জন্যই অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা তাঁহার নূতন নাটকে কোন ভূমিকা পাওয়া সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিতেন। অল্প আয়াসে অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শনের এরূপ সুযোগ ও সুশিক্ষা তাঁহারা আর কোথাও পাইতেন না।'

অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শনের সুযোগ পেয়ে একবার এক ভট্টাচার্যের সন্তান—গোপীমোহন ভট্টাচার্যের ছেলে—কী কাণ্ড করেছিল।

গোপীমোহনের ছেলে রসিকমোহনের খুব ইচ্ছা যে সে থিয়েটারে গিয়ে অভিনয় করে। তার ধারণা, থিয়েটারে সুযোগ পেলে সে রাতারাতি অভিনেতা হিসেবে বিখ্যাত হয়ে যাবে।

কিন্তু সুযোগ কোথায়? সুযোগ হবে, হবে। আরে, স্বয়ং গিরিশচন্দ্র যখন এই পাড়ার বাসিন্দা, তখন আর সুযোগের জন্যে ভাবনা কিসের।

গোপীমোহনের ইচ্ছা নয় যে তার ছেলে থিয়েটারে গিয়ে অভিনয় করে। ভদ্রলোক নিজে ব্রাহ্মণসন্তান, কথকতা করেন। তার ইচ্ছা, ছেলেও বামুনের কাজ করুক। ওসব থিয়েটারের বাতিক কেন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও গোপীমোহনকে একদিন গিরিশচন্দ্রের কাছে যেতে হল। সব শুনে গিরিশচন্দ্র বললেন—আপনার ছেলে লেখাপড়া শিখেছে, আপনি গিয়ে ওকে বামুনের কাজে লাগিয়ে দিন। থিয়েটারে গিয়ে যদি আপনার ছেলে বিগড়োয় তো একুল-ওকুল দুকুলই যাবে।

সেদিন তো গোপীমোহন ফিরে এলেন। কিন্তু কয়েকদিন পরে আবার তাকে যেতে হল গিরিশচন্দ্রের কাছে। রসিকমোহনকে আর থিয়েটারে না ঢোকালেই নয়।

তাই হল। কিছুদিন বাদে একটি দূতের ভূমিকা নিয়ে প্রথম রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে নামল রসিকমোহন। সেই প্রথম এবং সেই শেষ। শুনুন। শেষপর্যন্ত শুনুন।

রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে লোকজন আলো-টালো দেখে রসিকমোহনের অবস্থা কাহিল। চোখে অন্ধকার দেখল রসিকমোহন, তার হৃদ্‌পিণ্ডের ধকধকানি বেড়ে গেল, দু-পা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। রসিকমোহন প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে আর কি।

দূতের অবস্থা দেখে দর্শকেরা তো নাট্যশালার দরজা-দেয়াল কাঁপিয়ে হেসে আকুল। সেই প্রচণ্ড হাসির শব্দেই কি না কে জানে, পলকের জন্যে রসিকমোহন সম্বিৎ ফিরে পেল। কে আর তিলার্ধ সময় নষ্ট করে। সেই মুহূর্তে দূতবেশী রসিকমোহন রঙ্গমঞ্চ থেকে নেমে নাট্যশালার দরজা পার হয়ে সটান একেবারে রাজপথে—তারপর লম্বা দৌড়।

একজন থিয়েটারের লোক রসিকমোহনের পিছনে ছুটল—ও মশায়, পোশাক নিয়ে কোথায় যান, পোশাক পরে কোথায় যান, আরে ও মশায়।

কিন্তু কে কার কথা শোনে মশায়। এক দৌড়ে রসিকমোহন একেবারে বিডন স্ট্রীট থেকে বাগবাজারে, থিয়েটার থেকে বাড়িতে। বাড়িতে পৌঁছেই রসিকমোহন দড়াম করে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

পরদিন ভোরবেলা গোপীমোহন এসে দূতের পোশাক ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন গিরিশচন্দ্রকে। বলে গেলেন—পোশাকটা থিয়েটারে পাঠিয়ে দেবেন। রসিকমোহনের থিয়েটারের শখ মিটে গেছে। ও আর স্টেজে উঠবে না।

—ঃঃ০ঃঃ—

ছয়

মদ খেয়ে স্টেজে উঠে একদিন কী যেন বেচাল করেছেন গিরিশচন্দ্র। দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাই নিয়ে ছাপার অক্ষরে গিরিশচন্দ্রের বিস্তর নিন্দামন্দ করলেন।

গিরিশচন্দ্রের চোখে পড়েছে সেসব। গিরিশচন্দ্র তারপর একদিন সুরেশ-চন্দ্রকে বললেন—সুরেশবাবু, আমি অন্যায় করেছি নিশ্চয়। কিন্তু যে গিরিশ ঘোষ বাগবাজারের বিখ্যাত ঘোষবংশের বংশধর হয়ে নটী নিয়ে থিয়েটার করে, তাকে লজ্জা দিতে পার তোমার অভিধানে কি তেমন ভাষা আছে?

আরেকটা ঘটনা। 'চৈতন্যলীলা' দেখে মুগ্ধ হয়ে একদল বৈষ্ণববাবাজী গিরিশচন্দ্রকে বাড়িতে গিয়ে পর্যন্ত ঘিরে থাকতেন। তাদের প্রশংসাবাক্যে কান ঝালাপালা হয়, গিরিশচন্দ্রের কাজকর্ম কিছু হয় না। কেউ বলছেন, আপনি মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র। কেউ বলছেন, আপনার মধ্যে নিত্যানন্দের শক্তি আবির্ভূত হয়েছে।

মহা জ্বালাতন! বৈষ্ণব বাবাজীদের না তাড়াতে পারলে আর চলছে না।

তাই একদিন বৈষ্ণব বাবাজীদের সামনেই গিরিশচন্দ্র বোতল খুলে গেলাসে মদ ঢাললেন। একজন বাবাজী জিজ্ঞেস করলেন—কি খাচ্ছেন? ও কি মহাপ্রভুর চরণামৃত?

গিরিশচন্দ্র বললেন—না, মদ। আপনি খাবেন?

বৈষ্ণব বাবাজীর দল সেই যে উধাও হলেন, আর কখনও এমুখো হলেন না।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছেন: বিলাতে জন্মালে গিরিশবাবু নিশ্চয়ই 'স্যর' উপাধি পেতেন। আমি স্যর হেনরি আর্ভিংয়ের অভিনয় দেখেছি। তিনি গিরিশবাবুর চেয়ে ভাল অভিনয় করতেন না।

গিরিশচন্দ্র কোন রাজখেতাব পান নি। স্ক্রাইন সাহেব অবশ্যি একবার লাট দরবারে প্রস্তাব করেছিলেন, গিরিশচন্দ্রকে 'সি, আই, ই' উপাধি দেওয়া

হোক। কিন্তু সে-প্রস্তাব বাতিল হয়েছে। আপত্তির কারণ, গিরিশচন্দ্র বেশ্যা নিয়ে থিয়েটার চালান!

ক্রাইন সাহেব তখন দুঃখ করে বলেছিলেন—How little the world knows of its greatest men!

গিরিশচন্দ্র আত্মজীবনী লেখেন নি। বলেছেন—সে বড় সহজ কথা নয়। বেদব্যাস তাঁর জন্মবৃত্তান্ত যেমন অকপটে বলেছেন, যখন আত্মদোষ ব্যক্ত করবার সেরকম সাহস হবে, তখন আত্মজীবনী লিখবার কথা উত্থাপন করা যেতে পারে। নয়ত আত্মজীবনী লিখতে বসে নিজেকে নিজের উকিল হতে হয়, কেবল দোষক্ষালনের চেষ্টা, কেবল অহমিকার কথা।

কিন্তু গিরিশচন্দ্র কথা-প্রসঙ্গে আপন কথা বলেছেন কখনও-কখনও। অকপটে বলেছেন। কিছুই রাখেন নি, কিছুই ঢাকেন নি। কোন আত্মদোষ অব্যক্ত রাখেন নি। অহমিকার কথা বলেন নি, দোষক্ষালনের চেষ্টা করেন নি, নিজের পক্ষে কণামাত্র ওকালতি করেন নি। কত রকম নেশা করেছেন, সে-খবরটুকুও সৎসাহসীর মত খোলাখুলি বলেছেন।

নিজের মুখেই গিরিশচন্দ্র স্বীকার করেছেন: তামাক ঢের খেয়েছি। ওর ঝাড়ে বংশে খেয়েছি। শুধু কি তামাক—মদ, গাঁজা, আফিং, চরস, ভাং—কোনটা বাকি আছে। ··· সব নেশা করে দেখেছি। বোতল-বোতল মদ খেয়েছি। একদিন বাইশ বোতল বিয়ার খেয়েছি।

গাঁজাটা কী রকম? গাঁজাতে দেখেছি ভয়ানক will power বাড়ে।

আফিং? আফিঙের মত ছোটলোক নেশা নেই।

আর মদ? সব নেশার রাজা এই মদ।

সব নেশা যেমন করেছেন, তেমনি আবার সব নেশা ছেড়েছেন। কিন্তু লোকে যে বলে নেশা ছেড়ে দিলে নেশাখোরের শরীরে অসুখ-বিসুখ করে?

গিরিশচন্দ্র নস্যাৎ করে দিয়েছেন সেকথা। বলেছেন—রাম! ওসব নেশাখোরের কথা। মন দিয়েই সব। মানুষ এই মনে বদ্ধ, আবার এই মনেই মুক্ত হচ্ছে। নেশাও তাই। —লোকে বলে মাতাল মদ ছাড়লে, গেঁজেল গাঁজা ছাড়লে, ভাংখোর ভাং ছাড়লে, আফিংখোর আফিং ছাড়লে হঠাৎ অসুখ করে। ওসব বাজে কথা—মিছে কথা।

বাজে কথা বলবার মানুষ নন গিরিশচন্দ্র। অবাধে তিনি বলেছেন—জীবনে অনেক অকাজ-কুকাজ করেছি, কোন পাপ করতে আমার বাকী

নেই—সব রকম হয়েছে। কিন্তু তাই আমার গৌরবের বিষয় হয়েছে।

কেন, গৌরবের বিষয় কেন? না, এই ধুলোকাদা মেখেই তিনি পরমহংসদেবের সামনে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর অপার কৃপা পেয়েছেন।

গিরিশচন্দ্র বলেছেন—এই ধুলোকাদা মেখেই আমি ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়েছি—তাঁর নিষ্পাপ পুণ্যবান সন্তানেরা আছে—তাঁদের তিনি পথ দেখিয়ে চলুন। কিন্তু আমার এই ধুলোকাদা মহাপাপ ব্যভিচার জাল-জুয়াচুরি—সব নিয়ে—কলঙ্ক মেখে তাঁর সামনে এই গৌরব করে দাঁড়িয়েছি; 'প্রভু, আমার নিজের কোন গৌরব নেই—গর্ব নেই—গৌরব ও গর্ব আছে যে, পাপ করতে আমি কিছু বাকি রাখি নি। এখন তুমি কোলে তুলে ধুলোকাদা পুছে নাও তো নাও—নইলে আমার আর কিছু উপায় নেই।'

পরম মুহূর্তের আগে গিরিশচন্দ্র কি স্বপ্নেও কখনও ভেবেছিলেন যে তাঁর জীবনে পরমহংসদেব আসবেন? আগে যদি সেকথা জানতেন, তাহলে? গিরিশচন্দ্র বলেছেন—আগে যদি সেকথা জানতাম তাহলে আরও বেশি করে পাপ করে নিতাম।

আগে যদি জানতাম! কিন্তু আগে কি কেউ কিছু জানতে পারে। আগে কি কেউ জানে কোথায় কার মুক্তি, কোথায় কার বন্ধন, কোথায় কার চিরস্থায়ী আশ্রয়। কেউ কি জানতে পারে ভবিষ্যতের কোন সুদূর-কালের প্রান্তে কার জন্যে একটি সর্বজয়ী মুহূর্ত অপেক্ষা করে আছে।

যা থাকবার তা তো আছে, কিন্তু ঈশ্বর কি আছেন? এককালে গিরিশচন্দ্র উদ্‌ভ্রান্তের মত সপ্রশ্ন হয়েছেন—ঈশ্বর কি আছেন?

কোন সদুত্তর মেলে নি।

নানা মতের নানা পথ। খ্রীষ্টানেরা এক পথে, ব্রাহ্মেরা আরেক পথে। আবার ছাখ, হিন্দুধর্মের মধ্যেও কত দলাদলি, কত শাখা-পল্লব। বৈষ্ণব এক রাস্তায় হাঁটেন তো শাক্ত আরেক রাস্তায়। অনাচারী ব্রাহ্মণ সত্য-নারায়ণের পুঁথি নিয়ে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াতে যান, মাটির দেয়ালে পায়খানার ঘটি থেকে জল ঢেলে গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা কাটেন। এদিকে জড়বাদীরা বলছেন, ঈশ্বর নেই।

না, জড়বাদীর উক্তিই সারসত্য। ঈশ্বর নেই।

এককালে গিরিশচন্দ্র অনাচারী ব্রাহ্মণকে নাগালে পেলেই অপমান করেছেন। একবার একখানা আস্ত-সুস্থ দুর্গাপ্রতিমা খণ্ড-খণ্ড করে কেটে

ফেলেছেন। যা অসত্য, যা অস্তিত্বহীন, তার প্রতিমূর্তিটুকুও খণ্ড হোক, চূর্ণ হোক, লুপ্ত হোক।

গিরিশচন্দ্র নাস্তিক। না, ঈশ্বর নেই।

একবার গিরিশচন্দ্র ভাগলপুরে গিয়েছেন। একদিন ভাগলপুরের কাছাকাছি একটা পাহাড়ে বেড়াতে গেছেন। না, একা নন, কয়েকজন সঙ্গী আছে। যৌবন বয়সের খেয়াল, গিরিশচন্দ্র একলা একটা গুহার মধ্যে নেমে পড়লেন। কিন্তু বিপদ হল বেরবার সময়। বেরনোর রাস্তা কই? কিছুতেই গুহা থেকে বেরিয়ে আসবার রাস্তাটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। লোকালয় থেকে দূরে এই গুহার মধ্যেই বুঝি গিরিশচন্দ্রের জীবনান্ত হয়।

উপর থেকে সঙ্গীরা গিরিশচন্দ্রকেই দায়ী করল। —তুমি নাস্তিক। তোমার সঙ্গে এসেই এই বিপদ হল।

গিরিশচন্দ্র অপ্রতিভ হলেন। বললেন—আমাকে এখন কী করতে হবে বল।

সঙ্গীরা বলল—আর কী করতে হবে। এস, আমরা সমস্বরে মনেপ্রাণে ঈশ্বরকে ডাকি। তোমাকেও ডাকতে হবে।

গিরিশচন্দ্র অগত্যা রাজী হলেন। এবং আশ্চর্য ফল পাওয়া গেল অবিলম্বে। হঠাৎ একটা পথ দেখতে পাওয়া গেল। গুহার গর্ভ থেকে সেই পথে মহানন্দে বেরিয়ে এলেন গিরিশচন্দ্র।

কিন্তু সেদিন থেকেই কি গিরিশচন্দ্র ঈশ্বরবিশ্বাসী হলেন? না। বরং ঠিক করলেন—আর কখনও ভয়ে ঈশ্বরকে ডাকব না, প্রাণ গেলেও না। যদি কোনদিন প্রেমে ঈশ্বরকে ডাকতে পারি তো ডাকব।

ঈশ্বর কি সত্যি-সত্যি আছেন? কখনও বিশ্বাস আসে, কখনও সন্দেহ। হৃদয়ে ঘোর দ্বন্দ্ব।

চূড়ান্ত বিপদে পড়লে অনেকে দেখি বাবা তারকনাথকে ডাকে। ফল হয় কিছু? বিপদে পড়ে গিরিশচন্দ্র একবার পরীক্ষা করবার জন্যে বাবা তারকনাথের শরণাপন্ন হবার চেষ্টা করলেন। সেই চেষ্টাতেই সুফল হল, সকল বিঘ্ন-বিপদ পলকে কেটে গেল। গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাস হল, ঈশ্বর সত্য।

বিঘ্ন-বিপদ কেটে যাবার পর যখন খানিক নিশ্চিন্ত হলেন, মনের মধ্যে আবার সেই দ্বন্দ্ব! ঈশ্বর কি সত্যিই আছেন? সন্দেহের বিষম তাড়না। ভাবনা-চিন্তায় একেক সময় নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। না, প্রমাণ

চাই। ঈশ্বরের অস্তিত্বের সুনিশ্চিত প্রমাণ চাই।

এ বিষয়ে যাদের সঙ্গে কথা হল, সকলেই একবাক্যে বললেন—গুরু ছাড়া কিছু হয় না।

কাকে গুরু করা যায়! গুরু ঈশ্বরতুল্য, কাকে গিরিশচন্দ্র ঈশ্বর জ্ঞান করবেন। সামান্য মানুষকে গুরু মেনে গিরিশচন্দ্র তাঁকে 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু' বলে প্রণাম করতে পারবেন না।

কিন্তু গুরু না হলে কিছুই হবার নয়। গুরুকৃপা ছাড়া উদ্ধার অসম্ভব। গুরু কোথায়? গিরিশচন্দ্র গুরুলাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

বাবা তারকনাথের কাছে গিরিশচন্দ্র প্রার্থনা করলেন—বাবা, গুরুর যদি নিতান্ত দরকার হয় তো তুমি আমার গুরু হও।

কিন্তু বাবা তারকনাথ দেখা দিলেন না।

কোথায় গুরু? গুরুলাভের জন্যে গিরিশচন্দ্র নিত্য-নিয়মিত গঙ্গাস্নান করেন, হবিষ্যান্ন খান। শিবরাত্রির উপোসে পায়ে হেঁটে তারকেশ্বরে গিয়ে পূজো দিয়ে আসেন। শুধু তাই নয়, প্রায় প্রত্যেক শনি-মঙ্গলবারে কালীঘাটে যান। হাড়িকাঠের কাছে বসে সমস্ত রাত্রি কাতর হয়ে প্রার্থনা জানান—মা, আমাকে কৃপা কর। গুরুলাভ করিয়ে আমাকে দেখা দাও, অথবা অমনিই আমাকে দেখা দাও।

বসুপাড়া-লেনে এটর্নি দীননাথ বসুর বাড়িতে গিরিশচন্দ্র প্রথমবার দেখলেন পরমহংসদেবকে। দ্বিতীয়বার দেখেছেন রামকান্ত বসু স্ট্রীটে বলরাম বসুর বাড়িতে।

কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মনে শান্তি নেই। গুরু কোথায়? কবে গুরু মিলবে?

গিরিশচন্দ্র 'চৈতন্যলীলা' লিখলেন। 'চৈতন্যলীলা' অভিনীত হল। খোল, করতাল, কীর্তনে মুখরিত হয়ে উঠল রঙ্গালয়। নতুন তরঙ্গধ্বনি শোনা গেল থিয়েটারে। সাড়া পড়ে গেল সর্বত্র। প্রশংসায় সর্বজন পঞ্চমুখ।

কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অন্তরে ব্যাকুলতার অন্ত নেই। সব তো হল, কিন্তু গুরু?

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ সাল। রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ একখানা গাড়ি এসে থিয়েটারের দরজায় দাঁড়াল। এই গাড়িতে পরমহংসদেব এসেছেন। সঙ্গে কয়েকজন ভক্ত।

একজন ভক্ত—মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে

গিরিশচন্দ্রের কাছে গিয়ে বললেন—পরমহংসদেব এসেছেন 'চৈতন্যলীলা' দেখতে, আমরা কয়েকজন ভক্তও সঙ্গে আছি।

তাতে যেন তেমন কিছু যায়-আসে না, এমনিভাবে গিরিশচন্দ্র বললেন—পরমহংসদেবের টিকিট লাগবে না, কিন্তু আর-সকলের টিকিট লাগবে।

বলেই গিরিশচন্দ্র, কে জানে কেন, তক্ষুনি গাড়ির দিকে এগোলেন পরমহংসদেবকে অভ্যর্থনা করতে। পরমহংসদেব ততক্ষণে নেমে পড়েছেন গাড়ি থেকে। গিরিশচন্দ্র পরমহংসদেবকে নমস্কার করবার আগেই পরমহংসদেব নমস্কার করলেন গিরিশচন্দ্রকে। গিরিশচন্দ্র প্রতি-নমস্কার করলেন পরমহংস দেবকে। পরমহংসদেব আবার নমস্কার করলেন গিরিশচন্দ্রকে। গিরিশচন্দ্র আবার প্রতিনমস্কার করলেন। আরও একবার হল নমস্কার-প্রতিনমস্কার। আবার নমস্কার!

এই নমস্কারের পালাই চলবে নাকি অনন্তকাল! গিরিশচন্দ্র মনে-মনে প্রতিনমস্কার করে অগত্যা পালা সাঙ্গ করলেন। পরমহংসদেবকে উপরে বক্সে নিয়ে বসালেন। একজন পাখাঅলারও ব্যবস্থা করে দিলেন পরমহংসদেবের জন্যে। সেদিন আর কোন কথাবার্তা হল না। গিরিশচন্দ্রের শরীর সুস্থ নয়; বাড়ি চলে গেলেন তক্ষুনি।

'চৈতন্যলীলা' দেখে পরমহংদেব মুগ্ধ হলেন। হাসতে-হাসতে বললেন—আসল-নকল এক দেখলাম।

গিরিশচন্দ্র নিজের পাড়ার চৌরাস্তার একটি রকে বসে আছেন। পরমহংসদেব চৌরাস্তার পুবদিক থেকে আসছেন, আস্তে-আস্তে আসছেন, সঙ্গে কয়েকজন ভক্ত। উনি এদিকে কোথায় যাচ্ছেন? যাচ্ছেন রামকান্ত বসু স্ট্রীটে, বলরাম বসুর বাড়িতে।

গিরিশচন্দ্র দেখলেন পরমহংসদেবকে। পরমহংসদেব যেতে-যেতে নমস্কার করলেন গিরিশচন্দ্রকে। প্রতিনমস্কার হল, কোনও কথা হল না। পরমহংসদেব চলে গেলেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের মনে হল, কে যেন তাঁকে আকর্ষণ করছে পরমহংসদেবের দিকে। এই নিবিড় আকর্ষণ গিরিশচন্দ্রের প্রাণসত্তার কেন্দ্রমূলে গিয়ে বাসা বেঁধেছে। কার সাধ্য তাকে উপেক্ষা করে, প্রত্যাখ্যান করে, কার সাধ্য সেই নিঃশব্দ গভীর আহ্বানের সামনে বধির হয়ে থাকে।

কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় না ডাকলে গিরিশচন্দ্র কেমন করে গিয়ে পরমহংসদেবের সঙ্গ নেন।

মুখের ডাকের জন্যে ভাবনা? ডাক এসে গেল তন্মুহূর্তে। কে একজন ভক্ত গিরিশচন্দ্রকে এসে বললেন—ঠাকুর আপনাকে ডাকছেন।

ডাক যখন এসে গেছে তখন আর ভাবনা করা চলবে না। আচ্ছন্নের মত উঠে পড়লেন গিরিশচন্দ্র, পরমহংসদেবের সঙ্গ নিলেন, পরমহংসদেবের সঙ্গে-সঙ্গে বলরাম বসুর বাড়িতে এলেন।

সেদিনই, সেই বলরাম বসুর বাড়িতেই, পরমহংসদেবকে জিজ্ঞেস করলেন গিরিশচন্দ্র—গুরু কী?

পরমহংসদেব যা বললেন তার অর্থ এই যে গুরু হচ্ছেন ঘটকের মত। জুটিয়ে দেন, মিলিয়ে দেন।

কী রকম?

এককথায় পরমহংসদেব গিরিশচন্দ্রের সকল ব্যাকুল জিজ্ঞাসার একটি শান্ত উত্তর মিলিয়ে দিলেন, সহাস্যে বললেন—তোমার গুরু হয়ে গেছে।

আরও অনেক কথা বললেন পরমহংসদেব। এমন কি, থিয়েটারের কথাও পাড়লেন। বললেন—আরেকদিন আমায় থিয়েটার দেখিয়ো।

গিরিশচন্দ্র বললেন—যে আজ্ঞে, আপনার যেদিন ইচ্ছে হয় দেখবেন।

পরমহংসদেব বললেন—দেখব তো, কিন্তু কিছু নিতে হবে।

গিরিশচন্দ্র আপত্তি করলেন না। বললেন—বেশ তো, আপনি আট আনা দেবেন।

—মাত্র আট আনা? না হে, সে বড়ো র‍্যাজলা জায়গা।

গিরিশচন্দ্র বললেন—তা কেন, আপনি সেদিন যেখানে বসেছিলেন, সেখানেই বসবেন।

—বসব তো, তবে একটি টাকা নিও।

পরমহংসদেব গিরিশচন্দ্রকে আট আনা দেবেন না, ষোল আনা দেবেন। খণ্ড দেবেন না, অখণ্ড দেবেন।

সেদিন ফিরতি-পথে গিরিশচন্দ্রের মনে খুব আনন্দ। গিরিশচন্দ্র ভাবলেন: মূর্খে বলে, গুরু করতে হয়। এই তো পরমহংসদেব বললেন, আমার গুরু হয়ে গিয়েছে, তবে আর কার কথা শুনি?

আরেকদিন থিয়েটারে এলেন পরমহংসদেব। সেদিন গিরিশচন্দ্র একটি

ফুটন্ত গোলাপফুল তুলে দিলেন পরমহংসদেবের হাতে। গোলাপফুলটি পরমহংসদেব হাতে নিয়েই ফিরিয়ে দিলেন। বললেন—ফুলের অধিকার দেবতার আর বাবুদের, আমি কি করব।

দিনকয়েক পরে পরমহংসদেব এলেন সিমলায় মধু রায়ের গলিতে রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে। একটা চিরকুটে সে-খবর পেলেন গিরিশচন্দ্র। স্বয়ং পরমহংসদেবই সেদিন গিরিশচন্দ্রকে সে-খবর দেবার ব্যবস্থা করেছেন। গিরিশচন্দ্র গিয়েছেন দেব-দর্শনে। পরমহংসদেবের কথায় কত কৃপা, কত করুণা, কত মমতা।

গিরিশচন্দ্র মনে মনে ভাবলেনঃ আমার সম্পূর্ণ পরিচয় ইনি কি পান নাই? বোধ হয়। নচেৎ এরূপ আপনার ভাবিয়া কথাবার্ত্তা কেন কন! কথায় মনে হয় পরম আত্মীয়, ইনি কে? আমার মনে সাহস জন্মিয়াছে যে, ইনি কাহাকেও ঘৃণা করিতে জানেন না। আমি ইঁহাকে আত্মপরিচয় দিলে, ইনি আমাকে ঘৃণা করিবেন না বরং আত্মপরিচয় দিলে আমার পরম মঙ্গল হইবে। আমি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ইঁহার চরণে আশ্রয় লইব, ইনি শান্তিদাতা নিশ্চয়ই।

আর দেরি করা কোন কাজের কথা নয়, গিরিশচন্দ্র একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে সশরীরে উপস্থিত হলেন। পরমহংসদেব তখন দক্ষিণদিকের বারান্দায় একখানা কম্বলে বসে ভবনাথ নামে একটি বালক ভক্তের সঙ্গে কথাবার্তা কইছেন।

গিরিশচন্দ্র গিয়ে প্রণাম করলেন পরমহংসদেবকে। গিরিশচন্দ্রকে বসতে বললেন পরমহংসদেব। বললেন—আমি তোমার কথাই বলছিলাম, মাইরি, একে জিজ্ঞেস কর।

তারপর উপদেশের কথা বলতে আরম্ভ করলেন পরমহংসদেব। কিন্তু গিরিশচন্দ্র উপদেশ শুনতে চাইলেন না, বললেন—আমি উপদেশ শুনব না, উপদেশ আমি অনেক লিখেছি, ওতে কিছু হয় না। যদি আপনি আমার কিছু করে দিতে পারেন, করুন।

রামলাল সেখানে আছেন। পরমহংসদেব তাঁকে বললেন—কি রে, কী শ্লোকটা বল তো?

রামলাল একটি শ্লোক আউড়ে গেলেন। শ্লোকটির ভাবার্থঃ পর্বত-গহ্বরে নির্জনে বসলেও কিছু হয় না, বিশ্বাসই আসল।

নিজেকে নিষ্কলুষ মনে হল গিরিশচন্দ্রের। মনে হল, আশ্রয় পাওয়া গেল, কোথাও আর ভয়ের চিহ্নমাত্র রইল না। মনে এল, আমার মত দাম্ভিকের মাথা কার চরণধূলার তলে নত হল!

ব্যাকুল হয়ে গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কে?

পরমহংসদেব বললেন—আমায় কেউ-কেউ বলে, আমি রামপ্রসাদ, কেউ বলে, রাজা রামকৃষ্ণ,—আমি এইখানেই থাকি।

প্রণাম করে গিরিশচন্দ্র বিদায় নিলেন, পরমহংসদেব উত্তরের বারান্দা অবধি এলেন গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে। গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—আমি আপনাকে দর্শন করেছি, আবার কি আমায় যা করতে হয়, তা করতে হবে?

পরমহংসদেব বললেন—তা করো না!

ভক্তদের সঙ্গে একদিন থিয়েটারে 'প্রহ্লাদ চরিত্র' দেখতে এলেন পরমহংসদেব। দেখে মহাখুশী। সহাস্যে গিরিশচন্দ্রকে বললেন—বাঃ, তুমি বেশ সব লিখেছো!

কিন্তু শুধু লিখে গেলে কী হবে যদি ধারণা না থাকে। সেই কথাই বললেন গিরিশচন্দ্র—শুধু লিখে গেছি। ধারণা কই?

পরমহংসদেব বললেন—না, তোমার ধারণা আছে। সেদিন তো তোমায় বললাম, ভক্তি ভিতরে না থাকলে চালচিত্র আঁকা যায় না।

গিরিশচন্দ্র বললেন—মনে হয় থিয়েটারগুলো আর করা কেন?

পরমহংসদেব বললেন—না না, ও থাক, ওতে লোকশিক্ষা হবে।

গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—কী রকম দেখলেন?

পরমহংসদেব বললেন—দেখলাম সাক্ষাৎ তিনিই সব হয়েছেন। যারা সেজেছে, তাদের দেখলাম, সাক্ষাৎ আনন্দময়ী মা। যারা গোলোকে রাখাল সেজেছে, তাদের দেখলাম সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনিই সব হয়েছেন।

গিরিশচন্দ্র বললেন—আর কর্মই বা কেন?

পরমহংসদেব বললেন—না গো, কর্ম ভাল। জমি পাট করা হলে যা রুইবে তাই জন্মাবে। তবে কর্ম নিষ্কামভাবে করতে হয়। তুমি পরের জন্য করবে।

গিরিশচন্দ্র বললেন—আপনি তবে আশীর্বাদ করুন।

পরমহংসদেব বললেন—তুমি মার নামে বিশ্বাস কর, হয়ে যাবে।

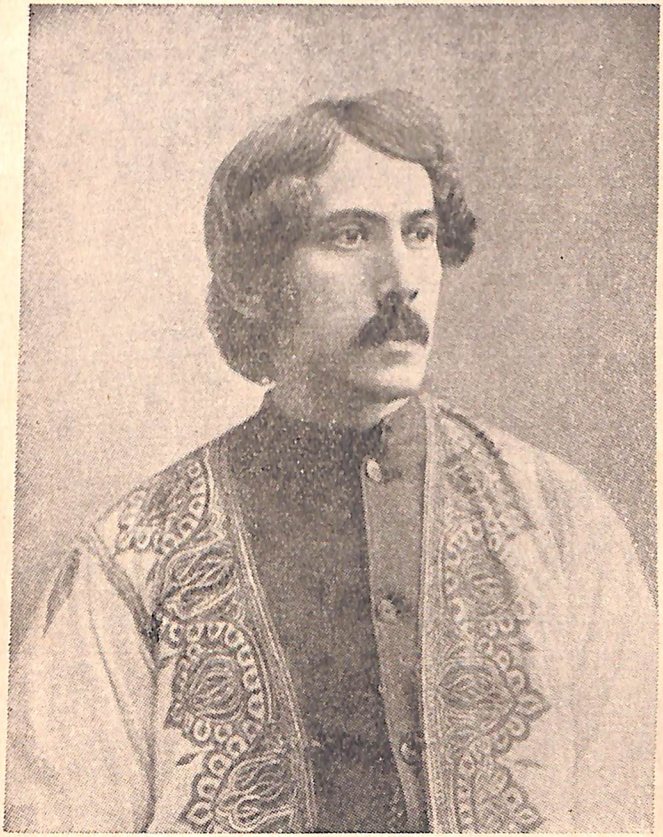

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছেন : এ-কালে, সর্ব্বদেশের রঙ্গালয়েই দৃশ্য প্রদর্শনের আড়ম্বর বাড়িতেছে এবং প্রকৃত অভিনয়ের ক্রমশই অবনতি হইতেছে। প্রাচীন ভারতের রঙ্গালয়ে দৃশ্য আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু অভিনয়-বিদ্যা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

মাইকেল মধুসূদনের প্রথম বাঙলা বই 'শর্ম্মিষ্ঠা নাটক' ১৮৫৯ সালের জানুয়ারিতে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের প্রস্তাবনায় মাইকেল লিখেছেন :

অলীক কুনাট্য রঙ্গে,
মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

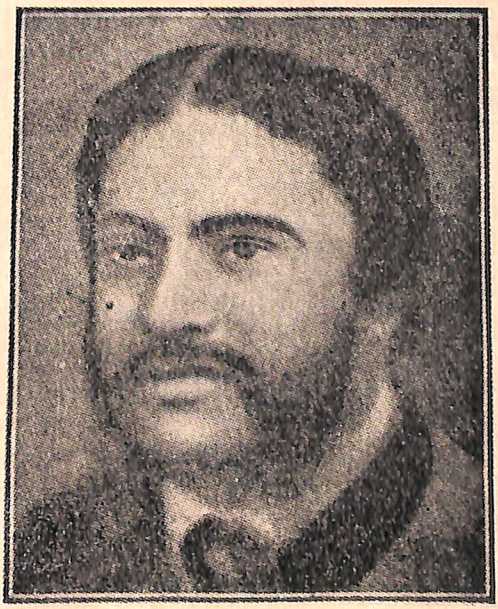

মাইকেল মধুসূদন



তারাসুন্দরী



বিনোদিনী



মহেন্দ্রলাল বসু



অমৃতলাল মিত্র

—আমি যে পাপী!

—সবসময় যে পাপ-পাপ করে, সে শালাই পাপী হয়ে যায়।

গিরিশচন্দ্র বললেন—আমি যেখানে বসতাম, সে-মাটি অশুদ্ধ!

পরমহংসদেব বললেন—সে কি! হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সে কি একটু-একটু করে আলো হয়? না, একেবারে দপ করে আলো হয়?

—আপনি আশীর্বাদ করলেন।

—তোমার যদি আন্তরিক হয়, আমি কী বলব! আমি খাইদাই তাঁর নাম করি।

অতঃপর গিরিশচন্দ্র প্রায়ই চলে আসতেন দক্ষিণেশ্বরে, পরমহংসদেবের চরণতলে। আসতেন অমৃত তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে। একদিন পরমহংসদেবকে জিজ্ঞেস করলেন—এখন থেকে আমি কী করব?

পরমহংসদেব বললেন—যা করছ, তাই করে যাও। এখানে বিশ্বাস রাখলেই সব হবে। তবে সকালে-বিকালে তাঁর স্মরণ-মননটা রেখ।

গিরিশচন্দ্র ভাবলেন: আমার যে-কাজ, তাতে স্নানাহারেরই কোন ধরাবাঁধা নিয়মকানুন থাকে না, সকাল-বিকাল স্মরণ-মনন করতে নির্ঘাত ভুল হয়ে যাবে। গুরুবাক্য লঙ্ঘন হবে। সর্বনাশ হবে।

তা এসব কথা মুখ ফুটে বলবার নয়। গিরিশচন্দ্র চুপ করে রইলেন।

মনের কথা বুঝি শুনতে পেলেন পরমহংসদেব। বললেন—আচ্ছা তা যদি না পার তবে খাওয়া-শোওয়ার আগে তাঁকে একবার স্মরণ করে নিও।

গিরিশচন্দ্র তবুও মুখে কিছু বললেন না; মনে-মনে বললেন—তাতেই বা কেমন করে 'হ্যাঁ' বলি। বলে কখন খাই, কখন শুই তারই কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। শেষকালে কি 'হ্যাঁ' বলে গুরুর কাছে মিথ্যাবাদী হব?

অন্তর্যামী আর্তের অন্তরের বেদনার্দ্র বার্তাটুকু শুনতে পেলেন। হাসতে-হাসতে বললেন—তুই বলবি, তাও যদি না পারি?

যে-পথ আর কাউকে দেখান নি, পরমহংসদেব গিরিশচন্দ্রকে সেই পথ দেখালেন। যে-কথা আর কাউকে বলেন নি, পরমহংসদেব গিরিশচন্দ্রকে সেই কথা বললেন—আচ্ছা, তাও যদি না পারিস, তবে আমায় বকলমা দে।

সেদিন গিরিশচন্দ্রের মনে মহানন্দ। অপার করুণা বটে পরমহংসদেবের। গিরিশচন্দ্র ভাবলেন: সংসারে যে যা বলে বলুক, যতই ঘৃণা করুক, ইনি

তো সকল সময়ে সকল অবস্থায় আমার—তবে আর কি? কাকে ডরাই?

একদিন গিরিশচন্দ্র পরমহংসদেবের কাছে বসে আছেন। আরও কয়েকজন ভক্ত আছেন সেখানে। পাঁচরকম ঈশ্বরীয় কথাবার্তা হচ্ছে। কিন্তু গিরিশ-চন্দ্রের সময় হয়ে এল, থিয়েটারে যেতে হবে। গিরিশচন্দ্র বললেন—আপনাকে ছেড়ে আবার যেতে হবে।

পরমহংসদেব বললেন—না, ইদিক-উদিক দুদিক রাখতে হবে। জনকরাজা ইদিক-উদিক দুদিক রেখে, খেয়েছিল দুধের বাটি।

কথা শুনে সকলে হাসলেন। গিরিশচন্দ্র বললেন—থিয়েটারগুলো ছোঁড়াদেরই ছেড়ে দিই মনে করছি।

কিন্তু পরমহংসদেবের তাতে মত নেই। বললেন—না, না, ও বেশ আছে। অনেকের উপকার হচ্ছে।

তা তো হচ্ছে, কিন্তু গিরিশ ঘোষ নাকি মদ খায়? খায় মানে কি, দুর্দান্ত মদ খায়। তার ওপর আবার বেশ্যা সংসর্গও আছে! সেকথা পরমহংসদেবের জানতে বাকি নেই। তা নিয়ে কেউ নালিশ করলে পরমহংসদেব বলেন—থাক না, থাক না, কদিন খাবে? একদিন তো একজন শিষ্য পরমহংসদেবের কাছে ধমক খেল—তোমার এত মাথা ব্যথা কিসের? সে মদ ছাড়ুক আর না ছাড়ুক, যে তার কর্তা সে বুঝবে।

পরমহংসদেব বললেন—মদে গিরিশের কোন দোষ হবে না।

কেন, দোষ হবে না কেন?

পরমহংসদেব বললেন—গিরিশের ভৈরবের অংশে জন্ম। অনেকদিন আগে আমি গিরিশকে মা কালীর মন্দিরে দেখেছি। উলঙ্গ, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, কাপড়খানা মাথায় পাগড়ির মত জড়ান, বগলে বোতল। নাচতে-নাচতে এসে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার বুকে মিলিয়ে গেল।

কোন এক অভিনেত্রীর অসুখ করেছে। রোগিণীকে দেখতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র মদ খেলেন খানিক, জমজমাট নেশা হল। গিরিশচন্দ্রকে সারারাত কাটাতে হল অভিনেত্রীর বাড়িতে।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই সম্বিত ফিরে এল। তাই তো, কোথায় রাত কাটল। না, বাড়ি ফেরা নয় এখন, একখানা গাড়ি ভাড়া করে গিরিশচন্দ্র চললেন দক্ষিণেশ্বরে। অবশ্যি সঙ্গে এক বোতল মদ আছে।

গিরিশচন্দ্র পরমহংসদেবের পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। খানিকক্ষণ

পরে খোঁয়ারি ভাঙার সময় হতেই গিরিশচন্দ্রের খেয়াল হল, সর্বনাশ হয়েছে, মদের বোতল গাড়িতে পড়ে আছে। কিন্তু গাড়ি কোথায় আছে? ভাড়াটে গাড়ি সওয়ারী নামিয়ে দিয়ে এতক্ষণে কোথায় চলে গেছে ঠিক কি।

খোঁয়ারি ভাঙার সময় এখন মদ না পেলে যে সর্বনাশ। উপায় কি হবে।

উপায় হয়ে আছে। ঠিক সময়ে পরমহংসদেবই একজন ভক্তকে দিয়ে গাড়ি থেকে গিরিশচন্দ্রের জুতো, চাদর আর মদের বোতল আনিয়ে রেখেছেন। পরমহংসদেবের কথায় সেই মদের বোতল গিরিশচন্দ্রকে দেওয়া হল। দক্ষিণেশ্বরে বসে গিরিশচন্দ্র মহানন্দে ঢুকঢুক করে মদ খেতে লাগলেন।

আরেকদিন সন্ধ্যার পর পরমহংসদেব বলরাম বসুর বাড়ি থেকে গিরিশ-চন্দ্রের বাড়িতে এসে উপস্থিত। পরমহংসদেবকে নিজের বাড়িতে দেখে গিরিশচন্দ্র আনন্দে বিভোর হয়ে গেলেন। আনন্দে এলোমেলো হয়ে পড়লেন।

চাকরকে বাজারে পাঠিয়ে লুচি আর আলুর দম আনালেন। ঘরে তোশক পাতা, তোশকের উপর লম্বা জাজিম। গিরিশচন্দ্র নিজে যে কাঁসার থালায় বরাবর খাওয়া-দাওয়া করেন, সেই থালাখানায় লুচি তার আলুর দম সাজিয়ে পরমহংসদেবকে খেতে দিলেন।

এমন জায়গায় অন্যের থালায় পরমহংসদেব কেমন করে খাবেন। তিনি একটু আপত্তি করলেন।

কিন্তু কে কার আপত্তি শোনে। তখন গিরিশচন্দ্র একটু রঙে আছেন, বললেন—কেন, বলরামের বাড়িতে খেতে পারেন, আর এখানে খেতে যত আপত্তি?

এ একেবারে অগাধ ভালবাসার দাবি। এমন ভালবাসায় শুচি-অশুচির কান বাছবিচার থাকে না। এমন ভালবাসার দাবি পরমহংসদেব নামঞ্জুর করতে পারলেন না। খুশি হয়ে তিনি হাসতে-হাসতে লুচি আর আলুর দম খেতে লাগলেন।

কিন্তু শুধু লুচি আর আলুর দমে হবে না, তার সঙ্গে আবার একটু চচ্চড়ি খেতে হবে। গিরিশচন্দ্র চাকরকে বললেন—ত্যাখ দিকিনি, সকালে পুঁইশাক আর চিংড়িমাছের চচ্চড়ি হয়েছিল, সেটা খেতে বড় ভাল হয়েছিল, থাকে তো নিয়ে আয়।

আছে। চাকর রান্নাঘর থেকে সকালবেলার চচ্চড়ি এনে পরমহংসদেবের পাতে ঢেলে দিল।

আর-কেউ ছুঁলে বা কোনরকমে অশুচি হলে পরমহংসদেব সে-জিনিস খেতে পারেন না। কিন্তু এখন এখানে আরেকরকম। পরমহংসদেব হাসতে-হাসতে লুচি আর চচ্চড়ি খেতে লাগলেন। অন্যান্য ভক্তেরা দৃশ্য দেখে অবাক।

তা অবাক হবার কিছু নেই। পরমহংসদেব বললেন—বলরামের কাছে বলরামের ভাব, গিরিশের কাছে গিরিশের ভাব।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ সাল। মঙ্গলবার। জন্মাষ্টমী। এন্তার মদ টেনে গিরিশচন্দ্র গাড়িতে উঠে পড়েছেন। গাড়িতেও বোতল নিয়ে উঠেছেন, মদ খেতে-খেতেই চলে এলেন দক্ষিণেশ্বর। পরমহংসদেবকে প্রণাম করলেন সাষ্টাঙ্গে।

মদমত্তকে পরমহংসদেব অকৃপার চোখে দেখলেন না। সস্নেহে গিরিশচন্দ্রের গায়ে হাত চাপড়াতে লাগলেন। একজন ভক্তকে ডেকে বললেন—ওরে একে তামাক খাওয়া।

গিরিশচন্দ্র মাথা তুলে হাত জোড় করে পরমহংসদেবকে বললেন—তুমিই পূর্ণব্রহ্ম। তা যদি না হয়, সবই মিথ্যা। বড় খেদ রইল তোমার সেবা করতে পেলুম না। দাও বর ভগবন, এক বৎসর তোমার সেবা করব। মুক্তি ছড়াছড়ি—প্রস্রাব করে দি। বল, তোমার সেবা এক বৎসর করব?

আরেকদিন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেব যোগেন মহারাজকে বললেন—যা, গিরিশের কাছ থেকে একটা বাতি নিয়ে আয়।

কোথায় দক্ষিণেশ্বর, কোথায় বাগবাজার। আশ্চর্য, তুচ্ছ একটা বাতির জন্যে এখন যোগেন মহারাজকে দক্ষিণেশ্বর থেকে বাগবাজার যেতে হবে। আর আশ্চর্য-টাশ্চর্য নয়, গুরুর আদেশ হয়েছে যখন, যেতেই হবে।

তখন পর্যন্ত যোগেন মহারাজের গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে চেনা-জানা নেই। যোগেন মহারাজ শুধু কানে শুনেছেন, গিরিশ নামে থিয়েটারওলা একটা পাঁড় মাতাল আছে বটে।

যোগেন মহারাজ গেলেন বাগবাজারে। খুঁজে-খুঁজে ঠিক জায়গায় এলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র বাড়িতে নেই, অতএব যোগেন মহারাজ অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সেদিন অমৃতলাল বসুর ঠাকুমার শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন। গিরিশচন্দ্র সেখানে গিয়েছেন। জ্ঞাত-ভোজন, দিব্যি খাওয়া-দাওয়া হল। তারপর খুব মাল টেনে বেসামাল হয়ে গিরিশচন্দ্র ঘরমুখো হলেন। কাছা-কোঁচা ঠিক নেই,

কাপড় ময়লা হয়ে গেল, টলতে-টলতে গিরিশচন্দ্র ঘরে ঢুকলেন। কে বসে আছে?

গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—কোত্থেকে এসেছ?

গিরিশচন্দ্রের অবস্থা দেখে যোগেন মহারাজ ভয় পেলেন। এ যে চুরচুরে মাতাল। আঁচড়ে-কামড়ে দেবে কি না কে জানে। ভয়ে-ভয়ে বললেন—দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মশাই একটা বাতির জন্যে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সামান্য একটা বাতির জন্যে লোক পাঠিয়েছেন! এত দয়া পরমহংস-দেবের! গিরিশচন্দ্রের মনে হল, আমার কী সৌভাগ্য।

আনন্দে আত্মহারা হলেন গিরিশচন্দ্র। বললেন—একটা কেন, একটা প্যাকেট নিয়ে যাও।

বলে থ্যাবড়ানি মেরে ঘরের মধ্যিখানে বসে পড়লেন।

আনন্দ, আনন্দ। পরমহংসদেব সামান্য একটা বাতির জন্যে লোক পাঠিয়েছেন! কী সৌভাগ্য। কী আনন্দ।

আনন্দে ফেটে পড়লেন গিরিশচন্দ্র। আনন্দের টানে গিরিশচন্দ্র মদের মুখে পরমহংসদেবের নামে কটুবাক্যের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলেন। খালি গাল, কেবল খেউড়। মুখের আর কোন বাধা-বন্ধন নেই। আর? আর কিছু নয়? আর মাঝে-মাঝে গিরিশচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করে কী বলতে লাগলেন আর মেঝেতে টিপ টিপ করে তিনটি করে গড় করতে লাগলেন।

গিরিশচন্দ্রের মনের কথা জানেন না যোগেন মহারাজ, তিনি এখন এই ত্রেপণ্ড মাতালের ঘর থেকে পালাতে পারলে বাঁচেন। কিন্তু তাঁর সাধ্য কি যে পালিয়ে যাবেন। যতবার যোগেন মহারাজ উঠে পালাতে যান, ততবার গিরিশচন্দ্র তাঁকে বসিয়ে রাখেন। যোগেন মহারাজকে গিরিশচন্দ্র পালাতেও দিচ্ছেন না, বাতিও দিচ্ছেন না।

যোগেন মহারাজ ভাবলেন: বাতি কি আর দোকানে পাওয়া যায় না, দু-পয়সা না হয় তিন পয়সা দাম হবে। একটা বাতির জন্য এক রাজ্যি থেকে আর এক রাজ্যি আসা আর এই শালা পাঁড় মাতালের সামনে আসা।

যার জন্যে আসা, সন্ধ্যার পর গিরিশচন্দ্র এক প্যাকেট বাতি আনিয়ে দিলেন। বাতির প্যাকেট হাতে নিয়ে যোগেন মহারাজ জোরপায়ে একেবারে দক্ষিণেশ্বর। যোগেন মহারাজ পরমহংসদেবকে বললেন—কোথায় পাঠিয়েছিলেন

আমাকে একটা বাতির জন্যে! একটা ত্রেপণ্ড মাতাল, খালি গাল, খেউড় ওড়াতে লাগল।

শুধু এই, আর কিছু নেই? পরমহংসদেব জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ রে, গাল তো দিয়েছিল, আর কী করেছিল বল দিকিনি।

যোগেন মহারাজ বললেন—মাঝে-মাঝে দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করে কী বলতে লাগল আর মেঝেতে টিপটিপ করে তিনটি করে গড় করল।

পরমহংসদেব বললেন—তুই শালা কেবল গালটাই দেখলি? ভালটা দেখলি নি? কী ভক্তি, কী টান?

অন্তর্যামী অন্তরের কথা শুনেছেন, মুখের কথা শোনেন নি।

চূড়ান্ত কাণ্ড হল একদিন থিয়েটারে। পরমহংসদেব থিয়েটারে এসেছেন, কিছু লুচি প্রসাদ করে দিয়েছেন। কে জানে কেন, সেদিন গিরিশচন্দ্রের মনে হল, আমি ভক্তিহীন, আমি ঠাকুরকে সেবা করতে পারব না, কিন্তু ঠাকুর যদি আমার ছেলে হন, তাহলে তাঁর শুশ্রূষা করতে পারব।

কিন্তু পরমহংসদেব কি গিরিশচন্দ্রের ছেলে হতে রাজি হবেন? রাজি হবেন কি না পরে দেখা যাবে, মদের মুখে গিরিশচন্দ্র পরমহংসদেবকে ধরে পড়লেন—তুমি আমার ছেলে হও।

পরমহংসদেব বললেন—তা কেন রে, আমি তোর গুরু। ইষ্ট হয়ে থাকব।

গিরিশচন্দ্র বললেন—না, ঠাকুর তোমাকে আমার ছেলে হতেই হবে। বল, কবে আমার ছেলে হবে?

পরমহংসদেব বললেন—আমি তোর ছেলে হব কেন রে? জানিস আমার বাপ কত নির্মল ছিলেন।

পরমহংসদেব কিছুতেই গিরিশচন্দ্রের ছেলে হতে রাজি নন? তবে আর ভাল কথায় কাজ নেই, মদমত্ত গিরিশচন্দ্র কটুবাক্যের ঝড় বইয়ে দিলেন। পর্যন্ত মা-বাপ তুলে গালিগালাজ।

বর্ষাকাল। জলকাদায় রাস্তা ভর্তি। অভিনয়ান্তে পরমহংদেব গিয়ে গাড়িতে উঠছেন; আর, গাড়ির পাশে রাস্তার জলকাদার মধ্যে গিরিশচন্দ্র পরমহংসদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। পরমহংসদেব গাড়িতে চলে গেলেন। গিরিশচন্দ্রও চলে এলেন বাড়িতে।

সেদিন হরিপদ চট্টোপাধ্যায় আগাগোড়া গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে আছেন।

তিনি বললেন—গিরিশদাদা, কাজটা বড় অন্যায় হয়েছে।

গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—কোন্‌টার কথা বলছিস ?

—এই যে আপনি আজ ঠাকুরকে বড় গালাগাল দিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে এখনি ক্ষমা চাওয়া উচিত।

গিরিশচন্দ্র বললেন—বলিস কি রে। তাঁর কি নিন্দাগাল আছে। তিনি কি আমার অপরাধ ধরতে পারেন, তাহলে তো আমি রেণুর রেণু হয়ে যাই !

হরিপদ তবুও নিরস্ত হলেন না। বললেন—না, আজ আপনি খুব অন্যায় করেছেন। এখন একমাত্র উপায় ঠাকুরের কাছে গিয়ে তাঁর পায়ে পড়া।

বিষয়বস্তু অতীব গুরুতর, কিন্তু গিরিশচন্দ্র নির্বিকারভাবে বললেন—বড্ড ঘুম পেয়েছে, একটু শুইগে।

হরিপদ বিরক্ত হয়ে বিদায় নিলেন। আর গিরিশচন্দ্র সটান গিয়ে শুয়ে পড়লেন, ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই যেন সংবিৎ ফিরে এল গিরিশচন্দ্রের। না, কাজটা অত্যন্ত অন্যায় হয়ে গেছে। অনুতাপের আগুন জ্বলল অন্তরে। অত্যন্ত অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায়। মার্জনার অযোগ্য অপরাধ। একবার বারান্দায় আসেন, একবার ঘরে আসেন—গিরিশচন্দ্র ছটফট করতে লাগলেন। বুকের রক্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল।

ওদিকে এই সময়ে দক্ষিণেশ্বরে কী হচ্ছে ? পরমহংসদেব যাকে সামনে পাচ্ছেন তাকেই বলছেন—শুনেছ গা ! গিরিশ ঘোষ দেড়খানা লুচি খাইয়ে আমায় যা নয় তাই বলে গালাগালি দিয়েছে।

শুনে অনেকেই বললেন—জানি ওটা একটা পাষণ্ড। ওর কাছেও আপনি যান !

কিন্তু পরমহংসদেব কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছেন না।

রামচন্দ্র দত্ত সেই সকালেই কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। কলকাতা থেকেই রামচন্দ্র সবিস্তারে শুনে এসেছেন গতরাত্রের ঘটনা। শুনে এসেছেন, যে-গিরিশচন্দ্র পরমহংসদেবকে এক মুহূর্তে অবাক্য-কুবাক্য বলেছেন সেই গিরিশচন্দ্রই পরমুহূর্তে কর্দমাক্ত কলেবরে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছেন পরমহংসদেবকে।

পরমহংসদেব রামচন্দ্রকে বললেন—ছাখ, গিরিশ আমায় গাল দিয়েছে।

রামচন্দ্র অক্লেশে বললেন—বেশ তো করেছে।

পরমহংসদেব আর-সকলকে বললেন—শোন, শোন, রাম কী বলে শোন, আমার মাতৃপিতৃ উচ্চারণ করেছে, তবু বলে বেশ করেছে।

রামচন্দ্র বললেন—হ্যাঁ তো। শ্রীকৃষ্ণ কালীয়নাগকে বলেছিলেন, 'তুমি বিষ উদ্‌গীরণ কর কেন?' কালীয়নাগ উত্তর দিয়েছিল, 'তুমি আমাকে বিষ দিয়েছ, আমি সুধা উদ্‌গীরণ করব কোত্থেকে?' আপনিও থিয়েটারের গিরিশ ঘোষকে যা দিয়েছেন, তাই দিয়েই সে আপনার পূজো করেছে।

পরমহংসদেব বললেন—যাই হোক, আর কি তার বাড়িতে যাওয়া ভাল?

অনেকেই সমস্বরে আপত্তি করে উঠলেন, কিন্তু রামচন্দ্র বললেন—যেতে হবে বৈকি।

পরমহংসদেব বললেন—রাম, তবে গাড়ি আনতে বল, চল, তার বাড়ি যাই।

কিন্তু এই দুপুরের রোদে যেতে পরমহংসদেবের নিশ্চয়ই কষ্ট হবে, কোন কোন ভক্ত তাই আপত্তি করলেন। কিন্তু পরমহংসদেব কোন কথা শুনলেন না, কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে সরাসরি চলে এলেন কলকাতায়, গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে। গাড়ি থেকে নেমেই পরমহংসদেব বললেন—ঈশ্বর ইচ্ছায় এলুম।

সেদিন স্বামী বিবেকানন্দ উপস্থিত ছিলেন অকুস্থলে। দৃশ্য দেখে তিনি গিরিশচন্দ্রের পায়ের ধুলো নিলেন, বললেন—জি. সি., ধন্য তোমার বিশ্বাস।

হ্যাঁ, স্বামী বিবেকানন্দ 'জি. সি.' বলে ডাকতেন গিরিশচন্দ্রকে। একই মহাগুরুর শিষ্য দু-জনে, একই বনস্পতির স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রিত, একই সূর্যের আলোকে-উত্তাপে উজ্জীবিত।

কতদিন স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে মুখোমুখি তর্ক করেছেন গিরিশচন্দ্র। দুই বন্ধুর তর্ক-বিতর্ক। তর্কের মধ্যে হাসতে-হাসতে দু-জনে দু-জনকে কটুবাক্য পর্যন্ত কইতেন।

হয়ত গিরিশচন্দ্র স্বামী বিবেকানন্দকে বললেন—থাম শালা, সন্ন্যাসী ভিখারী।

সঙ্গে-সঙ্গে বিবেকানন্দ বললেন—যা শালা ভাঁড়, তুই শালা থিয়েটারে মাগী নাচাবি, তোর শালা কি ব্রেন আছে?

আবার তুমুল তর্ক লেগে গেল দু-জনে।

যাক, যা বলছিলাম।

পরমহংসদেব একদিন ভাবাবেশে বলেছেন—গিরিশ ঘোষ, তুই কিছু ভাবিস নে, এর পর তোকে দেখে লোকে অবাক হয়ে যাবে।

পরমহংসদেবের অহেতুকী কৃপা পেয়েছেন গিরিশচন্দ্র। পরমহংসদেবের

অপার স্নেহে ধন্য হয়েছেন।

পরমহংসদেব সবেমাত্র খাওয়া শেষ করেছেন, এমন সময় একদিন গিরিশ-চন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত। পরমহংসদেব গিরিশচন্দ্রকে বললেন—পায়েস খাও। আমি তোমায় খাইয়ে দিই।

পরমহংসদেব নিজের হাতে খাইয়ে দিতে লাগলেন গিরিশচন্দ্রকে। চেঁচে-পুছে খাইয়ে দিলেন। যেন জননী আপন হাতে একটি নিরাবরণ বালককে খাইয়ে দিচ্ছেন।

এই ঘটনা মনে করে গিরিশচন্দ্র উত্তরকালে বলেছেনঃ যখন মনে হয় যে অনেক অস্পর্শীয় ওষ্ঠে আমার ওষ্ঠ স্পর্শিত হইয়াছে, সেই ওষ্ঠে তিনি নির্ম্মল হস্তে পায়েস দিয়াছেন, তখন যেন আত্মহারা হইয়া ভাবি—এ ঘটনা কি সত্য হইয়াছিল না স্বপ্নে দেখিয়াছি!

সত্য। স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রম নয়। সত্য।

—ঃঃ০ঃঃ—

সাত

মধুর কোমল সত্য নয়, এখন এতক্ষণে একটি কঠিন নিষ্করুণ সত্যের সীমায় চলে আসার সময় হল। সত্য যে কখনও-কখনও কী দারুণ হৃদয়হীন হতে পারে, বাঙলা নাট্যশালার ইতিহাসে তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ আছে বোধকরি রাজকৃষ্ণ রায়ের জীবনে।

একেবারে শৈশবে মায়ের মৃত্যু। কে দেখাশোনা করে। মফস্বল থেকে তাই রাজকৃষ্ণকে কলকাতায় নিয়ে এলেন বাবা। একজন মহিলা রাজকৃষ্ণকে দেখাশোনা করেছেন। রাজকৃষ্ণ তারই স্নেহযত্নে বড় হয়েছেন। তাকে বরাবর 'মাসি' বলে ডেকেছেন রাজকৃষ্ণ। কী রকম মাসি? বড় হয়ে রাজকৃষ্ণ জেনেছিলেন, উনি আসলে কেউ নন, উনি আসলে বাবার সেবাদাসী।

যাই হোক, ওর সেবা-যত্নেই তো রাজকৃষ্ণ বড় হয়েছেন। বড় হয়ে কোনদিন মাসির অযত্ন করেন নি রাজকৃষ্ণ। বাবার মৃত্যুর পরেও রাজকৃষ্ণ ওই মহিলাকে মায়ের মত ভক্তিশ্রদ্ধা করেছেন।

রাজকৃষ্ণ রায় সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি চমৎকার গল্প বলেছেন ঃ

'বহুদিন পূর্ব্বে একবার আমি, গুণুদাদা, আমার ভগ্নীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ও আমাদের একজন আত্মীয় কেদার, এই কয়জনে পূজার সময় পশ্চিমে বেড়াইতে যাইতেছিলাম। মধ্যে কি একটা ষ্টেশনে রোগা, পরণে ময়লা কাপড়, খালি পা, একটি ছোকড়া আসিয়া আমাদিগকে বলিল—'আমি মামার বাড়ি যাইব, হাতে পয়সা নাই, যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার ভাড়াটি আপনারা দিয়া দেন ত বড় উপকৃত হই।' যদুবাবু বড় আমুদে লোক ছিলেন। তিনি তামাসা করিতে বড় ভালবাসিতেন, রহস্য করিয়া গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কবিতা টবিতা লিখিতে পার?" বালক অমনি সপ্রতিভ-ভাবে মৃদুস্বরে বলিল "হাঁ পারি।" আমরা ভাবিলাম—লোকটা পাগল নাকি? যদুবাবু অধিকতর কৌতূহলী হইয়া রহস্যচ্ছলে আবার বলিলেন—"তা বাঃ,

বেশ বেশ। দেখ, এই কেদার আমার আমার প্রেয়সী 'তারা'র নিকট হইতে, ছিনাইয়া লইয়া চলিয়াছে! বল ত বাপু, এমনি করিয়া কি ভদ্রলোককে দুঃখ দিতে হয়? তুমি এই বিষয়ে একটি কবিতা আমায় লিখিয়া দাও দেখি!" বালক তৎক্ষণাৎ একখানি চোতা কাগজে পেন্সিল দিয়া ফস্‌ফস্ করিয়া একটা প্রকাণ্ড কবিতা লিখিয়া ফেলিল। তাহার প্রথম দুই ছত্র এখনও আমার মনে আছে:—

"কেদার দেদার দুখ দিলেন আমায়
তারা ধনে হারা করে আনিয়া হেথায়।" ইত্যাদি।

আমরা জানিতাম না, এই বালকই তখনকার উদীয়মান কবি রাজকৃষ্ণ রায়। ...'

চব্বিশ কি পঁচিশ বছর বয়স হবে তখন, রাজকৃষ্ণ কাজ নিলেন মানিকতলা স্ট্রীটে নিউ বেঙ্গল প্রেসে। সেই ছাপাখানার মালিকের নাম কৃষ্ণগোপাল ভক্ত।

তারপর দেখি রাজকৃষ্ণ একখানা কাব্যগ্রন্থ ছাপতে শুরু করেছেন। এর আগেও অবশ্যি রাজকৃষ্ণের একাধিক গ্রন্থ বেরিয়েছে। যা-হোক, এই নতুন কাব্যগ্রন্থখানার নাম—'অবসর-সরোজিনী'। এ-বাবদে রাজকৃষ্ণকে সাহায্য করেছেন মহারাণী স্বর্ণময়ী এবং তাঁর দেওয়ান রাজীবলোচন।

'অবসর-সরোজিনী' ছাপা হচ্ছিল আলবার্ট প্রেসে। কিন্তু আলবার্ট প্রেসের তখন অবস্থা ভাল নয়, আলবার্ট প্রেসের মালিক তখন সাব্যস্ত করেছেন যে প্রেস উঠিয়ে দেবেন। রাজকৃষ্ণ প্রেসের মালিককে বললেন—আমি প্রেস দেখাশোনা করি। লাভের অর্ধেক আমাকে দেবেন।

মালিক রাজি হলেন। ঠিক হল, রাজকৃষ্ণ প্রেসের জন্যে কাজ যোগাড় করবেন, প্রেসের কাজকর্ম দেখাশোনা করবেন। আর মালিকের একজন কর্মচারী হিসেবপত্র রাখবেন। অবশ্যই রাজকৃষ্ণ নিজের জন্যে দরকারী খরচ প্রেস থেকে নেবেন। যা নেবেন, তা হিসেবের খাতায় লেখা থাকবে, পরে সে-টাকা তাঁর লাভের অংশ থেকে কাটা যাবে। আর এই প্রেস থেকেই রাজকৃষ্ণের বই ছাপা হবে। সেসবের লাভ-লোকসানের ভাগী এই প্রেসই থাকবে। বেশ কথা।

'অবসর-সরোজিনী' বেরল। কিছুকাল বাদে বেরল রাজকৃষ্ণের প্রথম নাটক—'অনলে-বিজলী'।

বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হল 'অনলে বিজলী'। বেঙ্গল থিয়েটারের সঙ্গে রাজকৃষ্ণের এই প্রথম যোগাযোগ হল। বেঙ্গল থিয়েটারের জন্যে আরও

কয়েকখানা নাটক লিখলেন রাজকৃষ্ণ।

কিন্তু মালিক আর আলবার্ট প্রেস রাখতে রাজি নন। লভ্যাংশ যা পাচ্ছেন, তাতে তাঁর পোষাচ্ছে না। আলবার্ট প্রেস বিক্রি করে দিলেন তিনি।

একাধিক সাময়িকপত্র পরিচালনা করেছেন রাজকৃষ্ণ—সমাজ-দর্পণ, বীণা, গল্পকল্পতরু।

'বীণা' নানাবিষয়িণী কবিতাপ্রসবিনী মাসিক পত্রিকা। আলবার্ট প্রেস বিক্রি হয়ে গেল, অতএব 'বীণা' বন্ধ করে দিতে হল। কিছুকাল পরে টাকাকড়ি ঋণ নিয়ে রাজকৃষ্ণ ঠনঠনিয়ায় একটা প্রেস খুললেন, নাম দিলেন—বীণা যন্ত্র। 'বীণা' পত্রিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আবার খোলা হল।

ছাপাখানার কাজে আর বই-টই বিক্রি করে সুখে-স্বচ্ছন্দে চলছিল, হঠাৎ কোত্থেকে কী হয়ে গেল, রাজকৃষ্ণ আরেকদিকে এলেন। নাট্যশালার দিকে। নিজে একটা নাট্যশালা খুলবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

রাজকৃষ্ণ সেতার বাজাতে পারেন, অভিনয় করতে পারেন। পারেন কি, মাঝে-মাঝে নানা জায়গায় অভিনয় দেখিয়েছেন রাজকৃষ্ণ। পাণ্ডুয়া স্টেশনের কাছে সরাই গ্রামে তাঁরই চেষ্টায় একটা অভিনয়ের দল পর্যন্ত তৈরি হয়েছে। সেই দলে অভিনয় করেছেন রাজকৃষ্ণ।

তারপর একদিন কলকাতার আর্য্য-নাট্য-সমাজের সঙ্গে রাজকৃষ্ণ 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' অভিনয় করলেন। অভিনয় সুন্দর হল। তাই অপেরা-হাউস ভাড়া নিয়ে দুরাত্রি 'প্রহ্লাদচরিত্র' অভিনয় করে কলকাতার সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের দেখান হল। সর্বত্র শোনা গেল 'প্রহ্লাদচরিত্রে'র প্রশংসা। বিশেষত, 'প্রহ্লাদচরিত্রে'র হিরণ্যকশিপুর অভিনয়ের প্রশংসা। বলা বাহুল্য হবে না, রাজকৃষ্ণ হিরণ্যকশিপু সেজেছিলেন।

রাজকৃষ্ণ সাব্যস্ত করলেন, থিয়েটার খুলবেন। সাব্যস্ত করলেন, সাধারণ থিয়েটারে যে-সমস্ত কুরুচি আছে, তাঁর থিয়েটারে সেসব কুরুচির প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। নতুন হবে তাঁর থিয়েটার। তাঁর থিয়েটারে বেশ্যা থাকবে না, বালকেরাই স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করবে।

থিয়েটারের কাজে লেগে গেলেন রাজকৃষ্ণ। অন্যদিকে তাকানোর সময় নেই, তাই 'বীণা' পত্রিকাটি বন্ধ করে দিতে হল। ১৮৮৭ সালের ৩১শে অক্টোবরের 'অনুসন্ধান' পত্রিকার সংবাদ: 'রাজকৃষ্ণ বাবু ঠনঠনিয়া পল্লীতে নিজের একটি থিয়েটার খুলিতেছেন; সেই হেতু অন্য কাজে লিপ্ত থাকিবার অবসর

তাঁহার আদৌ নাই। তজ্জন্যই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে 'বীণা' বন্ধ করিতে হইল।'

হ্যাঁ, সাকুল্যে চারবছর চলবার পর 'বীণা' পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গেল। কয়েকজন গ্রাহক অগ্রিম মূল্য পাঠিয়েছিলেন পঞ্চমবর্ষের 'বীণা'র জন্যে, সে-টাকা ফেরত দেওয়া হল। সকল গ্রাহক অবশ্যি নগদ টাকা নেন নি, টাকার বদলে বই নিয়েছেন কেউ-কেউ।

১৮৮৭ সালের শেষাংশ। মেছোবাজার রোডে রাজকৃষ্ণের নতুন থিয়েটার প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এল। রাজকৃষ্ণ এই নতুন থিয়েটারের নাম রেখেছেন—বীণা।

এই নতুন থিয়েটার সম্পর্কে ১৮৮৭ সালের ১২ই ডিসেম্বরের 'নববিভাকর-সাধারণী'র মন্তব্য থেকে একটুখানি তুলে দিচ্ছি ঃ

'আমরা বিগত ৮ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বীণা-রঙ্গগৃহে চন্দ্রহাস নামক একখানি নবনাটকের মহলা দেখিতে গিয়াছিলাম। সকলেই অবগত আছেন, উক্ত রঙ্গালয়টি শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় কর্তৃক স্থাপিত। অন্যান্য রঙ্গালয়ে যেরূপ স্ত্রীলোকের অভিনয় বারাঙ্গনা কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে, এই নব-প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ে সেরূপ হয় না। এই পার্থক্যই বীণা-রঙ্গালয়ের বিশেষ চিহ্ন ও এই পার্থক্য রক্ষা করিবার জন্যই ইহার আবির্ভাব। বাবু রাজকৃষ্ণ রায়, বহুযত্নে বহু পরিশ্রমে, বহু অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া, এই রঙ্গালয়টি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

বীণা-রঙ্গালয় এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু এই অসম্পূর্ণাবস্থায় যাহা দেখিলাম, তাহাতেই ইহা প্রশংসার যোগ্য। দৃশ্যপটগুলি মহামূল্যের না হইলেও, অতি পরিপাটি হইয়াছে—তবে, কমদামের জিনিসে যেমন আভ্যন্তরিক গুণ অপেক্ষা বাহ্যিক চাকচিক্য অধিক থাকে, ইহাতেও সেইরূপ বাহ্যিক চাকচিক্যের আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা গুণহীন নহে।'

বীণা-রঙ্গভূমিতে প্রথম অভিনীত হল 'চন্দ্রহাস'। ১৮৮৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর 'অনুসন্ধান' লিখেছে ঃ 'বীণা-রঙ্গভূমি। —কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় বীণা-রঙ্গভূমির একমাত্র অধিকারী ও পরিচালক। সাধারণ থিয়েটারে যে যে কুরুচি আছে, তাহাই দূর করা তাঁহার উদ্দেশ্য ; সুতরাং এ থিয়েটারে বারাঙ্গনা নাই,—পুরুষ দ্বারা স্ত্রী-অংশ অভিনীত হয়। আর, ইহাই এ থিয়েটারের নূতনত্ব। সংপ্রতি 'চন্দ্রহাস' নামক একখানি হরিভক্তিময় নাটক ইহাতে অভিনীত হইতেছে। অভিনয় দোষশূন্য না হইলেও, সমিতির অনেক মেম্বর অভিনয় দেখিয়া বিশেষ তুষ্ট হইয়াছেন।'

পত্র পত্রিকায় প্রশংসা হলে হবে কী, টাকাকড়ি আয় হচ্ছে না সেরকম।

অবশ্যি একটা সুবিধে আছে, অভিনেতাদের মাইনে দিতে হয় না। মাইনে দিতে হয় না, কিন্তু আদর-অভ্যর্থনা করতে হয়। তাতে বেশ খরচ লাগে।

একে-একে বীণা-রঙ্গভূমিতে অভিনীত হল চন্দ্রহাস, প্রহ্লাদচরিত্র, হর-ধনুর্ভঙ্গ, দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি। কেউ-কেউ সেসময়ে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছেন রাজকৃষ্ণকে। দেখতে পাচ্ছি, বীণা-রঙ্গভূমির জন্যে রাজকৃষ্ণকে তাজহাটের জমিদার রাজা গোবিন্দলাল রায় আড়াইশো টাকা দিয়েছেন, কুচবিহারের মহারাণী দুশো টাকা দিয়েছেন।

এত করেও রাজকৃষ্ণ দল বজায় রাখতে পারলেন না। ঋণের ভার বেড়ে গেল, ছ-মাস যেতে-না-যেতেই অভিনয় বন্ধ করে দিতে হল। সেসময়ে রাজকৃষ্ণ রায় দুঃখ করে লিখেছেন: অনেক কাল চেষ্টা করিয়া, বড় সাধের আশায় মজিয়া বীণা-রঙ্গভূমি স্থাপন করি। একা, কেহই সহায় নাই। মুখের কথায় অনেকে আমাকে হিমালয়ের এভারেষ্ট্ শৃঙ্গে তুলিয়াছিল; কিন্তু কাজের কথার বেলায় সবাই বোবা। কি করিয়া জানিব যে, তোমরা আমার সাধের চারা গাছটির কীট—আমার মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খাইবে—প্রথমে কুটিল স্বার্থপরতাবারুদ ও গোলা গোপনে গোপনে মন-কামানে ঠাসিয়া শেষে আমার প্রাণে দাগিবে? নটের হাটে কি কেবল "সর্পাদপি ভয়ঙ্করো" জীব?

১৮৮৮ সালে রাজকৃষ্ণ বীণা-রঙ্গভূমি তুলে দিলেন আর্য্য-নাট্য-সমাজের হাতে। এই পন্থায় যদি ঋণ শোধ করা যায়! যদি সুদিনের নাগাল মেলে!

কিন্তু তাতেও আশানুরূপ ফল হল না। দর্শকের তেমন ভিড় হয় না। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। স্ত্রী-ভূমিকায় পুরুষেরা নামে, ভিড় হবে কোত্থেকে। ওভাবে থিয়েটার করে টাকা পাওয়া যায় না, কারও-কারও কাছে বাহবা পাওয়া যায়।

১৮৮৮ সালের ৯ই নভেম্বর 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' মন্তব্য করেছে:

'সম্প্রতি আমরা বীণা রঙ্গভূমিতে আর্য্য নাট্য সমাজ কর্ত্তৃক সুপ্রসিদ্ধ নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। বীণা রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠাতা বাবু রাজকৃষ্ণ রায় স্বয়ং এখন অভিনয় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। রঙ্গভূমিতে তাঁহার ন্যায় একজন খ্যাতনামা অভিনেতার অভাব বিশেষ ক্ষতি-জনক; কিন্তু আর্য্য নাট্য সমাজ যেরূপ সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিতেছেন তাহাতে অবিচলিত অধ্যবসায় থাকিলে, তাঁহারা যে রাজকৃষ্ণ বাবুর মহৎ উদ্দেশ্যও পূর্ণ করিতে পারিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজকাল সহরে

বেশ্যা সংযুক্ত থিয়েটার সকলের পশার ও প্রতিপত্তি যেরূপ, তাহাতে কেবল পুরুষ অভিনেতা লইয়া স্থায়ী থিয়েটার স্থাপন করা অনেক সাহস ও বলের কার্য্য; তাহার পথে বিস্তর বিঘ্নবাধা। কিন্তু এ সকলের মধ্যেও আর্য্য নাট্য সমাজ যে কতক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহা আমরা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না।...

বিখ্যাত অভিনেতা বাবু অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি আর্য্য নাট্য সমাজে যোগ দিয়াছেন। তাঁহার সহায়তায় নীলদর্পণের অভিনয় যে বড়ই স্বাভাবিক হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য।'

কিন্তু এই নভেম্বর মাসেই আর্য্য-নাট্যসমাজ বীণা-রঙ্গভূমি ছেড়ে দিল। রাজকৃষ্ণ তারপর বীণা-রঙ্গভূমি ভাড়া দিলেন উপেন্দ্রনাথ দাসকে। বীণা-রঙ্গভূমিতে উপেন্দ্রনাথ বেশ্যা অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয় করবেন, একথা জেনে-শুনেও উপেন্দ্রনাথকেই ভাড়া দিতে হল। তাছাড়া রাজকৃষ্ণের আর উপায় নেই। ঋণের ভার অসহ্য হয়ে উঠেছে।

১৮৮৮ সালের ৭ই ডিসেম্বর 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' মন্তব্য করল ঃ

'বাবু রাজকৃষ্ণ রায় অতি সৎ উদ্দেশ্য লইয়াই বীণা থিয়েটার স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণের নিকট বিশেষ সহানুভূতি না পাইয়া এবং নিজেরও নানা অসুবিধা ও অভিনয়-সম্প্রদায়ের মধ্যে নানারূপ গোলযোগ ঘটায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে অভিনয় বন্ধ করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, তৎপরে আর্য্য-নাট্য-সম্প্রদায় রাজকৃষ্ণ বাবুর সে উদ্দেশ্য পালন করিয়া সন্নীতিপরায়ণ ভদ্রলোকদিগের মনোরঞ্জন করিতেছিলেন। আমরা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে আর্য্য-নাট্য-সম্প্রদায়ও রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের পক্ষে ইহা একটি কম ঘৃণা এবং লজ্জার কথা নহে, যে বাঙ্গালীরা আজিও সন্নীতির পোষকতা করিতে শিখে নাই। তাহা না হইলে এক কলিকাতা সহরেই "বেঙ্গল" "ষ্টার" "এমারেল্ড" বেশ্যা অভিনেত্রী মিশ্রিত এই তিনটী রঙ্গভূমি বহুকাল হইতে নির্ব্বিবাদে চলিয়া কি প্রকারে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে? গত বৎসর কলিকাতার ষ্টার থিয়েটার কতকগুলি বেশ্যা লইয়া অভিনয় করিবার জন্য ঢাকায় গিয়াছিল, কিন্তু তথাকার ভদ্র-লোকদিগের প্রতিবন্ধকতায় তথায় অভিনয় করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাতে বোধ হয়, কলিকাতার লোক অপেক্ষা ঢাকার লোকেরা অধিক নীতিপরায়ণ। আমরা শুনিতেছি "ন্যাশন্যাল" থিয়েটারের ভূতপূর্ব্ব কার্য্যাধ্যক্ষ বহুবাজার

নিবাসী বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস সম্প্রতি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া "নিউ ন্যাশনাল" নামে একটী থিয়েটার খুলিতেছেন এবং আপাততঃ বীণা থিয়েটারের ঘর ভাড়া লইয়া সেই স্থানেই অভিনয় করাইবেন। উপেন্দ্রবাবু নাকি বেশ্যা অভিনেত্রী দ্বারা অভিনয় করাইবেন। তবে কি রাজকৃষ্ণ বাবু সামান্য ভাড়ার খাতিরে তাঁহার মহদুদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেন?'

রাজকৃষ্ণ দুঃখিত হলেন। ও-পত্রিকার সম্পাদককে চিঠি লিখলেন একখানা। চিঠিখানা আদ্যন্ত তুলে দিচ্ছি ঃ

"মহাশয়! গত ২৩শে অগ্রহায়ণ শুক্রবারের সুলভ সমাচারে দেখিলাম আমার বীণা থিয়েটার ভাড়া দেওয়া সম্বন্ধে আপনি একটি প্রস্তাব লিখিয়াছেন। আপনি দুঃখিত হইয়াছেন, আমিও দুঃখিত হইয়াছি। আমি কেবল অত্যন্ত ঋণের দায়ে আমার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের বহির্ভূত কার্য্য করিয়াছি। আমি দরিদ্র হইয়াও যাঁহাদের জন্য নিজের যাহা কিছু ছিল তাহা খোয়াইয়া, শক্তির অতীত ঋণ করিয়া যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, যার জন্য প্রাণ মন দেহ যত্ন চিন্তা পরিশ্রম এক সঙ্গে জড়াইয়া ডুব দিয়াছিলাম, তাঁহারা তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না—বুঝিয়াও বুঝিলেন না। এক বৎসরের মধ্যেই আমার সাধের আশা, সাধের যত্ন, সাধের চেষ্টা মরিয়া গেল—আমাকেও মারিয়া গেল। এখন ঋণ ও সুদের বিভীষিকায় আমি নিতান্ত অস্থির হইয়াছি। মহাজনেরা অর্থাৎ ঋণদাতারা আমার নিকট অনেক টাকা পাইবেন। আমি বই কে তাঁহাদিগকে টাকা দিবে? অথচ টাকা দিতে পারি না। সুতরাং তাঁহারা ঋণ পরিশোধের জন্য, যাহাতে বেশী টাকা আদায় হয়, সেইরূপ হিসাবে আমার বীণা থিয়েটার ভাড়া দেওয়াইলেন। আর বেশী কি বলিব, এখন আমি প্রাণ থাকিতেও মৃত। আজ যদি কেহ আমার এই দুর্ব্বিষহ ভার শিথিল করিয়া দেন, তা হইলে আমি আবার পূর্ব্বের ন্যায় আপনাকেও সন্তুষ্ট ও আপনাদিগকেও সন্তুষ্ট করিতে পারি। ঋণ যে বিষের অপেক্ষাও অতি তীব্র, তা যে ঋণবিপন্ন, সেই বুঝিতে পারে।

আপনি একস্থানে বলিয়াছেন, "তবে কি রাজকৃষ্ণ বাবু সামান্য ভাড়ার খাতিরে তাঁহার মহদুদ্দেশ্য বিস্মৃত হইলেন?" কিন্তু সম্পাদক মহাশয়, তা নয়, তা নিশ্চিত নয়। "সামান্য ভাড়ার খাতিরে" নয়, আমার পক্ষে অসামান্য ঋণের যন্ত্রণায় এই কার্য্য হইয়াছে। আপনি ত জানেন "Debt is the worst kind of poverty." ভগবান্ যদি দিন দেন, তবে এই

ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, ইচ্ছামত কার্য্য করিব। আপনি জানেন মুখের কথায় অনেকে আমাকে আকাশে তুলিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের বেলায়—ম্যাও ধরিবার বেলায় তাহারাই আবার আমাকে পাতালের নিম্নতম তলায় ফেলিয়া দিল। এখন বলুন দেখি আমার অপরাধ, না তাহাদের অপরাধ? দেশে ত অনেক রাজা, উজির, জমিদার ও বড় মেজো, ছোট কর্ম্মচারী ও ব্যবসায়ী আছেন, অনেকরূপ ধর্ম্মসম্প্রদায় আছেন, তাঁহারা যদি—বেশী নয় দুই চারি আনা এমন কি দুই চারি পয়সাও মাসে মাসে দিয়া আমায় সাহায্য করিতেন, তাহা হইলে কি আমি আজ ধনে প্রাণে সারা হইতাম? অথবা আমার যদি প্রয়োজনোপযোগী টাকা থাকিত, তাহা হইলেও আমার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতাম। আমার গন্তব্য পথে কাঁটা পড়িয়াছে। আমার মন আছে, ধন নাই; ভক্তি আছে, শক্তি নাই।

আমি এক বীণা থিয়েটার করিয়া মানবচরিত্রের কত রকম ভোজবাজী ভেল্কিবাজী দেখিলাম, তাহার সীমা নাই। বীণা থিয়েটার না হইলে বোধ হয় সংসার থিয়েটারের এই সকল সং রং দেখিতে পাইতাম না। একান্ত বশম্বদ শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।"

উপেন্দ্রনাথ দাসের দল ছ-মাস ছিল বীণা থিয়েটারে। সে-দল বিদায় নেবার পর আবার রাজকৃষ্ণ নিজের হাতে বীণা থিয়েটারের ভার তুলে নিলেন। সাব্যস্ত করলেন, স্ত্রী ভূমিকায় এবার আর বালক নয়, এবার অভিনেত্রী নিয়েই থিয়েটার চালান হবে।

১৮৮৯ সালের ২২শে জুলাই 'নববিভাকরসাধারণী' লিখেছে: 'কলিকাতার রঙ্গমঞ্চগুলি লোকের মনে এমন একটি মন্দ ধারণা করিয়া দিয়াছেন, যে নাট্যসমাজে বেশ্যা না থাকিলে, মন উঠে না। বেশ্যার রঙ্গ ভঙ্গ বেশ্যার চক্ষুর পালট নাট্যোমোদীগণের বড়ই ভাল লাগে। নির্ম্মল আমোদে মন সরে না—কিন্তু কীর্ত্তিটি নাট্য-সমাজ হইতেই ঘটিয়াছে; রাজকৃষ্ণ বাবু অনেক ব্যয় করিয়া, নির্ম্মল আমোদের জন্য বীণা রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরাও ভাবিয়াছিলাম—বীণা সুগীতি বাজাইবে কিন্তু নাট্যামোদীদের কর্ণে এবং চক্ষে পুরুষের চীৎকার পুরুষের নৃত্য ভাল লাগিবে কেন? ক্রমে ক্রমে ব্যয় কুলাইতে না পারিয়া বীণার তার ছিঁড়িয়া গেল। অনেক বিবেচনার পর রাজকৃষ্ণ বাবু বুঝিলেন, বিদ্যাধরীর করে একালে বীণা বাজান লোকের ভাল লাগিবে না। তাই এবার অবিদ্যার হস্তে বীণা দিয়াছেন।

গত শনিবার হইতে মীরাবাই নামক নাটক অভিনয়ার্থ প্রথম খুলিয়াছেন। ভাল দেখা যাক্—এবার বীণা কেমন বাজে!'

তাহলে ১৮৮৯ সালের জুলাই মাসে 'মীরাবাই' নাটক নিয়ে রাজকৃষ্ণ নতুন করে বীণা থিয়েটার খুললেন। নতুন, কেননা এবার রাজকৃষ্ণের থিয়েটারে অভিনেত্রী আছে।

১৮৮৯ সালের ৩০শে জুলাই 'অনুসন্ধান' মন্তব্য করেছেঃ 'বীণা-রঙ্গভূমি। কবিবর রাজকৃষ্ণ বাবুর নূতন নাটক 'মীরাবাই' উক্ত রঙ্গালয়ে আজকাল বড়ই দক্ষতার সহিত অভিনীত হইতেছে।'

কিন্তু 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' এবার সরাসরি রাজকৃষ্ণের বিপক্ষে দাঁড়াল। ১৮৮৯ সালের ২৬শে জুলাইয়ের 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' থেকে তুলে দিচ্ছিঃ 'আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, কবিবর রাজকৃষ্ণ বাবু অভিনেত্রী লইয়া বীণা থিয়েটারের অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন। মধ্যে যখন উপেন্দ্রবাবুকে অভিনেত্রী লইয়া বীণা থিয়েটারগৃহে অভিনয় করিবার জন্য রাজকৃষ্ণ বাবু ভাড়া দেন, তখন তাঁহার সঙ্গে আমাদের এ বিষয় লইয়া অনেক লেখালেখি হইয়াছিল। সে সময়ে রাজকৃষ্ণবাবু আমাদিগকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিয়াছিলেন যে, ঋণদায়ে পড়িয়া আমি এই কার্য্য নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও করিতে বাধ্য হইয়াছি। রাজকৃষ্ণ বাবুর নিকট আমরা ইহাও আভাস পাইয়াছিলাম যে, এইরূপ ভাড়া দিয়া তিনি ঋণমুক্ত হইয়া পুনঃ পূর্ব্বের ন্যায় নিজে অভিনয় কার্য্য আরম্ভ করিবেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি তিনি নিজেই অভিনেত্রী লইয়া থিয়েটার খুলিলেন। যদিও তাঁহার এখনও সেই উত্তর যে, ঋণদায়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে এরূপ কার্য্য করিতে হইতেছে। কিন্তু আমরা কখনই আশা করি নাই যে, রাজকৃষ্ণ বাবুর মত লোক এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, আমরা রাজকৃষ্ণ বাবুর এই কার্য্যে আন্তরিক দুঃখিত হইলাম। বীণা থিয়েটারের ঋণ শোধের কি তিনি আর কোন সদ্‌উপায় বাহির করিতে পারিলেন না?'

না, আর কোন সদুপায় বের করতে পারলেন না। এমন কি, এ-উপায়েও শেষরক্ষা হল না। অভিনয়ের জন্যে রাজকৃষ্ণ নতুন-নতুন বই লিখলেন—চমৎকার, চতুরালী, চন্দ্রাবলী, জগা পাগলা প্রভৃতি; অভিনেত্রী নিয়ে সুঅভিনয় করা গেল, কিন্তু কিছুতেই সুদিনের দেখা পাওয়া গেল না। ঋণের ভার বেড়ে উঠতে লাগল দিনে-দিনে। শেষে অবস্থা এমন

চরমে উঠল যে জনসাধারণের কাছে কৃপাপ্রার্থনা করতে হল রাজকৃষ্ণকে। সাদা কথায়, ভিক্ষা চাইতে হল।

১৮৯০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর 'অনুসন্ধানে' বেরোল ঃ

'শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায়

এই হতভাগ্য বাঙ্গালা দেশের একজন কবি। দুর্ভাগ্যক্রমে কি এক কুক্ষণে তিনি কবিতা-কানন ছাড়িয়া, দেশীয় রঙ্গভূমির সংস্কার করিতে যান। আজ তাই তিনি সর্ব্বস্ব ঘুচাইয়া বিপন্ন অবস্থায় পতিত। এমন কি, এখন যদি দেশের সহৃদয় ব্যক্তিগণ তাঁহাকে কিছু কিছু সাহায্য না করেন, তবে আর তাঁহার কোন আশাই নাই। তাই আজ তিনি সাধারণের নিকট কৃপাপ্রার্থী। এখন সকলেই যাহার যেমন সাধ্য, রাজকৃষ্ণ বাবুকে কিছু কিছু সাহায্য করিয়া তাঁহাকে বিপদ্ হইতে মুক্ত করেন, সাধারণের প্রতি আমাদের এই অনুরোধ। রাজকৃষ্ণ বাবুর ঠিকানা ৩৮নং মেছুয়া বাজার রোড, কলিকাতা।'

ঋণের দায়ে সর্বস্বান্ত হলেন রাজকৃষ্ণ। শেষপর্যন্ত তাঁর সাধের বীণা থিয়েটার গেল হাতছাড়া হয়ে। ছাপাখানাটাও বিক্রি করে দিতে হল। আয়-আদায়ের কোন পথ নেই। অবস্থা এমন যে একেকদিন সপরিবারে উপোস করে থাকতে হয়েছে রাজকৃষ্ণকে।

বড় দুঃখের দিন। মন ভেঙেছে, শরীর ভেঙেছে। রোগশয্যায় ছটফট করতে করতে রাজকৃষ্ণ একেক সময় বলতেন—ভগবান, আমার অদৃষ্টে কি মৃত্যু নেই?

কোথাও কি একবিন্দু আশা নেই? দুঃখের দিনে শেষকালে একটু ভরসা পাওয়া গেল। একশোটাকা মাইনেয় রাজকৃষ্ণ চাকরি পেলেন স্টার থিয়েটারে। ১৮৯১ সালের কথা।

কিন্তু রাজকৃষ্ণের এত সাধের বীণা থিয়েটারের কী দশা হল? ১৮৯২ সালের ২৯শে নভেম্বর 'অনুসন্ধান' লিখেছে ঃ

'ভিক্টোরিয়া অপেরা হাউস। —শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই রঙ্গভূমির স্বত্বাধিকারী। কবিবর রাজকৃষ্ণ বাবুর 'বীণা থিয়েটারটি' ক্রয় করিয়া লইয়া, তিনি তাহার সম্পূর্ণ সংস্কার করিয়া লইয়াছেন; এবং

'ভিক্টোরিয়া অপেরা হাউস' এই নামে তাহা পরিচিত হইতেছে। এখন ইহার দৃশ্যপট, সাজসজ্জা প্রভৃতি সমস্তই নূতন—প্রিয়নাথ বাবু বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া রঙ্গভূমির এই অভিনব সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। আরও একটা কথা এই উপলক্ষে বলা উচিত যে, আপাততঃ এখানে কেবলই স্ত্রীলোক দ্বারা অভিনয়-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে; আগে যেমন স্ত্রীলোকের সংস্রব ছিল না, এখন এখানে সেইরূপ পুরুষের সংস্রব নাই। সুতরাং এও একটা নূতনত্ব বলিতে হইবে।'

রাজকৃষ্ণ যেখানে মেয়েদের নামগন্ধটুকু পর্যন্ত রাখতে চান নি, সেখানেই শেষপর্যন্ত একেবারে উল্টো কাণ্ড হল, পুরুষদের নামগন্ধটুকু পর্যন্ত রইল না।

কেবলমাত্র মেয়েদের থিয়েটার! ব্যাপারটায় নতুনত্ব আছে বৈকি। এও যদি নতুন না হয় তো নতুন আর কাকে বলে।

কিন্তু নতুনের কথা রেখে আপাতত পুরনো কথায় যাই। পুরনো দিনে, পুরনো বাড়িতে। কৃষ্ণকিশোর নিয়োগীর বাড়িতে।

—ঃঃ০ঃঃ—

আট

কৃষ্ণকিশোর নিয়োগীর বাড়িতে মর্নিং স্কুল। এই স্কুলেই অর্ধেন্দুর লেখাপড়া আরম্ভ।

পাথুরেঘাটা-রাজবাড়ির স্বনামধন্য যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর অর্ধেন্দুর পিসতুতো দাদা। যতীন্দ্রমোহনের মা—অর্থাৎ অর্ধেন্দুর পিসীমা—ছেলেবেলাতেই অর্ধেন্দুকে পাথুরেঘাটা-রাজবাড়িতে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। রাজবাড়িতে অর্ধেন্দু পিসীমার কাছে থাকে। পিসীমা খুব ভালবাসেন অর্ধেন্দুকে। দিন যায়।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর থিয়েটারের ভক্ত। নিজের বাড়িতেই তিনি থিয়েটারের একটি মঞ্চ করেছেন। সেখানে মাঝে-মাঝে নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা আছে। অর্ধেন্দু যেসময়ে রাজবাড়িতে আসে, তখন রাজবাড়িতে প্রায়ই অভিনয় হত। রাজবাড়ির নাট্যাচার্য তখন নটকুলচূড়ামণি কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

অভিনয় দেখতে বালক অর্ধেন্দুর প্রচণ্ড উৎসাহ। এত উৎসাহ যে স্নানাহারের পর্যন্ত খেয়াল থাকে না। অভিনয় আরম্ভ হবার অনেক আগে থেকেই অর্ধেন্দু একটা পছন্দসই জায়গা বেছে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। ভাল জায়গায় বসে ভাল করে থিয়েটার দেখতে হবে আগাগোড়া।

একদিনের একটা শোনা গল্প শোনাচ্ছি।

সেদিন রাজবাড়িতে অভিনয় হবে। অভিনয়ের দিন রাজবাড়িতে কাজের ভিড় একটু বেশি হবারই কথা। রাত্রে থিয়েটার হবে, অতএব সন্ধ্যার পরেই বাড়ির ছোট-ছোট ছেলেদের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে দেবার বন্দোবস্ত। ছোট-ছোট ছেলেরা সবাই খেতে বসেছে, কিন্তু অর্ধেন্দুর দেখা নেই। পিসীমা জিজ্ঞেস করলেন—তোরা সবাই খেতে বসেছিস, অর্ধেন্দু কোথায়?

কে জানে অর্ধেন্দু কোথায়।

খুঁজতে-খুঁজতে পাওয়া গেল অর্ধেন্দুকে। সে থিয়েটারের আসরে একা বসে আছে। পিসীমা খেতে ডাকছেন? ডাকুন গে। আমি উঠব না,

এক ইঞ্চি নড়ব না এখান থেকে। আর-কেউ যদি এসে জায়গা দখল করে!

কিন্তু, অর্ধেন্দু, কথা শোন, থিয়েটার আরম্ভ হতে এখনও ঢের দেরি। এত আগে থাকতে কেউ আসবে না, তোমার জায়গা নিটুট থাকবে।

অর্ধেন্দু অটল। না, আমি এখান থেকে উঠব না।

থিয়েটার দেখার এমন শখের জন্যে অল্পবয়সে অর্ধেন্দুকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি, থিয়েটারের টান একবিন্দু কমে নি। অর্ধেন্দু রাজবাড়িতে অভিনয় দেখে, অভিনয়ের মহলা দেখে।

বালক অর্ধেন্দুর আরেকটা গুণের খবর বলি। অন্যের কথাবার্তা চাল-চলন ভাবভঙ্গি হুবহু নকল করতে পারে অর্ধেন্দু। অর্ধেন্দুর অনুকরণপটুত্বের পরিচয় যারা পেয়েছেন তারাই মুগ্ধ হয়েছেন।

২রা নভেম্বর, ১৮৬৭ সাল, কয়লাহাটায় 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসন অভিনীত হয়। এখানেই রঙ্গমঞ্চে প্রথম অবতীর্ণ হলেন অর্ধেন্দুশেখর। বয়স কত হবে তখন? এই ধরুন, সতেরো বছর। প্রথম দেখা গেল 'কিছু কিছু বুঝি'তে একাধিক ভূমিকায়।

যতীন্দ্রমোহনের ছোট ভাইয়ের নাম শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। শৌরীন্দ্রমোহন দন্তশূলে ভুগতেন। 'কিছু কিছু বুঝি'তে তা নিয়ে দন্তবক্রের চরিত্রে ব্যঙ্গ করা হল। অর্ধেন্দুশেখর সেই দন্তবক্রের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, অতএব অর্ধেন্দুশেখরের পিসীবাড়ি অর্ধেন্দুশেখরের ওপর খুশি হল না। অবশ্যি খুশি না হবারই কথা। এবং তার ফল খুব সুখের হল না। অর্ধেন্দুশেখরের বাবা মাসহারা পেতেন ঠাকুরবাড়ি থেকে, সেটা বন্ধ হয়ে গেল। অর্ধেন্দুশেখরের বাবা অর্ধেন্দুশেখরকে আর অভিনয় করতেই বারণ করে দিলেন।

অর্ধেন্দুশেখর রাজবাড়ি ছাড়লেন। কিন্তু অভিনয়?

একটা চমৎকার যোগাযোগ হয়ে গেল।

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'কিছু কিছু বুঝি'তে অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয় দেখে বিমোহিত। এই অত্যুৎকৃষ্ট অভিনেতার কথা নগেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে জানালেন। তারপর গিরিশচন্দ্রের আগ্রহে নগেন্দ্রনাথ অর্ধেন্দুশেখরকে নিয়ে এলেন। এঁদের দলেই ভর্তি হয়ে গেলেন অর্ধেন্দুশেখর। এই দলে তখন 'সধবার একাদশী' নাটকাভিনয়ের আয়োজন হচ্ছে।

সেই 'সধবার একাদশী' থেকে আরম্ভ করে দীনবন্ধু মিত্রের অনেক নাটকে

নানা চরিত্রে প্রথম থেকেই অর্দ্ধেন্দুশেখর অসাধারণ নাট্যনৈপুণ্য দেখিয়েছেন। প্রত্যেক ভূমিকাভিনয়ই বিস্ময়কর; প্রশংসায় কলকাতা পরিপূর্ণ। "প্রতি গ্রন্থে অর্দ্ধেন্দু প্রধান ও অতুলনীয়!"— গিরিশচন্দ্রের ভাষায় বলা হচ্ছে··· "তন্মধ্যে 'নবীন তপস্বিনীর' জলধরের অভিনয় অতুলনীয়ের মধ্যে অতুলনীয়।"

ন্যাশনাল থিয়েটারে শিশিরকুমার ঘোষের 'নয়শো রুপেয়া' নাটকে অর্দ্ধেন্দু-শেখর ছাতুলাল সাজলেন। সেবার অনেকেই শিশিরকুমারের সামনে অর্দ্ধেন্দুশেখরকে দেখিয়ে বলেছেন—ছাতুলালের ভূমিকায় এই বাবুটির যে-অভিনয় দেখলাম, এমনটি যে কোনও বিলাতী থিয়েটারে কোনও অভিনেতা পারে, তা আমাদের বিশ্বাস হয় না।

গিরিশচন্দ্র যথার্থ বলেছেন···অর্দ্ধেন্দু যে অংশ স্পর্শ করিতেন, তাহাই অননুকরণীয় হইত।

যা হোক, দলভেদ হল। গিরিশচন্দ্র দল ছেড়ে চলে গেলেন; কিন্তু যেসব নাটকে গিরিশচন্দ্র আর অর্দ্ধেন্দুশেখর একত্রে অভিনয় করেছিলেন তার প্রত্যেকটাতেই গিরিশচন্দ্রের ছিল নায়কের ভূমিকা, অর্দ্ধেন্দুশেখরের হাস্যরসোদ্দীপক ভূমিকা।

এবার একটা মজার ঘটনা শোনা যেতে পারে। ঘটনাটি বিনোদিনী চমৎকার বর্ণনা করেছেন ঃ

'একবার অর্দ্ধেন্দুবাবুর মুখে-মুখে-গড়া একটি প্রহসন আমাদের প্লে করতে হয়েছিল। সে ভারি মজার। অভিনয় শেষ হয়ে গেল, কিন্তু বৃষ্টি আর থামে না। দর্শকবৃন্দ ভারি চঞ্চল হয়ে উঠল। আমরাও যে কি করি বসে বসে তাই ভাবছি, এমন সময় অর্দ্ধেন্দুবাবু বললেন, "র'স, একটা কাজ করা যাক, ধর্ম্মদাস, তুমি বাইরে বেরিয়ে বল, মশায়রা ব্যস্ত হবেন না, একখানি ছোট প্রহসন দেখুন; আপনাদের শুধু শুধু বসে থাকতে হবে না; আর তার মধ্যে বৃষ্টিও ধরে যেতে পারে।"

প্রহসনের নাম হল "মুস্তফি সাহেব্ কা পাক্কা তামাসা"। অর্দ্ধেন্দুবাবু হলেন মুস্তফি সাহেব, ক্ষেতুদিদি হল তার মা, আর আমি লালপেড়ে সাড়ী পরে হলাম তার বৌ। রিহার্সাল মুখে মুখে চলল।

সঙ্গে সঙ্গে সিন সাজান হতে লাগল। একখানি ভাঙ্গা একতলা ঘরের সিন দেওয়া হল। ইট সাজিয়ে পায়া করে তার ওপর তক্তা পেতে টেবিল করা হয়ে গেল, সাদা ছেঁড়া থানের খানিকটা সেই টেবিলের ওপর বিছিয়ে

দিয়ে চাদরের অভাব পূরণ করা হল।

এদিকে দশ মিনিট বিশ্রামের পর কনসার্ট বাজতে লাগল। অর্দ্ধেন্দুবাবু সাজঘরে গিয়ে অনেক দিনের একটা পুরাণ ইজের, আর একটা ছেঁড়া কোট পরে হাতে মুখে কালি মেখে ত বেরিয়ে পড়লেন। আমাকে সেই ভাঙ্গা সিনের পাশে দাঁড় করিয়ে রেখে বলে গেলেন, "তুই একবার একবার উঁকি মেরে দেখবি, আর ভয়ে মুখ সরিয়ে নিবি।" ক্ষেতুদিদিকে বড় কিছু বলতে হত না, একটু আভাষ দিলেই সে সব ঠিক করে নিতে পারত।

মুস্তফি সাহেব ত বেরিয়ে সেই ভাঙা টেবিলের ওপর সাহেবী ধরণে বসে এক হাতে কুশী আর এক হাতে গুণ-ছুঁচ না নিয়ে শুক্‌নো পাঁউরুটি খেতে লাগলেন, আর সাহেবের মত ঘাড় বেঁকিয়ে দর্শকদের দিকে চাইতে লাগলেন। তাঁর কিছু বলবার আগেই তাঁর সেই মিটির মিটির চাউনি আর সাহেবী ভাবভঙ্গী দেখে দর্শকেরা ত হেসেই অস্থির। এর ওপর মুস্তফি সাহেবের কথা! যাক।

সাহেব ছেলে, শুধু শুক্‌নো পাঁউরুটি দাঁত দিয়ে টেনে টেনে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে খাচ্ছে দেখে মা বধূকে বল্লেন, "আমাদের ছোলার ডাল আর একটু মোচার ঘণ্ট এনে দাও ত মা।" বালিকা-বধূ তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর থেকে একটা বাটিতে ছোলার ডাল ও একখানি রেকাবিতে একটু মোচার ঘণ্ট এনে মার হাতে দিলেন। মা ভয়ে ভয়ে টেবিলের কাছে গিয়ে অতি আস্তে আস্তে বললেন, "বাবা শুধু রুটি খাচ্ছিস্, একটু ডাল আর এই তরকারিটুকু দিয়ে খা।" এই আর কোথা আছে! সাহেবকে বাঙালির তরকারি খেতে বলা! সাহেব ত লাফিয়ে উঠে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চীৎকার করে উঠলেন, "কা! হামি বাঙ্গালা তরকারি খাতা?" রকম দেখে ভয়ে হাত পা কেঁপে মার হাত থেকে ডালের বাটি আর মোচার ঘণ্ট মেজের ওপর ছড়িয়ে পড়ল। মা ভয়ে ভয়ে বৌয়ের হাত ধরে ঘরের ভেতর চলে গেল। কিন্তু সেই শুক্‌নো তেবাস্‌টে রুটি ত আর গেলা যায় না। তাই এদিক ওদিক চেয়ে সেই ছড়ান ডাল আর একটু মোচার ঘণ্ট মেজের ওপর থেকে তুলে নিয়ে খেয়ে সাহেব এমনই মুখভঙ্গী করলেন যে তাতে বেশ বোঝা গেল, তরকারিটুকু তাঁর খুব ভাল লেগেছে।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দরজার দিকে তাকিয়ে 'এমা, এমা, আম্‌মা' বলে ডাকা আর চারিদিকে চাওয়া; ছেলের গলা পেয়ে মার, 'কি বাবা কি বাবা' বলতে

বলতে ব্যস্তভাবে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ান, সাহেবের সেই ছোলার ডাল দেখিয়ে দিয়ে বলা, "এমা, এ—মাফিক কেয়া লে আয়া? দেও তো হামাকে";—মার অমনই ব্যস্তসমস্ত ভাবে "খাবে বাবা, আন্‌ব বাবা" বলে চলে যাওয়া—সে সব দৃশ্য যে না দেখেছে সে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। ক্ষেতুদিদির তখনকার কি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী, কি তদ্গতভাব দৃষ্টি!

এমন সময় মিউনিসিপিলিটির একজন চাপরাশি একখানা নোটিশ হাতে করে সেখানে এসে উপস্থিত। রাস্তায় এক মুটো জঞ্জাল ফেলা হয়েছে এ তারই নোটিশ। সে এসে যেমন বলা, "সাপো, নটিশ অছিঃ" অমনি সাহেব তাকে তেড়ে গিয়ে বললেন, "এই কালা বাঙ্গালী নীচু যা আবি।" উড়ে ত তার রকম দেখে, হুপা সরে গিয়ে বললে, "ও বাবা, নীচু যাব কোথা, পাতকোয়ার ভেতর না কি?" এই বলে ত সে চলে গেল। তারপর মুস্তফি সাহেবের পা তুলে তুলে কি পল্‌কা নাচ; সে লম্বা লম্বা ঠ্যাং উঁচু করে কি লাফান, আর তাঁর সঙ্গে গান।...

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দর্শকের দিকে সভঙ্গী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ। দর্শকদের মধ্যে যে কি রকম হাসির রোল পড়ে গেল, তা সবাই বুঝতে পারচেন, আমার না বললেও হয়।

এই ভাবে তিনি দু'ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন। বৃষ্টিও ধরে গেল, দর্শকরা আনন্দ করতে করতে যে যার বাড়ী চলে গেলেন। আমরাও হেসে লুটোপুটি খেতে খেতে বাড়ী ফিরলাম।...'

প্রতাপচাঁদ জহুরীর থিয়েটারে গিরিশচন্দ্র যখন ম্যানেজার হলেন, অর্ধেন্দুশেখর তখন কলকাতায় ছিলেন না। গিরিশচন্দ্র ছাড়বার পর প্রতাপচাঁদের থিয়েটারের ম্যানেজার হলেন কেদারনাথ চৌধুরী। সেখানেই অর্ধেন্দুশেখরকে দেখতে পাচ্ছি।

তারপর কেদারনাথ চৌধুরীকে দেখা যাচ্ছে এমারেল্ড থিয়েটারে। কেদারনাথ এমারেল্ডের প্রথম ম্যানেজার। অর্ধেন্দুশেখর কেদার নাথের সঙ্গে এমারেল্ডে আছেন। ১৮৮৭ সালের কথা। ১৮৮৭ সালের একেবারে শেষের দিকে গিরিশচন্দ্র এমারেল্ডে ম্যানেজার হয়ে এলেন। সঙ্গে-সঙ্গে কেদারনাথ এমারেল্ড ছেড়ে চলে গেলেন, অর্ধেন্দুশেখরও কেদারনাথের অনুবর্তী।

সদলে মফস্বলে নানা স্থানে অভিনয় করেছেন অর্ধেন্দুশেখর। অনেক নাট্যসম্প্রদায় অর্ধেন্দুশেখর গড়ে দিয়েছেন। নাট্যসম্প্রদায়ের দুর্দিনে অর্ধেন্দুশেখর পরম বন্ধু। কিন্তু সুদিনে? সুদিনে অর্ধেন্দুশেখর কেউ নয়।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: 'অর্ধেন্দুশেখর দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন, দুঃস্থ নাট্যসম্প্রদায় তাঁহার দ্বারা যত উপকৃত হইয়াছে, তত উপকৃত আর কাহারও দ্বারা হয় নাই। যখনই কোন নাট্যসম্প্রদায় অভাবগ্রস্ত হইয়াছেন, সেই সম্প্রদায় যখন দর্শক আকর্ষণে আর সমর্থ নহেন, ভাঙ্গা দলে অর্থাভাবে যখন নামজাদা অভিনেতা অভিনেত্রীর অভাব, তখনই সেই সকল সম্প্রদায় অর্ধেন্দুশেখরের দ্বারস্থ হইয়াছেন। অর্ধেন্দুশেখরও মুক্তপ্রাণে অর্থের বা স্বার্থের আশা না রাখিয়া সেই সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়াছেন, তাহাদের শিক্ষা দিয়াছেন, এবং সেই সম্প্রদায়কে দর্শনোপযোগী করিয়া দর্শকের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। অর্ধেন্দুশেখরের অদৃষ্ট মন্দ, তিনি কিন্তু কখনও তাঁহার এই সকল মহৎ কার্য্যের ফলভোগ করিবার সুযোগ পান নাই। অর্ধেন্দু শেখরের সাহায্যে দুর্দশা কাটিয়া গেলেই ঐ সকল সম্প্রদায় অর্থ সামর্থ্যে আবার লক্ষ্মীর বরপুত্র বড় হাতী আনিয়া পুষিতেন কিন্তু অর্ধেন্দুর দিকে ফিরিয়া দেখিতেন না। মহাপুরুষ অর্ধেন্দুও সেজন্যে কখনও কোন অনিষ্ট ব্যবহার করিয়া মহত্ত্ব হইতে ভ্রষ্ট হন নাই।'

দীর্ঘকাল বাদে মিনার্ভা থিয়েটারে অর্ধেন্দুশেখর আর গিরিশচন্দ্র আবার একত্রিত হলেন। মিনার্ভায় অর্ধেন্দুশেখর 'ম্যাকবেথে' একাই একাধিক ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করলেন। তারপর অর্ধেন্দুশেখর 'আবুহোসেনে' আবুহোসেন সেজেছেন, 'মুকুলমুঞ্জরা'য় বরুণচাঁদ, 'জনা'য় বিদূষক প্রভৃতি।

অর্ধেন্দুশেখরের আবুহোসেন দেখে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র বলেছেন—অর্ধেন্দু, তোমার জুড়ি নেই। তোমার তুলনা কেবল তুমিই।

সেসময়ে অর্ধেন্দুশেখর একদিন বলেছেন—গিরিশ ঘোষের মত নাট্যকার আমিও কখনও পাব না, তাঁর নাটক ফুটিয়ে তুলতে আমার মত অভিনেতা গিরিশ ঘোষও কখনও পাবে না।

তারপর একদিন অর্ধেন্দুশেখর মিনার্ভা ছেড়ে চলে গেলেন।

অনেক আগেই বলা হয়েছে, গোপাললাল শীলের কাছ থেকে এমারেল্ড থিয়েটার ইজারা নিয়েছিলেন হরিভূষণ ভট্টাচার্য, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, মতিলাল

সুর, ব্রজলাল মিত্র। বছরখানেক বাদে আবার এমারেল্ড থিয়েটারের ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন গোপাললাল; সেবার তাঁর থিয়েটারের ডিরেক্টর হলেন মনোমোহন বসু, ম্যানেজার হলেন কেদারনাথ চৌধুরী।

১৮৯২ সালের জুনমাস থেকে দেখা যাচ্ছে এমারেল্ড থিয়েটার ইজারা নিয়েছেন মহেন্দ্রলাল বসু আর অতুলকৃষ্ণ মিত্র। তারপর দেখতে পাচ্ছি মিনার্ভা ছেড়ে এসে অর্ধেন্দুশেখর ১৮৯৪ সালে এমারেল্ড থিয়েটার ইজারা নিলেন।

এমারেল্ড থিয়েটারের দল একদিন নৌকোয় করে মফস্বলে থিয়েটার করতে যাচ্ছে। অর্ধেন্দুশেখরও আছেন সেই নৌকোয়।

সন্ধ্যার সময় দেখা গেল দূর থেকে একখানা ছিপ তীরবেগে এই নৌকোর দিকে ছুটে আসছে। নৌকোর মাঝিরা বলল—হুজুর, ওরা ডাকাত, ছিপে চড়ে এসে নৌকোয়-নৌকোয় ডাকাতি করে।

জলপথে রাত্রে যদি ডাকাত এসে পড়ে তো এই নিরস্ত্র অভিনেতাদের বাঁচবার উপায় কি। অভিনেতারা ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

অর্ধেন্দুশেখর গম্ভীরমুখে বললেন—চুপ, চ্যাঁচাস নি। যা বলি, তাই কর তাড়াতাড়ি। নৌকোয় ড্রেসের বাক্স আছে। চটপট সাহেবের আর কনষ্টেবলের পোশাকগুলো বের কর।

অর্ধেন্দুশেখর সাহেব সাজলেন। কয়েকজন অভিনেতাকে কনষ্টেবল সাজালেন। অভিনয়ের জন্যে একটা নকল বন্দুকও ছিল নৌকোয়। সাহেব-বেশে অর্ধেন্দুশেখর সেই বন্দুক হাতে নিয়ে কনষ্টেবলরূপী কয়েকজন অভিনেতার সঙ্গে নৌকোর বাইরের দিকে এসে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে ডাকাতের ছিপও এসে পড়েছে কাছাকাছি। সাহেববেশী অর্ধেন্দুশেখর পুরোপাক্কা মিলিটারি কায়দায় বন্দুক তুলে হাঁকলেন—who comes there?

আর কি ডাকাতেরা আসে! পলকে তারা ছিপ ঘুরিয়ে উধাও হয়ে গেল।

অর্ধেন্দুশেখর শিল্পী, ব্যবসায়ী নন। বিষয়বুদ্ধি প্রখর না হলে থিয়েটারের ব্যবসাতেও লাভ হবার কথা নয়। অর্ধেন্দুশেখর এমারেল্ড ইজারা নিয়ে লোকসান দিলেন, থিয়েটার রাখতে পারলেন না। নিজে থিয়েটার চালাতে গিয়ে অর্ধেন্দুশেখর বলতে গেলে সর্বস্বান্ত হলেন; ঋণের দায়ে বসতবাড়িখানা পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে হল।

১৯০২ সালে অর্ধেন্দুশেখরকে অরোরা থিয়েটারে দেখতে পাচ্ছি। বেঙ্গল-স্টেজে অরোরা অভিনয় করে। 'রিজিয়া' নাটকে ঘাতক সেজেছেন অর্ধেন্দুশেখর।

তারপর স্টার থিয়েটারে চলে আসি। স্টারে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকের মহলা চলছে। অর্ধেন্দুশেখর তখন স্টারে। বলা বাহুল্য, অভিনয় শেখানোর ভার অর্ধেন্দুশেখরের ওপর। মন্মথমোহন বসু একদিন রাত্রে ক্ষীরোদপ্রসাদের সঙ্গে 'প্রতাপাদিত্যে'র রিহার্সাল দেখতে গেলেন।

রিহার্সাল দেখে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরবার পথে ক্ষীরোদপ্রসাদ মন্মথ-মোহনকে বললেন—সমস্ত চরিত্রই আমার মনের মত হয়েছে, কিন্তু বিক্রমাদিত্য ভূমিকাটি খারাপ হয়ে গেল বলে আমার মনে হয়। ও ভূমিকাটি ঠিক হচ্ছে না।

মন্মথমোহন বললেন—কথাটা আপনি অর্ধেন্দুবাবুকে বললেন না কেন?

ক্ষীরোদপ্রসাদ বললেন—সর্বনাশ! সাহেব তাহলে চটে লাল হয়ে যেতেন। ওর এটাই হল সবচেয়ে দোষ যে উনি কারও কথা শোনেন না।

মন্মথমোহন ক্ষীরোদপ্রসাদের কথায় সায় দিলেন না। বললেন—আপনি না পারেন তো কথাটা কাল আমি অর্ধেন্দুবাবুকে বলব।

পরদিন সকালে অর্ধেন্দুশেখরের সঙ্গে দেখা করলেন মন্মথমোহন, তাঁকে খোলাখুলি বললেন বিক্রমাদিত্য ভূমিকার কথা। সব শুনে অর্ধেন্দুশেখর হাসতে-হাসতে বললেন—তুমি যা বললে ভায়া ওকথাটা যে আমি ভাবি নি তা নয়। কিন্তু একখানা ভূমিকা নিয়েই তো একখানা নাটক হয় না। নাটকের সব চরিত্রগুলোরই সামঞ্জস্য রাখা দরকার। বিক্রমাদিত্যের চরিত্রটা একটু লঘু না করলে বসন্তরায়ের ভূমিকাটি কেমন করে ফুটবে?

অর্ধেন্দুশেখর বিক্রমাদিত্যকে যেমনটি করেছেন তেমনটিই অনবদ্য হয়েছে।

১৯০৩ সালের ১৫ই আগষ্ট স্টারে 'প্রতাপাদিত্য' অভিনীত হল। অর্ধেন্দুশেখর বিক্রমাদিত্য ও রডার ভূমিকায় অবতীর্ণ। জনসাধারণ অর্ধেন্দু-শেখরের প্রশংসায় উল্লসিত।

১৯০৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর মিনার্ভায় 'প্রতাপাদিত্য' খোলা হল। অর্ধেন্দুশেখর তখন মিনার্ভায় এসেছেন।

অর্ধেন্দুশেখরের পরামর্শেই মিনার্ভা 'প্রতাপাদিত্যে'র আয়োজন করেছে। স্টারে যে-রকম হয়েছে মিনার্ভায় 'প্রতাপাদিত্য' ঠিক সেরকম হয় নি। অর্ধেন্দুশেখর অভিনয়ের ধারায় কিছু-কিছু অদলবদল করেছেন। একটা উদাহরণ দিই। কল্যাণীকে প্রতাপ দুর্বৃত্তদের হাত থেকে উদ্ধার করল; স্টারে এই দৃশ্যে কল্যাণী সজ্ঞানে দাঁড়িয়ে থাকত, কিন্তু মিনার্ভায় এই দৃশ্যে, অর্ধেন্দুশেখরের ইচ্ছায়, কল্যাণী অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত।

কল্যাণীর ভূমিকা তারাসুন্দরীর। মিনার্ভায় 'প্রতাপাদিত্যে'র প্রথম অভিনয়রজনীতেই এই মূর্ছা-পতনের দৃশ্যে দর্শকবৃন্দ হেসে উঠল। তারাসুন্দরী অর্ধেন্দুশেখরকে বললেন—সাহেব, লোকে যে হেসে উঠল, এ তো নিলে না।

অর্ধেন্দুশেখর তারাসুন্দরীর পিঠ চাপড়ে আশ্বাস দিলেন—কোন ভয় নেই, ক্রমশ নিতে শিখবে।

অর্ধেন্দুশেখরের আশ্বাসবাক্য ব্যর্থ হয় নি। মিনার্ভায় 'প্রতাপাদিত্যে'র প্রথম রাত্রির বিক্রি মাত্র ২২৭৲ টাকা। পরে হাজারের ওপর উঠেছে।

মিনার্ভায় নানা নাটকে নানা ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অর্ধেন্দুশেখর। 'বলিদানে' রূপচাঁদ, 'রাণাপ্রতাপে' পৃথ্বীরাজ, 'সিরাজদ্দৌলা'য় ড্রেক, 'বাসরে' বিধাতাপুরুষ, 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিদ্যাদিগ্‌গজ, 'মীরকাসিমে' হলওয়েল, হে, মেজর আডামস্, 'প্রফুল্লে' রমেশ।

একবার মিনার্ভা থিয়েটারের দল হাটোয়ার রাণীর বাড়িতে অভিনয় করতে গেছে। 'নবীন তপস্বিনী'র অভিনয় হবে সেখানে। অর্ধেন্দুশেখরের জলধরের ভূমিকা।

অভিনয় আরম্ভ হল। তা তো হল, কিন্তু দর্শকদের মধ্যে সেদিন মাত্র দু-একজন বাঙালী, বাদবাকি সব সাহেব। সাহেবরা 'নবীন তপস্বিনী'র বাঙলা কথার মর্ম বুঝবে কি। বেগতিক।

বেগতিক দেখে জলধররূপী অর্ধেন্দুশেখর বাঙলায় সংলাপ বলবার পরক্ষণেই তার তর্জমা করে ইংরেজীতে বলে যেতে লাগলেন। ভাবি, কী অসাধারণ ক্ষমতা থাকলে এমন কাণ্ড করা যায়।

মিনার্ভায় 'বলিদানে'র প্রথম অভিনয় হয় ১৯০৫ সালের ৮ই এপ্রিল। 'বলিদানে' করুণাময়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র। দুচার রাত্রি অভিনয়ের পর তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। গিরিশচন্দ্রের বদলে করুণাময় সাজবেন কে? কেউ রাজী হয় না। ওদিকে গিরিশচন্দ্রও চান না যে তাঁর অভাবে 'বলিদান' বন্ধ হয়ে থাকে।

গিরিশচন্দ্র ম্যানেজারকে বললেন—দু-রাত্রি যদি চালিয়ে দিতে পার, বোধ হয় পরে আমি সাজতে পারব।

কিন্তু এই দু-রাত্রিই বা কে চালিয়ে দিতে পারে?

ভেবে-চিন্তে গিরিশচন্দ্র বললেন—পারে এক অর্ধেন্দু। তবে তাকে যদি এ-কদিন নজরবন্দী রাখতে পার, আর কোনরকমে পার্টটি মুখস্থ করিয়ে দিতে পার।

অর্ধেন্দুশেখর অহোরাত্র মদ খান। উপরন্তু, ইদানীং তিনি পার্ট মুখস্থ করতেন না।

সোমবার অর্ধেন্দুশেখরকে গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছা জানিয়ে দেওয়া হল—আগামী শনিবার আপনি করুণাময় সাজবেন।

সে-প্রস্তাব অর্ধেন্দুশেখর এককথায় নস্যাৎ করে দিলেন—বলিস কী? ও-পার্ট যে গিরিশ জ্বালিয়ে দিয়েছে! ও-পার্ট আর কাউকে ছুঁতে হবে না।

—উপায় কি। বই বন্ধ দিলে যে বইখানা একেবারে যায়। আর সবচেয়ে বড় কথা, বিপক্ষদল যে হাসবে। বলবে, ওদের দলে এমন একটা লোক নেই যে করুণাময় সাজে!

অর্ধেন্দুশেখর বললেন—বলুকগে * * রা! এ কি ছেলের হাতে মোয়া! যারা বলবে তারা এর বোঝে কি?

অনেক ধরাধরির ফলে অর্ধেন্দুশেখর অবশ্যি শেষপর্যন্ত রাজী হলেন। সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত অর্ধেন্দুশেখর বাড়ি গেলেন না, মদ ছুঁলেন না, দিনরাত একাগ্রমনে 'করুণাময়ে'র জন্যে তৈরি হতে লাগলেন। চোখে ভাল দেখতে পান না, আরেকজন মুখে-মুখে পার্ট বলে যায়, অর্ধেন্দুশেখর পার্ট মুখস্থ করেন।

শনিবার করুণাময় সাজলেন অর্ধেন্দুশেখর। একজন প্রত্যক্ষদর্শী পরবর্তী-কালে ব্যক্ত করেছেন—গিরিশচন্দ্রের পর এ-পর্য্যন্ত যত করুণাময় দেখিয়াছি, অর্ধেন্দু-করুণাময়ের মত করুণাময় আর দেখি নাই।

সত্যি, করুণাময়ের ভূমিকায় ভারি সুন্দর, মর্মস্পর্শী অভিনয় করলেন অর্ধেন্দুশেখর। খুব সুখ্যাতি হল। এই করুণাময়ের ভূমিকাভিনয় সূত্রে গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখর সম্পর্কে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন:

'গিরিশচন্দ্রের করুণাময় যাহা বলে, যাহা করে, তাহা কন্যাদায়গ্রস্ত কেরাণীর মত হইলেও সাধারণ কেরাণী বা সাধারণ কন্যাদায়গ্রস্ত বাপের মত নহে। সে করুণাময়ের বাক্যে ও কার্য্যে যেন অন্তর্নিহিত এমন একটা গভীর ভাব আছে, যাহা বাহিরে সহজে ধরা যায় না, কিন্তু মর্ম্মে অনুভব করা যায়। একটা প্রচ্ছন্ন বিষাদ, একটা প্রচ্ছন্ন মহত্ত্ব, একটা প্রচ্ছন্ন উদার হৃদয়, একটা প্রচ্ছন্ন বেদনা, একটা প্রচ্ছন্ন সত্যনিষ্ঠা, একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান! —এই অভিমানকে, এই বিষাদক্ষিপ্ন ভাবকে চাপা দিয়া করুণাময় আফিসে যায়, অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহের জন্য বরের বাপের দ্বারস্থ হয়,

পণের টাকা সংগ্রহ করিতে বাড়ী বাঁধা দেয়, পাওনাদারের তাগাদা সহ্য করে, কিন্তু Insolvent court এ যায় না, আর মেয়েগুলোকে অনিচ্ছায় অপাত্রে দিয়া মর্ম্মের আগুনে গুমরিয়া পোড়ে। এ করুণাময়ের অন্তরে যৌবনের প্রথম দিনে যেন উচ্চাভিলাষের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া নিভিয়া গিয়াছে, কিন্তু অঙ্গারের উত্তাপ দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বক্ষ রক্তকে শুকাইয়া দিতেছে। সাহেবের করুণাময় হইত ঠিক সাধারণ গৃহস্থ বাপ। মমতাকাতর, দারিদ্র্যে ম্রিয়মান্, কন্যাদায়ে উদ্বাস্ত এবং সংসারচক্রে নিষ্পেষিত সাধারণ মানব। সাহেবের এ ভঙ্গীর অভিনয় দেখিয়াও দর্শক কাঁদিত এবং গিরিশচন্দ্রের করুণাময় দেখিয়াও দর্শকের চক্ষে জল ঝরিত। কিন্তু এই দুই চোখের জলেরও প্রভেদ ছিল। সাহেবের অভিনয় দেখিয়া চোখের জল পড়িত বটে, কিন্তু তাহাতে গলা শুকাইত না; মনে হইত না যে, বুকের মধ্যে সব যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে; মনে হইত না—পরিচিতকণ্ঠে কে যেন ক্রন্দনের গুঞ্জনরোল কানের কাছে তুলিয়াছে; মনে হইত না যে, কেহ যেন বক্ষের পঞ্জর একখানির পর একখানি করিয়া খুলিয়া লইতেছে। যে দৃশ্যে হিরণ্ময়ী পুকুরে ডুবিয়া মরে, সেই দৃশ্যে তাহার মৃতদেহ দেখিয়া অর্দ্ধেন্দুশেখর মমতাবিগলিত চক্ষের ধারে বক্ষ ভাসাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন, "এই যে, খুঁজে পাওয়া গিয়েছে! তাইত বলি, আমার শান্ত মেয়ে, রাস্তায় যাবে না" ইত্যাদি। এ ক্রন্দনে দর্শকও কাঁদিতেন, কিন্তু গিরিশচন্দ্র যখন এই কথা বলিতেন, তখন তার চক্ষে জল কোথায়! দেহের সমস্ত রস যেন শুকাইয়া গিয়াছে, শোণিত প্রবাহ স্তব্ধ, নিষ্পলক-নেত্রে জমাটবাঁধা মেঘ, কণ্ঠস্বর শুষ্ক, ভগ্ন, গভীর! এ চিত্র দেখিয়া দর্শকের অন্তরের অন্তর হইতে কে যেন হাহাকার করিয়া উঠিত, কোন্ অপরিজ্ঞাত শোক—কোথায় ছিল, কখন আসিল—দম্‌কা ঝড়ের মত অলক্ষ্যে, নিমিষে, সব যেন ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়া গেল! গিরিশচন্দ্রের করুণাময় দর্শককে অনুসরণ করিত। অভিনয়ান্তে—পথে, গৃহদ্বারে, অন্ধকার শয়নকক্ষে, আহারে, নিদ্রায় স্বপ্নে, অভিনয় দেখার দু-তিন দিন পরেও এ করুণাময়ের প্রভাব দর্শককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। সাহেবের অভিনয়ে সমস্ত নাটকের প্রভাব দর্শককে আকুল করিয়া তুলিত; কিন্তু গিরিশচন্দ্রের অভিনয়ে নাটকের সকল ঘটনা চাপা দিয়া মানসচক্ষে কেবল দেখা দিত—করুণাময়, বজ্রাহত তরুর ন্যায়, পত্রপুষ্পহীন, বিদগ্ধ কাষ্ঠখণ্ডের মত! গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে এই দুই

করুণাময় আলোচনায় তিনি বলিয়াছিলেন, "করুণাময় যদি ও দৃশ্যে কাঁদে, তাহলে সে আর গলায় দড়ি দিতে পারে না।"

মূলকথায় ফিরে যাই। মিনার্ভার পর কোহিনুর। এই কোহিনুরই অর্ধেন্দুশেখরের শেষ কর্মক্ষেত্র। এই কোহিনুর থিয়েটারেই অর্ধেন্দুশেখর জীবনের শেষ অভিনয় দেখিয়েছেন।

সেদিন রবিবার। আগেই প্রোগ্রাম ছাপান হয়ে গেছে—'প্রফুল্ল' আর 'নবীন তপস্বিনী' হবে। অর্ধেন্দুশেখর সাজবেন 'প্রফুল্লে' যোগেশ আর 'নবীন তপস্বিনী'তে জলধর।

প্রোগ্রাম ছাপা হবার পর অর্ধেন্দুশেখর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শনিবার অর্ধেন্দুশেখরকে বলে দেওয়া হল—কাল আর আপনার অভিনয় করে কাজ নেই।

কিন্তু কে কার কথা শোনে, অভিনয়ের দিন অর্ধেন্দুশেখর সকলের আগে বিকেল চারটের সময় থিয়েটারে এসে উপস্থিত। পাছে আর কেউ যোগেশ সাজে, অর্ধেন্দুশেখর ড্রেসারকে ডাকিয়ে আগে থাকতেই যোগেশ সেজে বসে রইলেন।

সন্ধ্যার পর অভিনয় আরম্ভ হবে। অপরেশচন্দ্র অর্ধেন্দুশেখরকে বললেন—আপনার অসুখ, কদিন কিছু খান নি, আজ যদি সমস্ত রাত জেগে অভিনয় করেন তো অসুখ বেড়ে যাবে।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন—বাধা দিও না বাবা। আমি যতক্ষণ দাঁড়াতে পারব আর কথা কইতে পারব, ততক্ষণ সাজব, সাজতেই আমি এসেছি। অভিনয় করতে-করতে স্টেজেই যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহলে জানব আমার গঙ্গালাভ হয়েছে, আমার আর অন্য গঙ্গার দরকার নেই।

অর্ধেন্দুশেখর সেরাত্রে যোগেশ সাজলেন, জলধর সাজলেন। পরদিন সকালে তাঁর আর উঠবার শক্তি রইল না। শয্যাশায়ী অর্ধেন্দুশেখরকে নিয়ে যাওয়া হল—না, তাঁর নিজের বাড়িতে নয়—তাঁর শিষ্য থাকোবাবুর বাড়িতে। নিজের বাড়িতে যেতে চাইলেন না তিনি। বললেন—না, বাড়িতে টিকতে পারব না। থাকোর ওখানে তবু পাঁচটা থিয়েটারের কথা হবে, থাকব ভাল।

না, ভয়ের বোধ হয় কিছু নেই। আশা হল, অর্ধেন্দুশেখর সুস্থ হয়ে উঠবেন। অর্ধেন্দুশেখর ঠিক করলেন, হাওয়া-বদল করতে বেনারস যাবেন।

অর্ধেন্দুশেখরের ছেলের মুখে সেকথা শুনলেন গিরিশচন্দ্র। এবং আপত্তি

করলেন। অর্ধেন্দুশেখরের ছেলেকে গিরিশচন্দ্র বললেন—কিছুতেই অর্ধেন্দুকে নিয়ে অন্য কোথাও যেয়ো না। অনেকদিন অসুখে ভুগলে রোগী নিজের ইচ্ছায় চলতে চায়, তুমি সঙ্গে থাকলেও হয়তো সামলাতে পারবে না।

অর্ধেন্দুশেখরের ছেলে গিরিশচন্দ্রকে বললেন—তিনি যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন, তাঁকে ফেরান আর সহজ নয়।

আর কিছুতেই ফেরান গেল না। সকল বন্ধন ক্ষয় করে অর্ধেন্দুশেখর চিরকালের জন্যে এই মর্তভূমি ছেড়ে চলে গেলেন।

কেউ-কেউ বলেছেন, গিরিশচন্দ্র আর অর্ধেন্দুশেখর পরস্পর বিরোধী। ভুল, ভুল, মহাভুল। অনেক সময়ে দুজনে দুই বিরোধী থিয়েটারে কাজ করেছেন, কিন্তু তাতে কি। অর্ধেন্দুশেখর বহুবার বলেছেন—গিরিশ ঘোষ যদি আগে মরে তো আমি ছাড়া আর কাঁদবার লোক নেই। আর আমি যদি আগে মরি তো গিরিশ ঘোষ ছাড়া আর কাঁদবার লোক নেই।

বলুন, এ কি বিরুদ্ধবাদীর কথা?

আরও একটা দামী ব্যাপার শুনতে পাই। দুজনে এক থিয়েটারে কাজ করেছেন অনেকদিন; কিন্তু গিরিশচন্দ্র কখনও অর্ধেন্দুশেখরের কথার অমর্যাদা করেন নি। হয়তো কোনও নতুন নাটকের একটি ভূমিকা অর্ধেন্দুশেখর একের বদলে আরেকজন অভিনেতাকে দিয়েছেন, ক্ষুণ্ণমনে কয়েকজন দল বেঁধে গিরিশচন্দ্রের কাছে গেল—অর্ধেন্দুবাবু অমুক অভিনেতার ভূমিকাটি অন্যায়ভাবে কেড়ে নিয়ে তমুককে দিয়েছেন, এ-অন্যায়ের আপনাকে যা-হোক একটা প্রতিকার করতেই হবে।

এরকম নালিশের উত্তরে গিরিশচন্দ্র প্রায়ই বলতেন—অর্ধেন্দু যখন করেছে তখন তার প্রতিকার আমি কিছু করতে পারি না।

বলুন, এ কি বিরুদ্ধবাদীর কথা?

গিরিশচন্দ্র নিঃসন্দেহে অর্ধেন্দুশেখরের গুণমুগ্ধ। অর্ধেন্দুশেখরের মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র ব্যক্ত করেছেন: অর্দ্ধেন্দুগুণমুগ্ধ যিনিই থাকুন, যিনিই যত তাঁহার প্রশংসা করুন, যিনিই যত অন্তর হইতে বলুন, যে অর্দ্ধেন্দু স্বর্গগত

হওয়ায় বঙ্গরঙ্গালয়ের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা যদি বেশী না হই, অন্ততঃ আমি তাঁহাদের সমান অর্দ্ধেন্দুর গুণমুগ্ধ, একথা দম্ভ করিয়া বলিতে পারি।

গিরিশচন্দ্রই অর্দ্ধেন্দুশেখরের অভিনয়শক্তির অনুপম ব্যাখ্যা করেছেন। তার কিয়দংশ ঃ

"যাঁহারা Natural কথাটী কুড়াইয়া লইয়া অভিনয় সমালোচনা করেন, তাঁহারা—আমি অর্দ্ধেন্দুর যে শক্তির পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইতেছি, তাহা বুঝিবেন কি না জানি না। যিনি পাশ্চাত্য প্রদেশের অভিনয় সম্বন্ধে সমালোচনা পাঠ করিয়া থাকেন, তিনি বুঝিবেন, যে অর্দ্ধেন্দুর যে শক্তি বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি, এক্ষণে সভ্যপ্রদেশে তাহা উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া গণ্য। অর্দ্ধেন্দুর অভিনয় এই,—অর্দ্ধেন্দু কি ভূমিকা (Part) লইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছেন, অর্দ্ধেন্দু তাহা দর্শককে দেখিতে দিতেন না। দর্শক দেখিত—অর্দ্ধেন্দুবাবু আসিয়াছেন। যতবার প্রবেশ করিতেন, ততবারই দর্শক আগ্রহের সহিত বলাবলি করিতেন—অর্দ্ধেন্দুবাবু আসিয়াছেন। দর্শক দেখিতেন অর্দ্ধেন্দু, কি ভূমিকা তাহা নয়। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি একক, দর্শকের সম্পূর্ণ প্রীতি জন্মাইতে পারে,—দৃশ্যপট, অভিনেতা প্রভৃতির বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন হয় না।...

পূর্ব্বে বলিয়াছি, অর্দ্ধেন্দুকে দর্শক অর্দ্ধেন্দু দেখিতেন। অর্দ্ধেন্দু এই অংশে বা ঐ অংশে এ লইয়া বিচার নয়, অর্দ্ধেন্দু বাবু চমৎকার—এই কথা।

অর্দ্ধেন্দুর এই উচ্চ প্রশংসা (প্রশংসা কেন, প্রশংসা বলিলে যেন কিছু বাড়াইয়া বলিতেছি বোধ হয়) অর্দ্ধেন্দুর এই স্বরূপ বর্ণনায় কাহারও বা মনে হইতে পারে, যে এরূপ অভিনয়ে নাটক-বর্ণিত চরিত্রের সম্পূর্ণ অভিনয় হয় না। ঐরূপ মনে করা ভ্রম। কলাবিদ্যা—কলাবিদ্যা, স্বভাব নয়। চিত্রকর যখন কোন স্বভাবদৃশ্য অঙ্কিত করিতে চান, সেই দৃশ্যের অনেক বাদ দিয়া, অনেক যোগ করিয়া, তাঁহাকে চিত্রাঙ্কন করিতে হয়। উদ্দেশ্য এই যে, যে দৃশ্য অঙ্কিত করিতেছেন, স্বভাবে সেই দৃশ্য দেখিয়া চিত্রকরের যেরূপ মনের ভাব হইয়াছিল, সেই ভাবটী যতদূর পারেন, তুলিতে তোলেন। কল্পনাপ্রসূত দৃশ্যেও অনেক যোগ করিতে হয়। ... অর্দ্ধেন্দু উচ্চ কলা-বিদ্যাবলে তাঁহার অভিনীত অংশে চিত্রকরের ন্যায় কতকগুলি কল্পিত হাবভাব দ্বারায় নাটককারের চরিত্র পরিপুষ্ট করিতেন। ... অর্দ্ধেন্দুর যে

শক্তি বর্ণনা করিলাম—তাহা হাস্যরস সম্বন্ধে। গম্ভীর ভূমিকাতেও তাঁহার সমদক্ষতা ছিল, কিন্তু গম্ভীর ভূমিকা লইয়া তিনি বাহির হইলে, দর্শক প্রথমে সে অংশের গাম্ভীর্য্য ধরিতে পারিত না। অবশ্যই পরিশেষে সে ভূমিকার প্রকৃত পরিচয় পাইত এবং যেরূপ হাস্যরসাত্মক অংশে হাসিত, করুণ রসাত্মক অংশেও কাঁদিত। ...

উপস্থিত হাবভাবের পরিবর্ত্তন করিতে অর্দ্ধেন্দুর ন্যায় সুনিপুণ কলাবিদ্যা-বিশারদ পৃথিবীতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, অর্দ্ধেন্দু সকল স্থানেই অর্দ্ধেন্দু। নীলদর্পণে 'গোলক বসুর' অভিনয় হইতেছে, কিন্তু তাহাতেও একটু 'অর্দ্ধেন্দুরী' টিপ্‌নি আছে। চাষা হাঁ করিয়া বসিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে একটী মশা মারিল, এটী 'অর্দ্ধেন্দুরী'। 'রডা, ও 'উড' সাহেব সাজিয়া নৃত্য, ইহাতে অর্দ্ধেন্দু প্রকট। "আবুহোসেনে" সখীদের সহিত পিটবস্ত্র, ঘাগরার ঢংয়ে ছড়াইয়া সখীভাবে নৃত্য, "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" প্রহসনে গদা খানসামাকে খানসামাগিরি শিক্ষা দেওয়া, স্টেজে কাহারও সাজিয়া বাহির হইতে বিলম্ব হইতেছে,—নাটকের কথাবার্ত্তা বন্ধ রহিয়াছে, হঠাৎ নেপথ্য হইতে একজনকে টানিয়া আনিয়া তাহার সহিত কথা কওয়া; 'লীলাবতী'তে হরবিলাস বসিয়া আছে, (কাহার আসিতে বিলম্ব হইতেছে, আমার স্মরণ হয় না) অর্দ্ধেন্দু বলিলেন, "জমাদার সাহেব, তোমার আসামী সট্‌কেছে, এখন তুমিই আসামী আর জমাদার দুই হ'য়ে দাঁড়াও, আমাদের কাজ চলুক। (দর্শকগণকে দেখাইয়া) বাবুরা সব বসে আছেন।" এ সমস্ত কাহারও বিসদৃশ লাগিত, অপর কেহ করিলে যে বিসদৃশ হইত না, তাহা নহে, কিন্তু অর্দ্ধেন্দুর অতুল প্রতিভায় সমস্ত ঢাকিয়া যাইত।"

'নীলদর্পণে' গিরিশচন্দ্র উডসাহেব সেজেছিলেন। একবার পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন—কেমন হয়েছে উডসাহেব ?

পাঁচকড়ি বলেছিলেন—বেশ হয়েছে বটে, কিন্তু মুস্তফী মশায়ের মত হয় নি।

গিরিশচন্দ্র বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হন নি। সহাস্যে বলেছেন—ত্যাখো, ওর মত সাহেব সাজতে বাঙালী কেউই পারবে না।

'নীলদর্পণ' যাঁর, 'কমলে কামিনী'ও তাঁরই রচনা। 'কমলে কামিনী' দীনবন্ধু মিত্রের শেষ রচনা। 'কমলে কামিনী' যখন ছেপে বেরোল, দীনবন্ধু তখন রোগশয্যায়। শেষশয্যায়।

অর্ধেন্দুশেখর দেখতে যেতেন দীনবন্ধুকে। একদিন দীনবন্ধু 'কমলে কামিনী' পড়ে শোনাতে বললেন অর্ধেন্দুশেখরকে। অর্ধেন্দুশেখর পড়তে শুরু করলেন। যখন গান্ধারীর অনুতাপ পড়তে লাগলেন, দীনবন্ধু ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। অর্ধেন্দুশেখর দীনবন্ধুর চোখের জল মুছিয়ে দিলেন।

দীনবন্ধু জড়িতকণ্ঠে বললেন—আমার এ-নাটকখানা তোমরা অভিনয় করবে?

অর্ধেন্দুশেখর বললেন—আপনার নাটক নিয়েই সাধারণ রঙ্গালয়ের আরম্ভ। আপনার নাটকের অভিনয়ের জন্যে কি কোন অনুরোধের দরকার?

দীনবন্ধু বললেন—অনুরোধ করছি না। আমি জানি, তোমরা অভিনয় করবে। কিন্তু তুমি সাজবে, আমি দেখতে পাব না!

'কমলে কামিনী'র অভিনয় দীনবন্ধু দেখে যেতে পারেন নি। 'কমলে কামিনী'র প্রথম যেদিন অভিনয় হল, তার অল্প কিছুদিন আগেই দীনবন্ধু ইহসংসার থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। বলা বাহুল্য হবে না, 'কমলে কামিনী'র সেই অভিনয়ে অর্ধেন্দুশেখর অনিবার্য কারণে কোন অংশ নিতে পারেন নি।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বিবেচনায় অর্ধেন্দুশেখরই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। রবীন্দ্রনাথ বলতেন—এমনটি আর হয় না।

ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক অভিনয়-মজলিসে অর্ধেন্দুশেখরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একবার অভিনয় পর্যন্ত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—অতটা স্টেজ-ফ্রি অ্যাক্টরের সঙ্গে মঞ্চে নেমে সবসময় সতর্ক থাকতে হত, স্বচ্ছন্দে নিজের অভিনয় করার ব্যাঘাত হত।

একটি সুন্দর ঘটনা নিবেদন করি।

এককালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে 'খামখেয়ালী মজলিস' নামে একটা আসর ছিল। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একদিন 'খামখেয়ালী মজলিসে'র আসর বসত।

একদিন একটা আশ্চর্য ঘটনা হল 'খামখেয়ালী মজলিসে'। আসরে উপস্থিত হয়ে 'খামখেয়ালী মজলিসে'র সভ্যরা দেখলেন, রবীন্দ্রনাথ বিষণ্ণমুখে বসে আছেন। ব্যাপার কী?

ব্যাপার যা শোনা গেল, খুব ভয়াবহ।

বাঙালী হয়েও ঘোরতর সাহেব, 'খামখেয়ালী মজলিসে'র এমন একজন সভ্যের একটু ভুলে সামনে মস্ত বিপদ। ওই সাহেববাবু বাড়িবদল করেছেন, কিন্তু সে

খবরটুকু দয়া করে সময়মত 'খামখেয়ালী মজলিস'কে জানান নি। মজলিসের খাতায় সাহেববাবুর পুরোনো ঠিকানা লেখা আছে, সেই ঠিকানাতেই মজলিসের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ সাহেববাবুকে নেমন্তন্ন চিঠি পাঠিয়েছেন। দারোয়ান তো নেমন্তন্ন চিঠি নিয়ে পুরোনো ঠিকানায় গিয়ে উপস্থিত। সেখানে কে একজন বুড়ো ভদ্রলোক নেমন্তন্ন চিঠিখানা খুলে পড়েছেন, আর দারোয়ানকে বলে দিয়েছেন—ওঃ, রবীন্দ্র বাবুর নিমন্ত্রণ? বেশ, বেশ। তিনি যে একজন খুব বড়লোক। কিন্তু সে বাবুটি তো এখন এখানে নেই, বাড়ি বদলেছেন। তা হোক গে, আমিই যাব এখন। আচ্ছা দারোয়ান, রবিবাবুকে বলো, আমি ঠিক সময়ে যাব।

দারোয়ানের কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ তারপর খোঁজ-খবর নিয়ে সাহেববাবুর নতুন ঠিকানাটি জানলেন। আবার সাহেববাবুর নামে নতুন একখানা নেমন্তন্ন চিঠি পাঠালেন।

তাহলে তো সব ঠিক হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ অযথা বিষণ্ণমুখে বসে আছেন কেন?

না, কিছুই ঠিক হয় নি। রবীন্দ্রনাথ সেই অচেনা-অজানা বুড়োর কথা ভেবে অস্থির হয়ে আছেন। গায়ে পড়ে যে নেমন্তন্ন নেয়, সে কী রকম ভদ্রলোক? অচেনা-অজানা একজন বুড়োমানুষ এসে আজকের মজলিসটাকে নির্ঘাত পণ্ড করে দেবে।

কী উপায় করা যায়, পরামর্শ করতে বসলেন সকলে। সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে রবীন্দ্রনাথ সাব্যস্ত করলেন—এই আপদের জন্যে বাবুসাহেবই দায়ী। উনি বাড়ি বদল করেছেন, অথচ সময়মতো সে-খবরটুকু খামখেয়ালী মজলিসে জানান নি। এখন সবদিক সামলায় কে! ওই বাবুসাহেবকেই সব সামলাতে হবে, ওকেই হোস্ট সাজতে হবে আজ।

তা বাবুসাহেব এতে আপত্তি করলেন না। হয়ত ভাবলেন, অপরাধ যখন একটা করে ফেলেছেন, তখন তার প্রায়শ্চিত্ত তো করতেই হবে।

অতএব সেই সাহেববাবুই রবীন্দ্রনাথ সাজলেন। অর্থাৎ, জাল রবীন্দ্রনাথ হলেন। আসুক এবার সেই অচেনা-অজানা বুড়োমানুষ।

এলেন। তৃতীয় শ্রেণীর একখানা ছক্কর ভাড়াটে গাড়ি বারান্দার নিচে এসে দাঁড়াল। গ্যাসের আলোয় দেখা গেল, গাড়ি থেকে সেই বুড়ো নামছেন, একখানা পুরনো বালাপোশে তাঁর পা থেকে মাথা অবধি ঢাকা। গাড়ি থেকে নেমে উনি খুব সাবধানে পয়সা গুণলেন। পয়সা গুণে-গেঁথে গাড়োয়ানকে দিলেন।

তারপরেই গাড়োয়ানের সঙ্গে বুড়োর ঝগড়া-বচসা বেধে গেল। গাড়োয়ান এক টাকার কমে নেবে না, ইনিও আট আনার বেশি দেবেন না। যা-হোক, সে গোলমাল এক সময়ে মিটে গেল, আরও কিছু বেশী পয়সা নিয়ে গাড়োয়ান চলে গেল।

ফটাস-ফটাস করে চটি জুতোর শব্দ হচ্ছে সিঁড়িতে। অর্থাৎ, উনি আসছেন! এলেন। পায়ে ধুলোভরা ছেঁড়া চটি জুতো, ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে জোরগলায় সকলকে জিজ্ঞেস করলেন—চটি জুতো কোথায় রাখি?

জাল রবীন্দ্রনাথ বললেন—আসুন, আপনি ওই চটি জুতোসুদ্ধই ভেতরে চলে আসুন।

উনি বললেন—রাম বলেন রবিবাবু! এমন সাহেবী বৈঠকখানায় আমার চটিজুতো? এ কখনও হতে পারে না।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক করলেন, জুতোজোড়া দারোয়ানজীর জিম্মায় রাখাই নিরাপদ।

তারপর সভায় এসে বসলেন। জাল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করলেন—তোমারই নাম রবি ঠাকুর? তা, তুমি বেশ পদ্য লেখ শুনেছি। আচ্ছা, তোমার সঙ্গে আমার কোথায় আলাপ হয়েছিল, বল দেখি?

তারপর সাংঘাতিক সব আহাম্মুখি কথা বলতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁর অমুক জায়গায় আলাপ হয়েছিল! তমুক ঘটনা হয়েছিল ওখানে! সব বাজে কথা, মিথ্যে কথা। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এমন ঘটনার কথাও ওঁর মুখে শোনা গেল, যে-ঘটনা রবীন্দ্রনাথের জন্মের ঢের আগে ঘটে গেছে।

মজলিসের সভ্যেরা নিজেদের মধ্যে চুপি-চুপি হাসাহাসি করতে লাগলেন। আহাম্মক কোথাকার!

কিন্তু বুড়ো আমাদের জাল রবীন্দ্রনাথকে কিছুতেই ছাড়েন না। ছিনে জোঁকের মত তাঁকে ধরে আছেন। বুড়োর নানারকম সেকেলে রসিকতার প্রশ্নে ও মন্তব্যে জাল রবীন্দ্রনাথ ব্যতিব্যস্ত। ব্যাপার দেখে কেউ কেউ রেগে যাচ্ছেন, কেউ কেউ মুখ টিপে হেসে যাচ্ছেন।

ওদিকে আরেকটা কাণ্ড করে ফেললেন বুড়ো, কিছু না বলে-কয়ে জাল রবীন্দ্রনাথের গেলাসের রঙিন বস্তু, হুইস্কি-পেগ কিনা কে জানে, নিয়ে ঢকঢক করে গিলে ফেললেন, চাকরকে হুকুম দিলেন—আরও নিয়ে এস।

জাল রবীন্দ্রনাথের আর সহ্য হল না। তিনি সরাসরি আসল রবীন্দ্রনাথের

কাছে গিয়ে হাতজোড় করে বললেন—দোহাই আপনার, এই মুশকিল থেকে আমাকে উদ্ধার করুন। আমি আর পেরে উঠছি না।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—তাও কি সম্ভব? আপনি যখন হোস্ট সেজেছেন, তখন এতদূর এসে সে-দায়িত্ব কেমন করে ঝেড়ে ফেলবেন? সহ্য করা ছাড়া আর উপায় নেই।

জাল রবীন্দ্রনাথ তবু আর সেই বুড়োর সামনে গেলেন না। সটান চলে গেলেন গগনেন্দ্রনাথের কাছে। সেখানে বসে আলবোলা টানতে লাগলেন।

কিন্তু কিছুতেই নিস্তার নেই, নাছোড়বান্দা বুড়ো ঠিক সেখানে চলে এলেন। একটানে জাল রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে আলাবোলার নলটা কেড়ে নিলেন, বললেন—এতক্ষণ তামাক না খেয়ে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছে। আঃ, বেশ তামাকটি তো।

তামাক খেতে খেতে বুড়ো ঢুলতে লাগলেন। সকলে ভাবলেন, বুড়ো নির্ঘাত আফিমখোর।

যথাসময়ে খাবার ডাক এসে গেল।

পাছে বুড়ো আবার কোন কাণ্ড বাধিয়ে বসেন, ভয়ে-ভয়ে জাল রবীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছেন। কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। বুড়ো ঠিক ডাকা-ডাকি আরম্ভ করলেন—ওগো রবিবাবু, আমায় ফেলে তুমি যাচ্ছ কোথায়? আমি তোমাকে ধরে ধরে নিচে নামতে চাই। বুড়ো মানুষ সিঁড়িতে আছাড় খেয়ে মরব?

বুড়ো এসে জাল রবীন্দ্রনাথকে জড়িয়ে ধরলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে বুড়ো কথায়-কথায় জাল রবীন্দ্রনাথকে নাকাল করতে লাগলেন। এ বড় বাড়াবাড়ি। কথা শুনে অনেকেই মনে-মনে বিরক্ত হলেন।

হঠাৎ পড়ে গেলেন বুড়ো। পড়ে গিয়ে, কাণ্ডটা দেখুন একবার, ধরলেন জাল রবীন্দ্রনাথের শালের অঞ্চল। গড়াতে গড়াতে পড়লেন গিয়ে সিঁড়ির শেষ ধাপে। কোনরকমে উঠে দাঁড়ালেন। উনি পড়ে গেছেন তার সব দায়-দোষ যেন জাল রবীন্দ্রনাথের, এমনি গলায় কথাবার্তা কইতে লাগলেন।

খাবার জায়গায় পৌঁছে গেলেন সকলে। যে যার জায়গায় বসে পড়েছেন, কিন্তু বুড়ো তখনও বারান্দায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে উনি মুখ ধোবার জলের ফরমায়েশ দিচ্ছেন।

জল এল। সশব্দে মুখটুখ ধুলেন। পাঁচরকম কথা কইতে কইতে এসে বসলেন, যা ভাবা গেছে, জাল রবীন্দ্রনাথের পাশে। বসেই উঁচুগলায় বললেন—

গিন্নী তাঁর জন্যে ভাল খাবার কিছু ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যেতে বলে দিয়েছেন। একখানা সরা চাই মশায়—এখনই চাই। কোন জিনিস উচ্ছিষ্ট না হতে হতেই চাই, আমার গিন্নী রোজ পূজো-আহ্নিক করেন কি না!

জাল রবীন্দ্রনাথ বিষম চটে গেলেন। জাল রবীন্দ্রনাথের চোখ মুখের চেহারা দেখে, কারও কারও ভাবনা হল, বুড়োর বুঝি জাল রবীন্দ্রনাথের হাতে আজ চড়-চাপড় খেতে হয়।

যা-হোক, সরা নিয়ে চাকর এসে গেল। দু-পাশের পাতা থেকে বুড়ো টপাটপ মিষ্টি-মিঠাই তুলে সরা বোঝাই করতে লাগলেন।

সরাটি সামনে নামিয়ে রাখলেন তারপর। নিজের গা থেকে ময়লা বালাপোশ-খানা খুলে বুড়ো নিজের হাতে দূরে ছুঁড়ে ফেললেন। হাতজোড় করে বললেন —মশায়রা, আমাকে মাপ করবেন। এতক্ষণ আপনাদের সকলকে যথেষ্ট জ্বালিয়েছি—আর না। এবার নিজের আসল পরিচয় দিই—আমি অর্ধেন্দুশেখর।

হ্যাঁ, খামখেয়ালী মজলিসে একটা নতুন রকম আমোদ করবার জন্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই সেদিন অর্ধেন্দুশেখরের সঙ্গে পরামর্শ করে এসব ব্যবস্থা করেছেন। আমোদ হল, উপরন্তু সাহেবিয়ানার ভক্ত খামখেয়ালী মজলিসের সভ্য ওই বাবুটিকেও কায়দা করে কিঞ্চিৎ জব্দ করা গেল।

কিন্তু ওই বাবুসাহেবের সঙ্গে অর্ধেন্দুশেখরের চেনা-জানা নেই। তাই অর্ধেন্দুশেখর শেষপর্যন্ত সবিনয়ে ক্ষমা চেয়েছেন বাবুসাহেবের কাছে। বাবুসাহেব অর্ধেন্দুশেখরকে আলিঙ্গন করেছেন। বোধ করি, অর্ধেন্দুশেখরের পায়ের ধুলোও নিয়েছেন।

মধুর সমাপ্তি হল। খাওয়া-দাওয়ার পর অর্ধেন্দুশেখর 'ডিস্পেনসরী' অভিনয় করে দেখালেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন: 'অনেক সময়ে থিয়েটারে দেখিতাম, অর্দ্ধেন্দু বাবু ধুতি ও চাদর গায়ে, ভুঁড়ীটি খুলিয়া নানারূপ রঙ্গভঙ্গ করিতেছেন, আর থিয়েটার সুদ্ধ লোক হাসিতেছে। একবারের একটা কথা বড়ই মনে পড়িতেছে—সেটা আলবার্ট হলে। তিলক আসিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আলবার্ট হলে সভা হইয়াছে, স্টেজ হইয়াছে, নানারূপ আমোদপ্রমোদ ও কৌতুক হইতেছে। অর্দ্ধেন্দুবাবু একাই একটি ডিস্পেন্‌সরী সাজিয়াছেন। অতি কাতর স্বরে ক্ষীণ কণ্ঠে চিঁচিঁ করিতে করিতে ডাক্তারের কাছে গিয়া আপনার কষ্টের কথা বলিতেছেন; আবার ডাক্তার হইয়া ভঙ্গী করিয়া রোগী দেখিতেছেন, রোগীকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর টেবিল

হইতে কাগজ লইয়া প্রেস্কৃপ্সন লিখিতেছেন; আবার কম্পাউণ্ডার হইয়া "এস" বলিয়া রোগীকে ডাকিতেছেন আর ঔষধ দিতেছেন—বলিতেছেন, "এ কাগজখানি হারিও না, আবার যখন আসবে কাগজখানি হাতে করে এস।" ঔষধ দিতেছেন কিন্তু সেই এক ক্যাষ্টর অয়েল। একজন রোগী চিৎকার করিতে করিতে আসিল, দাঁত কটকটানিতে সে মারা যাইতেছে, সে কখন মুখে হাত দেয়, কখন কাঁদে, কখন যন্ত্রণায় বসিয়া পড়ে। ডাক্তার হাত দেখিলেন, পেট টিপিলেন, আর ক্যাষ্টর অয়েল ব্যবস্থা করিলেন। কম্পাউণ্ডার বলিলেন—এস। খানিক ক্যাষ্টর অয়েল একটা শিশিতে ঢালিয়া দিলেন। রোগী বলিল, "আমার হয়েছে দাঁতে শূল, আপনি জোলাপ দিলেন যে?" কম্পাউণ্ডার খাদে গলা তুলিয়া বলিলেন, "ওতেই আরাম হবে।" এইরূপ কত রোগী আসিল—সবই একসুর, একই রকম চিকিৎসা, একই রকম ঔষধ। হলসুদ্ধ লোক হাসিয়া অস্থির।

ডিস্পেন্সরী-কাণ্ড শেষ হইয়া গেলে অর্দ্ধেন্দুবাবু তিন তোতলার নকল করিতে বসিলেন। একটা তেমাথার পথে একটা রকের উপর দুই তোতলা বসিয়া আলাপচারী করিতেছে, এমন সময় আর একজন তোতলা আসিয়া তাঁহাদের দুজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "ম-ম-মশায়, মাঝের পাড়ার ম-ম-মহিম চক্রবর্ত্তীর বাড়ী কোথায় যাব?" সে লোকটা "ম"-এ তোতলা, ম বলিতে গেলেই ম-ম-ম-মকার। দুজনের মধ্যে একজন বলিল, "এই যে বাঁ-আ দিকের রা-রাস্তা দেখছেন, ঐ রাস্তা ধরে শুঁ-উঁ-উঁ-ড়ীদের পুকুর দেখতে পাবেন। সেই পুকুরের বাঁ-আঁ দিকে সি-ই-ইংগি ওয়ালা বাড়ী চ-অ-অক্রবর্ত্তী মশায়ের।" এ লোকটা অনুনাসিকে তোতলা, আর তালব্য বর্ণে তোতলা। যে আসিয়াছিল, সে লোকটা মনে করিল আমায় ভেঙচাইতেছে। সে বড়ই রাগ করিয়া উঠিল, আর বলিল, "ম-ম-শায় আমা-মারই যেন গলার দোষ আছে। তাই বলে কি ম-মশায়ের তামা-মা-আসা করা উচিত?" তাই শুনিয়া তৃতীয় তোতলা মধ্যস্থ করিতে আসিয়া বলিল—"মশায় র্ র্ র্ রাগ কর্ র্ রেন কেন? আপনার-র-র ও যেমন একটু গলার-র্-র্ দোষ আছে, এনার্ রো তেমনি একটু আছে।" হলসুদ্ধ লোক ত হাসিয়া অস্থির।··· অর্দ্ধেন্দুর মত হাস্যরসের রসিক আর একটি মিলিবে কি না সন্দেহ।'

একবার ন্যাশনাল থিয়েটারের দলের সঙ্গে অর্দ্ধেন্দুশেখর রাজসাহীতে

গিয়েছিলেন অভিনয় করতে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় অর্দ্ধেন্দুশেখরের সেই অভিনয় দেখেছিলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের সেই অভিনয়—অক্ষয়কুমারের বিবেচনায়—অনন্য-সাধারণ, চিরস্মরণীয়, উল্লেখযোগ্য, উপাদেয়। অক্ষয়কুমার সানন্দে জানিয়েছেন, সেরকম অভিনয় যে-কোন দেশের রঙ্গমঞ্চকেই গৌরবান্বিত করতে পারত।

উত্তরকালে অক্ষয়কুমার লিখেছেন: 'নবীন তপস্বিনী'তে জলধরের এবং 'কৃষ্ণকুমারী'তে ধনদাসের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধেন্দুশেখর যে সকল অভিনয় কৌশলের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহা একালের পক্ষে দিন দিন দুর্ল্লভ হইয়া পড়িয়াছে। দৃশ্যকাব্যের বাক্যাবলীর মধ্যে যাহা অনুক্ত থাকিয়া যায়, তাহা ধরিয়া লইয়াই অভিনয় করিতে হয়। জলধরের ন্যায় সুপণ্ডিত অনায়াসে কবিতা রচনা করিতে পারিলে, কবির চরিত্র চিত্রাঙ্কন চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়িত। অভিনয়কালে অর্দ্ধেন্দুশেখর যে ভাবে কবিতা রচনার প্রয়াস এবং প্রক্রিয়া প্রদর্শিত করিতেন, তাহা কেবল হাস্যোদ্দীপক নহে,—প্রত্যুত প্রকৃত অভিনয়কলার উৎকর্ষজ্ঞাপক,—অভিনেতার অসাধারণ প্রতিভাব্যঞ্জক,—কবি-বাক্যের বিশদ ভাষ্যরূপে উল্লিখিত হইবার যোগ্য। এরূপ অভিনয়-কৌশল অর্দ্ধেন্দুশেখরই প্রথমে প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ধনদাসের অভিনয় ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। যে দৃশ্যে হৃতসর্ব্বস্ব ধনদাস ছিন্নবস্ত্রে মলিনবদনে রাজপথপার্শ্বে উপবিষ্ট, তাহার অভিনয়কালে অর্দ্ধেন্দুশেখর কোনরূপ বাক্যব্যয় বা অঙ্গচালনা না করিয়া, বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া, কেবল সাত্বিকাভিনয়ে দর্শকচিত্ত অশ্রুসিক্ত করিয়া দিয়াছিলেন! তিনি যে মানব প্রকৃতির কিরূপ অন্তস্তলদর্শী ছিলেন, তাহা তাঁহার অভিনয়ে নিয়ত অভিব্যক্ত হইলেও, এই উপলক্ষে তাহা বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। সেরূপ অভিনয় অর্দ্ধেন্দুশেখরের নিকটেও আর কখন দর্শন করিতে পারি নাই। যাহা কবির প্রাপ্য, কেবল সেইটুকু ব্যক্ত করিয়াই, অভিনেতা প্রশংসালাভ করিতে পারেন। যাহা কবি লিখিয়া ব্যক্ত করেন নাই, তাহা ব্যক্ত করিতে পারিলে, অভিনেতার গৌরব কত অধিক হইয়া পড়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর অনেক বার তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

ব্যোমকেশ মুস্তফী অর্ধেন্দুশেখরের ছেলে। দীনেশচন্দ্র সেন ব্যোমকেশের বন্ধু। সেই সুবাদে এককালে দীনেশচন্দ্র প্রায়ই অর্ধেন্দুশেখরের বাড়িতে যেতেন। অর্ধেন্দুশেখর সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র যা বলেছেন তার সারাংশটুকু তুলে দিচ্ছি:

'ব্যোমকেশের সঙ্গে আমি প্রায়ই তাঁদের বাগবাজারের বাসায় যেতেম, তখন বৃদ্ধ অর্দ্ধেন্দুশেখর এসে আমাদের কাছে বসতেন, বুড়ার পিঠে গড়াবার কথা তিনি যে কতবার আমাদের নকল করে শুনিয়েছেন, তার সংখ্যা নেই। বুড়ী জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে কাঁথা ও লেপ মুড়ি দিয়ে যে পিঠে কি করে তৈরী কচ্ছিল তা অর্দ্ধেন্দুবাবু এমনই কণ্ঠস্বর করে বলে যেতেন যে আমরা হাসতে হাসতে মেঝেয় গড়াগড়ি দিয়ে পড়তুম। আমরা তাঁর ছেলের বন্ধু, কিন্তু তিনি এমনিভাবে মিশতেন যেন মনে হতো তাঁর সঙ্গে আমাদের বয়স বা পদের কোন পার্থক্য নেই। এক অবাধ সারল্য যেন সকল বাধার গণ্ডী অতিক্রম করে বুড়োকে এনে যুবকের সঙ্গে এক পংক্তিতে মিলিয়ে দিত। গগনবাবুর বাটীতে ষ্টার থিয়েটারের একবার অভিনয় হচ্ছিল··· অর্দ্ধেন্দুবাবু "গজপতি দিগ্‌গজ" সেজে এসেছিলেন। বঙ্কিমবাবুর বর্ণিত পোড়াকাঠের মত পা, লম্বকর্ণ দিগ্‌গজ ঠাকুর সেদিন যেমন আমার চক্ষের সামনে প্রত্যক্ষ হয়েছিলেন—এমন তাঁর বই পড়ে কখন হয় নি। দিগ্‌গজ যখন মুসলমান ফকির সেজে ছড়া আওড়াচ্ছিলেন, "হপ্ত দিনের মরা গরু দন্তে কাটে ঘাস" —তাঁর মুখে সেই দিন শুনেছিলুম, এখনও তা বেশ মনে আছে এবং লাঠি হাতে টুপি মাথায় উদ্ভট ফকির মূর্ত্তি এখনও যেন সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন—স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তাঁর অভিনয় মনের উপর এমনই ছাপ মেরে গেছে!'

একজন নাট্যবোদ্ধা লিখেছেন: 'অধিকাংশ অভিনেতাই বড় বড় ভূমিকার জন্যে লালায়িত হন। কিন্তু বড় বড় ভূমিকাভিনয়ের জন্যে অতুলনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও এবং নিজে নাট্যাচার্য হয়েও অর্ধেন্দুশেখর কখনও প্রধান রূপে পরিচিত হতে চান নি। প্রায়ই গ্রহণ করতেন ছোট ছোট অবান্তর ভূমিকা এবং প্রায়ই দেখা গিয়েছে তাঁর অপূর্ব অভিনয়নৈপুণ্যে সেই সব ছোট ছোট ভূমিকাই নাটকের মধ্যে অত্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করেছে। "রিজিয়া" পালায় সকলকে নাটকের পাঠ শিখিয়ে এবং বড় বড় ভূমিকাগুলি অন্যান্য পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বিলি করে তিনি নিজে নিলেন ঘাতকের ছোট্ট ভূমিকা। কিন্তু তাঁর অভিনয়গুণে সেই ক্ষুদ্র ভূমিকাই এতটা বিখ্যাত হয়ে উঠল যে, পরে শ্রেষ্ঠ নট ছাড়া আর কেউ সেই ভূমিকাটি গ্রহণ করতে সাহসী হত না। "প্রতাপাদিত্য" নাটকের রডার ভূমিকাটি আগে আরও ছোট ছিল। পালাটি যখন খোলা হয়, তখন কোন নামজাদা নটই ঐ ভূমিকাটি গ্রহণ

করতে রাজি হন নি। অবশেষে রডা সেজে দেখা দিলেন অর্ধেন্দুশেখর নিজেই। সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকাটি এমন প্রধান হয়ে উঠল যে, তারপর থেকে সেরা সেরা অভিনেতারা ঐ ভূমিকাটি নিয়ে কাড়াকাড়ি করতেন এবং রডার লোকপ্রিয়তা দেখে নাট্যকারও ভূমিকার আকার আরও বাড়িয়ে দিলেন। যখন "ম্যাকবেথ" খোলা হয়, তখন হোমরাচোমরা অভিনেতারা গ্রহণ করলেন ভারি ভারি ভূমিকা। কিন্তু অধিকাংশ হোমরাচোমরাদের মাথার মণি হয়েও অর্ধেন্দুশেখর নিজের জন্যে বেছে নিলেন ক্ষুদে ক্ষুদে পাঁচটি ভূমিকা—প্রথম ডাকিনী, বৃদ্ধ, প্রথম হত্যাকারী, ডাক্তার ও দ্বারপাল।

পাশ্চাত্য নাট্যজগতে নবযুগ এনেছিল জার্মানীর মিনিন্‌জেন নাট্য-সম্প্রদায়—পরে যার আদর্শে গঠিত হয় রুশিয়ার বিশ্ববিখ্যাত মস্কো আর্ট থিয়েটার। সেখানে বড় ও ছোট ভূমিকা ছিল তুল্যমূল্য। অর্ধেন্দুশেখরও নিশ্চয় ঐ মতই পোষণ করতেন। কিন্তু এই রকম নিঃস্বার্থ শিল্পী-মনের পরিচয় দিয়ে তাঁর পক্ষে আখেরে ফল বড় ভাল হয়নি। তিনি নটগুরু এবং সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের অন্যতম স্রষ্টা হলেও সকলেই তাঁর মাথাতেই কাঁঠাল ভেঙে ভক্ষণ করেছে পরমানন্দে। সে সময়ে একজন নৃত্যশিক্ষকও দেড়শত টাকা মাহিনা পেতেন, অথচ নিজের মৃত্যুকাল পর্যন্ত অর্ধেন্দুশেখর কখনও আশী টাকার বেশী মাহিনা পান নি!···

তিনি আর এক আশ্চর্য শক্তির অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন কণ্ঠস্বর ব্যবহার করতে পারতেন। কোন নাটকে একাই যখন তিন-চারটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন, তখন তাঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যেও লক্ষ্য করা যেত তিন-চার রকম পরিবর্তন। এ শক্তি আর কোন নটের আছে বলে জানি না। কত কঠিন কণ্ঠসাধনার দ্বারা এই দুর্লভ শক্তি অর্জন করা যায় তা ধারণাতেও আসে না।'

অর্ধেন্দুশেখর সম্পর্কে লোকমুখে চালু একটি ঘটনা নিবেদন করি। না, ঠিক ঘটনা নয়। কিংবদন্তি।

'নীলদর্পণ' হচ্ছে। অর্ধেন্দুশেখর উডসাহেব সেজেছেন। সেদিন বিদ্যাসাগর 'নীলদর্পণ' দেখতে এসেছেন। অত্যাচারী উডসাহেবের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয় এমন নিপুণ হল যে বিদ্যাসাগর স্থানকালপাত্র ভুলে গেলেন। পায়ের চটি তিনি ছুঁড়ে মারলেন উডসাহেবরূপী অর্ধেন্দুশেখরের গায়ে। অর্ধেন্দুশেখর মহানন্দে বিদ্যাসাগরের পায়ের চটি মাথায় তুলে নিলেন।

সত্য না হয়েও এই রটনা জীবন্ত হয়ে আছে। সন্দেহ নেই, এই রটনা আসলে নাট্যশিল্পী অর্ধেন্দুশেখরের ওপর অগণ্য নাট্যামোদীর বিপুল বিশ্বাস ও অপার ভালোবাসার প্রমাণ। *

অভিনয়-প্রসঙ্গে অর্ধেন্দুশেখরের একটা বিশেষ ক্ষমতার উল্লেখ না করলে গুরুতর অপরাধ হয়। হ্যাঁ, বিশেষ ক্ষমতা। অভিনয়কালে অনেক নাটক-ছাড়া কথা বলতেন, কিন্তু তাতে কিছুমাত্র রসভঙ্গ হত না, বরং সংলাপ-নৈপুণ্যে বিমুগ্ধ হত দর্শকবৃন্দ। সে-বিষয়ে গিরিশচন্দ্র বলেছেন: "অর্দ্ধেন্দুর আর একটি শক্তি ছিল, অভিনয়কালীন নাটকের কথায়, নিজ মস্তিষ্ক-প্রসূত কথা উপস্থিত যোগ করিয়া দিতে পারিতেন; যথা মুকুল-মুঞ্জরায় "বরুণ-চাঁদের" ভূমিকায় বরুণচাঁদকে লক্ষ্য করিয়া যখন রাজা বলিতেছে—"এ কে, ভাঁড় না কি?" তখন অর্দ্ধেন্দু-বরুণচাঁদ উত্তর করিল, "মহারাজ, ভাঁড়—অত বড় নই—আমি একখানি খুরি।" ইহা নাটকের কথা নয়। কিন্তু শ্রবণমাত্র যে হাস্যের রোল উঠিল, তাহা যিনি শুনিয়াছেন—তিনিই জানেন। সামান্য অভিনেতার অর্দ্ধেন্দুকে এস্থলে অনুকরণ করিতে যাওয়া বড়ই বিপজ্জনক। অর্দ্ধেন্দুর নিকট শিক্ষিত না হইয়া, তাঁহার ন্যায় ঢং করিতে গেলে ভাঁড়ামি হইয়া উঠে।"

কিন্তু অর্ধেন্দুশেখর ভাঁড় নন, অর্ধেন্দুশেখর সুরসিক, অর্ধেন্দুশেখর অসামান্য অভিনেতা। অর্ধেন্দুশেখর রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেই দর্শকেরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত।

মিনার্ভা থিয়েটারে 'মুকুল-মুঞ্জরা'র অভিনয় হচ্ছে। আফিংখোর বরুণ-চাঁদের ভূমিকা নিয়েছেন অর্ধেন্দুশেখর। ভজনরামের সঙ্গে বরুণচাঁদ স্টেজে আছেন, এই দৃশ্যে হঠাৎ কোত্থেকে একটা বেড়াল স্টেজে ঢুকেই আবার তক্ষুনি ছুটে বেরিয়ে গেল। বলা-কওয়া নেই, বেড়াল কোত্থেকে এল? দর্শকেরা হো-হো করে হেসে উঠল।

---

* বলা বাহুল্য, এ-বিষয়ে লিখিত একটি পংক্তিও কোথাও আমার চোখে পড়ে নি। যথাসাধ্য অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু এ-বিষয়ে কোথাও কিছু পাই নি; অর্ধেন্দুশেখরের স্মৃতিকথায় না, অর্ধেন্দুশেখর কিম্বা বিদ্যাসাগর বিষয়ে কোন রচনায় না, নির্ভরযোগ্য কোন গ্রন্থে বা সাময়িকপত্রে না, কোথাও না। কিন্তু নানাজনের মুখে আমি এটা শুনেছি। শুধু আমি কেন, অনেকেই শুনেছেন। তাই এই রটনার সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্যে আমি বহুজনের দ্বারস্থ হয়েছি। কারও কাছে এমন কিছু শুনতে পাই নি যার বলে একে সত্য বলা চলে। প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন—এই রটনার মূলে কোন সত্য নেই।

কিন্তু অর্ধেন্দুশেখর পলকে সামলে নিলেন অবস্থাটা। এই বেড়ালের প্রবেশ-প্রস্থানটুকুও তিনি রসসৃষ্টির কাজে লাগালেন তৎক্ষণাৎ। অর্ধেন্দুশেখর অভিনয়ছলে বললেন—ওরে ভজন, বুঝি সর্বনাশ হল—একে আমি আফিংখোর মানুষ—দুধটুকু বুঝি হতভাগা বেড়ালে সব খেয়ে গেল।

আরও একটা দিক আছে অর্ধেন্দুশেখরের, নাটকাভিনয় করতে-করতেই অর্ধেন্দুশেখর বহুদিন দর্শকদের নানা টিকা-টিপ্পনীর যথাযোগ্য সরস জবাব দিয়েছেন। কথা যে রসে-হাস্যে কী পরিমাণ ক্ষুরধার হতে পারে তার অকাট্য প্রমাণ দিয়েছেন।

একদিন কী একটা ভূমিকায় অভিনয় করছেন অর্ধেন্দুশেখর। প্রস্থান-সময়ে কে একজন দর্শক হঠাৎ একটা হাঁচি দিয়ে ফেলল। আরেকজন দর্শক অর্ধেন্দুশেখরকে লক্ষ্য করে বলে উঠল—যাবেন না। হাঁচি পড়েছে।

অর্ধেন্দুশেখর যেতে-যেতেই বললেন—ও কিছু না, গো-হাঁচি, নাকে খড় আটকেছে।

আরেকটা ঘটনা।

অর্ধেন্দুশেখর অভিনয় করছেন, জোরগলায় চাকরকে ডাকছেন—হরে, হরে।

কিন্তু হরের দেখা নেই। অর্ধেন্দুশেখর কপট ক্রোধে আরও চিৎকার করে ডাকলেন—হরে, হরে।

তখন গ্যালারি থেকে একজন দর্শক রঙ্গ করে বলে উঠল—আজ্ঞে যাই।

অর্ধেন্দুশেখর মুখ ফেরালেন সেই দর্শকটির দিকে; বললেন—ও গুয়োর ব্যাটা, তুমি ওখানে বসে আছ?

দর্শকটির মুখে আর কথা নেই।

মিনার্ভা থিয়েটারে 'আবু হোসেন' অভিনীত হচ্ছে। আবুহোসেনকে ধরে-বেঁধে পাগলা-গারদে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আবুহোসেনের মা আকুল হয়ে কাঁদছে—ও বাপ রে, আমার কী হলো রে।

আবুহোসেনের ভূমিকায় অভিনয় করছেন স্বয়ং অর্ধেন্দুশেখর। কয়েকজন দর্শকের এই কান্নার দৃশ্যে একটু রঙ্গ করবার বাসনা হল, তারা আবুহোসেনের মায়ের কান্নার সুরে সুর মিলিয়ে উচ্চরবে কাঁদতে লাগল, রঙ্গালয়ে তুমুল কাণ্ড। সেই রঙ্গপ্রিয় দর্শকদের এক কথায় ঠাণ্ডা করে দিলেন অর্ধেন্দুশেখর। আবুহোসেন-বেশী অর্ধেন্দুশেখর যেতে যেতে মাকে বললেন—আর কাঁদিস নে মা, তোর কান্না শুনে শেয়াল-কুকুরে কাঁদছে।

কলকাতার বাঙলা নাট্যশালায় অনেকদিন থিয়েটার দেখতে এসেছেন একজন ইহুদি সাহেব, নাম সলোমন। থিয়েটারে তিনি একটি ফুলের বাস্কেট নিয়ে এসে বসতেন। বাঙলা কথাবার্তা তিনি দিব্যি বুঝতে পারতেন। থিয়েটারে একেবারে সামনের সারির আসনে বসতেন সলোমন সাহেব। যার অভিনয় ভাল লাগত, সাহেব রঙ্গমঞ্চে তার দিকে ছুঁড়ে দিতেন ফুলের তোড়া, ফুলের মালা। সলোমন সাহেবের সেই উপহার সাদরে গ্রহণ করতেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। সলোমন সাহেবকে প্রীতির চোখে দেখতেন তাঁরা।

মিনার্ভা থিয়েটারে 'নবীন তপস্বিনী' দেখতে এসেছেন সলোমন সাহেব। সেদিন অর্ধেন্দুশেখর জলধর সেজেছেন, গুলফন হরি সেজেছেন জলধরপত্নী জগদম্বা। অর্ধেন্দুশেখর ও গুলফন হরি—দুজনেই রঙ্গরসে সিদ্ধমুখ।

স্বামীচরিত্রে সন্দিগ্ধা জগদম্বারূপিণী গুলফন হরি মুড়োঝাঁটা হাতে নিয়ে বলতে লাগল—আজ তোমারি একদিন কি আমারি একদিন; * * * আমি ঘোমটা দিয়ে চুপ করে বসি, যদি ধরতে পারি, আজ মালতী মল্লিকেকে 'মা' বলিয়ে নেবো, তবে ছাড়ব।

স্বামীর অপেক্ষায় ঘোমটা টেনে বসল জগদম্বা।

আর এই অভিনয় দেখে মুগ্ধ হলেন সলোমন সাহেব। তন্মুহূর্তে সাহেব একছড়া গড়ে মালা ছুঁড়ে দিলেন রঙ্গমঞ্চে, গুলফন হরির দিকে। সসম্মানে সেই মালাটি নিলেন গুলফন, সেই মালাটি গলায় দিয়ে ঘোমটা টেনে রঙ্গমঞ্চে বসে রইলেন। তারপর জলধরবেশী অর্ধেন্দুশেখর স্টেজে ঢুকলেন, জগদম্বার হাতে জলধরের যে দুর্দশা হবার তাও হল।

এক সময়ে জলধরবেশী অর্ধেন্দুশেখর বললেন—আমায় তো কথায়-কথায় সন্দেহ কর, বলি এই যে গলায় বাহারের মালা দুলছে—মালাটি দোলালে কে? বল, দিলে কে?

জগদম্বারূপিণী গুলফন আঙুল দিয়ে সলোমন সাহেবকে দেখিয়ে দিলেন। বললেন—এই, আমার নন্দাই।

অর্ধেন্দুশেখর শুধু অভিনেতা নন, অভিনয় শিক্ষকও; শুধু নট নন, নাট্যাচার্যও।

অমৃতলাল বসু লিখেছেন: 'অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী—বিধাতার হাতে গড়া একটার ও অতুলনীয় নাট্যশিক্ষক, অর্দ্ধেন্দু ছিল সেই রকম মাষ্টার, যিনি কখন কোন ছেলেকে বলেন না যে, তোর কিছু হবে না; একটা দু'কথার পার্টের ভিতরেও মনে রাখবার মতন ছবি ফুটিয়ে দিতে সমর্থ।'

অর্ধেন্দুশেখর প্রথম শিক্ষার্থীকে উচ্চকণ্ঠে ছন্দমাত্রা বজায় রেখে পড়তে বলতেন সংস্কৃত স্তবস্তোত্র। ওতে অভিনেতার জিভের আড় ভাঙবে, দম বাড়বে। শুধু কি তাই? অভিনয়ের নানাদিকে লক্ষ্য অর্ধেন্দুশেখরের। শিক্ষার্থীর গলা যেন তৈরী হয়, স্বর যেন সংযত হয়, উচ্চারণ যেন নিষ্কলঙ্ক হয়, অভিনয় যেন চরিত্রোচিত হয়, যেন সজীব হয়, যেন রস থাকে।

শিক্ষার্থীকে অর্ধেন্দুশেখর প্রথমেই বলতেন—ছাখ বাপু, লোকে পয়সা খরচ করে তোমার কথা শুনতে এসেছে। গ্যালারির যে দর্শক আটগণ্ডা পয়সা দিয়ে সকলের শেষ বেঞ্চে বসে, সে যদি তোমার সব কথা শুনতে না পায়, তাহলে মনে রেখ তুমি তাকে আটগণ্ডা পয়সা ঠকালে। এরকম জুয়াচুরি করবার কোন অধিকার তোমার নেই। প্রত্যেকটি কথা সুস্পষ্ট হবে, আর তা অডিটরিয়মের সব জায়গা থেকেই শোনা যাবে, এমনিভাবে বলা অভ্যাস কর।

অভিনয় যে-পর্যন্ত নিখুঁত না হবে, অর্ধন্দুশেখরের কাছ থেকে কোন ছাত্রের অব্যাহতি নেই। অর্ধেন্দুশেখরের কাছে আগে কাজ, পরে অন্য কথা। অর্ধেন্দুশেখরের মহলার আসরে নিটুট শৃঙ্খলা।

হয়তো কোন ছাত্রকে আসরে বসে সযত্নে অভিনয় শেখাচ্ছেন, আসরের এক কোণায় কে বুঝি একটি পান চেয়েছে কার কাছে, অর্ধেন্দুশেখরের চোখ পড়েছে সেদিকে। অর্ধেন্দুশেখর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রকে বললেন—থাম। বাবুদের কী কথাবার্তা হচ্ছে, তা শেষ হোক, তারপর কাজ হবে।

হয়তো কেউ আসর ছেড়ে উঠে গেল, পায়ের শব্দ উঠল একটু, অর্ধেন্দুশেখর সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রকে বললেন—স্থির হও। আর কে কে উঠে যাবেন, যান, তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ আরম্ভ করি।

ঐতিহাসিক নাটকে প্রায়ই সৈনিকদের সমবেত কণ্ঠে উচ্চরোলে 'হর হর মহাদেও' বা 'আল্লা আল্লা হো' বলতে হয়। দু-চারজন সৈন্য রঙ্গমঞ্চ বা নেপথ্য থেকে ও রকম ধ্বনি তোলে, কিন্তু তাতে তেমন ফললাভ হয় না, তেমন জমে না। তাহলে?

একদিন মিনার্ভা থিয়েটারে অর্ধেন্দুশেখর সকল অভিনেতাকে ডেকে বললেন —যখন 'আল্লা আল্লা হো' করবার দরকার হবে, তখন থিয়েটারের যে যেখানে যে অবস্থায় থাক, 'আল্লা' শব্দ একবার কানে গেলেই 'আল্লা আল্লা হো' করে উঠবে। যে না করবে তাকে আমার কঠিন দিব্যি রইল।

তারপর আর কি। মুস্তফী সাহেব কঠিন দিব্যি দিয়েছেন, তাই সময়মত সকলেই 'আল্লা আল্লা হো' ধ্বনি তুলে দর্শকদের চমকিত করে দিয়েছে। নেপথ্য থেকে নানা অবস্থায় 'আল্লা আল্লা হো', করে উঠেছে অভিনেতারা। কেউ হুকো-হাতে, কেউ মুখের খাবার ফেলে, কেউ জলের গ্লাস হাতে, কেউ বেঞ্চিতে শুয়ে, কেউ তন্দ্রাবস্থায়, কেউ পায়খানা থেকে।

একজন শিক্ষার্থীকে বাঙাল উচ্চারণে 'ব্যয় বাহুল্য' বলতে হবে। 'ব্যয় বাহুল্য' বাঙাল উচ্চারণে হবে 'ব্যাবাহুল্য'। কিন্তু শিক্ষার্থী কিছুতেই উচ্চারণটি রপ্ত করতে পারছেন না।

অর্ধেন্দুশেখর জিজ্ঞেস করলেন—পাঁঠা কী করে ডাকে ?

শিক্ষার্থী জবাব দিলেন—ব্যা-ব্যা।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন—আচ্ছা, এবার বল, ব্যা-বা হুল্য।

অর্ধেন্দুশেখর স্পষ্টাক্ষরে শিক্ষার্থীকে বলতেন—দর্শকে হাততালি দিক বা না দিক সেদিকে লক্ষ্য রাখবার কোন দরকার নেই। সত্য কখনও চাপা থাকে না। অভিনয় যদি ঠিক হয় তাহলে দর্শক আপনিই মোহিত হবেন, হাততালি ভিক্ষে করতে হবে না।

অপরেশচন্দ্র অর্ধেন্দুশেখরের শিষ্য। তিনি একদিন অর্ধেন্দুশেখরকে বললেন —সাহেব, আপনি যেমন দেখিয়ে দিচ্ছেন, আমার তো তেমনটি হচ্ছে না। আপনাকে অনুকরণ করতে গিয়ে একটা কিম্ভূতকিমাকার হয়ে যাচ্ছে। কী করলে ঠিক আপনার মত অমনি বলতে পারি বলুন তো।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন—তোমাদের শিখতে এত কষ্ট হয় কেন জান ? আমি দেখি, তোমরা দেখতে জান না। অভিনয় কোন একজনের কাছে শেখা যায় না, আসল অভিনয় সমাজের কাছে শিখতে হয়। দেখে শিখতে হয়, দেখে বিচার করতে হয়। নানা রকম বই পড়ে, নানা রসের স্বাদ নিতে হয়; আর সময়মত তাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে হয়। খালি মুখস্থ করে আবৃত্তি করলে হয় না, অভিনেতার কাজ খুব সোজা নয়।

হ্যাঁ, অভিনেতার কাজ অত্যন্ত গুরুতর। চোখ মেলে দেখতে হবে, হঠাৎ রেগে গেলে লোকের চোখমুখ কেমন হয়, হঠাৎ আনন্দ সংবাদ পেলে লোক কেমন উল্লসিত হয়ে ওঠে। সংসারে দেখতে হবে, পুত্রহারা জননী কেমন করে কাঁদেন, পিতা কেমন করে কাঁদেন। দেখতে হবে, মায়ের কান্নায় আর বাপের কান্নায় তফাত কোথায়। সব দেখতে হবে, শিখতে হবে। অন্তত অর্ধেন্দুশেখর সেই পরামর্শই দিয়েছেন।

অর্ধেন্দুশেখর বলেছেন—আমাকে কেউ অভিনয় শেখায় নি। আমি সমাজের কাছ থেকে, বন্ধুর কাছ থেকে, বইয়ের পাতা থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। সেসব আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে আঁকা আছে। বরাবর আমি সেসব জায়গামত কাজে লাগানোর চেষ্টা করি, তাই বোধ হয়, অনেকটা আমার হয়।

মিনার্ভা থিয়েটারে অর্ধেন্দুশেখর একবার কড়িবাবুকে যেমন করে অভিনয় শিখিয়েছিলেন, তেমন করে বোধ হয় কেউ কাউকে শেখায় নি। কড়িবাবুর পোশাকী নাম সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।

মিনার্ভায় 'শিরী ফরহাদ' গীতিনাট্যের অভিনয় হবে, মহলা চলছে যথারীতি। সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় 'শিরী ফরহাদে' মহবুবের ভূমিকা পেয়েছেন।

সাতকড়িকে মহবুবরূপে হো-হো করে হাসতে-হাসতে মঞ্চে ঢুকতে হবে একটা দৃশ্যে। সাতকড়ি কিছুতেই হাসিটা রপ্ত করতে পারছেন না, কিছুতেই মনের মত হচ্ছে না। অগত্যা সাতকড়ি অর্ধেন্দুশেখরকে ধরলেন —সাহেব, এই হাসিটা আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে।

অর্ধেন্দুশেখর রাজী হলেন। শেখাবেন বইকি, শেখাবেন। কিন্তু, আজ নয়।

আবার পরদিন সাতকড়ি হাজির। সেই হো-হো হাসিটা ঠিকঠাক শিখিয়ে দিতে হবে।

অর্ধেন্দুশেখর শিখিয়ে দেবেন। কিন্তু, আজ নয়।

আজ নয়, কাল। আজ নয়, কাল।

আজ-কাল করতে করতে অনেক দিন হয়ে গেল, কিন্তু অর্ধেন্দুশেখর তো সাতকড়িকে শেখালেন না।

সাতকড়ি হতাশ হলেন। হয়তো একটু অভিমান করলেন। আর অনুরোধ করলেন না সাহেবকে।

নতুন নাটকের প্রথম অভিনয়ের রাত্রে কোন অভিনেতা-অভিনেত্রী নাট্যাচার্যকে নমস্কার না করে মঞ্চে ওঠেন না। কিন্তু 'শিরী ফরহাদে'র প্রথম অভিনয়ের রাত্রে কই সাতকড়ি তো অর্ধেন্দুশেখরকে নমস্কার করলেন না।

অর্ধেন্দুশেখর হয়তো মনে-মনে হাসলেন।

তারপর সেই দৃশ্য, যে-দৃশ্যে মহবুবরূপে সাতকড়িকে হো-হো করে হাসতে-হাসতে মঞ্চে ঢুকতে হবে। সেই হাসিটি আরম্ভ করার আগের মুহূর্তেই সামনের উইংসের পাশে একটা শব্দ হল; শব্দ শুনে সেদিকে চোখ ফেলতেই সাতকড়ি দেখলেন, অর্ধেন্দুশেখর আজব ভঙ্গিতে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সেই দৃশ্য দেখে হো-হো করে হেসে উঠলেন সাতকড়ি, হাসতে-হাসতেই অভিনয় করলেন, অভিনয় চরিত্রোচিত হল, সাতকড়ির আর কোন ক্ষোভ রইল না।

অভিনয়ান্তে সাতকড়ি এসে অর্ধেন্দুশেখরের পায়ের ধুলো নিলেন। অর্ধেন্দুশেখর সাতকড়ির পিঠ চাপড়ে বললেন—কেমন, প্রাণের হাসি শিখলি তো! বড় যে অভিমান করেছিলি!

অর্ধেন্দুশেখর অসামান্য পরিহাসকুশল। অর্ধেন্দুশেখর যেখানে বসেন, সেখানে হাসির বন্যা বয়ে যায়। অর্ধেন্দুশেখরের কাছে রঙ্গরসের কথা শুনতে চাইলে, নিশ্চিন্ত থাকুন, কেউ কখন বিমুখ হবে না। বাকচাতুর্যে অর্ধেন্দু-শেখর অদ্বিতীয়।

মিনার্ভা থিয়েটারের সামনে একদিন গম্ভীরমুখে বসে আছেন অর্ধেন্দুশেখর। কে একজন চেনা ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞেস করলেন—কি মশাই, এত কী ভাবছেন?

অর্ধেন্দুশেখর জবাব দিলেন—না, এমন কিছু ভাবছি না। কী ভাবব, তাই ভাবছি।

আরেকদিন। পীরুর হোটেলে দুটো হাফ্-বয়েল্ড হাঁসের ডিমের অর্ডার দিয়েছেন অর্ধেন্দুশেখর। হোটেলের বয় ডিম নিয়ে এল। ডিম দুটোর দাম কত?

বয় বলল—আজ্ঞে, দু-আনা।

—দু-আনা? এত দাম কেন? —অর্ধেন্দুশেখর বললেন—ডিমের জোড়া তো চারপয়সা।

—আজ্ঞে, আজকাল ডিম বড় মাগ্‌গি হয়েছে।

অর্ধেন্দুশেখর বললেন—কেন? হাঁসেরা আজকাল সব পরমহংস হয়ে উঠেছে নাকি?

আরেকদিনের কথা। অর্ধেন্দুশেখর মিনার্ভা থিয়েটারে তেল মেখে স্নানের জন্যে চৌবাচ্চায় নামতে যাচ্ছেন, কে একজন ভদ্রলোক অর্ধেন্দু-শেখরকে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন আছেন মশায়?

অর্ধেন্দুশেখর সঙ্গে-সঙ্গে সর্বাঙ্গ কুঞ্চিত করে ফেললেন। বিকৃতমুখে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—উঃ, বড় জ্বর!

ভদ্রলোক অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—সে কি মশাই। ভাল না থাকলে কেউ তেল মেখে স্নান করে? জ্বর কি বলছেন আপনি?

অর্ধেন্দুশেখর পলকে সহজ-স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। বললেন—আমি তো কিছুই বলি নি মশায়। আমি তোফা স্নান করতে যাচ্ছি, আপনিই এসে বললেন—কেমন আছেন?

উনষাট বছর বয়সে অর্ধেন্দুশেখর লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র লিখেছেনঃ "অর্দ্ধেন্দু চলিয়া গেলেন। ইতিপূর্ব্বে অনেক অভিনেতা যাঁহারা তারার ন্যায় ইন্দুকে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন, তাঁহারা অগ্রে গিয়াছেন। যদি এরূপ হয় যে সমব্যথী আত্মা একত্রে বাস করে, তাহা হইলে তাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রেও যেরূপ ছিলেন, তথায়ও সেইরূপ একত্রে আনন্দ করিতেছেন। কিন্তু হেথায় "অর্দ্ধেন্দু নাই—অর্দ্ধেন্দু নাই" এই শব্দ। যিনি কখনও রঙ্গালয়ে পদার্পণ করিয়াছেন, অর্দ্ধেন্দুর মৃত্যুতে তিনিও ব্যথিত। যাঁহারা তাঁহার সহযোগী, তাঁহাদের মনে দিবারাত্র উদয় হইতেছে—"অর্দ্ধেন্দু কোথায় গেল!" ভাবিতেছে—আর তাঁর দেখা পাইবে না, আর তাঁর সহিত পরামর্শ হইবে না, আর তাঁহাকে সাজঘরে যত্নের সহিত সজ্জা করিতে দেখিবে না, আর তাঁহার অলৌকিক অভিনয় শুনিবে না; সকলই ফুরাইয়াছে। অর্দ্ধেন্দুর স্মরণার্থে মূর্ত্তি প্রস্তুত হোক, তাঁহার কোন প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান হোক, যাহা হইবার হউক, স্মৃতিচিহ্ন দেশে দেশে থাকুক, কিন্তু অর্দ্ধেন্দু আর নাই, সে আর ইহজগতের বার্ত্তা কিছুই রাখিবে না, যোগ্যস্থান লাভ করিয়াছে, অন্য কোন উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত আছে, কিন্তু

অর্দ্ধেন্দু কি তাঁহার প্রিয় রঙ্গালয় ভুলিবেন? কখনও না! দেবকার্য্যে, নিযুক্ত থাকিয়া যদ্যপি তিনি ভোলেন, যতদিন বাঙ্গালায় রঙ্গালয় থাকিবে কেহ তাঁহাকে ভুলিবে না। বঙ্গরঙ্গভূমি চিরদিন তাঁহার উজ্জ্বল স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিবে। রঙ্গালয়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর অমর!"

—:::০:::—

নয়

অমৃতলাল বসু বলেছেনঃ আমার নাট্যজীবনে অর্দ্ধেন্দু আমার প্রথম গুরু।

কিন্তু অমৃতলালের সঙ্গে অর্ধেন্দুশেখরের প্রথম দেখা হয় কোথায়? কম্বুলিটোলা বাঙলা ইস্কুলে। এই ইস্কুলেই অমৃতলালের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ত অর্ধেন্দুশেখর। দু-বছর কম্বুলিটোলা ইস্কুলে একসঙ্গে লেখাপড়া করে অর্ধেন্দুশেখর চলে গেল পাইকপাড়া ইস্কুলে।

প্রায় চার বছর কেটে গেল তারপর। অমৃতলালও ইস্কুল বদল করেছে। অর্ধেন্দুর সঙ্গে কোন দেখাশোনা নেই। বলতে কি, অর্ধেন্দুর নাম পর্যন্ত ভুলে গেল অমৃতলাল।

ছেলেমহলে সে সময়ে থিয়েটার নিয়ে খুব জল্পনাকল্পনা হত। কোথায় কোন নাটকের অভিনয় হল, কে কোন ভূমিকায় অভিনয় করল, কাকে কোন নাটকে ব্যঙ্গ করা হল।

ভোলানাথ মুখুয্যে 'কিছু কিছু বুঝি' লিখেছেন। চুটিয়ে লিখেছেন। কয়লা-হাটায় অভিনয়। হই-চই পড়ে গেছে চতুর্দিকে।

বন্ধুরা অমৃতলালকে বলল—চল, থিয়েটার দেখতে হবে।

কিন্তু অমৃতলালের থিয়েটার দেখার উপায় নেই। সন্ধ্যার পর বাড়ির বাইরে বেশিক্ষণ থাকা বারণ। সেই কথাই বলল অমৃতলাল—আমার যাওয়া হবে না। সন্ধ্যার পরে কখন বাড়ির বাইরে থাকি নি।

বন্ধুরা বলল—তবে না হয় দিনের বেলায় চল। স্টেজ দেখে আসবে।

তা বরং দেখে আসা যেতে পারে। অমৃতলাল রাজী হল। দিনের বেলায় স্টেজ দেখতে গেল। একজনকে জিজ্ঞেস করল—কে কে অভিনয় করবে?

অনেকেই অভিনয় করবে। তাদের মধ্যে ধর্মদাস আছে, অর্ধেন্দু আছে।

অর্ধেন্দু! নাম শুনে চমকে উঠল অমৃতলাল।

অর্ধেন্দু! কোন অর্ধেন্দু?

কে একজন বলল—অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। চমৎকার প্লে করে।

এ নাম আর কারও হতে পারে না। এ নিশ্চয়ই সেই অর্ধেন্দু, সেই কম্বুলিটোলা ইস্কুলের অর্ধেন্দু। কিন্তু কম্বুলিটোলা ইস্কুলে তো অর্ধেন্দু অত্যন্ত অরসিক ছিল, সে এখন প্লে করে, চমৎকার প্লে করে?

অমৃতলাল জিজ্ঞেস করল—একবার তার সঙ্গে দেখার সুবিধা হয় না? সে কোথায়?

দেখা হল না। অমৃতলালকে ফিরে আসতে হল সেদিন।

কয়েকদিন পরে হঠাৎ একদিন অর্ধেন্দুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বাড়ির সামনে বসে আছে অমৃতলাল, সেখানে হঠাৎ অর্ধেন্দু এসে উপস্থিত। অর্ধেন্দুকে দেখে অমৃতলাল খুব খুশি। অনেক কথা হল দু-জনে। শেষে অর্ধেন্দু বলল—তুমি একদিন আমাদের থিয়েটার দেখতে যাবে? টিকিট এনে দেবো।

যে-সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন থিয়েটারের টিকিট পাওয়া মুখের কথা নয়। একখানা থিয়েটারের টিকিট জোগাড় করতে বিস্তর খোশামোদ লাগে।

কিন্তু অর্ধেন্দু টিকিট এনে দিতে চাইলে কি হবে, অমৃতলালের থিয়েটার দেখতে যাবার উপায় নেই। অমৃতলাল বলল—না ভাই, আমার যাওয়া হবে না, রাত্তিরে বাইরে থাকা আমার নিষেধ, আর এ-বছরে আমি এণ্ট্রান্স একজামিন দেবো।

জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করল অমৃতলাল। তারপর ঢুকে পড়ল মেডিক্যাল কলেজে।

আবার আরেকদিন অর্ধেন্দুর সঙ্গে দেখা। তখন 'সধবার একাদশী'র অভিনয় হয়েছে। অর্ধেন্দু বলল অমৃতলালকে—'সধবার একাদশী' দেখতে গেলে না?

না, অমৃতলাল 'সধবার একাদশী' দেখে নি। অমৃতলাল জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, তোমাদের নিমে দত্ত কে সাজে?

অর্ধেন্দু বলল—গিরিশ ঘোষ।

কে গিরিশ ঘোষ? কোন্ গিরিশ ঘোষ?

অর্ধেন্দু বলল—বোসপাড়ার নীলকমল ঘোষের ছেলে। চমৎকার অ্যাক্টর।

—ওঃ, নবীন সরকার মশায়ের জামাই?—অমৃতলাল এককথায় উড়িয়ে দিল—সে তো কেরানীগিরি করে! সেক্সপীয়র আওড়াবে কি করে? কলা

পাতার প্রকাণ্ড ঠোঙায় মুড়ে সাজা পান নিয়ে তাকে রোজ আপিস যেতে দেখি। দিগম্বর দে'র কাছে Book-Keeping শিখে, সে আপিসে খুব ভাল Book-Keeper হয়েছে জানি; কিন্তু সেক্সপীয়রের সে কী বোঝে?

তখন অমৃতলাল কি ঘুণাক্ষরেও বুঝেছিলো এই গিরিশচন্দ্রই ভবিষ্যতে তার গুরু হবেন! কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে হবে।

অমৃতলালের কথা শুনে অর্ধেন্দু রাগ করল না। হাসতে হাসতে বলল —তা নয় হে, তা নয়। নিমের পার্ট সে বেশ প্লে করে। তুমি একদিন চল না, দেখবে।

কিন্তু অমৃতলাল অভিনয় দেখতে গেল না।

তারপর একদিন মেডিক্যাল কলেজ ছেড়ে দিলেন অমৃতলাল। এলোপ্যাথি ছেড়ে দিয়ে হোমিওপ্যাথির লাইনে এলেন। শুধু তাই নয়, কলকাতাও ছেড়ে দিলেন। চলে গেলেন কাশীতে।

কাশী থেকে অবিশ্যি মধ্যে-মধ্যে কলকাতায় আসতেন। যে-কদিন কলকাতায় থাকতেন, মাস্টারি করতেন কম্বুলিটোলা ইস্কুলে। মাস্টারি করতেন, কিন্তু কোন মাইনে-টাইনে নিতেন না। শখের মাস্টারি।

ওই ইস্কুলেই সেসময়ে মাস্টারি করতেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও ধর্মদাস সুর।

একদিন অর্ধেন্দুশেখর অমৃতলালকে বললেন—তুমি এসেছো, ভালোই হয়েছে। 'লীলাবতী'র অভিনয় করতে হবে।

'লীলাবতী'র রিহার্সাল চলতে লাগল। রিহার্সাল হত গোবিন্দ গাঙ্গুলীর বাড়িতে। অমৃতলালের বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, অর্ধেন্দুশেখর জোর করে একটি ভূমিকা দিলেন অমৃতলালকে। কিন্তু সেবার অমৃতলাল অভিনয় করতে পারেন নি। অভিনয়ের আগেই অমৃতলালকে কাশীতে ফিরে যেতে হল।

কাশী থেকে বাঁকিপুর, বাঁকিপুর থেকে কলকাতা। ১৮৭২ সালের নভেম্বর মাসের কথা। হ্যাঁ, অমৃতলাল কলকাতায়। সেবার কলকাতায় এসে অমৃতলাল প্রথম যেদিন কম্বুলিটোলা ইস্কুলে গেলেন, অমৃতলালকে দেখে অর্ধেন্দু-শেখর ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলেন। হেডমাস্টারের কাছ থেকে ছুটি নিলেন। তারপর অমৃতলালকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। হাঁটতে-হাঁটতে অনেক কথা

শোনা গেল অর্ধেন্দুশেখরের মুখে। সবচেয়ে বড় কথা, গিরিশচন্দ্র দল ছেড়ে চলে গেছেন, গিরিশচন্দ্রকে বাদ দিয়েই থিয়েটার করতে হবে। হাঁটতে-হাঁটতে দু জনে ভুবনমোহন নিয়োগীর বাড়িতে এলেন। এখানেই মহলার বন্দোবস্ত।

'নীলদর্পণে'র মহলা চললো পুরোদমে। অমৃতলালের কোন পার্ট নেবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দলের সকলেই এক বাক্যে বলল—তুমি সৈরিন্ধ্রীর পার্টটা নাও। বেশি নয়, দু-এক রাত্রি তুমি প্লে কর। তারপর না হয় আমরা অন্য ব্যবস্থা করে নেব।

অগত্যা রাজী হওয়া গেল।

সৈরিন্ধ্রীকে নিখুঁত করবার দিকে অমৃতলালের চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই। একদিন অর্ধেন্দুশেখর অমৃতলালকে বললেন—তোমার পার্টটা কেমন হল দেখি।

পরখ করে দেখলেন অর্ধেন্দুশেখর। বললেন—না, হয় নি।

সৈরিন্ধ্রীর প্রথম দৃশ্যে চুলের দড়ি বিনানোর সময় কথার ভঙ্গি কী রকম হবে, অর্ধেন্দুশেখর সবিস্তারে বুঝিয়ে দিলেন অমৃতলালকে। বাড়িতে এসে অমৃতলাল ভাবলেন, কথাবার্তার ধরন-ধারন রপ্ত করে নিতে বেশি দেরি হবে না, আসল ব্যাপারটা হচ্ছে কান্না। কান্নাটা ঠিকঠাক রপ্ত করতে পারলেই আর কোন ভাবনা নেই।

অমৃতলালের ছেলেবেলায় কলকাতার নাট্যসমাজে খুব নাম ডাক ছিল কালিদাস সান্যালের। কাছাকাছি থাকতেন ভদ্রলোক। অমৃতলাল তাঁর কাছে গেলেন কান্না শিখতে। কিন্তু কালিদাসবাবুর কান্না অমৃতলালের পছন্দ হল না। অমৃতলাল ভাবলেন, আমি একাই চেষ্টা করে দেখব।

একাই চেষ্টা করতেন অমৃতলাল। পাড়ার একটা পড়ো বাড়িতে দুপুরবেলা গিয়ে একা-একা কান্না প্রাকটিস করলেন। দিন কয়েক পরে অমৃতলাল একদিন অর্ধেন্দুশেখরকে বললেন—একবার আমার কান্নার জায়গাটা শোন দেখি।

শুনলেন। শুনে খুব খুশি হয়ে অর্ধেন্দুশেখর বললেন—বহুত আচ্ছা। বেশ হয়েছে।

একদিন অমৃতলাল একলা ভুবনমোহন নিয়োগীর বৈঠকখানায় বসে-বসে তামাক খাচ্ছেন। দলের আর কেউ নেই সেদিন সেখানে। সেদিন দলের অন্য সকলে খুব সম্ভব মেটেবুরুজের নবাবের চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছে।

তিনজন ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। অমৃতলাল সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন।

একজন ভদ্রলোক অমৃতলালকে জিজ্ঞেস করলেন—ভুবন নিয়োগীর এই বাড়িতে থিয়েটারের রিহার্সাল হয় ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তুমি কি সেই দলের একজন প্লেয়ার ?

—হুঁ।

—আজ তোমরা এখন রিহার্সাল আরম্ভ কর নি কেন ?

—আজ আমাদের রিহার্সাল বন্ধ। আজ আমি ছাড়া আর কেউ এখানে উপস্থিত নেই।

—তাই তো ! আমরা এলাম তোমাদের রিহার্সাল দেখতে···

—আসুন, ভেতরে বসুন, তামাক খান।

—থাক, আর তামাক খাব না। আমাদের তুমি চিনতে পারছ না। আমার নাম শিশিরকুমার ঘোষ, ইনি অক্ষয়চন্দ্র সরকার, আর ইনি প্যারীমোহন রায়।

শিশিরকুমারের পায়ের ধুলো নিলেন অমৃতলাল। নমস্কার করলেন অক্ষয়-চন্দ্রকে, প্যারীমোহনকে।

শিশিরকুমার জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নাম কী ?

—অমৃতলাল বসু।

—তুমি কী সাজবে ?

—সৈরিন্ধ্রী।

—আচ্ছা, সমস্ত পালাটা না হয় আজ না-ই হল, তুমি সৈরিন্ধ্রীর পার্টটা একটু আমাদের শোনাবে ?

একটু শোনাবে ? একটু ইতস্তত করে রাজী হলেন অমৃতলাল। শিশির কুমারকে বললেন—আমি আপনার লেখা পড়েছি, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি খুব বেশি, আপনি যখন বলছেন তখন আমি আমার পার্ট একটু আপনাকে শোনাতে পারি।

একটু শোনানো হল। ভদ্রলোকেরা খুশী হয়ে ফিরে গেলেন।

সব তো হল, কিন্তু থিয়েটার হবে কোথায় ? আগেই বলা হয়েছে সেকথা, চিৎপুরের মধুসূদন সান্ন্যালের বাড়ির উঠোনটি ভাড়া নেওয়া হল মাসিক চল্লিশ টাকায়। তারপর স্টেজ তৈরি করতে হবে। আব্দুল মিস্ত্রীকে নিয়ে অমৃতলাল স্টেজ তৈরী করতে বসে গেলেন। কাজ চলতে লাগল

আস্তে-আস্তে। না, ধর্মদাস সুর না থাকলে স্টেজের সুব্যবস্থা হবে না। কিন্তু ধর্মদাস তো সমস্তদিন কম্বুলিটোলা ইস্কুলে মাস্টারী করেন, ছুটি পান বিকেল চারটে নাগাদ। তাঁরই কথামত স্টেজ তৈরি হচ্ছিলো, কিন্তু তাঁকে তো সারাদিন আটক থাকতে হয় ইস্কুলে।

অমৃতলাল একদিন ধর্মদাসকে বললেন—ত্যাখ, এক কাজ করা যাক্। তোমার বদলে আমি ইস্কুলে পড়াবো। মাসকাবারে তোমার পুরো মাইনে তোমার হাতে দেব। তুমি সারাদিন এখানে থাক, আব্দুল মিস্ত্রীকে খাটাও, স্টেজ তৈরী কর।

সেই ব্যবস্থাই হল। হেড মাস্টার আপত্তি করলেন না। ধর্মদাসের বদলে অমৃতলাল কম্বুলিটোলা ইস্কুলে মাস্টারী করতে লাগলেন। ইস্কুল ছুটি হলেই অবিশ্যি অমৃতলাল চলে আসতেন, ধর্মদাসের সঙ্গে স্টেজের কাজ করতেন রাত এগারোটা অবধি।

স্টেজ তৈরি হয়ে গেল।

সত্যি, একটা থিয়েটার খোলার জন্যে বিস্তর পরিশ্রম করেছে সেসময়ে কয়েকজন সহায়সম্বলশূন্য যুবক। বাধা-বিঘ্ন অভাব-অভিযোগের সামনে নির্ভয়ে কাজ করেছে। টাকাকড়ির জোর নেই, মুরুব্বির জোর নেই, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে বিস্তর। অঢেল কুলি বা চাকর রাখবে, তেমন পয়সা কই! নিজেরাই তাই হাত লাগিয়েছে। প্ল্যাকার্ড পর্যন্ত নিজের হাতে লাগাতে হয়েছে অমৃতলালকে।

সেসব দিনের কথা মনে করে অমৃতলাল শেষ বয়সে লিখেছেন ঃ

যুবা-ক'টি সহায়বিহীন।
মাটী হ'য়ে খাটিয়াছি কত নিশিদিন ॥…
গেছে দিন পাই-হীন ছিনু ক'টি ভাই।
পুষিতে বিরাট্ পুত্র ঘরে দুধ নাই ॥
একটি কাঠের কপি এক-আনা মূল্য।
অভাবে ভেবেছি তারে সুবর্ণের তুল্য ॥
সাণ্ডেল-দালানে উচ্চ পড়-পড় কড়ি।
ঝুল-ঢাকা ছিল তাতে ঝাড়-ঝোলা দড়ি ॥
আমি আর ধর্ম্মদাস নিশীথ-আঁধারে।
বাঁশ বেয়ে উঠিয়াছি চুরি করিবারে ॥

সেকালে ছিল না বেশী কুলি কি চাকর।
যারা ছিল কাজে যেতে একা পেত ডর॥
তাই দেখিয়াছে লোক লালদীঘি-ধারে।
প্ল্যাকার্ড ম'য়েতে উঠে' 'ভুনিবাবু' মারে॥

কে ভুনিবাবু? বলা হয় নি কথাটা, অমৃতলালের ডাক নাম ভুনি। আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে ডাকনামেই ভুনিবাবুর নামডাক।

যা বলছিলাম।

হ্যাঁ, উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে ধর্মদাস অমৃতলালের সঙ্গে রাতের অন্ধকারে বাঁশ বেয়ে উঠেছেন। ধর্মদাস সুর সম্পর্কে এখানে দু-একটা কথা বলে রাখি। জীবনে স্বক্ষেত্রে সার্থক হয়েছিলেন ধর্মদাস।

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ধর্মদাস সুরের বাল্যবন্ধু। বলতে গেলে অর্ধেন্দুই ধর্মদাসকে থিয়েটারে নিয়ে আসেন।

বছর চোদ্দ বয়স তখন ধর্মদাসের, ডফ সাহেবের ইস্কুলের ছাত্র। অর্ধেন্দু বললেন থিয়েটার করতে। ধর্মদাস রাজী। অর্ধেন্দু ধর্মদাসকে নিয়ে এলেন কয়লাহাটায়, 'কিছু কিছু বুঝি'র আখড়ায়। 'কিছু কিছু বুঝি'তে ধর্মদাস চন্দন-বিলাসীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। শুধু তাই নয়, সেখানে স্টেজ-ম্যানেজারও হয়েছেন ধর্মদাস। সকলেই জানত, ধর্মদাসের কারুকর্মে হাত আছে।

তারপর একদিন 'শকুন্তলা' দেখলেন ধর্মদাস। 'শকুন্তলা'র দৃশ্যপট দেখে ধর্মদাস বিমুগ্ধ। এই দৃশ্যপটের কাজই শিখতে হবে।

শিখেছেন, উত্তমরূপে ধর্মদাস শিখেছেন। আজীবন প্রমাণ দিয়েছেন আপন কৃতিত্বের। জীবনে নানা রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে এসেছেন ধর্মদাস। বলতে কি, সেকালের প্রায় সমস্ত রঙ্গালয়ের ইতিহাসের সঙ্গেই ধর্মদাসের নাম বিজড়িত হয়ে আছে।

মানুষটিও বড় প্রিয়ভাষী।

বলতে গেলে, মঞ্চের নেপথ্যলোকেই অতিবাহিত হয়েছে ধর্মদাসের নাট্যজীবন। অভিনেতারা দর্শকবৃন্দের প্রশংসা পেয়েছেন, আর ধর্মদাস নেপথ্যে থেকে ঋণী করেছেন অভিনেতাদের। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র একদিন মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, 'ধর্ম্মদাস আমাকে কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ করিয়াছে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব যে সকল অভিনেতা রঙ্গমঞ্চ হইতে দর্শকের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বর্গগত এবং যাঁহারা জীবিত, সকলেই সেই ঋণ-পাশে আবদ্ধ।' বলেছেন, 'যে সকল নাট্যরথী

দর্শকবৃন্দের ভূয়সী প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন, ধর্ম্মদাস না থাকিলে তাঁহারা প্রতিভা বিকাশের স্থান পাইতেন না।'

১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বর 'নীলদর্পণ' অভিনীত হল। রোগ-সাহেব সেজেছিলেন অবিনাশচন্দ্র কর। অমন রোগ-সাহেব আর হল না। রেবতী সেজেছিলেন তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়। তিনকড়িবাবুর বয়স বেশি ছিল না তখন, অথচ মজার কাণ্ড, দলের সকলে 'ঠাকুর্দা' বলে ডাকত তাকে। অমন নিখুঁত রেবতীও আর হল না। তিনকড়িবাবুর কথা মনে পড়লে দুঃখ হয়। মরবার আগে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক।

পদী ময়রাণীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন মহেন্দ্রলাল বসু। আগেও মহেন্দ্রলাল অভিনয় করে প্রশংসা পেয়েছেন, পরেও পেয়েছেন। উত্তরকালে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন ঃ

'আমাদের অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায় যখন চলিত রঙ্গমঞ্চে "সধবার একাদশী" অভিনয় করে, মহেন্দ্রলাল প্রায়ই অভিনয়ের দিন উপস্থিত হইতেন। তৎপরে ঐ সম্প্রদায় "লীলাবতী" অভিনয়ের উদ্যোগ করে, সেই সময়ে মহেন্দ্রলালের সহিত আমার প্রথম দেখা। কৈশোরকাল অতীত, যৌবনে পদার্পিত, গৌরবর্ণ সুঠাম কলেবর মহেন্দ্রলালকে আমি এখনও চক্ষের উপর দেখিতেছি। তিনি "লীলাবতী" নাটকের একটী ভূমিকার (Part) প্রার্থী হইয়া আসেন। তৎপূর্ব্বে প্রায় সকল ভূমিকাই বিতরিত হইয়াছিল। তাঁহাকে "ভোলানাথ চৌধুরীর" ভূমিকা দেওয়া হইল। কৈশোরমূর্ত্তি আবরণার্থ একটী পরচুলের গোঁফ দিয়া মহেন্দ্রলালকে জমীদার সাজাইলাম। মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমাদের দলশুদ্ধ আনন্দিত। নাট্যোল্লিখিত ভোলানাথ চৌধুরী যখন "শ্রীনাথের" সহিত কথোপকথনে মত্ততার ভঙ্গীতে বলিতেন,—"সে যে ব'ল্লে ভাই, তা আমি কি ক'র্‌বো"—সে যাহারা শুনিয়াছে, কখনও ভুলিবে না। অভিনয়-অন্তে স্বর্গগত দীনবন্ধু বাবু, তাঁহাকে "ভোলানাথ চৌধুরী" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। "নীলদর্পণে" তিনি 'পদী-ময়রাণী'র ভূমিকা লন, তাহাতেও গ্রন্থকারের প্রশংসা লাভ করেন। "কৃষ্ণ-কুমারী"র 'রাণী'র অভিনয়ে, রাণীর অবয়বের বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও, দর্শক চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিতেন না। শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে অভিনয় দর্শনে, উক্ত রাজবাড়ীর "কৃষ্ণকুমারী"র অভিনয়ে যিনি রাণী সাজিয়াছিলেন, তিনি আনন্দে

ঈর্ষা ভুলিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। যে ভূমিকায় তিনি দর্শকের সম্মুখীন হইতেন, সেই ভূমিকাই উত্তম হইত। যে সময় শোভাবাজার-রাজবাটীর নাট্য-মন্দিরে "কৃষ্ণকুমারী"র অভিনয় হয়, সেই সময়ে "কপাল কুণ্ডলা" অভিনয়ও হইয়াছিল। কোন কারণে অভিনয় রাত্রিতে নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত "কপাল কুণ্ডলা"র পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয়। অসংখ্য দর্শক উপস্থিত,—'কপালকুণ্ডলা'র অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে। মহেন্দ্রলাল ও অন্যান্য সুযোগ্য অভিনেতা মিলিয়া তৎসাময়িক ডাইরেক্টারকে বলেন, "মহাশয়, আপনি বঙ্কিমবাবুর বই ধরিয়া প্রম্‌ট (prompt) করিয়া যান, আমরা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করি।" নবকুমারের ভূমিকা মহেন্দ্রলাল লইলেন। অভিনয়-অন্তে দর্শক বুঝিতে পারিল না যে ভিতর ভিতর এরূপ বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

ন্যাসানাল থিয়েটারের পর গ্রেট ন্যাসানাল থিয়েটার স্থাপিত হয়। মহেন্দ্রলালের সকল অভিনয়ই উত্তম হইত। কিন্তু ৺উপেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত "শরৎ-সরোজিনী"তে শরতের ভূমিকা যারপরনাই উৎকৃষ্ট হইল। বিচ্ছেদ-অন্তে শরৎ-সরোজিনীর যখন মিলন হয়, সে স্থানের অভিনয়ের আর তুলনা হয় না। অদ্যাবধি সে ভূমিকার অভিনয় অন্য কাহারও দ্বারা সেরূপ সুন্দর আমার চক্ষে ঠেকে নাই। "পলাশীর যুদ্ধে" সিরাজদ্দৌলার ভূমিকা মহেন্দ্রলাল লন,—সে ভূমিকা তাঁহারই অনুকরণে আজও চলিতেছে।...

আমিও তাঁহার সকল ভূমিকার অভিনয় দেখি নাই। কিন্তু প্রতি ভূমিকা মহেন্দ্রলাল যেরূপ পারেন, সেইরূপই হইয়াছিল, তাহা শ্রুত আছি ও বিশ্বাস করি। আমার সহিত যে যে রঙ্গমঞ্চে তাঁহার সংস্রব ছিল, সেই সেই স্থানে কিরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব মাত্র।

"মেঘনাদে" 'লক্ষ্মণ'রূপে মহাদেবকে সমরে আহ্বান, রামের নিকট বিদায় গ্রহণ ও যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিতকে আক্রমণ—এ সকলের অভিনয় আমি স্মৃতি থাকিতে ভুলিব না। "রাবণবধের" লক্ষ্মণ, সীতার কথার উত্তরে "জ্যেষ্ঠ-অনুগামী মাতঃ" এবং স্বগত "কেন মাগো সুমিত্রা জননি, ধ'রেছিলে গর্ভে মোরে!" গভীর শোকাচ্ছন্ন বীরকণ্ঠে প্রস্তরবৎ অচলভাবে যেরূপে উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণে দর্শকবৃন্দ প্রস্তরবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন। আমি 'রাম' সাজিয়াছিলাম, আমার চক্ষে জল আসিল, রঙ্গমঞ্চের সকলে এমন কি হীন পটপরিবর্ত্তনকারীরাও নিজ কার্য্য ভুলিয়া মুগ্ধপ্রায় হইল।

"সীতার বনবাসে"র লক্ষ্মণ—সীতাকে বনে রাখিয়া উন্মাদবৎ সন্তপ্ত হৃদয়-ভাবে মহেন্দ্রলাল সকলকে আছন্ন করিয়াছিলেন ; এ অভিনয়ে আমি রাম ছিলাম, অদ্ভুত অভিনয় দর্শনে আমি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশকাল বিস্মৃত হই।

"বিষাদ" নাটকে অলর্কের ভূমিকা যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মহেন্দ্রলালের অভিনয়ের যাঁহারা পক্ষপাতী, তাঁহারাও স্বীকার করেন যে, তৎপূর্ব্বে তাঁহার এরূপ অদ্ভুত শক্তি তাঁহাদের অনুভূত হয় নাই। এ অভিনয়ে মহেন্দ্রলাল আপনার সমস্ত অভিনয় পরাজয় করিয়াছিলেন।

"পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" নাটকে, বৃহন্নলার অভিনয়ে দ্রৌপদীর প্রতি উক্তি—

"হের দীর্ঘ বেণী শঙ্খের বলয়,—
আমি ধনঞ্জয়—কি হেতু প্রত্যয় কর ?"

এখনও আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

বলিয়াছি, প্রতি ভূমিকায়ই মহেন্দ্রলাল সুদক্ষ অভিনেতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।···এক কথায় পাঠককে বুঝাই যে, অদ্যাবধি সকল ভূমিকাই তাঁহার অনুকরণেই চলিতেছে, কেহই তাঁহার কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া অভিনয় করিতে সক্ষম হন নাই।···

মহেন্দ্রলাল যে কেবল অভিনয় কার্য্যে দক্ষ ছিলেন, তাহা নয়, তাঁহার পরামর্শে অনেক রঙ্গমঞ্চ অনেক সময়ে সুন্দর চিত্রপটে সুসজ্জিত হইয়াছিল। সৌন্দর্য্য অনুভব মহেন্দ্রলালের স্বভাবসিদ্ধ। আজীবন তিনি সৌন্দর্য্যের সেবা করিয়াছিলেন। যদিও বাল্যকালে পিতৃবিয়োগে নানা দুর্ঘটনা বশতঃ বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল, নট-জীবনে বিদ্যালোচনায় তিনি সে বাল্যক্ষতি পূরণ করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্রলাল মুক্ত-হস্ত পুরুষ ছিলেন। পরদুঃখ মোচনে ও সুহৃদ সেবায় তিনি তাঁহার অনেক সম্পত্তি ব্যয় করিয়াছিলেন। বিদ্যাদানে কখনও কাতর হইতেন না। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশকালে অনেক অভিনেতাকে মহেন্দ্রের পদে নমস্কার করিয়া প্রবেশ করিতে হইত। তাঁহার অসীম সামাজিকতা ছিল। তাঁহার সহিত যিনি যিনি আলাপ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কখনও তাঁহার সদালাপ বিস্মৃত হইবেন না।

অনেক সময় আমরা পৃথক্ পৃথক্ রঙ্গালয়ে কার্য্য করিতাম ; কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী রঙ্গালয়ে থাকিয়া স্নেহ-ভাবের ভাবান্তর জন্মে নাই। আমি বয়োজ্যেষ্ঠ, আমায় তিনি গুরু বলিয়া প্রণাম করিতেন ; ইহাতে আমি পরম সম্মানিত হইতাম। মহেন্দ্রের মৃত্যু আমার হৃদয়ে বাজিয়াছিল। তাঁহার বিয়োগে আমি নাট্যক্রীড়ার

একজন প্রধান সহকারী হারাইয়াছ। কিন্তু তাঁহার বিয়োগে বঙ্গরঙ্গালয়ের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূর্ণ হইবার নহে; অপর—মহেন্দ্রলালের জন্মগ্রহণ সময় সাপেক্ষ।'

তারপর কাপ্তেন বেলের কথায় আসি। ১৮৭২ সালের ৭ ডিসেম্বরের 'নীল দর্পণে' ক্ষেত্রমণি সেজেছিলেন অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ওরফে বেলবাবু বা কাপ্তেন বেল। বাঙলা নাট্যলোকের আরেকজন দিকপাল অভিনেতা।

উত্তরকালে গিরিশচন্দ্র বলেছেন ঃ

'প্যাণ্টোমাইম অভিনয়ে কাপ্তেন বেল অদ্বিতীয় ছিলেন। ন্যাসানাল ও গ্রেট ন্যাসানার্ল থিয়েটারে যে সমস্ত ছোট ছোট প্যাণ্টোমাইম অভিনীত হইত, বেলবাবু তাহাতে অদ্ভুত ক্ষমতা দেখাইতেন।

"যেরা হাস্‌কে ব'লো, ও মুন্নাজান, জান গিয়ারে।
তোমার নাম ফুলকুমারী, তোমায় না দেখ্‌লে মরি,
তবে কেন রাধা পিয়ারী, নজ্‌রা মার রে॥"

এই গানখানি যখন নৃত্য ও অঙ্গভঙ্গির সহিত গাহিতেন, দর্শকগণ যেন একটী ছবি দেখিতেন।

'ক্লাউন' সাজিবার বেলবাবুর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। 'বেল্লিকবাজারে' রংদারের অভিনয় সকলেই দেখিয়াছেন। 'কুব্জ ও দর্জ্জি' এবং 'ধীবর ও দৈত্য' অভিনয়ে ইঁহার সুন্দর নৃত্যকলা প্রকাশ পাইত।

'হারানিধি' নাটকে অঘোরের ভূমিকায়, বেলবাবু, যখন যেরূপ অবস্থাগত হইতেন, ঠিক সেইভাবে অভিনয় করিতেন অর্থাৎ অবস্থায় যাহা প্রয়োজন—তাহাই করিতেন।...প্রফুল্ল নাটকে 'ভজহরির' ভূমিকাভিনয়েও ঐরূপ। "সরলা"য় গদাধরচন্দ্রের অভিনয়—বেলবাবুর অক্ষয় কীর্ত্তি।

'বেলবাবু' নিজে Paint করিয়া মনোমত সাজিতেন, অতি সুন্দর সাজিতেন, সাজিবার তাঁহার নৈপুণ্য ছিল।

হাস্যরসাভিনয়ে বেলবাবুর একাধিপত্য ছিল; গম্ভীর ভূমিকার অভিনয়েও প্রতিভা স্ফূরিত হইত। 'পলাশীর যুদ্ধে' সিরাজদ্দৌলা, 'সীতাহরণ' ও 'রাম-বনবাস' নাটকে লক্ষ্মণ, 'আনন্দরহো' নাটকে সেলিম, 'অভিমন্যুবধ' নাটকে অভিমন্যু, 'রূপ-সনাতনে' চৈতন্য প্রভৃতির ভূমিকা তিনি বহুবার অতি দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন।



অর্ধেন্দুশেখর



শিশিরকুমার

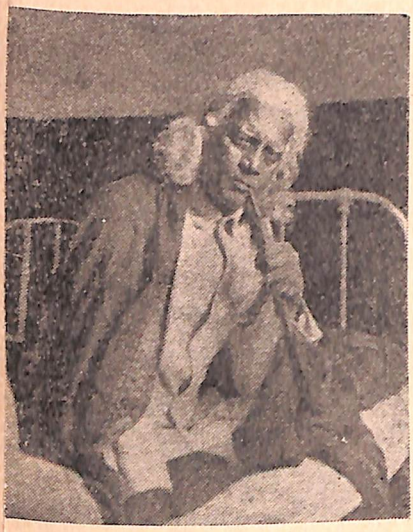

অমৃতলাল বসু



ধর্মদাস সুর



ষোড়শী'তে জীবানন্দ রূপে শিশিরকুমার

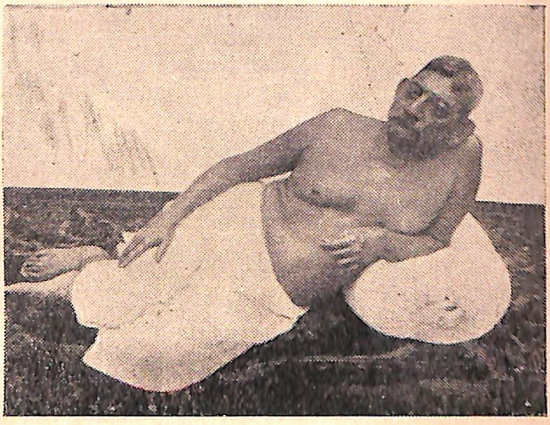

গিরিশচন্দ্র

চরিত্র উপলব্ধি ব্যতীত নট কখনও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। যে ভূমিকা অভিনয় করিতে হইবে, নটকে চিন্তা দ্বারা সেই ভাবাপন্ন হইতে হয়। বেলবাবুর অভিনয়ে নটের এই বাহ্য ও অন্তর্দৃষ্টির সূক্ষ্মতা বিশেষ লক্ষিত হইত। ন্যাসানাল থিয়েটারে 'ধীবর ও দৈত্য' অভিনয়ে, 'ধীবর'বেশী বেলবাবু যখন দৈত্যকে কৌশলে পুনরায় পিপার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, পিপার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার উপরে বসিতেন, আর দৈত্য 'আমায় খুলিয়া দাও' বলিয়া অনুনয়-বিনয় করিতে থাকিত, তখন রোষাবিষ্ট বেলবাবু মস্তক চালিয়া বলিতেন—'কভি নেই' এবং সেই সঙ্গেই নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেন—তাহার জালটী ছিঁড়িয়া গিয়াছে কি না। জেলে না হইলে এরূপ অবস্থায় জালের প্রতি কেহ লক্ষ্য রাখে না—দৈত্য পাছে বাহির হয়, এই ভয়েই বিব্রত থাকে। (বলা বাহুল্য, ধীবর মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত সমুদ্রে জাল ফেলিয়াছিল, মৎস্যের পরিবর্ত্তে এই পিপা উঠিয়াছিল এবং সেই পিপার মধ্যে ভীষণ এক দৈত্য আবদ্ধ ছিল।)

বেলবাবু দেখিতে যেরূপ সুপুরুষ, সেইরূপ অমায়িক এবং মিষ্টভাষী ছিলেন। ভগবান তাঁহাকে যেন অভিনেতা করিয়াই সংসারে পাঠাইয়াছিলেন। 'হারানিধি' নাটকে অঘোরের ভূমিকাই তাঁহার শেষ অভিনয়। হারানিধি খুলিবার কয়েকমাস পরে বেলবাবুর মৃত্যু হয়।'

'নীলদর্পণে' মতিলাল সুর ভূমিকা নিয়েছিলেন তোরাপের। অমন তোরাপ আর কেউ কখন সাজতে পারল না। উত্তরকালে অভিনেতা হিসেবে প্রচুর নাম কিনেছিলেন মতিলাল। অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ। সুযোগ পেলেই মতিলালকে নিয়ে বন্ধু-বান্ধবেরা একটু রসরঙ্গ করতেন।

একবার ন্যাশনাল থিয়েটারে 'মেঘনাদ বধ' অভিনয় হবে। মতিলাল সুরের বিভীষণের ভূমিকা। ড্রেস-রিহার্সাল হয়ে গেল। মতিলাল অমৃতলাল বসুকে জিজ্ঞেস করলেন—আমার অভিনয় তোমার কী রকম লাগল ?

অমৃতলাল মুখখানাকে গম্ভীর করলেন। বললেন—অভিনয় চমৎকার হচ্ছে, কিন্তু ন্যাচারল হচ্ছে না।

—কী ? কই গিরিশবাবু তো সে রকম কিছু বলেন নি। আনন্যাচারল হলে কি গিরিশবাবু বলতেন না ?

অমৃতলাল বললেন—জানি না। হয়ত উনি অতটা খেয়াল করেন নি।

মতিলাল অধৈর্য হয়ে বললেন—তোমার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না। একটু ভেঙে বল।

অমৃতলাল নিজের গাম্ভীর্য একবিন্দু কমালেন না। বললেন—আচ্ছা, ভেঙে বলছি। ছাখ, সকলেই জানে যে বিভীষণ শান্তশিষ্ট, ধার্মিক। কিন্তু জাতিতে বিভীষণ রাক্ষস তো বটে। তোমার অভিনয়ে সবই ভাল কিন্তু সেই রাক্ষস ভাবের একেবারেই অভাব। তোমার অভিনয় তো চমৎকার হচ্ছে, কিন্তু সেই সঙ্গে যদি ওই রাক্ষসের ভাবভঙ্গি···

মতিলাল বললেন—ঠিক বলেছ। দেবতা বা রাক্ষসের অভিনয়ের ভাবভঙ্গি মানুষের অভিনয়ের ভাবভঙ্গি থেকে আলাদা হবারই তো কথা। তুমি ঠিকই বলেছো হে। যা হোক, কথাটা আর পাঁচকান করো না। আমি স্টেজে একেবারে অভিনয়ে রাক্ষসের ভাবভঙ্গি দেখিয়ে, অন্য সকল তো দূরস্থান, গিরিশবাবুকে পর্যন্ত তাক লাগিয়ে দেবো। তাহলে এই কথাই রইল।

শুধু তাই নয়, অমৃতলাল গোপনে গোপনে মতিলালকে রাক্ষসের ভাবভঙ্গিও শিখিয়ে দিলেন।

অভিনয়ের রাত্রে রঙ্গালয় জনাকীর্ণ। 'মেঘনাদবধ' হচ্ছে। যথাসময়ে বিভীষণবেশী মতিলাল স্টেজে ঢুকে এমন এক ভয়ঙ্কর রাক্ষুসে হুঙ্কার ছাড়লেন যে রামবেশী গিরিশচন্দ্র ও লক্ষ্মণবেশী মহেন্দ্রলাল পর্যন্ত চমকে উঠলেন। তারপরে পার্ট বলতে বলতে বিভীষণ বিকট অঙ্গভঙ্গি করতে লাগল। আরে, মতিলালের হল কী।

একটা চূড়ান্ত কেলেঙ্কারি হয় আর কি। এই দৃশ্যটা তো কোনগতিকে সামলানো যাক। তাই মতিলাল যখনই হুঙ্কার দিয়ে বিকট অঙ্গভঙ্গি করতে ওঠেন, তখনই গিরিশচন্দ্র মতিলালকে আড়াল করে অভিনয় করেন। তারপর সেই দৃশ্যের শেষে ভিতরে এসে গিরিশচন্দ্র তো মহাক্রুদ্ধ। মতিলালকে বললেন—নেশা করে এসেছ নাকি? স্টেজে আজ কী মাতলামিটা করছিলে? যদি আড়াল করে না থাকতাম তাহলে আজ তো একটা কেলেঙ্কারির চরম করতে।

মতিলাল বুঝতে পারলেন না তাঁর দোষ কোথায়। তাই অসঙ্কোচে বললেন—কী দোষ হয়েছে বলুন। বিভীষণ তো রাক্ষস, আমি তাই রাক্ষসের জাতিগত ভাবভঙ্গি দেখিয়ে অভিনয় ন্যাচারল করবার চেষ্টা করেছি।

গিরিশচন্দ্র জানতেন মতিলালকে। মতিলাল এ রকম কথা বলছে যখন, নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন একটা রহস্য আছে। গিরিশচন্দ্রের সন্দেহ হল,

ভুনির কারসাজি নয় তো। দেখি।

ডাক ভুনিবাবুকে।

কিন্তু কোথায় ভুনিবাবু। তিনি ধারে কাছে কোথাও নেই।

আরেকবার মফস্বলে গিয়ে মতিলালকে একটা সাংঘাতিক ঠাট্টা করেছিল বন্ধুরা।

অভিনয় করবার জন্যে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মতিলাল গেছেন মফস্বলে। সঙ্গে নিয়েছেন তাঁর হিন্দুস্থানী চাকরকে। চাকরটির নাম—একলু।

মতিলালের বন্ধুরা গোপনে পরামর্শ করে গোপনেই একদিন একলুকে ডাকল। একলুর হাতে একটা টাকা দিয়ে বলল—নাও, এই টাকাটা বকশিশ নাও। তোমার কাজকর্ম দেখে আমরা খুব খুশী হয়েছি। শোন, দরকার হলে তামাক-টামাক দিও আমাদের। আর শোন, তোমার ওই 'একলু' নামটা খুব বাজে বড়িয়া না, আজ থেকে তোমার নতুন নাম রাখলাম—চামচিকে। যখনই 'চামচিকে' বলে ডাকব, তক্ষুনি সাড়া দেবে, কেমন ?

—যো হুকুম মহারাজ !

এককথায় রাজী। এইমাত্র নগদ একটাকা বকশিশ পেয়েছে, ও রাজী না হয়ে যাবে কোথায়।

তারপর থেকে এরা যখনই ডাকে—চামচিকে ; তক্ষুনি একলু সাড়া দেয়—হুজুর !

মতিলাল অবাক হয়ে ভাবলেন, ওরাই বা একলুকে 'চামচিকে' ডাকে কেন, আর একলুই বা 'চামচিকে' ডাক শুনে সাড়া দেয় কেন। যাক গে। তারপর একদিন মতিলাল লক্ষ্য করে দেখলেন, 'চামচিকে' বলে ডাকলে একলু যখন সাড়া দেয়, ওর বন্ধুরা তখন মুখ টিপে হাসে। হাসে কেন ? যাক গে।

কিন্তু মতিলাল মনে-মনে খুব বিরক্ত হলেন। থিয়েটারের চাকর থাকতে বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁর প্রাইভেট চাকর একলুকে খাটাবে কেন ? আর শুধু কি খাটাচ্ছে, আবার কেমন একটা বিচ্ছিরি নাম রেখেছে ছাখ—চামচিকে ! জঘন্য নাম একটা। কথায় বলে—ছুঁচোর গোলাম চামচিকে।

অ্যাঁ ! ও-ব্যাটা তো আমার গোলাম। ও যদি চামচিকে তো আমি কে, আমি কী !! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাকে বলা হচ্ছে···?

দাঁড়াও। দেখাচ্ছি।

লাঠি নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে মতিলাল তাড়া করলেন বন্ধুদের। অনেক কষ্টে সেদিন তাঁকে শান্ত করতে হয়েছিল।

মূলকথায় ফিরে আসি। অমৃতলালের কথায় যাই।

বাঙলা নাট্যশালায় অমৃতলালের মত এমন সর্বগুণান্বিত পুরুষ দুর্লভ। অমৃতলাল একাধারে নট, নাট্যকার, নাট্যাচার্য এবং নাট্যশালার অধ্যক্ষ।

নাট্যশালার অধ্যক্ষ অমৃতলাল হুকুম দিয়েছিলেন—থিয়েটারের ভেতর কেউ কোন মেয়ের সঙ্গে কোন কারণেই রহস্যালাপ করতে পারবে না। এটা কাজের জায়গা, আড্ডাবাড়ি নয়, একথা যেন সকলের স্মরণে থাকে।

দর্শকদের মধ্যেও যদি কখনও কারও কোন বেচাল দেখেছেন, অমৃতলাল সঙ্গে-সঙ্গে তাকে ডেকে নির্ভয়ে বলেছেন—বাপু, এখানে ওসব চলবে না। তোমার টিকিটের দাম ফেরত নাও, এখান থেকে চলে যাও।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন: 'রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে অমৃতলালের তুলনা নাই। তিনি নিয়ম ও নিষ্ঠার বলে থিয়েটারে সর্ব্বরকমের উচ্ছৃঙ্খলতাকে নিবারণ করিয়া তাঁহার পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারকে এক সময়ে আদর্শ থিয়েটারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কি ভাবে থিয়েটার চালাইতে হয়, অতীত ষ্টার থিয়েটার তাহার সাক্ষ্য। আমি নিজে তাঁহার সময়ে ষ্টারে কাজ করিয়া দেখিয়াছি, এমন অপূর্ব্ব নিয়মানুবর্ত্তিতা, এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্য্যপ্রণালী, খুঁটিনাটি প্রত্যেক জিনিসটির প্রতি এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টি, এমন ব্যবহার কৌশল আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ষ্টার থিয়েটারের কাজ চলিত ঠিক যেন কলে, ঠিক যেন ঘড়ীর কাঁটার তালে। আড়ম্বর নাই, হৈ হৈ নাই, ঢক্কানিনাদ নাই, ধাপ্পা নাই, চাল নাই, হুজুগ নাই,—নিরুপদ্রবে, নীরবে যে যাহার কাজ করিয়া যাইতেছে। সব বিষয়েই এখানে একটা ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল। একাদিক্রমে প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল এইভাবে থিয়েটার চালাইয়া অমৃতলাল থিয়েটারের কর্ণধারত্ব পরিত্যাগ করেন।'

শরীর যখন জরাজীর্ণ, অমৃতলাল তখন মিনার্ভা থিয়েটারে 'প্রেমের প্রেমারা' নামে একখানা কৌতুক নাটিকার মহলার ভার নিয়েছেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন: 'প্রেক্ষাগারের প্রথম সারের আসনে বসে অমৃতলাল মহলা দেখতে লাগলেন এবং দেখতে দেখতে হাস্য-পরিহাসের সঙ্গে বলতে লাগলেন নাট্যশিল্প

সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ নানা কথা। নট-নটীদের প্রবেশ ও প্রস্থান হওয়া উচিত কি রকম, সংলাপের স্বাভাবিকতা ও অস্বাভিবকতা, মৌলিক কথার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গির সঙ্গতি প্রভৃতি নিয়ে এক-একবার মতামত প্রকাশ করেন এবং এক-একবার আল-বোলার নলে মুখ লাগিয়ে ধূমপান করতে থাকেন।

এক জায়গায় চারুশীলার ভূমিকায় একটি গানে 'আমার হৃদয়দোলা দোদুল দোলে' এই জাতীয় কি কথা ছিল।

অমৃতলাল জিজ্ঞাসা করলেন,—'চারু, হৃদয়-দোলা কেমন করে দোলে দেখাও তো!'

অমৃতলাল তখনি দেখিয়ে দিলেন, তাঁর জরাজীর্ণ দেহেও সেই সরস ভঙ্গি হল অপূর্ব।

অমৃতলালের শেষ নাটকের নাম 'যাজ্ঞসেনী'। মিনার্ভায় 'যাজ্ঞসেনী'র অভিনয় হয়েছে। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছিঃ 'মিনার্ভা থিয়েটারে যখন অমৃতলালের শেষ নাটক "যাজ্ঞসেনী" খোলবার আয়োজন হয়, তখন তার মহলায় আমি নিয়মিতরূপে হাজির থাকতুম। সেই সময়েই তাঁর মহলা দেবার পূর্ণশক্তি আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলুম। কি পুরুষ-ভূমিকা, কি নারী-ভূমিকা, কি কবিতায়, কি গদ্যে সংলাপ, কি অঙ্গবিন্যাস, কি ভাবাভিব্যক্তি,—প্রত্যেক দিকেই থাকত তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং প্রত্যেক বিষয়টি তিনি তাঁর নিজের দেহের ও কণ্ঠস্বরের সাহায্যে বিশদ করে তুলতে পারতেন—এমন কি আলোকপাত, দৃশ্যপট ও অঙ্গ-সংস্কার বা দেহ-সজ্জা পর্য্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরখ না করে ছাড়তেন না।'

উত্তরকালে শিশিরকুমার ভাদুড়ী বলেছেনঃ 'অমৃতলাল খুব বড়লোক ছিলেন। তিনি একজন বড় প্রতিভা, বড় বাগ্মী, বড় লেখক, বড় নাট্যকার, বড় নট। কিন্তু তাঁর একটা রূপ আমার কাছে সবচেয়ে বেশি নিকট, বেশি অন্তরতম—সে হচ্ছে তাঁর নটরূপ। তিনি নটশ্রেষ্ঠ ছিলেন, নটনায়ক ছিলেন, তাই তিনি নটজাতিকে উন্নত করবার চেষ্টা করেছিলেন, সমাজের কাছ থেকে তাঁর আসন আদায় করে নিয়েছিলেন। নটের জাত নেই; আমি ব্রাহ্মণসন্তান, নট হ'য়ে হয়তো পতিত হয়েছি। কিন্তু এই পতিত নট-সম্প্রদায়কে তিনি উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন—তাই তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দি। তিনি নট হ'তে লজ্জিত হননি। সমাজ নটকে গ্রহণ করেনি; কিন্তু তিনি গ্রহণ করিয়েছিলেন। একাজ আর কারুর দ্বারা হয়নি—স্বয়ং গিরিশচন্দ্র

পারেননি। তিনি সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি থিয়েটার করতেন, বাড়িতে বসে থাকতেন। তাঁর লজ্জা ছিলো না—তিনি ছিলেন ভৈরব। পাঁচজন লোক দেখা করতে গিয়ে দেখতো তিনি দিগম্বর হয়ে আছেন। কিন্তু অমৃতলাল সমাজের সঙ্গে মিশে নটের সম্মান আদায় করেছিলেন।·· অমৃতলাল তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব দিয়ে নটকে জাতির মধ্যে বসিয়েছিলেন, সেইজন্য তাঁকে স্মরণ করি।'

জীবনে নানা নাটকে নানা ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অমৃতলাল। কয়েকটির নামোল্লেখ করি ঃ 'কমলে কামিনী'তে বক্কেশ্বর, 'হীরক চূর্ণে' মিস্টার স্কোবল, 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'তে ম্যাজিস্ট্রেট, 'রাবণবধে' বিভীষণ, 'দক্ষযজ্ঞে' দধীচি, 'নসীরামে' নসীরাম, 'প্রফুল্লে' রমেশ, 'বেল্লিকবাজারে' দোকড়ি সেন, 'তরুবালা'য় বেহারী খুড়ো, 'চন্দ্রশেখর' ও 'রাজসিংহে' বিভিন্ন চরিত্র, 'খাসদখলে' নিতাই, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' কৃষ্ণকান্ত।

কিন্তু কোন জাতের ভূমিকাভিনয়ে অমৃতলাল অতুলনীয়? গিরিশচন্দ্র বলেছেন ঃ যে চরিত্রে শ্লেষ আছে—তাহার অভিনয়ে ভুনিবাবু অতুলনীয়। তাঁহার সামাজিক প্রহসনগুলির অভিনয়ে দর্শকগণ তাহার পুনঃ পুনঃ পরিচয় পাইয়াছেন।

জীবনের আরম্ভে অমৃতলাল প্রথম যখন থিয়েটার করতে এসেছিলেন, ভেবেছিলেন মাত্র দু-এক রাত্রি থিয়েটার করে চলে যাবেন। কিন্তু তা আর হল কই। সার্ধ-শতাব্দীর অধিককাল কাটাতে হল নাট্যশালায়। অমৃতলালের নাট্যজীবনের ইতিহাস ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানি, বেঙ্গল, স্টার, মিনার্ভা প্রভৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রইল। অমৃতলালের জীবনে নাট্যকলাই পাটপ্রিয়া হয়ে রইল।

অমৃতলাল নিজেই বলেছেন ঃ

নাট্যকলা পাটপ্রিয়া সুরা ছোটরাণী।
একের কথায় আসে অন্যের কাহিনী॥

এবার তাহলে সেই ছোটরাণীর কাহিনীতে আসি। ছোটরাণী স্বয়ং বোতল সুন্দরী। ছোটরাণীর কী রূপলাবণ্য! গোলাঙ্গিণী, শ্যামবরণা, লম্বগ্রীবা। ছোটরাণীর মুখামৃত প্রকৃত অমৃত।

ছোটরাণী সম্পর্কে অমৃতলাল কোন কথা রেখে-ঢেকে বলেন নি। সরাসরি বলেছেন ঃ

আমি আর গুরুদেব যুগল ইয়ার।
বিনির বাড়ীতে যাই খাইতে বিয়ার্ ॥
বিয়ার্ ফুরায় পুন আনায় বিয়ার্।
তিনশক্রবধ তবু চাগে না চিয়ার্ ॥
ঘোষজা বলেন চেয়ে মুখপানে মোর।
"তুই বাপু নিজে গিয়ে খোলা ব্যাক্-ডোর্ ॥
বিয়ার্ খাইয়ে মন হইয়াছে ঠাণ্ডি।
নগদ নি' আয় দুটো বি-হাইভ ব্র্যাণ্ডি ॥
এত রাত্রে দুটো কিছু না করিব পার।
ঘর করে' রাখা ভাল গৃহস্থ সংসার ॥"
তখন হুইস্কি ছিল ঘোঁড়ার ঔষধ।
পায় নাই আজিকার রাজপেয় পদ ॥
ব্র্যাণ্ডি এল ঠাণ্ডি গেল পাণ্ডা হল কাত্।
সমকোণ হয়ে শোন্ সঙ্গেতে স্যাঙাত ॥

এখানে একটু টীকা দরকার। গুরুদেব, ঘোষজা, পাণ্ডা—অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র। বিনি মানে সেকালের প্রখ্যাত অভিনেত্রী বিনোদিনী। আর স্যাঙাত তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে স্বয়ং অমৃতলাল।

অমৃতলালের সরস স্বীকারোক্তি থেকে আরেকটু ঃ

প্রভাতে ধরেছি গ্লাস্ সন্ধ্যা হয়ে গেছে।
দ্বিযামা ত্রিযামা পুন উষা দেখা দেছে ॥
ঘুরিয়াছে বসুমতী সেরে নিজ কাজ।
আমার স্মরণে গোল 'কাল' কিম্বা 'আজ' ॥
উঠি-উঠি বাধা পড়ে—"আর এক পাত্র"।
গুরু যদি বাড়ে ভাত পাত পাড়ে ছাত্র।

গিরিশচন্দ্রকে 'গুরু' বলে মেনেছেন অমৃতলাল। কিন্তু গিরিশচন্দ্র কি কেবল অমৃতলালের নাট্যকলার গুরু ?

অমৃতলাল হাঁটাপথে একদিন গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে বিডনস্ট্রীটে থিয়েটারে যাচ্ছেন। পথে বাগবাজারের শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরীতলা। সেখানে দাঁড়িয়ে গিরিশচন্দ্র প্রণাম করলেন শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরীকে। অমৃতলাল দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ।

আবার হাঁটাপথ। যেতে-যেতে গিরিশচন্দ্র অমৃতলালকে বললেন—তুমি প্রণাম করলে না ?

অমৃতলাল বললেন—না।

তারপর শোভাবাজারের পঞ্চানন্দ ঠাকুর। সেখানেও গিরিশচন্দ্র প্রণাম করলেন। আর অমৃতলাল রইলেন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ।

আবার হাঁটাপথ। যেতে-যেতে গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন—ওখানে ঘাড়টা ফিরিয়েছিলে কেন ?

অমৃতলাল বললেন—ও বাবাঠাকুরটি অপয়া।

গিরিশচন্দ্র বললেন—অপয়া বলে তোমার বেশ বিশ্বাস আছে ?

অমৃতলাল বললেন—সকলেই তো বলে, কাজেই বিশ্বাস করতে হয়।

গিরিশচন্দ্র বললেন—বেশ, ওই বিশ্বাসই ঠিক রেখো। ও ঠাকুরের আর মুখ দেখো না।

এবিষয়ে সেদিন আর কোন কথা হল না। কিন্তু অমৃতলালের মনে কেমন একটু খটকা লাগল ঃ যদি অপয়া বিশ্বাস করি, তবে পয়মন্ত বিশ্বাস করি না কেন ?

সে সময়ে গিরিশচন্দ্র আধ্যাত্মিকতার পথে অনেকখানি এগিয়েছেন। প্রবল বিশ্বাস তাঁর। দর্প করে তিনি বলতেন—বেটীকে গাল ভরে, বুক ভরে চেঁচিয়ে ডেকে যা চাব, তাই পাব।

অনবরত গিরিশচন্দ্র 'মা, মা, মা কালী, কালী করালবদনা, মা, মা' করতেন। তাই থিয়েটারের অন্য সকলের মুখেও—মা, মা। বলা বাহুল্য, অমৃতলালও বাদ নেই। কিন্তু মুখে ডাকলে কী হবে, মনে তৃপ্তি হয় না, কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে।

কী একটা নাটকের রিহার্সাল হচ্ছে। রিহার্সাল হয়ে গেল, সন্ধ্যা হয়ে গেল। স্টেজে বসে আছেন সকলে। ঈশ্বরীয় কথাবার্তা হচ্ছে। অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রকে বললেন—মশায়, আমি তো একরকম ছিলুম, আপনার দেখাদেখি এখন 'মা, মা' করে ডাকি, কিন্তু তাতে প্রাণের ভেতরে যেন আরও ফাঁক পড়ে যায়, এর চেয়ে না ডাকা ভাল ছিল।

মিনিটখানেক চুপ করে রইলেন গিরিশচন্দ্র। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। অমৃতলালকে বললেন—শোন, এদিকে এস।

স্টেজের মধ্যিখানে একখানা সীন জোড়া, তার পিছনে একটানা অন্ধকার। সেখানে গিয়ে গিরিশচন্দ্র আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন। অমৃতলালকেও একই ভঙ্গিতে বসতে হল মুখোমুখি।

অমৃতলালের দুই উরুতে গিরিশচন্দ্র নিজের হাত দুখানা রাখলেন। গিরিশ-চন্দ্রের কথায় অমৃতলালকেও নিজের হাত দুখানা রাখতে হল গিরিশচন্দ্রের উরুতে। অন্ধকার।

অসুরনাশিনী শ্যামা নামের একটা স্তোত্র গিরিশচন্দ্র ঘন-ঘন উচ্চারণ করতে আরম্ভ করলেন। গিরিশচন্দ্রের কথায় তাঁর সঙ্গে সেই স্তোত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন অমৃতলাল।

অমৃতলালের সমস্ত শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠল আস্তে-আস্তে। মনের মধ্যে বিচিত্র বদ্যুতের স্পর্শ পেলেন চোখের পলকে। কী শান্তি, কী উল্লাস, কী আনন্দ।

গিরিশচন্দ্রের পা জড়িয়ে ধরলেন অমৃতলাল। কম্পিতকণ্ঠে বললেন—গুরু, গুরু, আজ তুমি আমায় মাকে ডাকিয়েছ। এ শান্তি, এ উল্লাস, এ আনন্দ আমি আর কখনও অনুভব করি নি।

উত্তরকালে অমৃতলাল বলেছেনঃ লোকে জানে গিরিশবাবু কেবল আমার নাট্যকলার গুরু; আমি জানি, তিনি আমার মনুষ্যত্বের গুরু।

অমৃতলাল সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী বলেছেনঃ তিনি ছিলেন সদালাপী, রসালাপী, humourist—তাঁর মধ্যে যা ছিল, তা সচরাচর বাঙালীর মধ্যে দেখা যায় না।

অমৃতলালের রসালাপের কয়েকটি উদাহরণ দাখিল করি।

কেশবচন্দ্র সেনের প্রচণ্ড প্রভাব-প্রতিপত্তি তখন। যুবকদের চোখে তখন আদর্শ পুরুষ কেশবচন্দ্র। কেশবচন্দ্রের দেখাদেখি অনেক যুবকের চোখে চশমা উঠেছে। হ্যাঁ, কেশবচন্দ্রের চশমা ছিল। কেশবচন্দ্র ঘুমোতেন পর্যন্ত চশমা চোখে দিয়ে।

অমৃতলাল একদিন তাঁকে বললেন—চশমা চোখে না থাকলে কি আপনি স্বপ্নও দেখতে পান না।

কথা শুনে কেশবচন্দ্র হেসে উঠলেন।

রমানাথ নামে একজন ভদ্রলোক গিরিশচন্দ্রের চেনা-জানা। ভদ্রলোকের খানিক লেখা-টেখার অভ্যেস আছে। গিরিশচন্দ্র একদিন রমানাথকে বললেন—কি হে রমানাথ, নতুন আর কিছু লিখলে নাকি?

রমানাথ বললেন—লিখেছি, আজ্ঞে! 'কমলে-কামিনী' নামে একখানা অপেরা লিখেছি।

গিরিশচন্দ্র বললেন 'কমলে-কামিনী' অপেরা ? নাচগান ছাড়া তো অপেরা হয় না ! কিন্তু কমলে-কামিনীতে যে-কাহিনী আছে তাতে তো লহনা-খুল্লনা দুই মা ছেলেটিকে নিয়ে স্বামী-বিরহে দুঃখে-কষ্টে দিন কাটায়। তুমি তাহলে নাচালে কাকে ?

অমৃতলাল তখন ওখানে উপস্থিত। তিনি রমানাথকে জিজ্ঞেস করলেন—বইখানা ছাপতে দিয়েছ ?

রমানাথ বললেন আজ্ঞে, হ্যাঁ। ছাপা প্রায় প্রায় শেষ হয়ে এল।

অমৃতলাল তখন গিরিশচন্দ্রকে বললেন, আপনি কিছু ভাববেন না। রমানাথ নাচের ব্যবস্থা করেছে। ওই ছাপাখানার বিল পেলেই রমানাথের বাবা নাচতে আরম্ভ করবে।

স্টার থিয়েটারের একজন কর্মচারীকে একদিন কয়েকজোড়া কাপড় কিনে আনতে দিয়েছেন অমৃতলাল। কর্মচারীটি তো কাপড় কিনে নিয়ে এল। থিয়েটারের কয়েকজন অভিনেতা কাপড় দেখলেন, দাম শুনলেন ; বললেন—দাম কিছু বেশী পড়েছে।

অমৃতলাল জিজ্ঞেস করলেন—কাপড় কোন দোকান থেকে কিনেছ ?

কর্মচারীটি বলল—আজ্ঞে, রক্ষিত কোম্পানির দোকান থেকে।

অমৃতলাল হাসলেন। বললেন—ও, রক্ষিত ? বাজারে নয় ! তাহলে মাল ভাল, দামটাও বেশি হবে বইকি।

অমৃতলালের বাড়ির ঠিকানা কী ? ৯ নম্বর মৈত্রের লেন। ঠিক তো ? ঠিক-বেঠিক পরের কথা, এই ঠিকানাই বলে দিয়েছেন থিয়েটারের একজন অ্যাক্টর। চলুন, দেখি।

থিয়েটারের একজন অ্যাক্টরের থেকে ওই ঠিকানা নিয়ে দুজন ভদ্রলোক অমৃতলালের বাড়ি খুঁজতে বেরিয়েছেন। কিন্তু কোথায় ৯ নম্বর মৈত্রের লেন ! ৯ নম্বর তো দূরের কথা, মৈত্রের লেনেরই যে দেখা নেই। কোথায় মৈত্রের লেন !

দুর্ভাগ্য দুই ভদ্রলোকের। চৈত্রের প্রখর রোদে শ্যামবাজারের মোড় থেকে শোভাবাজারের মোড় পর্যন্ত কয়েকবার ঘোরাঘুরি করা গেল, কিন্তু কোথাও মৈত্রের লেন পাওয়া গেল না। কলকাতা কেন, ও মৈত্রের লেন হয়ত ইহলোকে কোথাও নেই।

কিন্তু ওই ভদ্রলোক দুজনের ভাগ্য মন্দের ভাল বলতে হবে। ঠিকানায় হল না; অমৃতলালের নামে কাজ হল। রসরাজ অমৃতলালের বাড়িটা কোথায় ?

দেখা গেল, অনেকেই চেনেন বাড়িটা। শেষপর্যন্ত বাড়িটা পাওয়া গেল, বাড়িতে অমৃতলালকেও পাওয়া গেল। অমৃতলাল আলবোলায় সুখটান দিচ্ছেন।

ভদ্রলোকদের বাড়ি খোঁজার হাঙ্গামার খবরটা শুনলেন অমৃতলাল। এতক্ষণ ঘোরাঘুরি করেছেন ঠিকানা খুঁজে বের করতে? অমৃতলাল বললেন—কেন, আমার বাড়ি খুঁজে পাওয়া তো বিশেষ কথা নয়। বোধ হয়, অনেকেই ঠিকানা জানেন।

—আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা আপনার বাড়ির ঠিকানা পেয়েছিলাম, ৯ নম্বর মৈত্রের লেন। কিন্তু এখন দেখছি আপনার বাড়ির ঠিকানা, ৯।২ নম্বর, রামচন্দ্র মৈত্রের লেন। মানে, আসল ঠিকানার আদ্ধেক আমরা পেয়েছি। তাই এত ঘুরতে হয়েছে।

অমৃতলাল আশ্চর্য হলেন। বললেন—এ অদ্ভুত ঠিকানা কে দিলে?

—একজন থিয়েটারের অ্যাক্টর।

—ও, থিয়েটারের অ্যাক্টর!—অমৃতলাল সহাস্যে বললেন—তাই আদ্ধেক মুখস্থ করেছে, বাকি আদ্ধেক প্রম্পটারের হাতে!

এবার অ্যাক্টর নয়, অ্যাকট্রেস। শোনা গেল, স্টার থিয়েটারের একটি অভিনেত্রী একজন পয়সাঅলা যুবকের রক্ষিতা হয়েছে। এটা কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, ওই অভিনেত্রী যুবকটির চেয়ে বয়সে অনেক বড়।

অমৃতলাল বসু একদিন অমৃতলাল মিত্রকে জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁ হে, যা শুনছি, সত্যি নাকি?

অমৃতলাল মিত্র বললেন—হ্যাঁ, তাই শুনছি বটে।

অমৃতলাল বসু বললেন—তাই তো, এ হল কি হে! আচ্ছা, কী দেখে ছোঁড়াটা এমন ঝুঁকে পড়ল বল দেখি?

অমৃতলাল মিত্র বললেন—অভিনেত্রীটির বয়স বেশি হলে কী হবে বাজারে একটা নাম আছে।

ও, নাম, নামের জন্যে? অমৃতলাল বসু বললেন—বটে? তাহলে দাদাভাই নৌরজীর তো খুব নাম, তার উপর ঝুঁকলেই তো হত!

একটা দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

'সরোজিনী ' নাটকে বিনোদিনীর যখন নাম ভূমিকা ছিল, তখন বিনোদিনীর বয়স খুব কম। একেবারে বালিকা বললেই চলে।

'সরোজিনী'তে তখন বিজয় সিংহ সাজতেন অমৃতলাল।

কতকাল কেটে গেছে তারপর। কত পুরনো দৃশ্য মুছে গেছে, কত নতুন দৃশ্য এসেছে। সংসারের ঘাটে-ঘাটে অগণ্য তরঙ্গধ্বনির জন্ম-মৃত্যু ঘটেছে। বিনোদিনী রঙ্গমঞ্চ থেকে অবসর নিয়েছেন।

বিনোদিনীর সঙ্গে অমৃতলালের দেখা হল একদিন। সেই 'সরোজিনী' অভিনয়ের কথা উঠল কথায়-কথায়। অমৃতলাল বিনোদিনীকে বললেন—সে-সময় তোমার সঙ্গে আমার বিজয় সিংহের ভূমিকা নিয়ে প্রেমাভিনয় করতে বড় লজ্জা হত। কিন্তু অভিনয় চমৎকার হত। একদিন তো অভিনয়কালে 'ভৈরবাচার্য' যখন 'সরোজিনী'কে বলি দিতে যায়, দর্শকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। এত উত্তেজিত যে তারা ফুটলাইট ডিঙিয়ে স্টেজে উঠে পড়ে আর কি। মহা গোলমাল। অভিনয় বন্ধ রাখতে হল কিছুক্ষণ। তোমার মনে আছে ?

মনে আছে বইকি। সব মনে আছে।

—:::০:::—

দশ

সব মনে আছে।

দিদিমা, মা আর তার দুটি ছেলেমেয়ে। মেয়েটী বড়, সে ছেলেটির দিদি। এই মেয়েটির নাম বিনোদিনী।

দিদিমার নিজস্ব একখানা বাড়ি; কয়েকখানা খোলার ঘর। গরীব। গরীবের কাছেই গরীব আসে। ওসব খোলার ঘরের ভাড়াটেরাও গরীব। তা ঘরভাড়া বাবদ কিছু আয়-আদায় হয়।

ভাড়াটেরা কেউ বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষ নয়, কিন্তু বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের মতই ঘর-সংসার করে। দিন আনে দিন খায়। আবার, কখনও-কখনও এমন মারামারি করে যেন সেই মুহূর্তেই ইহজীবনের মত ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। কিন্তু সেসব কিছু না। পরক্ষণেই দেখুন সবকিছু ভুলে গিয়ে আবার চলছে চিরাচরিত হাসি-ঠাট্টা খাওয়া-শোওয়া।

ওদের আচার-ব্যবহার দেখে-শুনে বিনোদিনীর কেমন একটা বিতৃষ্ণা হত, ভয় হত। বিনোদিনী ভাবতো, আমি তো, কখনও এরকম ঘৃণিত হব না।

কিন্তু খাওয়া-পরা বুঝি আর ঠিকমত চলে না। মা আর দিদিমার যা কিছু সঞ্চয় ছিল, নিঃশেষ হয়ে গেছে। তখন দিদিমা বিনোদিনীর পাঁচ-বছরের ভাইটির বিয়ে দিলেন। বিয়ে দিলেন আড়াই বছর বয়সের একটি মা-মরা মেয়ের সঙ্গে। এই বিয়ের দৌলতে যৎকিঞ্চিৎ সোনাদানা পাওয়া গেল। তা বেচেই অতঃপর চলল। একেকখানা গহনা স্বর্ণকারের সিন্ধুকে যায়, আর তার বদলে খাদ্যবস্তু আসে সংসারে।

বিনোদিনীর বছর সাতেক বয়স হল।

একদিন বিনোদিনীর মা কোন বাড়ি থেকে কয়েকটি সন্দেশ চেয়ে-চিন্তে এনেছেন। দশ-পনেরো দিনের বাসি সন্দেশ, গন্ধ বেরিয়েছে। কিন্তু গরীবের ঘরের সাত বছরের বিনোদিনীর কাছে সেই সন্দেশ অমৃত। সেই সন্দেশ তারিয়ে-তারিয়ে আধ ঘণ্টা বসে খাওয়া হয়েছে।

শুনতে পাই, বালিকা বয়সেই একটি সুন্দর বালকের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বিনোদিনীর। কিন্তু সেই বালকটির মাসি একদিন নাকি বালকটিকে নিয়ে গেলেন, আর কখনও এ-মুখো হতে দিলেন না। শুনতে পাই, তার অন্যত্র বিবাহাদি হয়েছে, সে দিব্যি জমিয়ে ঘর-সংসার করেছে।

আর একটা দুঃখের খবর, বালককালেই বিনোদিনীর ছোট ভাইটি মারা গেল।

বিনোদিনীর বালিকা বয়সেই একদিন গঙ্গা বাঈজী এলেন বিনোদিনীর বাড়িতে; ওবাড়িতে একখানা পাকা একতলা ঘর ছিল, সেখানেই থাকবার ব্যবস্থা হল গঙ্গা বাঈজীর। এই গঙ্গা বাঈজীর সঙ্গে বিনোদিনী 'গোলাপ-ফুল' পাতাল; দুজনেই দুজনকে 'গোলাপ' বলে ডাকত। নিঃসহায় অবস্থায় বিনোদিনীদের বাড়িতে এসেছিলেন, কিন্তু পরে গায়িকা-অভিনেত্রী গঙ্গা বাঈজীর বিস্তর যশ-খ্যাতি হয়েছিল।

পরবর্তীকালে বিনোদিনী বলেছেন: "গঙ্গা বাঈজি ষ্টার থিয়েটারে একজন প্রসিদ্ধা গায়িকা হইয়াছিলেন।...নিঃসহায় অবস্থায় আমাদের বাটীতে আসিয়া আমার মাতার নিকট কন্যা-স্নেহে আদৃত হইয়া পরমানন্দে একসঙ্গে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সে-কথা তিনি সমভাবে তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত স্মরণ রাখিয়াছিলেন। সময়ের গতিকে এবং অবস্থাভেদে পরে যদিও আমাদের দূরে দূরে থাকিতে হইত, তথাপি সেই বাল্য-স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে সমভাবে ছিল। এবং তাঁহার অন্তঃকরণ অতিশয় উন্নত, ও উদার ছিল বলিয়া আমার মাতামহী ও মাতাকে বড়ই সম্মান করিতেন। এখনকার দিনে অনেক লোক বিশেষ উপকৃত হইয়া ভুলিয়া যায় ও স্বীকার করিতে লজ্জা এবং মানের হানি মনে করে, কিন্তু "গঙ্গামণি"—ষ্টারে গায়িকা ও অভিনেত্রীর উচ্চস্থান অধিকার করিয়াও অহঙ্কার শূন্যা ছিলেন। সেই উন্নত হৃদয়া বাল্য-সখী স্বর্গগতা গঙ্গামণি আমার বিশেষ সম্মান ভক্তির পাত্রী ছিলেন।"

এই গঙ্গা বাঈজীর কাছে গান শিখত বিনোদিনী। গান-বাজনা শিখত, আর রকমারি গল্প শুনত। গঙ্গামণির ঘরে নানারকম বন্ধুবান্ধব আসতেন, তাদের গল্প। বিনোদিনী দিব্যি চালাক-চতুর মেয়ে; তাকে আদর-টাদরও করতেন গঙ্গামণির বন্ধু-বান্ধবেরা। সেসব আদর ভালো লাগলেও বিনোদিনীর লজ্জা করত, ভয় করত; দূরে দূরে থাকত বিনোদিনী।

পূর্ণচন্দ্র নামে একজন ভদ্রলোক প্রায়ই আসতেন গঙ্গামণির ঘরে। তিনি একদিন বিনোদিনীর দিদিমাকে বললেন—তোমাদের তো দেখছি খুব

কষ্ট। তা তোমার এই নাতনীটিকে থিয়েটারে দেবে? এখন কিছু কিছু জলপানি পাবে, পরে কাজ শিখলে বেশি মাইনে পাবে।

দু-চারজনের সঙ্গে পরামর্শ করে দিদিমা পূর্ণচন্দ্রের কথায় রাজী হলেন। পূর্ণচন্দ্র বিনোদিনীকে ভর্তি করে দিলেন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে। মাইনে ঠিক হল দশ টাকা।

বিনোদিনী এতদিন যা দেখেছে যা শুনেছে থিয়েটারের আবহাওয়ার সঙ্গে তার কিছুই মেলে না। এখানে সবই আরেকরকম, নতুনরকম। থিয়েটারের রিহার্সাল হত গঙ্গার ঘাটের ওপর রসিকচন্দ্র নিয়োগীর বাড়িতে। এই রসিকচন্দ্র ভুবনমোহন নিয়োগীর ঠাকুর্দা।

ভারি সুন্দর জায়গাটা। নীচে গঙ্গার বাঁধানো ঘাট, আর একেবারে গঙ্গার ওপরে বাড়ি ও বারান্দা। সেই টানা বারান্দায় বিস্তর ছুটাছুটি করেছে বিনোদিনী। সকলেই খুব স্নেহ-যত্ন করতেন বিনোদিনীকে। সকলেই বলাবলি করতেন—এই মেয়েটাকে ভালো করে শেখালে বোধ হয় খুব কাজের হয়ে উঠবে।

এখানেই গিরিশচন্দ্র প্রথম দেখেছেন বিনোদিনীকে। সে সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র বলেছেন: 'শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নীয়োগী মহাশয়ের গঙ্গাতীরস্থ চাঁদনীর উপর আমার সহিত তাহার প্রথম দেখা। তখন বিনোদিনী বালিকা।··· কিন্তু সেসময়ে তাহার শিক্ষাগ্রহণের ঔৎসুক্য ও তীব্র মেধা দেখিয়া ভবিষ্যতে যে বিনোদ রঙ্গমঞ্চে প্রধানা অভিনেত্রী হইবে, তাহা আমার উপলব্ধি হইয়াছিল।'

সে সময়ের কথা বিনোদিনী বলেছেন: 'কিছুই বুঝিতাম না, কিছুই জানিতাম না, তবে যেরূপ শিক্ষা পাইতাম, প্রাণপণ যত্নে সেইরূপ শিক্ষা করিতাম। সাংসারিক কষ্ট মনে করিয়া আরও আগ্রহ হইত। মাতার শোক-দুঃখপূর্ণ মুখখানি মনে করিয়া আরও উৎসাহ বাড়িত। ভাবিতাম যে মায়ের এই দুঃখের সময় যদি কিছু উপার্জন করিতে পারি, তবে সাংসারিক কষ্টও লাঘব হইবে।'

'শত্রুসংহার' নাটকে দ্রৌপদীর একটি পরিচারিকার পার্টে প্রথম মঞ্চাবতরণ করল বিনোদিনী। ছোট পার্ট, দু-চার ছত্র কথা।

বিনোদিনীর প্রথম পার্টের কথা বিনোদিনীর মুখ থেকে শুনি:

"একটি পরিচারিকা বা দাসীর ভূমিকা। দুই চারি ছত্র কথা। মুখস্থ

করেছি, রিহার্সেলও দিয়েছি। বক্তব্য সামান্য; মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন দুঃশাসনের রক্ত পান করে, সেই রক্ত-মাখা হাতে অভিমানিনী দ্রৌপদীর বেণী বাঁধতে আসছেন, এই খবরটি আমায় দ্রৌপদীকে দিতে হবে। দিতে হবে তো দিতে হবে; কিন্তু কে জানতো তখন যে এই সামান্য কথা কটা স্টেজে বেরিয়ে বলে আসার কি বিপদ,—অবশ্য প্রথম পার্ট নিয়ে বেরুনর দিন। সকলে যে যার 'পার্ট' অভিনয় করে আসছে, শেষকালে এল আমার পালা! বেরুবার আগে বুকের ভেতর সে কি কাঁপুনি, ভয়ে তো জড়সড় হয়ে যাচ্ছি। অত লোকের সামনে বেরিয়ে বলতে হবে, এর আগে কখনও তো অত লোক একসঙ্গে দেখিনি!···

আমার সেই প্রথম স্টেজে বেরুনর কথা। আমি তো উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছি, বোধ হয় একটু বেরুতে দেরীও হয়ে থাকবে, ধর্ম্মদাস-বাবু এসে আমাকে ঠেলে ষ্টেজে বার করে দিলেন।

আমি বেরিয়েই দ্রৌপদীকে প্রণাম করে, হাত জোড় করে, যেমনটি শিখিয়ে দিয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবেই আমার বক্তব্য যা বলে গেলাম। খুব সাজ-পোষাক-পরা গর্ব্বিতা পাণ্ডব-মহিষীর সামনে যেমন সঙ্কুচিত হয়ে বলতে হয়, তেমনি সঙ্কুচিত ভাব আপনি আমার হয়ে পড়লো। দর্শকদের দিকে ফিরেও চাইনি! কিন্তু তাঁরা আমার অবস্থা দেখে দয়া করেই হোক, কিম্বা যে কারণে হোক—আমার বক্তব্য শেষ হলে আমায় খুব হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিলেন। আমি কোন রকমে কাজ সেরে পিছনে হেঁটে—ধর্ম্মদাসবাবু উইংসের পাশ থেকে আমাকে সেই রকম করে চলে আসতেই বলে দিচ্ছিলেন,—ভিতরে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। ধর্ম্মদাসবাবু আমাকে বুকের মধ্যে নিয়ে, আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, "চমৎকার হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে"—ইত্যাদি। কত আশীর্ব্বাদ করলেন।···হাততালি পেয়ে আর ধর্ম্মদাসবাবুর মুখে 'বেশ হয়েছে' শুনে ভারি আহ্লাদ হল। ধর্ম্মদাসবাবু বল্লেন, "যা—যা পোষাক ছেড়ে ফেল গে যা।" লাফাতে লাফাতে সাজঘরে গেলাম। যেন দিগ্বিজয় করে চলেছি। ৺কার্ত্তিক পাল, আমাদের তখনকার "ড্রেসার" (বেশকারী) বল্লেন, "আয় পুঁটি, আয়; বেশ হয়েছে।" এই আমার অভিনেত্রী-জীবনের প্রথম পার্ট—একটি পরিচারিকার।···"

তারপর 'হেমলতা' নাটক। তাতে হেমলতার ভূমিকা পেল বিনোদিনী। বিনোদিনীর অভিনয় শেখার আগ্রহ দেখে সকলে বলতেন—এই মেয়েটি

হেমলতার পার্ট ভাল করে অভিনয় করতে পারবেন।

বাস্তবিক, অভিনয় শিখতে বিনোদিনীর প্রবল উৎসাহ, বিপুল আনন্দ। বাড়ি থেকে গাড়িতে করে বিনোদিনী কাজের জায়গায় যায়, অভিনয় শেখে, তারপর যথাসময়ে সেখান থেকে বাড়িতে ফিরে আসে। কিন্তু বাড়িতে এসেই কি বিনোদিনী কাজের কথা সব ভুলে যায়?

বিনোদিনী বলেছেন: 'আমি যখন কার্য্যস্থান হইতে বাড়ীতে আসিতাম, সেই সকল কার্য্য আমার মনে আঁকা থাকিত। তাঁহারা যেমন করিয়া বলিয়া দিতেন, যেমন করিয়া ভাব ভঙ্গি সকল দেখাইয়া দিতেন, সেইসকল যেন আমার খেলার সঙ্গিনীদের ন্যায় চারিদিকে ঘেরিয়া থাকিত। আমি যখন বাড়ীতে খেলা করিতাম তখনও যেন একটা অব্যক্ত শক্তিদ্বারা সেই দিকেই আচ্ছন্ন থাকিতাম। বাড়ীতে থাকিতে মন সরিত না, কখন আবার গাড়ি আসিবে, কখন আমায় লইয়া যাইবে, তেমনি করিয়া নূতন নূতন সকল শিখিব, এই সকল সদাই মনে হইত। যদিও তখন আমি ছোট ছিলাম, তবুও মনের ভিতর কেমন একটা উৎসাহপূর্ণ মধুর ভাব ঘুরিয়া বেড়াইত। ইহার পর যখন আমার শিক্ষা শেষ হইয়া অভিনয়ের দিন আসিল, তখন আর প্রথমবারের মত ভয় হইল না বটে, কিন্তু বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল।'

রাজকন্যার ভূমিকায় অভিনয়, অতএব বিনোদিনীকে সেদিন রাজকন্যার যোগ্য পোশাক-আশাক দেওয়া হল। সেসব পরে বিনোদিনীর মহানন্দ। জীবনে কি বিনোদিনী কখনও স্বপ্নেও ভেবেছে যে এরকম সাজসজ্জা করবে!

হেমলতার ভূমিকায় সুচারু অভিনয় করল বিনোদিনী।

তখন থেকেই থিয়েটারের প্রায় প্রধান-প্রধান পার্ট পেত বিনোদিনী।

কিছুদিন পরে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের একটি দলের সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলে থিয়েটার করতে বেরিয়ে পড়ল বিনোদিনী। কিন্তু গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের সেই পশ্চিম-ভ্রমণের কাহিনী আগেই তো বলা হয়েছে।

বিনোদিনীর বয়স বড় অল্প। সেই অল্পবয়সিনীকেই কখনও কিশোরী কখনও যুবতী সাজাতে হয়। সেই সাজ করাতে গিয়ে রূপসজ্জাকরদের ঝামেলা বাড়ে। কেউ কেউ ঠাট্টা করে বিনোদিনীকে বলতেন—তোকে কামার দোকানে পাঠিয়ে দিয়ে পিটিয়ে একটু বড় করে আনাবো।

কলকাতায় ফিরে আসবার কিছুকাল পরে বিনোদিনী 'বেঙ্গল থিয়েটারে'

গেল। পঁচিশটাকা মাইনে। 'বেঙ্গল থিয়েটারে'র অধ্যক্ষ শরৎচন্দ্র ঘোষ আপন কন্যার মত ভালবাসতেন বিনোদিনীকে।

এই 'বেঙ্গল থিয়েটারে'ই 'মৃণালিনী'তে প্রথম মনোরমার ভূমিকায় অভিনয় করেছে বিনোদিনী। পরে অবশ্যি অন্য থিয়েটারেও বিনোদিনী মনোরমা সেজেছে। যিনিই বিনোদিনীর মনোরমাকে দেখেছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে বলেছেন—এ একেবারে ষোলো-আনা 'মৃণালিনী'র মনোরমা।

স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র একদিন বিনোদিনীর মনোরমাকে দেখে বলেছেন—আমি মনোরমার চরিত্র বইতেই লিখেছিলাম। কখনও মনে করি নি যে মনোরমাকে প্রত্যক্ষ করব। আজ মনোরমাকে দেখে আমার মনে হল যে আমার মনোরমাকে সামনে দেখছি।

পরবর্তীকালে রোগেশোকে জর্জরিতা বিনোদিনীকে দেখতে গিয়ে অমৃতলাল বসু একদিন বলেছিলেন—বিনোদ, তুমি কি সেই বিনোদ—যাকে দেখে বঙ্কিমবাবুও বলেছিলেন আমার মনোরমাকে প্রত্যক্ষ দেখছি?

'দুর্গেশনন্দিনী'তে বিনোদিনী কখনও আয়েষা সেজেছে, কখনও তিলোত্তমা সেজেছে। কখনও-কখনও, দরকার হলে, এক রাত্রে একসঙ্গে দুই ভূমিকাতেই অভিনয় করেছে।

একদিন বাড়ি থেকে বিনোদিনী আয়েষার সাজ-পোশাক করে থিয়েটারে এসেছে। শুনল, যার আসমানীর ভূমিকায় অভিনয় করবার কথা, সে অনুপস্থিত। বিনোদিনী অবশ্যি আসমানীর কাজটা চালিয়ে দিতে পারে, কিন্তু বিনোদিনী বাড়ি থেকে আয়েষার সাজে এসেছে, আয়েষার সাজ খুলে আসমানী সেজে আবার আয়েষা সাজতে গেলে তেমন নিখুঁত হবে না, বিনোদিনী নির্ঘাত রেগে যাবে। বিনোদিনীকে এখন সাহস করে আয়েষার পোশাক খুলে আসমানীর পোশাক পরতে বলবে কে?

কিন্তু রঙ্গালয় দর্শকে ভর্তি। অগত্যা অমৃতলাল বসু বললেন—বিনোদ, লক্ষ্মী বোনটি আমার! আসমানী যে সাজবে তার অসুখ করেছে, তোমায় আজ চালিয়ে দিতে হবে।

গোড়ায় অনেক আপত্তি করলেও অবস্থা বুঝে বিনোদিনী শেষ পর্যন্ত রাজী হল।

বিনোদিনীর প্রশংসা চতুর্দিকে। পর্যন্ত ইংরেজী সাময়িকপত্রও বিনোদিনীর গুণগান করছে। কেউ বলছে—ফ্লাওয়ার অব দি নেটিভ স্টেজ; কেউ বলছে—সাইনোরা।

একবার বেঙ্গল থিয়েটার সদলে সাহেবগঞ্জ না কোথায় যেন যেতে গিয়ে পথের মধ্যে বিপদে পড়ল।

একটা জঙ্গলাকীর্ণ পথ দিয়ে সেই গন্তব্যস্থলে যেতে হয়। সেই জঙ্গুলে পথ পার হতে হয় হাতির পিঠে, গোরুর গাড়িতে।

বেঙ্গল থিয়েটারের দলের জন্যে ব্যবস্থা হয়েছে চারটে হাতি, কয়েকখানা গরুর গাড়ি। যারা গরুর গাড়িতে যাবার, তারা তিনটের সময় চলে গেল। বিনোদিনী গরুর গাড়িতে যায় নি, সে হাতির পিঠে চড়ে যাবে।

বিনোদিনী গোলাপসুন্দরীকে ধরে বসল—দিদি, আমি তোমার সঙ্গে হাতিতে যাব।

গোলাপসুন্দরী বললেন—আচ্ছা, যাস।

সন্ধ্যা হয়েছে তখন, একেকটা হাতিতে চারজন করে উঠলেন। একটা হাতিতে উঠলেন গোলাপসুন্দরী, বিনোদিনী আর দুজন পুরুষমানুষ। তা হাতি তো রওনা দিল। খানিকদূর যাবার পরে দেখা গেল রাস্তা অত্যন্ত বিশ্রী, হাত খানেক চওড়া, দুদিকে বুক অবধি বন-জঙ্গল। ঝড়বৃষ্টি। রাত বাড়তে লাগল, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে লাগল ঝড়বৃষ্টি। শুধু বৃষ্টি নয়, শিলাবৃষ্টি। হাতির উপর ছাউনি-টাউনি কিছু নেই, ফলে সব বৃষ্টি, শিলা, ঝড় মাথার উপরে। উপরন্তু, হাতি আবার বেতবনে গিয়ে ঢুকল।

ভয়ের কথা বইকি, ভয়ে গোলাপসুন্দরী আর বিনোদিনী কাঁদতে আরম্ভ করে দিলেন। বৃষ্টির জলে চোখের জলে একাকার।

হাতি দাঁড়িয়ে পড়ল অনড় হয়ে। মাথার উপর শুঁড় তুলে দিয়ে, সামনের পা বাড়িয়ে দিয়ে হাতি স্থির। হাতি যাচ্ছে না কেন?

মাহুত বলল—বাঘ বেরিয়েছে। তাই হাতি যাচ্ছে না।

মাহুতেরা হই-হই করে উঠল।

শুধু ভয় নয়, কান্না নয়, বিনোদিনীর শরীরে কম্প ধরে গেল। পাছে বিনোদিনী হাতির উপর থেকে কাঁপতে-কাঁপতে পড়ে যায়, সঙ্গের একজন পুরুষ মানুষ ধরে রইল বিনোদিনীকে।

সেদিন বহুকষ্টে প্রায় আধমরা অবস্থায় এদের পৌঁছতে হয়েছিল যথাস্থানে। বিনোদিনীর শরীর এমন অসাড় হয়ে গিয়েছিল যে হাতির পিঠ থেকে নিজের ক্ষমতায় নামতেও পারে নি। শরৎচন্দ্র বিনোদিনীকে ধরে হাতির পিঠ থেকে নামিয়েছেন। শরৎচন্দ্র নিজের হাতে বিনোদিনীর সমস্ত গায়ে সেক দিয়েছেন।

আরেকবার বেঙ্গল থিয়েটারের দলের সঙ্গে কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে অভিনয় করতে গিয়েছিল বিনোদিনী। প্রমীলার ভূমিকা বিনোদিনীর। প্রমীলার ভূমিকায় বিনোদিনীকে ঘোড়ার উপর বসে অভিনয় করতে হত।

কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে থিয়েটারের প্ল্যাটফর্ম মাটিতে বানানো হয়েছে। সেই মাটির ধাপ ভেঙে ঘোড়া হুমড়ি খেয়ে পড়ল, ঘোড়ার উপর থেকে প্রায় দুহাত দূরে ছিটকে পড়ল বিনোদিনী। অভিনয়ের এখনও অনেকখানি বাকি, কিন্তু বিনোদিনীর আর উঠে দাঁড়াবার পর্যন্ত শক্তি নেই। চারুবাবু বিনোদিনীকে ওষুধ খাওয়ালেন, বিনোদিনীর হাঁটু থেকে পেট পর্যন্ত ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন।

শরৎচন্দ্র বিনোদিনীকে বললেন—লক্ষ্মীটি, আজকের কাজটা কষ্ট করে উদ্ধার করে দাও।

কোনক্রমে কার্যোদ্ধার হল সেদিন। কিন্তু পরদিন কলকাতায় ফিরে এসে মাসাধিককাল বিছানায় শুয়ে থাকতে হল বিনোদিনীকে।

বেঙ্গল থিয়েটার ছেড়ে ন্যাশনাল থিয়েটারে এল বিনোদিনী। যদিও বেঙ্গল থিয়েটার ছেড়ে এসেছে, তথাপি বেঙ্গল থিয়েটারের নিন্দামন্দ করে নি বিনোদিনী।

পরবর্তীকালে বিনোদিনী বলেছেন: 'বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয়কালে আমি একরূপ সন্তোষে কাটাইয়াছিলাম। কেননা তখন বেশী উচ্চ আশা হয় নাই। যাহা পাইতাম তাহাতেই সুখী হইতাম। যেটুকু উন্নতি করিতে পারিতাম, সেই টুকুও যথেষ্ট মনে করিতাম। বেশী আশাও ছিল না, অতৃপ্তিও ছিল না। সকলে বড় ভালবাসিত। হেসে খেলে নেচে কুঁদে দিন কাটাইতাম।'

বেঙ্গল থিয়েটার ছেড়ে এসেছে বলে তার কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট হয়েছে। বেঙ্গল থিয়েটারের কাছে বিনোদিনীর একমাসের মাইনে পাওনা ছিল। বিনোদিনী বেঙ্গল থিয়েটার ছেড়ে আসবার পর বিনোদিনীর মা বহুবার তাগাদা করেও সে-টাকা আদায় করতে পারেন নি।

যা হোক, যৌবনারম্ভে ন্যাশনাল থিয়েটারে এল বিনোদিনী—কেদারনাথ চৌধুরীর সঙ্গে একত্র হয়ে গিরিশচন্দ্র সেই থিয়েটার চালাচ্ছেন। শেষপর্যন্ত ন্যাশনাল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হলেন প্রতাপচাঁদ জহুরী। বিপুল গৌরবে চলতে লাগল প্রতাপচাঁদের থিয়েটার। বিনোদিনীর খ্যাতিও বাড়তে লাগল উত্তরোত্তর।

প্রতাপচাঁদ একদিন বললেন—বিনোদ তিল সমাত করন্তি।

অর্থাৎ, বিনোদিনী যাদু করেছে।

সত্যিই বিনোদিনী যাদু করেছে দর্শকদের। আর, গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে থিয়েটার আরম্ভ করবার পর বহুকাল বিনোদিনী তাঁর কাছেই যা শিখবার শিখেছে।

উত্তরকালে বিনোদিনী গিরিশচন্দ্র প্রসঙ্গে বলেছেন : 'কার্য্যক্ষেত্রে তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন এবং আমি তাঁহার প্রথমা ও প্রধানা শিষ্যা ছিলাম। তাঁহার নাটকের প্রধান প্রধান স্ত্রী চরিত্র আমিই অভিনয় করিতাম। তিনিও অতি যত্নে আমায় শিক্ষা দিয়া তাঁহার কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতেন।···গিরিশবাবু মহাশয়ের শিক্ষা ও সতত নানারূপ সৎ উপদেশ গুণে আমি যখন ষ্টেজে অভিনয়ের জন্য দাঁড়াইতাম, তখন আমার মনে হইত না যে আমি অন্য কেহ! আমি যে চরিত্র লইয়াছি আমি যেন নিজেই সেই চরিত্র।'

গিরিশচন্দ্র সযত্নে শেখাতেন বিনোদিনীকে; প্রথমে চরিত্রটি বুঝিয়ে দিতেন, তারপর পার্ট মুখস্থ করতে বলতেন। উপদেশ দিতেন নানারকম।

শিক্ষাদাতা বলে গিরিশচন্দ্রকে প্রগাঢ় সম্মান জানিয়েছেন বিনোদিনী। আর গিরিশচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে বলেছেন—রঙ্গালয়ে বিনোদিনীর উৎকর্ষ আমার শিক্ষা অপেক্ষা তাহার নিজগুণে অধিক।

বিদেশী বড়-বড় অভিনেতা-অভিনেত্রী এলে তাঁদের অভিনয় দেখবার জন্যে ব্যস্ত হত বিনোদিনী। তা থিয়েটারের উপরঅলারা সুযোগ হলেই বিনোদিনীকে ইংরেজী থিয়েটার দেখিয়ে আনতেন। বাড়ি এলে গিরিশচন্দ্র জিজ্ঞেস করতেন —কী রকম দেখে এলে বল দেখি।

দেখে বিনোদিনী যা বুঝেছে, বলত। মন দিয়ে শুনতেন গিরিশচন্দ্র; কোথাও ভুল-ভ্রান্তি হলে শুদ্ধ করে দিতেন।

আজে-বাজে কথা শুনতে ভাল লাগে না, বিনোদিনী বিলেতের বড় বড় অভিনেতা-অভিনেত্রীর গল্প শুনতে চায়, নানারকম মূল্যবান গ্রন্থের কথা শুনতে চায়। তা গিরিশচন্দ্র সেসব গল্প শোনাতেন, বই পড়ে শোনাতেন। বিনোদিনী মুগ্ধ হয়ে শুনত—এলেন টেরি কী রকম সাজসজ্জা করেন, ব্যাণ্ডমান কেমন হ্যামলেট সাজেন, ওফেলিয়া কী রকম ফুলের পোশাক পরেন। কিম্বা, কোন বিদেশী অভিনেত্রী বনের মধ্যে গিয়ে পাখির কাকলির সঙ্গে নিজের কণ্ঠ মিলিয়ে স্বর-সাধনা করেন।

শুধু গিরিশচন্দ্র নন, অন্যান্য বন্ধুরাও বিস্তর সাহায্য করেছেন বিনোদিনীকে। তাঁদের কাছে বিনোদিনী শুনেছে পৃথিবীর কত বড়-বড় লেখকের কত বিচিত্র কাহিনী।

কিন্তু, শুধুই কি কানে শুনেছে? না, বিনোদিনী সেসব গল্প শুধু কানে শোনে নি, মর্মের মধ্যে সঞ্চিত করেছে সারবস্তু। ভেবেছে, অনবরত ভেবেছে, ফলে, স্বভাবই কেমন হয়ে গিয়েছিল বিনোদিনীর!

বিনোদিনী বলেছেন ঃ

'আমার স্বভাব এমন হইয়া গিয়াছিল যে যদি কখন কোন উদ্যান ভ্রমণ করিতে যাইতাম, সেখানকার ঘর বাড়ী আমার ভাল লাগিত না, আমি কোথায় বন-পুষ্প শোভিত নির্জ্জন স্থান তাহাই খুঁজিতাম। আমার মনে হইত যে আমি বুঝি এই বনের মধ্যে থাকিতাম। আমি ইহাদের চিরপালিত! প্রত্যেক লতা-পাতায় সৌন্দর্য্যের মাখামাখি দেখিয়া আমার হৃদয় লুটাইয়া পড়িত! আমার প্রাণ যেন আনন্দে নাচিয়া উঠিত! কখন কোন নদীতীরে যাইলে আমার হৃদয় যেন তরঙ্গে তরঙ্গে ভরিয়া যাইত, আমার মনে হইত আমি বুঝি এই নদীর তরঙ্গে তরঙ্গেই চিরদিন খেলা করিয়া বেড়াইতাম। এখন আমার হৃদয় ছাড়িয়া এই তরঙ্গগুলি আপনা আপনি লুটোপুটি করিয়া বেড়াইতেছে। কুচবিহারের নদীর বালিগুলি অভ্র-মিশান, অতি সুন্দর, আমি প্রায় বাসা হইতে দূরে, নদীর ধারে একলাটি যাইয়া সেই বালির উপর শুইয়া নদীর তরঙ্গ দেখিতাম। আমার মনে হইত উহারা বুঝি আমার সহিত কথা কহিতেছে।'

একটা কথা বলা হয় নি। প্রতাপচাঁদ ন্যাশনাল থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হবার একটু আগে কিম্বা পরে, বিনোদিনী একজন যুবকের আশ্রিতা হয়েছিল। সেই যুবক সম্ভ্রান্ত এবং অবিবাহিত। সেই যুবকের নাম বলতে পারব না।

গোড়ার দিকে সেই যুবকের ইচ্ছা ছিল যে বিনোদিনী থিয়েটার ছেড়ে দিক। কিন্তু বিনোদিনী কিছুতেই থিয়েটার ছাড়তে রাজি হয় না। তখন সেই সম্ভ্রান্ত যুবক বললেন—তাহলে তুমি অ্যামেচার হয়ে থিয়েটারে কাজ কর। আমার গাড়ি ঘোড়া তোমাকে থিয়েটারে নিয়ে যাবে, থিয়েটার থেকে নিয়ে আসবে।

কিন্তু, অ্যামেচার? চিরকাল মাইনে নিয়ে থিয়েটার করেছে বিনোদিনী, এখন হঠাৎ কেমন করে অ্যামেচার হয়ে যায়। তাছাড়া অবস্থা এমন যে শখের থিয়েটার করা বিনোদিনীর পক্ষে আর সম্ভব নয়! অভিনয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয়, টাকা নেবে না কেন? তারপর আবার বিনোদিনীর মায়ের ধারণা যে থিয়েটার লক্ষ্মী, কেননা থিয়েটারের পয়সা থেকেই বিনোদিনীদের দারিদ্র্য দশা দূর হয়েছে।

সেই সম্ভ্রান্ত যুবক তো বিনোদিনীকে মহাবিপদে ফেলল!

বিপদের কথা বিনোদিনী আগাগোড়া বলল গিরিশচন্দ্রকে।

গিরিশচন্দ্র বললেন—তাতে আর কি। তোমার মাইনের টাকাটা আমি তোমার মায়ের হাতে দিয়ে আসব।

কিন্তু সেই সম্ভ্রান্ত যুবক? তাকে বিনোদিনী কী বলবে?

গিরিশচন্দ্র পরামর্শ দিলেন—তাকে বল, আমি মাইনে নিই না।

বিনোদিনী সেই পরামর্শ শুনে দুঃখিত হল। বিনোদিনী কুলবধূ নয়, কিন্তু প্রতারণার প্রতি তার বিপুল বিতৃষ্ণা। সেই সম্ভ্রান্ত যুবকের সঙ্গে মিথ্যাচার করতে হবে?

অনিচ্ছাসত্ত্বেও দায়ে পড়ে অনেক অন্যায় করতে হয় মানুষকে, মেয়েমানুষকে। বিনোদিনীকেও গিরিশচন্দ্রের পরামর্শ মেনে নিতে হল।

কিন্তু সেই সম্ভ্রান্ত যুবক সজ্জন, কর্তব্যপরায়ণ। পাছে কেউ কিছু মনে করে, সেজন্যে বিনোদিনীকে তিনি যথাসময়ে থিয়েটারে পৌঁছিয়ে দিতেন।

বিনোদিনী অসুস্থ হয়ে পড়ল। একমাসের ছুটি চাইল; তা মঞ্জুর হল না। অনেক জেদাজেদি করে পনের দিনের ছুটি পাওয়া গেল। ছুটি নিয়ে কাশীধামে গেল বিনোদিনী। কিন্তু সেখানে গিয়ে অসুখ বেড়ে গেল, ফলে কাশী থেকে ফিরে আসতে মাসখানেক লাগল। ফিরে এসে থিয়েটারে যোগ দিল। শুনতে পেল, প্রতাপচাঁদ নাকি ছুটির সময়ের মাইনে দিতে নারাজ।

সেদিনই প্রতাপচাঁদের কাছে ছুটির মাইনে দাবি করল বিনোদিনী।

প্রতাপচাঁদ হাসলেন। বললেন—মাহিনা কেয়া? তোম তো কাম নেহি কিয়া!

কথা শুনে বিনোদিনীর সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল।—বটে? মাইনে দেবেন না? —বলে বিনোদিনী চলে গেল।

তারপর গিরিশচন্দ্র আর অমৃতলাল মিত্র এলেন বিনোদিনীর বাড়িতে। বিনোদিনী গিরিশচন্দ্রকে বললেন—আমার বেশি মাইনে চাই। আর যে টাকা বাকি পড়েছে, তা চুক্তি করে চাই। নইলে কাজ করব না।

অমৃতলাল মিত্র বললেন—ভাখ বিনোদ, এখন গোলমাল করো না। একজন ভদ্রলোক একটা নতুন থিয়েটার করতে চাইছে। যত টাকা লাগবে সে খরচ করবে। এখন কিছুদিন চুপচাপ থাক। দেখি কতদূর কী হয়।

সেই কথাই বজায় রইল। বিনোদিনী প্রতাপচাঁদকে আর কিছু বলল না।

ইতিমধ্যে বিনোদিনী আরেকটা দুঃখ পেয়েছে।

সেই অবিবাহিত সম্ভ্রান্ত যুবককে মনে আছে তো? কয়েকমাস আগে তিনি বিয়ে করেছেন; প্রতারণা করেছেন বিনোদিনীর সঙ্গে। আগে তিনি বারংবার ধর্মসাক্ষী করে বিনোদিনীকে বলেছিলেন—'তুমিই আমার একমাত্র ভালবাসার বস্তু। আজীবন সে-ভালবাসা অটুট থাকবে।' কিন্তু সে-অঙ্গীকার তিনি রাখলেন না। বিনোদিনীর কাছে বিষয়-কর্মের ছল করে দেশে গিয়ে দিব্যি বিয়ে করলেন! কোথায় রইল তাঁর ভালবাসার প্রতিশ্রুতি!

ক্ষুণ্ণ হয়ে বিনোদিনী ভাবল: 'ঈশ্বর তো আমার জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য সামর্থ্য দিয়াছেন, এইরূপ শারীরিক মেহনৎ দ্বারা নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে যদি সক্ষম হই, তবে আর দেহ বিক্রয় দ্বারা পাপ সঞ্চয় করিব না ও নিজেকেও উৎপীড়িত করিব না।'

এদিকে প্রতাপচাঁদের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের বনিবনাও হচ্ছিল না। আর, এই সময়েই নতুন একটা থিয়েটার খুলবার প্রস্তাব নিয়ে এলেন একজন ভদ্রলোক। অবাঙালী। তাঁর নাম গুর্মুখ রায়। গিরিশচন্দ্র আনন্দিত হলেন। কোথায় কেমন করে থিয়েটার খোলা যায়, তার পরামর্শ চলতে লাগল।

হঠাৎ একদিন গুর্মুখ রায় বললেন—নতুন থিয়েটার খুলতে যত টাকা দরকার আমি সব দেব। কিন্তু একটা কথা। বিনোদিনীকে আমার আশ্রিতা হয়ে থাকতে হবে। সেজন্য অবশ্যি আমি বিনোদিনীকে অনেক টাকা দিতে রাজী আছি।

কিন্তু বিনোদিনী কি রাজী হবে? যদি রাজী না হয়? তাহলে কেউ যেন আর নতুন থিয়েটারের আশা না করে। গুর্মুখ রায় স্পষ্টাক্ষরে বলে দিয়েছেন—বিনোদিনী যদি আমার আশ্রিতা হতে রাজী না হয় তাহলে আমি কিছুতেই থিয়েটার খুলব না।

প্রতাপচাঁদের ব্যবহার অনেকের কাছেই অসহ্য হয়ে উঠেছে। অনেকে মিলে সাব্যস্ত করলেন, যেমন করে হোক বিনোদিনীকে রাজী করাতে হবে।

বিনোদিনী প্রথমে রাজী হয় নি। প্রস্তাব নস্যাৎ করে দিয়েছে এককথায়।

বন্ধু-বান্ধবেরা সহজে হাল ছাড়লেন না। বারংবার বিনোদিনীকে বলতে লাগলেন—যেমন করে পার, আরেকটি থিয়েটার গড়বার জন্যে সাহায্য কর।

তা নতুন থিয়েটার গড়ে তুলতে বিনোদিনীর আপত্তি নেই, কিন্তু সেজন্যে একজনকে ছেড়ে আরেকজনকে আশ্রয় করতে হবে?

বিনোদিনীর মন তাতে সায় দেয় না। এদিকে আবার বন্ধু-বান্ধবদের ধারাবাহিক কাতরোক্তি।

কিন্তু সেই সম্ভ্রান্ত যুবক তো বিনোদিনীর কাছে তার ভালবাসার প্রতিশ্রুতি রাখে নি, বিনোদিনীকে প্রতারণা করেছে। এখন বিনোদিনীও যদি তাকে প্রতারণা করে, তাহলে কি খুব অন্যায় হয়? বোধ হয়, না।

আবার একেক-সময় বিনোদিনীর মনে হয়—সেই সম্ভ্রান্ত যুবকের কোন দোষ নেই, আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে তিনি বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছেন। আমি তাঁর একমাত্র ভালবাসার পাত্রী, তবে···

রাত্রে এরকম মনে হলে, বিনোদিনী সারারাত্রি ঘুমোতে পারত না। মন আরেকরকম হয়ে যেত। কিন্তু সকালবেলা থিয়েটারের বন্ধু-বান্ধুবদের কাতরোক্তিতে বিনোদিনীর রাত্রির মন পলাতক হত। বিনোদিনীর দিনের মন জেগে উঠত।

বিনোদিনী ইচ্ছা করলেই একটা নতুন থিয়েটার হয়। তাই হবে। নতুন থিয়েটারের সঙ্কল্পই করল বিনোদিনী। সুদৃঢ় সঙ্কল্প। অতএব গুর্মুখ রায়ের আশ্রিতা হতে হবে বিনোদিনীকে।

সেই সম্ভ্রান্ত যুবকের আশ্রয় ছেড়ে গুর্মুখ রায়ের আশ্রয় নেবার সঙ্কল্প করেছে বিনোদিনী—এক-কথায় কেমন সহজে বলা হল ব্যাপারটা। কিন্তু যত সহজে বলা হল, তত সহজে কাজ হয় নি। অনেক হাঙ্গামা হয়েছে। শুধু হাঙ্গামা কেন দাঙ্গা-হাঙ্গামাও বলা চলে।

বিনোদিনী গুর্মুখ রায়ের আশ্রিতা হয়ে চিরকাল একটা থিয়েটারে থাকবার সঙ্কল্প করেছে, খবর শুনেই সেই সম্ভ্রান্ত যুবক বিপক্ষে দাঁড়ালেন। অনেক বাধা-বিপত্তি দেখা দিল। একদিন সেই সম্ভ্রান্ত যুবক নিজের দেশ থেকে লেঠেল এনে বাড়ি ঘেরাও করলেন। গুর্মুখ রায়ও চুপচাপ বসে থাকবার মানুষ নন, তিনিও ষণ্ডামার্কা গুণ্ডা লাগালেন।

ঝনঝন মসমস শব্দে একদিন ভোরবেলা বিনোদিনীর ঘুম ভেঙে গেল। বিনোদিনী তাকিয়ে দেখল, সেই সম্ভ্রান্ত যুবক একেবারে মিলিটারি বেশে ঘরের মধ্যিখানে। তার সঙ্গে কোষবদ্ধ তরবারি।

যুবক বললেন—মেনি, এত ঘুম কেন?

একটা কথা বলা হয় নি, উনি বিনোদিনীকে প্রায়ই 'মেনি' বলে ডাকতেন।

বিনোদিনী চমকে উঠল। উঠে বসল।

যুবক বললেন—স্থাখ বিনোদ, তোমাকে ওদের সঙ্গ ছাড়তে হবে। তোমার জন্যে যে-টাকা খরচ হয়েছে, আমি সবই দেব। এই দশ হাজার টাকা নাও। যদি বেশি দরকার হয় তো আরও দেব।

এই ঔদ্ধত্য বিনোদিনীকে অশান্ত করে তুলল। বিনোদিনী বলল—না, কখনও না। আমি ওদের কথা দিয়েছি, এখন কিছুতেই তার ব্যতিক্রম হবে না।

যুবক বললেন—যদি টাকার জন্যে হয় তো আমি তোমাকে আরও দশ হাজার টাকা দেব।

টাকার জোর !! কিন্তু টাকার জোরে কি সব সমস্যার সমাধান হয় ? সব ক্ষুধার তৃপ্তি হয় ? সব পিপাসার শান্তি হয় ?

বিনোদিনী উঠে দাঁড়াল। বলল—রাখ তোমার টাকা। টাকা আমি উপার্জন করেছি বই টাকা আমায় উপার্জন করে নি। ভাগ্যে থাকে অমন দশ-বিশ হাজার আমার কত আসবে ! তুমি এখন চলে যাও।

বিনোদিনীর কথা শুনে যুবক উদ্দীপ্ত হলেন। তরবারিতে হাত রেখে বললেন —বটে !—ভেবেছ কি যে তোমাকে সহজে ছেড়ে দেব ? তোমায় কেটে ফেলব। যে-বিশ হাজার টাকা তোমায় দিতে চেয়েছিলাম, তা অন্য উপায়ে খরচ করব। পরে যা হয় হবে।

বলতে-বলতে সেই সম্ভ্রান্ত যুবক চোখের পলকে কোষ থেকে তরবারি বের করে বিনোদিনীর মাথার দিকে চালালেন। বিনোদিনীও সেই মুহূর্তেই বসে পড়ল একটা টেবিল-হারমোনিয়মের পাশে। সৌভাগ্য বলতে হবে, সেই তরবারি বিনোদিনীর মাথায় লাগল না, লাগল হারমোনিয়মের ডালায়। হারমোনিয়মের ডালার কাঠ তিন আঙুল কেটে গেল।

পলকপাতের মধ্যে আবার ক্ষিপ্রহাতে তরবারি চালালেন যুবকটি। ঈশ্বরের অসীম দয়া, সেবারও বিনোদিনীর শরীরে লাগল না। সেবার তরবারির কোপ লাগল একটা চৌকিতে।

তৃতীয়বার আঘাত করবার জন্যে হাত তুলেছেন যুবকটি, সেই মুহূর্তেই বিনোদিনী তরবারিসমেত তার হাতখানা ধরে ফেলল। বলল—যদি কাটতে হয়, পরে কেট। কিন্তু তোমার পরিণাম ? আমার কলঙ্কিত জীবন গেল বা রইল, ক্ষতি কি। কিন্তু একবার তোমার পরিণাম ভাব। একটা ঘৃণিত বারাঙ্গনার জন্যে এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় করে সংসার থেকে চলে যাবে ? ছি ! ছি ! শোন। স্থির হও। কী করতে হবে, বল।

হাতের তরবারি দূরে ফেলে যুবকটি সেইখানেই মুখে হাত দিয়ে বসে পড়লেন। সেই আর্ত মানুষটির জন্যে অপরিসীম বেদনাবোধ করল বিনোদিনী।

যুবক আর-কিছু না বলে বিদায় নিলেন।

বিনোদিনী প্রতাপচাঁদের থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। শুধু বিনোদিনী নয়, আরও অনেকের সঙ্গে সেই সময়েই প্রতাপচাঁদের থিয়েটারের সকল সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল।

এদিকে গুর্মুখ রায় বারংবার বলছেন—বিনোদিনী আমার হাতে না এলে আমি থিয়েটারের জন্যে কোন কাজ করব না।

গোলমাল দিব্যি পেকে উঠেছে। দলের অন্য সকলের পরামর্শ শুনতে হল বিনোদিনীকে। কয়েকমাসের জন্যে দূরে-দূরে থাকতে হল। দূরে মানে কলকাতার বাইরে—রাণীগঞ্জে, এখানে, ওখানে।

যখন ঠিক হল যে বিডন স্ট্রীটে জমি ইজারা নিয়ে থিয়েটার খোলা হবে, তখন বিনোদিনী কলকাতায় ফিরে এল। বিনোদিনী স্পষ্টভাষায় বলে দিয়েছে—থিয়েটারের জন্যে বাড়ি না করে দিলে আমি কিছুতেই গুর্মুখ রায়ের বাধ্য হব না।

বিনোদিনী কলকাতায় ফিরে আসবার কয়েকদিন পরে গুর্মুখ রায় একদিন বিনোদিনীকে বললেন—ত্যাখ বিনোদ, আর থিয়েটারের গোলমালে কাজ নেই। তুমি আমার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নাও। আমি একেবারে তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি।

কতগুলো নোট বের করলেন গুর্মুখ রায়।

কিন্তু বিনোদিনী, পঞ্চাশ হাজার টাকা দূরের কথা, এক কর্পদকও নিল না। বিনোদিনী থিয়েটার ভালবাসে। সেই ভালবাসার জন্যে, পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রলোভন বারবধূ হয়েও বিনোদিনী সেই মুহূর্তেই অক্লেশে জয় করতে পেরেছে। বারবধূরও ভালবাসা থাকে। শুধু থিয়েটারের জন্যে ভালবাসা থাকে না, ভালবাসার জন্যেও ভালবাসা থাকে। তা না হলে সেই সম্ভ্রান্ত যুবকের আশ্রয় ত্যাগ করে গুর্মুখ রায়ের আশ্রয় নিয়েছে বলে বিনোদিনীর অন্তর ব্যথিত হল কেন?

সেই হৃদয়বেদনার মূল কথা বিনোদিনী নিজেই বর্ণনা করেছেন:

"একের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অপরের আশ্রয় গ্রহণ করা আমাদের চিরপ্রথা হইলেও এ অবস্থায় আমায় বড় চঞ্চল ও ব্যথিত করিয়াছিল। হয় তো লোকে শুনিয়া হাসিবেন যে আমাদেরও আবার ছলনায় প্রত্যবায় বোধ বা বেদনা আছে। যদি স্থির চিত্তে ভাবিতেন তাহা হইলে বুঝিতেন যে আমরাও রমণী। এ সংসারে যখন ঈশ্বর আমাদের পাঠাইয়া ছিলেন তখন নারী-হৃদয়ের সকল

কোমলতায় তো বঞ্চিত করিয়া পাঠান নাই। সকলই দিয়াছিলেন, ভাগ্যদোষে সকলই হারাইয়াছি! কিন্তু ইহাতে কি সংসারের দায়িত্ব কিছুই নাই, যে কোমলতায় একদিন হৃদয়পূর্ণ ছিল তাহা একেবারে নির্ম্মূল হয় না, তাহার প্রমাণ সন্তান পালন করা। পতি-প্রেম সাধ আমাদেরও আছে, কিন্তু কোথায় পাইব? কে আমাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তে হৃদয় দান করিবে? লালসায় আসিয়া প্রেমকথা কহিয়া মনোমুগ্ধ করিবার অভাব নাই, কিন্তু কে হৃদয় দিয়া পরীক্ষা করিতে চান যে আমাদের হৃদয় আছে? আমরা প্রথমে প্রতারণা করিয়াছি, কি প্রতারিতা হইয়া প্রতারণা শিখিয়াছি কেহ কি তাহার অনুসন্ধান করিয়াছেন? বিষ্ণুপরায়ণ প্রাতঃস্মরণীয় হরিদাসকে প্রতারিত করিবার জন্য আমাদেরই বারাঙ্গনা একজন প্রেরিত হয়, কিন্তু বৈষ্ণবের ব্যবহারে তিনি বৈষ্ণবী হন, এ কথা জগৎ ব্যাপ্ত। যদি হৃদয় না থাকিত, সম্পূর্ণ হৃদয় শূন্য হইলে কদাচ তিনি বিষ্ণুপরায়ণা হইতে পারিতেন না। অর্থ দিয়া কেহ কাহারও ভালবাসা কেনেন নাই। আমরাও অর্থে ভালবাসা বেচি নাই; এই আমাদের সংসারে অপরাধ। নাট্যাচার্য্য গিরিশবাবু মহাশয়ের যে "বারাঙ্গনা" বলিয়া একটি কবিতা আছে, তাহা এই দুর্ভাগিনীদের প্রকৃত ছবি। "ছিল অন্য নারী সম হৃদয় কমল।" অনেক প্রদেশে জল জমিয়া পাষাণ হয়! আমাদেরও তাহাই! উৎপীড়িত অসহায় অবস্থায় পড়িয়া পড়িয়া হৃদয় কঠোর হইয়া উঠে।"

—:০:—

এগারো

থিয়েটারের জন্য বিডন স্ট্রীটে জমি ইজারা নেওয়া হল। বিডন স্ট্রীটে বনমালী চক্রবর্তীর বাড়ি ভাড়া নিয়ে রিহার্সাল আরম্ভ হয়ে গেল। এক-একে অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী এসে যোগ দিলেন।

বেলা দুটো-তিনটের সময়ে সকলে রিহার্সালে যায়। সেখানকার কাজ সেরে যেতে হয় থিয়েটার বাড়ির জায়গায়। পূর্ণোদ্যমে থিয়েটারের বাড়ি তৈরি হচ্ছে। অনেক রাত পর্যন্ত কাজ হচ্ছে। অনেকেই চলে যেতেন, কিন্তু বিনোদিনী, গুর্মুখ রায় এবং আরও দু-একজন রাত জেগে কাজ করতেন। মহা আনন্দ বিনোদিনীর। বিনোদিনী পর্যন্ত নিজে ঝুড়িতে করে মাটি বয়ে এনে পিট, ব্যাক সীটের জায়গা ভর্তি করেছেন।

সেসময়ে সকলেই বিনোদিনীকে বলেছেন—এই যে থিয়েটার-হাউস হবে, তোমার নামের সঙ্গে এর যোগ থাকবে। এই থিয়েটারের নাম হবে, বি. থিয়েটার। তাহলে তোমার মৃত্যুর পরেও তোমার নামটি বজায় থাকবে।

কিন্তু কার্যকালে অন্য রকম হয়েছে।

সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, থিয়েটার খুলবার মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি। থিয়েটার রেজেস্ট্রি করা হয়ে গেল। বিনোদিনী জিজ্ঞেস করলেন—থিয়েটারের নাম কী হল?

দাশুবাবু বললেন—স্টার।

নাম শুনে বিনোদিনী নির্বাক হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করলেন। একবার শুধু বললেন—বেশ।

বিনোদিনী ভাবলেন, ওরা কি শুধু আমায় মুখে স্নেহ-মমতা দেখিয়ে কাজ উদ্ধার করলেন!

শুধু তাই নয়, অনেকে এমন চেষ্টাও করেছেন যাতে বিনোদিনী এই থিয়েটারে মাইনে করা অভিনেত্রী হিসেবেও না থাকতে পারেন। কেন এই অপচেষ্টা, কে জানে। এই চেষ্টা কিন্তু ষোলআনা বিফল হয় নি, মাস দুই বিনোদিনীকে চুপচাপ ঘরে বসে থাকতে হয়েছে।

প্রোপ্রাইটার নাকি তখন বলেছেন—এ তো বড় অন্যায়। যার জন্য থিয়েটার করলাম তাকে বাদ দিয়ে কাজ করতে হবে? তা কক্ষনও হবে না। তাহলে সব পুড়িয়ে ছারখার করে দেব।

বিনোদিনীকে কেন্দ্র করে যে এত সব কাণ্ড-কাহিনী হচ্ছে, তার মূলে সবটুকুই কি অন্যের দোষ, বিনোদিনীর নিজের কি কোন দোষ নেই? হয়তো আছে। বিনোদিনী নিজেই বলেছেন: 'একসঙ্গে থাকিতে হইলে ত্রুটি অনেক হইয়া থাকে, আমারও শত-সহস্র দোষ ছিল। কিন্তু অনেকেই আমায় বড় স্নেহ করিতেন, বিশেষতঃ মাননীয় গিরিশবাবুর স্নেহাধিক্যে আমার মান-অভিমান একটু বেশী প্রভুত্ব করিত; সেইজন্য দোষ আমারই অধিক হইত। কিন্তু আমার অভিনয় কার্য্যের উৎসাহের জন্য সকলেই প্রশংসা করিতেন, এবং দোষ ভুলিয়া আমার প্রতি স্নেহের ভাগই অধিক বিকাশ পাইত। আমি তাঁহাদের সেই অকৃত্রিম স্নেহ কখন ভুলিতে পারিব না! এই থিয়েটারে কার্য্যকালীন কোন সুকার্য্য করিয়া থাকি আর না করিয়া থাকি প্রবৃত্তির দোষে বুদ্ধির বিপাকে অনেক অন্যায় করিয়াছি সত্য! কিন্তু এই কার্য্যের দরুণ অনেক ঘাত-প্রতিঘাতও সহিতে হইয়াছে!'

অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের পরে স্টার থিয়েটারের জন্ম হল। স্টারে প্রথম অভিনীত নাটক 'দক্ষযজ্ঞ'। প্রথম অভিনয়ের তারিখ ২১ জুলাই, ১৮৮৩ সাল। তারপর ১১ই আগস্ট 'ধ্রুবচরিত্র', ১৫ই ডিসেম্বর 'নল-দময়ন্তী'। বিনোদিনী 'দক্ষযজ্ঞে' সতী, 'ধ্রুবচরিত্রে' সুরুচি, 'নল-দময়ন্তী'তে দময়ন্তী।

'নল-দময়ন্তী'তে নলের ভূমিকা অমৃতলাল মিত্রের।

অমৃতলাল মিত্রের গায়ের রঙ কাল। অমৃতলাল মিত্রকে নিখুঁত নল সাজানর জন্যে কোন এক দোকান থেকে একজন সাহেব ড্রেসার নিয়ে আসা হল।

অনেকে বিনোদিনীকে বললেন—তুমিও রঙ করিয়ে নাও।

বিনোদিনী বললেন—আগে নল মশায়ের রঙ হোক, দেখি।

সাহেব ড্রেসার অমৃতলাল মিত্রকে সাজালেন নলের বেশে। কিন্তু সে-সাজ বিনোদিনীর পছন্দ হল না। সাহেব যেন তেলচিটে-তেলচিটে করেছে, দেখে বিনোদিনীর বরং হাসি পেল। বিনোদিনী বললেন—আমার ড্রেস ও রঙ আমি নিজেই করে নিচ্ছি দেখুন।

সুন্দর রঙ-পোশাক করলেন বিনোদিনী। সকলেই দেখে খুশী হলেন। আর

তারপর থেকে যতবার অমৃতলাল মিত্র নল সাজতেন, বিনোদিনীই তাঁকে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিতেন; আর কেউ সাজিয়ে দিলে অমৃতলাল মিত্রের পছন্দ হত না।

একবার বনবিহারিণী বললেন—আসুন অমৃতবাবু, আমি আপনাকে রঙ করে দিই।

অমৃতলাল মিত্র বনবিহারিণীর প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন। বললেন—রঙ ও পোশাক সম্বন্ধে বিনোদের পছন্দ সকলের চেয়ে ভাল।

ড্রেসারেরা শুধু যোগাড় করে দিয়েছেন; নিজের সাজ-পোশাক বিনোদিনী নিজেই নিপুণ হাতে করেছেন বরাবর। বিনোদিনীর রূপসজ্জা নিখুঁত: পর্যন্ত চুলের কার্লিংগুলিও চমৎকার।

গিরিশচন্দ্র বিনোদিনীকে একদিন বললেন—একজন ইটালিয়ান কবি বলতেন, তাঁর বইয়ের একটি সুন্দর বালিকার মুখের একটি তিলের জন্য তাঁর জীবন দিতে পারতেন। তোমার এই চুলের কার্লিংগুলি দেখলে এর তিনি কত দাম ঠিক করতেন বলতে পারি না।

পরবর্তীকালে গিরিশচন্দ্র বলেছেন:

'সজ্জিত হইতে শেখা অভিনয় কার্য্যের প্রধান অঙ্গ, এ শিক্ষায় বিনোদিনী বিশেষ নিপুণা ছিল। বিনোদিনী ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায়, সজ্জা দ্বারা আপনাকে এরূপ পরিবর্ত্তিত করিতে পারিত যে, তাহাকে এক ভূমিকায় দেখিয়া অপর ভূমিকায় যে সেই আসিয়াছে, তাহা দর্শক বুঝিতে পারিতেন না। সাজসজ্জার প্রতি অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সজ্জিত হইয়া দর্পণে নিজের প্রতি-বিম্ব দর্শনে অনেক সময়ে অভিনেতার হৃদয়ে নিজ ভূমিকার ভাব প্রস্ফুটিত হয়। দর্পণ অভিনেতার সামান্য শিক্ষক নয়। সজ্জিত হইয়া দর্পণের সম্মুখে হাবভাব প্রকাশ করিয়া যিনি ভূমিকা (Part) অভ্যাস করেন, তিনি সাধারণের নিকট বিশেষ প্রশংসাভাজন হন। কিন্তু এরূপ অভ্যাস করা কষ্টসাধ্য। শিক্ষাজনিত অঙ্গভঙ্গী স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গীর ন্যায় অভ্যস্ত করা এবং স্বেচ্ছায় তৎক্ষণাৎ সেই অঙ্গভঙ্গী প্রকাশ,—শ্রম ও চিন্তা-সাধ্য। এ শ্রম ও চিন্তা-ব্যয়ে বিনোদিনী কখন কুণ্ঠিত ছিল না'

যে-কোন কারণেই হোক, গুর্মুখ রায় আর থিয়েটারের স্বত্ব রাখতে রাজী নন।

তা বলে বিনাশর্তে স্টারের স্বত্ব ছাড়তে চাইলেন না গুর্মুখ রায়। বললেন—এই থিয়েটার যার জন্যে তৈরি হয়েছিল আমি তাকেই এর স্বত্ব দেব। অন্তত এই থিয়েটারের অর্ধেক স্বত্ব তার থাকবে। নইলে আমি হাতছাড়া করব না।

কিন্তু গিরিশচন্দ্র চান না যে থিয়েটারে বিনোদিনীর স্বত্ব থাকে।

গিরিশচন্দ্র বিনোদিনীর মাকে বললেন—বিনোদের মা, ওসব ঝঞ্ঝাটে তোমাদের কাজ নেই। তোমরা মেয়েমানুষ, অত ঝঞ্ঝাট বইতে পারবে না। আমরা আদার ব্যাপারী, আমাদের জাহাজের খবরে কাজ কি। তোমার মেয়েকে ফেলে তো আমি কখনও অন্য জায়গায় কাজ করব না। আর থিয়েটার করতে হলে বিনোদ যে একজন খুব দরকারী, একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। আমরা কাজ করব, বোঝা বইবার দরকার নেই। গাধার পিঠে বোঝা দিয়ে কাজ করব।

গিরিশচন্দ্রের উপর বিনোদিনীর মায়ের অচলা ভক্তি। অতএব, গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছাই বজায় রইল। স্টারের অংশ পেলেন না বিনোদিনী।

একটানে 'চৈতন্যলীলা'য় চলে আসি।

স্টারের জন্যে গিরিশচন্দ্র 'চৈতন্যলীলা' রচনা করলেন। রিহার্সাল আরম্ভ হয়ে গেল যথারীতি। চৈতন্যের ভূমিকা স্বয়ং বিনোদিনীর।

মাঝে-মাঝে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক বৈষ্ণবচূড়ামণি শিশিরকুমার ঘোষ রিহার্সালে এসেছেন। সার্থক চৈতন্য ভূমিকাভিনয়ের জন্যে বিনোদিনীকে সদুপদেশ দিয়েছেন। বলেছেন—তুমি সতত গৌরপাদপদ্ম হৃদয়ে চিন্তা কর। তিনি অধম-তারণ, পতিতপাবন। পতিতের উপর তাঁর অসীম দয়া।

অনবরত মহাপ্রভুর পাদপদ্ম চিন্তা করতেন বিনোদিনী। মনে-মনে প্রার্থনা করতেন—হে পতিতপাবন গৌরহরি, এই পতিতা অধমাকে দয়া করুন।

১লা-আগস্ট, ১৮৮৪ সাল। বিনোদিনী প্রায় সারারাত ঘুমোতে পারলেন না। আগামীকাল 'চৈতন্যলীলা'র প্রথম অভিনয় রজনী। কী জানি কী হয়। ২রা-আগস্ট, ভোরবেলা বিনোদিনী গঙ্গাস্নানে গেলেন। তারপরে একশ-আট দুর্গানাম লিখে মহাপ্রভুর চরণে প্রার্থিনী হলেন—যেন এই মহাসঙ্কটে কূল পাই, যেন কৃপালাভ করি।

একটি অস্থির দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যা হল। 'চৈতন্যলীলা'র প্রথম অভিনয় রজনী। বিনোদিনী চৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয় করলেন। বহুদিন 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয় হয়েছে, বহুদিন চৈতন্য সেজেছেন বিনোদিনী। 'চৈতন্যলীলা'য় বিনোদিনীর অভিনয় দেখে কোন-কোন ভাবুক মুগ্ধচিত্তে বিনোদিনীর পায়ের ধুলো নেবার জন্য

ব্যগ্র হয়েছেন। দেশের ও সমাজের অনেক অগ্রগণ্য মানুষ আশীর্বাদ করেছেন বিনোদিনীকে।

গিরিশচন্দ্র বলেছেন ঃ "সকল ভূমিকাতেই বিনোদিনী সাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছিল, কিন্তু 'চৈতন্যলীলা'য় চৈতন্য সাজিয়া তাহার জীবন সার্থক করে। এই ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় আদ্যোপান্তই ভাবুকচিত্তবিনোদন।"

চৈতন্যের ভূমিকায় অভিনয়ের অভিজ্ঞতা বিনোদিনী নিজেই সবিস্তারে লিখে জানিয়েছেন ঃ

"মনে মনে বুঝিতে পারিলাম যে ভগবান আমায় কৃপা করিতেছেন। কেননা সেই বাল্যলীলার সময় "রাধা বই আর নাইক আমার, রাধা বলে বাজাই বাঁশী" বলিয়া গীত ধরিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই যেন একটা শক্তিময় আলোক আমার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল। যখন মালিনীর নিকট হইতে মালা পরিয়া তাহাকে বলিতাম "কি দেখ মালিনী ?" সেই সময় আমার চক্ষু বহির্দৃষ্টি হইতে অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিত। আমি বাহিরের কিছুই দেখিতে পাইতাম না। আমি হৃদয় মধ্যে সেই অপরূপ গৌর পাদপদ্ম যেন দেখিতাম, আমার মনে হইত "ঐ যে গৌরহরি, ঐ যে গৌরাঙ্গ" উনিই তো বলিতেছেন, আমি মন দিয়া শুনিতেছি ও মুখ দিয়া তাঁহারই কথা প্রতিধ্বনি করিতেছি! আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইত, সমস্ত শরীর পুলকে পূর্ণ হইয়া যাইত। চারিদিকে যেন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইত। আমি যখন অধ্যাপকের সহিত তর্ক করিয়া বলিতাম "প্রভু কেবা কার! সকলই সেই কৃষ্ণ" তখন সত্যই মনে হইত যে "কেবা কার!" পরে যখন উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া বলিতাম যে,—

"গয়াধামে হেরিলাম বিদ্যমান,
বিষ্ণুপদ পঙ্কজে করিতেছে মধুপান,
কত শত কোটী অশরীরি প্রাণী!"

তখন মনে হইত বুঝি আমার বুকের ভিতর হইতে এই সকল কথা আর কে বলিতেছে! আমি তো কেহই নহি! আমাতে আমি-জ্ঞানই থাকিত না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মাতা শচীদেবীর নিকট বিদায় লইবার সময় যখন বলিতাম যে—

"কৃষ্ণ বলে কাঁদ মা জননী,
কেঁদনা নিমাই বলে,
কৃষ্ণ বলে কাঁদিলে সকল পাবে,
কাঁদিলে নিমাই বলে,
নিমাই হারাবে কৃষ্ণে নাহি পাবে।"

তখন স্ত্রীলোক দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এমন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেন যে আমার বুকের ভিতর গুর্‌গুর্‌ করিত। আবার আমার শচীমাতার সেই হৃদয়ভেদী মর্ম্ম-বিদারণ শোকধ্বনি, নিজের মনের উত্তেজনা, দর্শকবৃন্দের ব্যগ্রতা আমায় এত অধীর করিত যে আমার নিজের দুই চক্ষের জলে নিজে আকুল হইয়া উঠিতাম। শেষে সন্ন্যাসী হইয়া সঙ্কীর্ত্তন কালে "হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়। আমি ভবে একা দাও হে দেখা প্রাণসখা রাখ পায়॥" এই গানটি গাহিবার সময়ের মনের ভাব আমি লিখিয়া জানাইতে পারিব না। আমার সত্যই তখন মনে হইত যে আমি তো ভবে একা, কেহ তো আমার আপনার নাই। আমার প্রাণ যেন ছুটিয়া গিয়া হরি পাদপদ্মে আপনার আশ্রয়স্থান খুঁজিত!"

'চৈতন্যলীলা'য় সঙ্কীর্তনের দৃশ্যে উন্মাদ হয়ে নাচতেন বিনোদিনী। একেকদিন অভিনয় করতে-করতে ভাবাবেগে অচৈতন্য হয়ে পড়তেন। এই 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয়ের উপলক্ষেই রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কৃপাস্পর্শ পেয়েছেন বিনোদিনী। ধন্য হয়েছেন।

সে-দিনের কথা বলব?

সে-দিন অভিনয়ান্তে পরমহংসদেবের চরণদর্শনের জন্যে বিনোদিনী আপিসঘরে এলেন। পরমহংসদেব প্রসন্নমুখে উঠে দাঁড়ালেন, নাচতে নাচতে বললেন—হরি গুরু, গুরু হরি, বল মা, হরি গুরু, গুরু হরি।

দু-হাত বিনোদিনীর মাথার উপর রেখে পরমহংসদেব বললেন—মা, তোমার চৈতন্য হোক।

একদিন অসুস্থ পরমহংসদেবকে দর্শন করতে শ্যামপুকুরেও গিয়েছিলেন বিনোদিনী। পরমহংসদেব রোগক্লান্ত প্রসন্নমুখে সস্নেহে বিনোদিনীকে বলেছেন —আয় মা, বোস।

পরবর্তীকালে বিনোদিনী বলেছেন: "আমার থিয়েটার কার্য্যকরী দেহকে এইজন্য ধন্য মনে করিয়াছি। জগৎ যদি আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাহাতেও আমি ক্ষতি বিবেচনা করি না। কেননা আমি জানি যে "পরমারাধ্য পরম পূজনীয় ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব "আমায় কৃপা করিয়াছিলেন!"

থিয়েটারের কথায় আসি, বিনোদিনীর কথায় আসি। বিনোদিনীর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না। অনেক বাধা-বিপত্তি, অনেক কষ্ট। মনের মধ্যেও আরেক ছন্দে বাতাস বইছে।

উত্তরীকালে বিনোদিনী বলেছেন ঃ

'অভিনয়কালীন কত যে বাধা বিপত্তি সহিতে হইত, এখন মনে হইলে ভাবি যে কেমন করিয়া এত কষ্ট সহিতাম। সময়ে সময়ে এত অসুস্থ হইয়া পড়িতাম যে স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে প্রায় আমার অনিষ্ট হইত। মাঝে মাঝে গঙ্গার তীরের নিকট কোন স্থানে বাসা লইয়া বাস করিতাম এবং শনি ও রবিবারে আসিয়া অভিনয় করিয়া যাইতাম। আমার স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যাহা প্রয়োজন হইত, তাহার ব্যয়ভার থিয়েটারের অধ্যক্ষেরা যত্নের সহিত বহন করিতেন।

এই সময়ের মধ্যে আর একটী পরিবর্ত্তন ঘটে। অসুখে ও নানারূপ বাধা বিপত্তিতে আমার মনের ভাব হঠাৎ অন্য প্রকার হয়। মনে করি যে আমি আর কাহারও অধীন হইব না। ঈশ্বর আমায় যে স্বকৃত উপার্জ্জনের ক্ষমতা দিয়াছেন তাহাই অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিব। আমার এই মনের ভাব প্রায় দেড় বৎসর ছিল এবং সেই সময়ে আমি বড় শান্তিতে দিন কাটাইতাম। সন্ধ্যার সময় কার্য্যস্থানে যাইতাম, আপনার কার্য্য সমাধা হইলে, ভুনীবাবু ও গিরিশবাবু মহাশয়ের নিকট নানা দেশ বিদেশের গল্প বা থিয়েটারের কথা সব শুনিতাম, এবং কি করিলে কোনখানে উন্নতি হইবে, কোন্ কার্য্যের কোথায় কি ত্রুটী আছে, এই নানারূপ পরামর্শ হইত। পরে বাটীতে আসিলে স্নেহময়ী জননী কত যত্নে আহার দিতেন। সেই তত রাত্রে উঠিয়া নিকটে বসিয়া আহার করাইতেন। আহারান্তে ভগবানের শ্রীচরণ স্মরণ করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতাম।'

সুখ চিরদিন রইল না। দুঃখের সঙ্গে থিয়েটার থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলেন বিনোদিনী। না, আর অভিনয় করবেন না বিনোদিনী। কিন্তু থিয়েটার থেকে অবসর নিলেন কেন ?

সে-বিষয়ে বিনোদিনী বলেছেন ঃ 'পরিশেষে নানারূপ মনভঙ্গ দ্বারা থিয়েটারে কার্য্য করা দুরূহ হইয়া উঠিল। যাহারা এক সঙ্গে কার্য্য করিবার কালীন সমসাময়িক স্নেহময় ভ্রাতা, বন্ধু আত্মীয়, সখা ও সঙ্গী ছিলেন তাঁহারা ধনবান উন্নতিশীল অধ্যক্ষ হইলেন। বোধ হয়, সেই কারণে অথবা আমারই অপরাধে দোষ হইতে লাগিল। কাজেই আমায় থিয়েটার হইতে অবসর লইতে হইল।'

চিরদিন কখনও সমান যায় না, বিনোদিনী সেকথা মর্মে-মর্মে জানেন। অবসর নেবার অনেকদিন পরে বিনোদিনী বলেছেন ঃ "চিরদিন কখন সমান যায় না ! আজ জগৎ জোড়া যশের বোঝা লইয়া সংসার ক্ষেত্রে যে "ষ্টার থিয়েটারের" নাম উন্নত বক্ষে অবস্থান করিতেছে, সেও একদিন এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র স্ত্রীলোককে বিশেষ আত্মীয়

বলিয়া মনে করিত ! এক্ষণে শত আরাধনায় যাহাদের একবারমাত্র দেখা পাওয়া যায় না, কিন্তু এমন দিন গিয়াছে যে এই অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি আত্মত্যাগ না করিলে হয় তো কোন আঁধারের কোণে কাহাকে পড়িয়া থাকিতে হইত ! তাই বলি, চিরদিন কখন সমান যায় না !"

জীবনে প্রায় ত্রিশখানি নাটকে প্রায় পঞ্চাশটি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বিনোদিনী। গুরু-গম্ভীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, লঘু-চপল ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

গিরিশচন্দ্র বলেছেন :

"গুরুগম্ভীর ভূমিকায় (serious part) বিনোদিনীর যেরূপ দক্ষতা, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে ফতীর ভূমিকায়, এবং 'বিবাহ-বিভ্রাটে' বিলাসিনী কারফর্ম্মার ভূমিকায়, 'চোরের উপর বাটপাড়ি'তে গিন্নী, 'সধবার একাদশী'তে কাঞ্চন প্রভৃতি হাল্‌কা ভূমিকায়ও বিনোদিনীর অভিনয় অতি সুন্দর হইত। মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত নাটক, প্রহসন, পঞ্চরং, নক্‌সা প্রভৃতিতে সেসময় বিনোদিনীই নায়িকা ছিল। প্রত্যেক নায়িকাই অন্য নায়িকা হইতে স্বতন্ত্র এবং প্রশংসনীয় হইত।...অনেক সময়েই আমি বিনোদিনীর সহযোগী অভিনেতা ছিলাম, 'মৃণালিনীতে' আমি পশুপতি সাজিতাম, বিনোদ 'মনোরমা' সাজিত। অন্যান্য অনেক নাটকেই আমরা নায়ক-নায়িকার অংশ গ্রহণ করিয়াছি ; সমস্ত বলিতে গেলে অনেক কথা,...কেবল 'মনোরমা'র কথাই বলিব। মনোরমার কথা বলিতেছি, তাহার কারণ, আমি প্রতি অভিনয়েই সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমবাবু-বর্ণিত সেই বালিকা ও গম্ভীরা মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। এই শিক্ষাদাত্রী তেজস্বিনী সহধর্ম্মিণী, আবার পরক্ষণেই "পশুপতি, তুমি কাঁদ্‌ছ কেন ?" বলিয়াই প্রেম-বিহ্বলা বালিকা ! হেমচন্দ্রের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে এই স্নেহশীলা ভগ্নী, ভ্রাতার মনোবেদনায় সহানুভূতি করিতেছে, আর পরক্ষণেই "পুকুরে হাঁস দেখিতে যাওয়া"—অসাধারণ অভিনয়-চাতুর্য্যে প্রদর্শিত হইত।...যিনি মনোরমার অভিনয় দেখিতেন, তাঁহাকেই বলিতে হইয়াছে যে, এ প্রকৃত 'মৃণালিনী'র মনোরমা। বালিকা-ভাব দেখিয়া এক ব্যক্তির মনে উদয় হইয়াছিল, বুঝি কোন বালিকা অভিনয় করিতেছে। অভিনয় কৌশলে বিনোদিনীর এই উভয় ভাবের পরিবর্ত্তন উচ্চশ্রেণীর অভিনেত্রীরও উচ্চ-প্রশংসা। বিনোদিনী একবাক্যে দর্শকের নিকট সেই উচ্চ-প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। বিনোদিনীর গঠনও অভিনেত্রীর সকল ভূমিকা গ্রহণেরই উপযুক্ত—যুবক, যুবতী, বালক, বালিকা, রাজরাণী হইতে ফতী পর্য্যন্ত সকল ভূমিকার উপযুক্ত।"

একটি কন্যার জননী হয়েছিলেন বিনোদিনী। ইচ্ছা হয়েছিল, মেয়েটিকে লেখাপড়া শেখাবেন। কিন্তু শত চেষ্টাতেও বিনোদিনী মেয়েটিকে কোন ইস্কুলে ভর্তি করাতে পারেন নি। ইস্কুলের কর্তৃপক্ষ আপত্তি করেছে; বারবধূর মেয়েকে কোন ইস্কুলে ভর্তি করে নি। চিরদিন যাদের বন্ধু বলে জেনেছেন, মেয়েকে ইস্কুলে ভর্তি করানোর জন্যে বিনোদিনী তাঁদের সাহায্য চেয়েছেন, অনেক অনুনয়-বিনয় করেছেন তাঁদের কাছে; কিন্তু, শুনতে পাই, সাহায্য তো দূরের কথা, বিনোদিনীর মেয়ে যাতে কোন ইস্কুলে ভর্তি হতে না পারে সেই চেষ্টাই তাঁরা অকাতরে করেছেন।

জন্মের উপর কি কোন জাতকের হাত আছে? কেউ কি আপন ইচ্ছায় বারবধূর সন্তান হয়ে জন্মায়? জন্ম থেকেই কি কেউ বারবধূ হয়ে আসে?

নিজেকে ভাগ্যহীনা, হতভাগিনী বলেছেন বিনোদিনী। বলেছেন ঃ

"এই ভাগ্যহীনা হতভাগিনীর হৃদয় যে কত দীর্ঘশ্বাসে গঠিত, কত মর্ম্মভেদী যাতনার বোঝা হাসিমুখে চাপা, কত নিরাশা হা-হুতাশ দিবানিশি আকুলভাবে হৃদয় মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—কত আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্ত বাসনা, যাতনার জ্বলন্ত জ্বালা লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে—তাহা কি কেহ কখন দেখিয়াছেন? অবস্থার গতিকে নিরাশ্রয় হইয়া স্থানাভাবে বারাঙ্গনা হয় বটে; কিন্তু তাহারাও প্রথমে রমণী-হৃদয় লইয়া সংসারে আসে। যে রমণী স্নেহময়ী জননী, তাহারাও সেই রমণীর জাতি! যে রমণী জ্বলন্ত অনলে পতি সনে হাসিমুখে পুড়িয়া মরে, আমরাও সেই একই নারী-জাতি! তবে গোড়া হইতে পাষাণে পড়িয়া আছাড়্ পিছাড়্ খাইতে খাইতে একেবারে চুম্বকঘর্ষিত লৌহ যেরূপ স্বর্ণ হয় আমরাও সেইরূপ পাষাণে ঘর্ষিত হইয়া পাষাণ হইয়া যাই! আরও একটি কথা বলি, সকলেই সমান নহে; যে জীবন অজ্ঞানতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া আছে, তাহা এক রকম নির্জীব ভাবে জড় পদার্থের মত চলিয়া যায়! কিন্তু যে জীবন দূরে দূরে উজ্জ্বল আলোক দৃষ্টি করিতেছে অথচ পতিত হইয়া আত্মীয়, সমাজ, স্বজন-বন্ধন হইতে বঞ্চিত তাঁহাদের জীবন যে কতদূর দুঃখময়, তাহা যে কতদূর কষ্টকর, যন্ত্রণাদায়ক, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহই অনুভব করিতে পারিবে না। বারাঙ্গনা জীবন কলঙ্কিত ঘৃণিত বটে? কিন্তু সে কলঙ্কিত ঘৃণিত কোথা হইতে হয়? জননী জঠর হইতে তো একেবারে ঘৃণিতা হয় নাই? জন্ম মৃত্যু যদি ঈশ্বরাধীন হয়, তবে তাহাদের জন্মের জন্য তো তাহারা দোষী হইতে পারে না? ভাবিতে হয় এ জীবন প্রথম ঘৃণিত করিল কে? হইতে পারে কেহ কেহ স্বেচ্ছায় অন্ধকারে ডুবিয়া

নরকের পথ পরিষ্কার করে কিন্তু আবার অনেকেই পুরুষের ছলনায় ভুলিয়া তাহাদের বিশ্বাস করিয়া চির কলঙ্কের বোঝা মাথায় লইয়া অনন্ত নরক যাতনা সহ্য করে। সে সকল পুরুষ কাহারা? যাঁহারা সমাজ মধ্যে পূজিত আদৃত তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নন্ কি? যাঁহারা লোকালয়ে ঘৃণা দেখাইয়া লোক-চক্ষুর অগোচরে পরম প্রণয়ীর ন্যায় আত্মত্যাগের চরম সীমায় আপনাকে লইয়া গিয়া ছলনা করিয়া বিশ্বাসবতী অবলা রমণীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন। হৃদয়ের ভালবাসা দেখাইয়া আত্ম সমর্পণকারী রমণী-হৃদয়ে বিষের বাতি জ্বালাইয়া অসহায় অবস্থায় দূরে ফেলিয়া অন্তর্হিত হন, তাঁহারা কিছুই দোষী নহেন! দোষ কাহাদের? যে সকল হতভাগিনীরা সুধাবোধে বিষপান করিয়া চিরজীবন জর্জ্জরিত হইয়া হৃদয়-জ্বালায় জ্বলিয়া মরে তাহাদের কি? যে ভাগ্যহীনা রমণীরা এইরূপে প্রতারিতা হইয়া আপনাদের জীবনকে চির শ্মশানময় করিয়াছে, তাহারাই জানে যে বারাঙ্গনা জীবন কত যন্ত্রণাদায়ক! যাতনার তীব্রতা তাহারাই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছে। আবার এই বিপন্নাদের পদে পদে দলিত করিবার জন্য ঐ অবলা-প্রতারকেরাই সমাজপতি হইয়া নীতি পরিচালক হন! যে ভাগ্যহীনাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন তাহারা যদি তাহাদের সুকুমার মতি বালক-বালিকাদের সৎপথে রাখিবার জন্য কোন বিদ্যালয়ে বা কোন কার্য্যশিক্ষার জন্য প্রেরণ করে, তখন ঐ সমাজপতিরাই শত চেষ্টা দ্বারা তাহাদের সেই স্থান হইতে দূর করিতে যত্নবান হন। তাঁহাদের নীতিজ্ঞতার প্রভাবে অভাগা বালকবালিকারাও জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য পাপ পথের পথিক হইতে বাধ্য হইয়া বিষ-দৃষ্টির দ্বারা জগতের দিকে চাহিয়া থাকে। সুকুমার মতি বালিকাদের পবিত্র সরলতা হৃদয় হইতে যাইতে না যাইতে, তাহাদের হৃদয়ে মধুরতা সমাপ্ত হইতে না হইতে, তাহাদের কচি হৃদয়খানি অবিশ্বাস অনাদরের জ্বালায় জ্বলিয়া উঠে। এমন পুরুষপ্রবর অনেকে আছেন, যে নিজের নিজের প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া, আত্মদমনে অক্ষম হইয়া, একজন অবলার চিরজীবনের শান্তি নষ্ট করিয়া—সমাজে ঘৃণিত, স্বজনে বঞ্চিত, লোকালয়ে লাঞ্ছিত, মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত করিয়া পৌরুষ জ্ঞান করেন। হায়! ভাগ্যহীনা রমণী, কি ভুল করিয়াই আত্মবিনাশ কর! পঙ্কে যে পদ্মফুল ফুটে তাহা দেবতা মস্তক পাতিয়া লন; কেননা তিনি ঈশ্বর! আর মানুষেরা সুকুমার মতি বালিকাগণকে লতা হইতে বিচ্যুত করিয়া পদে দলিত করেন, কেননা ইহারা মানুষ! যাক্! যে ভুল সারাজীবনকে বিষময় করে, তাহা যে কি ভয়ানক ভুল,

তাহা এই ভাগ্যহীনারাই বুঝে! শত দোষ করিলে পুরুষের ক্ষতি নাই; কিন্তু "নারীর নিস্তার নাই টলিলে চরণ।"..."

থিয়েটার থেকে অবসর নেবার পরে একদিন একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে। সে-ঘটনা একাধারে বিচিত্র ও অবিশ্বাস্য। ঘটনাটা বলবার মত বই কি।

বিনোদিনীর প্রাক্তন প্রেমিক সেই সম্ভ্রান্ত যুবককে মনে আছে? বিনোদিনী গুমুখ রায়ের আশ্রিতা হবার পর সেই সম্ভ্রান্ত যুবক একদিন বিনোদিনীকে বলেছিলেন—বিনোদ, তুমি আমায় প্রতারণা করে তোমার স্বার্থসিদ্ধি করে নিলে! কিন্তু এ তোমার ভুল! তুমি কতদিন লুকিয়ে থাকবে? আমি যতদিন বাঁচব ততদিন তোমার শত্রুতা করব। কখনই আমার কথার ব্যতিক্রম হবে না। তুমি ঠিক জেনো, আমার কথা মিথ্যে হবে না। মৃত্যুর পরেও তোমায় দেখা দেবো জেনো।

কিন্তু, যে যাই বলুক, মৃত্যুর পরে কেউ কি কখন দেখা দিতে পারে? আরে, বাজে কথা, কথার কথা। ব্যর্থ প্রেমিকের প্রলাপবাক্য। ওতে কর্ণপাত করতে নেই।

অনেকদিন কেটে গেছে তারপরে।

রবিবার। অলসভাবে বিছানায় শুয়ে আছেন বিনোদিনী। সন্ধ্যা হয়েছে সবেমাত্র। সন্ধ্যার আলো জ্বলছে ঘরের মধ্যে।

বিনোদিনী স্পষ্ট দেখতে পেলেন, সেই সম্ভ্রান্ত যুবক ম্লানভঙ্গিতে দরজা পার হয়ে আস্তে-আস্তে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। বিনোদিনীর মাথার দিকে খাটের ধারে হাত রাখলেন। শান্তকণ্ঠে বললেন—মেনি, আমি এসেছি।

চমকিত ও বিস্মিত হয়ে বিনোদিনী তার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন—এ কি! তুমি আবার এসেছ কেন?

কাতর দৃষ্টিতে তিনি বিনোদিনীর দিকে তাকালেন। অচঞ্চল প্রস্তরমূর্তির মত তিনি বললেন—আমি চলে যাচ্ছি, তাই তোমাকে বলতে এলাম।

মনে হল যেন তিনি একটু সরে এসে বিনোদিনীর দিকে হাত তুললেন। বিনোদিনী ভয় পেলেন, একটু পিছনে সরে গিয়ে বললেন—সে কি! তুমি কোথায় যাচ্ছ? আর এত দুর্বল হয়েছ কেন?

যেন আরও বিষণ্ণ আরও স্থির হয়ে গেলেন তিনি। বললেন—ভয় পেয়ো না। আমি তোমাকে কিছু বলব না। আমি বলেছিলাম যে আমি যাবার সময়ে তোমাকে বলে যাব, তাই বলতে এসেছি আমি যাচ্ছি!

বলে আস্তে-আস্তে তিনি প্রস্তরমূর্তির মত দরজার ওপারে চলে গেলেন।

ভয়ে বিস্ময়ে বিনোদিনী সেই মুহূর্তেই বিছানা ছেড়ে নেমে বাইরে এলেন। কিন্তু কোথাও জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র দেখতে পেলেন না। গেলেন কোথায়!

মা নীচে সিঁড়ির কাছে বসে আছেন। বিনোদিনী উপর থেকে বললেন—মা, উপরে কে এসেছিল?

মা বললেন—কে উপরে যাবে? আমি তো এই সিঁড়ির নীচেই বসে আছি!

কিন্তু তিনি যে এসেছিলেন! বিনোদিনী যে নিজের চোখে দেখেছেন! স্পষ্ট ভাষায় কথা বলেছেন তার সঙ্গে!

বিনোদিনীর মা হেসে বললেন—তুই স্বপ্ন দেখলি নাকি? আমি এখান থেকে সদর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি, দরজায় দারোয়ান বসে আছে, আসবে কে? আর, বাইরে থেকে কেউ এলে দারোয়ান তো আগে খবর দেয়।

তবে কি স্বপ্ন?

কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় খবর পাওয়া গেল যে আগের সেই সন্ধ্যায়ই ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

অনেকে বলতে পারেন, ও বিনোদিনীর ভ্রম।

ভ্রম, স্বপ্ন? সত্য নয়?

কে জানে, হয়তো ভ্রম নয়, হয়তো স্বপ্ন নয়, হয়তো সত্য। এই বিপুল মানব সংসারে কিছুই হয়তো বিচিত্র নয়।

—০৪০*০৪০—

বারো

নাট্যলোক বিচিত্রলোক। সেই বিচিত্রলোকের একজন প্রধান পুরুষ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাকনাম দানী। গিরিশচন্দ্রের ছেলে। বিস্তর রাজার ছেলে রাজা হয়েছে, মন্ত্রীর ছেলে মন্ত্রী, ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার। কিন্তু অভিনেতার ছেলে অভিনেতা? না, সে রকম ঘটনা বোধ করি খুব বেশী নেই।

ছ-সাত বছর বয়স তখন দানীর। থিয়েটার দেখতে গিয়েছে একদিন। মঞ্চের একেবারে সামনে বসে দানী থিয়েটার দেখছে। 'আগমনী' পালা হচ্ছে। অর্ধেন্দুশেখর কী একটা ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

অর্ধেন্দুশেখরের হঠাৎ চোখ পড়ল দানীর উপর। বলা-কওয়া নেই, চোখের পলকে দানীকে কোলে তুলে নিয়ে অর্ধেন্দুশেখর ফুটলাইটের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। যেন এই দুগ্ধপোষ্য শিশুটিও এই পালার একজন অভিনেতা, এমনি ভাবে অর্ধেন্দুশেখর দানীকে সামনে রেখে অভিনয় করে যেতে লাগলেন।

দর্শকেরা হেসে আকুল।

আলোয়-আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে নাট্যশালা। অর্ধেন্দুশেখর দানীকে আদর করে বললেন—এই রকম রোশনাই করে তোমার বিয়ে হবে। বাজনা বাজবে, নতুন বউ, রাঙা টুকটুকে বউ আসবে, আমরা সব কত লোক বরযাত্রী যাব, নেমন্তন্ন খাব। তারপর একদিন তোমার বাবা মরবে, আমরা সব ঘটা করে পোড়াতে যাব কাশী মিত্রের কিম্বা নিমতলার ঘাটে, তারপর আরও ঘটা করে তোমার বাপের শ্রাদ্ধ হবে। কেমন?

যা হবার হবে। যা হবার নয়, তা হবে না। ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে।

কিন্তু অতীতের কথা বলা যেতে পারে। দানীর যখন জন্ম হয়, তখন বাঙলাদেশে সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্ম হয় নি। ১৮৬৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর দানীর জন্ম। তারপর লেখাপড়ার কথা আসে। কিন্তু দানীর লেখাপড়ার কথা বিশেষ কিছু বলবার নেই। হাতে খড়ির পর জগবন্ধু মোদকের ইস্কুল, তারপর

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি, অতঃপর জেনারেল অ্যাসেনাব্লিজ ইনষ্টিস্টউশন। সেখানে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পাবার পরই—ব্যস্। ইস্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক ওই পর্যন্ত।

এদিকে থিয়েটারের নেশায় পেয়ে বসল দানীকে। ঘনঘন থিয়েটার দেখবার সাধ হয়। কিন্তু সুবিধা হয় না তেমন। খুড়োমশায়ের খরদৃষ্টি এড়িয়ে থিয়েটারে যাওয়া গিরিশচন্দ্রের ছেলের পক্ষেও সহজ কথা নয়।

থিয়েটারের নেশা, থিয়েটারের নেশা। এই থিয়েটারকে উপলক্ষ করেই পাড়ার বয়াটে ছেলেদের সঙ্গে দানীর ঘনিষ্ঠতা বেড়ে উঠল। একজনের নাম করি—গণেশ দত্ত। গণেশ গুণধর ব্যক্তি। বাক্স ভেঙে চুরি, মারপিট ইত্যাদিতে গণেশ পয়লা নম্বরের ওস্তাদ। এই গণেশের সঙ্গে দানীর খুব সদ্ভাব! যাক গে।

বন্ধুদের সঙ্গে মিলেমিশে দানী একটা থিয়েটারের দল বানিয়ে ফেলল। সে-দলের নাম হল, পেনালাট গঙ্গালাটের থিয়েটার। ওখানে 'চিতোররাজ' ও 'পদ্মিনী'র অভিনয় হল। দশ বছর বয়সের দানী ঢোলক বাজাল থিয়েটারে।

কাগজের সীন টানিয়ে ওরাই 'লক্ষণবর্জন' অভিনয় করল। ছেলেমানুষের কাণ্ড। লক্ষণের পার্ট করল দানী, দানীর মামাতো ভাই চুনিলাল দেব রামের, আর ব্রহ্মার পার্টে গঙ্গাধর। এই গঙ্গাধর পরে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, তাঁর নাম স্বামী অখণ্ডানন্দ। কিন্তু সেসব কথা এখানে অবান্তর।

একদিন একজন ফেরিঅলা বাড়িতে এসেছে, হাঁকছে—কালি চাই, কালি চাই।

সঙ্গে-সঙ্গে দানী হুঙ্কার দিয়ে তাকে তেড়ে এসেছে—নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা রে দূত।

ফেরিঅলা তো কাঁদতে আরম্ভ করে দিল। গিরিশচন্দ্র দোতলা থেকে দৌড়ে এলেন, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করলেন ফেরিঅলাকে। দানীটা বড় ডানপিটে!

পড়াশোনা তো তেমন কিছুই হল না, দানী ছবি আঁকতে আরম্ভ করে দিল। দেখে-শুনে গিরিশচন্দ্র দানীকে আর্টস্কুলে ভর্তি করে দিলেন। দিনকয়েক বাদে দানী সেই আর্টস্কুলও ছেড়ে দিয়ে এল। তারপর গিরিশচন্দ্র দানীকে শিক্ষা-নবিসীতে ভর্তি করে দিলেন ব্লাকউড আপিসে। তা সেই আপিসেও দানী টিকে থাকতে পারল না শেষপর্যন্ত।

দানী ছোট-খাট প্রাইভেট থিয়েটারে অভিনয় করে বেড়ায়। সেসব থিয়েটারের

দলে দানীর খুব মান-মর্যাদা। একদিন এমারেল্ডের স্টেজ ভাড়া নিয়ে 'পলাশীর যুদ্ধ' অভিনয় করা হল। দানীর সিরাজের ভূমিকা। চমৎকার অভিনয় করল দানী। অনেকেই প্রশংসা করলেন। অভিনয় দেখে প্রেমানন্দ ভারতী দানীকে বললেন—young G. C. Ghose.

দানীর ইচ্ছা করে যে সে সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনেতা হয়ে জীবন কাটায়। কিন্তু সে-ইচ্ছা বোধ করি পূর্ণ হবার নয়। স্বয়ং গিরিশচন্দ্রেরই তাতে ঘোরতর আপত্তি। না, ওসব হবে না।

বাড়িতে দানীর থাকা-খাওয়া চলছে ঠিকঠাক। আর ঠিকঠাক পাওয়া যাচ্ছে জলখাবার বাবদ দশপয়সা। আর? আর কিছু না। এদিকে আবার আরেক কাণ্ড। বাড়ির কাউকে কিছু না জানিয়ে দানী জীবন সঙ্গিনী করে ফেলল একটি তরুণী বিধবাকে।

তা তো হল, কিন্তু খরচ-পত্র কেমন করে চলবে, শুনি? দানীর তো কোন রোজগার নেই। টাকাকড়ি জোগাড় করবার উপায় কি। গত্যন্তর নেই দেখে দানী বাড়ি থেকে চুরি করতে আরম্ভ করল।

পাপ চাপা থাকবার কথা নয়। গিরিশচন্দ্র টের পেলেন। হা অদৃষ্ট! ছেলেটা শেষকালে চোর হল। দানীর পিসীমা ভাবলেন, দানীর ভবিষ্যতে কী দশা হবে!

দানীর পিসীমা একদিন ডেকে পাঠালেন অমৃতলাল মিত্রকে। বললেন —অমৃত, তোরা দেনোর কোন ব্যবস্থাই করবি নে? ও কি শেষে চোর-ডাকাত হয়ে জেল খাটবে?

অমৃতলাল নিরুপায়ভাবে বললেন—আমরা কী করতে পারি।

দানীর পিসীমা বললেন—কেন, ওকে থিয়েটারে নিয়ে যা না!

অমৃতলাল বললেন—গুরুদেবের যে তাতে মত নেই।

দানীর পিসীমা বললেন—তুই বুঝিয়ে বললেই তার মত বদলে যাবে। যা, ওকে থিয়েটারে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর।

গিরিশচন্দ্রকে বুঝিয়ে বললেন অমৃতলাল। কিন্তু গিরিশচন্দ্র কিছু বললেন না, চুপ করে রইলেন। সম্মতি দেবেন? না, দেবেন না?

অমৃতলাল তখন নিজেই দানীকে স্টারে নিয়ে এলেন। গিরিশচন্দ্রের অসাক্ষাতে দানীকে গোপনে শিখিয়ে-পড়িয়ে তুলতে লাগলেন অমৃতলাল। স্টারে তখন গিরিশচন্দ্রের 'চণ্ড' নাটকের মহলা চলছে। সব ভূমিকাই ঠিকঠাক আছে,

কেবল রঘুদেবের ভূমিকায় কাকে নামানো হবে সেটা তখনো সাব্যস্ত হয় নি। গিরিশচন্দ্র ভাবছেন, রঘুদেবের ভূমিকাটি কাকে দেবেন। কিন্তু রঘুদেবের কথা উঠলেই অমৃতলাল বলেন—ও ভাবতে হবে না, আমি সব ঠিক করে রেখেছি।

ড্রেস-রিহার্সালে অমৃতলাল হাজির করলেন দানীকে—এই রঘুদেব।

রঘুদেবের ভূমিকায় দানী মুগ্ধ করল দর্শকদের। এর আগে এই রঙ্গমঞ্চেই একধিক ছোট-ছোট ভূমিকায় নেমেছিল দানী, কিন্তু সেসব তেমন কিছু না। রঘুদেবের ভূমিকাভিনয় থেকেই কৌতূহলী হল দর্শকেরা, গুঞ্জন উঠল—কে ইনি? কী বললেন, গিরিশ ঘোষের ছেলে? তাই বলুন। বাপের ব্যাটা।

আর, গিরিশচন্দ্র অমৃতলালকে বললেন—অমৃত, তুই দানীকে দেখিস।

তারপর একদিন স্টার থিয়েটারের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। দানীবাবুও স্টার ছেড়ে চলে এলেন সিটি থিয়েটারে। সেখানে বিল্বমঙ্গল, বুদ্ধদেব, নল প্রভৃতি ভূমিকায় সুঅভিনয় করলেন দানীবাবু।

সিটির পর মিনার্ভা থিয়েটার। সেখানে অধ্যক্ষ স্বয়ং গিরিশচন্দ্র। তাঁরই 'ম্যাকবেথে'র বঙ্গানুবাদে দানীবাবু ম্যালকম সাজলেন। মিনার্ভায় আরও একাধিক ভূমিকায় সুন্দর অভিনয় করলেন দানীবাবু। গিরিশচন্দ্র খুশী হলেন। তারপর গিরিশচন্দ্রকে মিনার্ভা ছেড়ে আবার চলে আসতে হল স্টারে।

এই সময় একদিন গিরিশচন্দ্র একজনকে জিজ্ঞেস করলেন—কি, দানীর পার্ট-টার্ট কিছু দেখছ?

তিনি বললেন—না। দেখব। আচ্ছা, দানী কেমন দাঁড়াবে?

গিরিশচন্দ্র বললেন—যদি গরম না হয়ে পড়ে তো অমৃত মিত্রকেও ছাড়াবে।

গিরিশচন্দ্রের 'কালাপাহাড়' নাটকে লাটুর ভূমিকা পেলেন দানীবাবু। তারপর 'মায়াবসানে' হলধর, 'হীরক-জুবিলী'তে মাতাল, 'গ্রাম্য-বিভ্রাটে' ঘোলা কামার। এই ঘোলা কামারের ভূমিকায় দানীবাবুর অভিনয় দেখে নাট্যকার অমৃতলাল বসু গিরিশচন্দ্রকে বললেন—গুরুদেব, আপনি কি ভুল করছেন, ওকে কমিকপার্ট দেন না! অর্ধেন্দুর পরে ওর মত কমিকপার্ট করবার লোক স্টেজে নেই।

তারপর গিরিশচন্দ্র স্টার থিয়েটার ছেড়ে এলেন। দানীবাবুও চলে এলেন গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে। কিছুকাল বাদে দানীবাবু আবার ফিরে এলেন স্টার

থিয়েটারে সেখানে 'রাজসিংহ' নাটকে মোবারকের ভূমিকায় তিনি মুগ্ধ করলেন দর্শকদের।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সেই অভিনয় দেখে এসে অমরেন্দ্রনাথকে বললেন—অমর, দানীর কি অদ্ভুত অভিনয় দেখে এলাম।

আর অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রকে বললেন—দানীর অদ্ভুত অভিনয় দেখে মনে হয়, গুরুদেব, আপনি যেন যুবক সেজে মোবারকের পার্ট করছেন। মশায়, আপনার কি যৌবনকাল আবার ফিরে এল?

তারপর দানীবাবু গেলেন মিনার্ভা থিয়েটারে। মিনার্ভা ছেড়ে ক্লাসিক, ক্লাসিক ছেড়ে ইউনিক, ইউনিকের পরে আবার ক্লাসিক, ক্লাসিক ছেড়ে আবার সেই স্টার থিয়েটার।

হ্যাঁ, স্টার থিয়েটারে এমন একজন আছেন, দানীবাবুর ওপর যাঁর স্নেহের অন্ত নেই। অমৃতলাল। মাইনের তিরিশ টাকার উপর আরও দশটাকা তিনি নিজের পকেট থেকে দানীবাবুকে দেন।

কে একজন অমৃতলালকে বললেন—আপনি দানীকে বরাবরই নিয়ে আসেন, আবার সুবিধে পেলেই সে চলে যায়!

কিন্তু অমৃতলালের সেজন্যে কোন অভিযোগ নেই। অমৃতলাল বললেন—ওর দোষ কি। ওর সংসার চালানো দরকার। অন্যে যখন বেশী টাকা কবুল করে, ও না গিয়ে পারে না। ও কী করবে?

হাজার টাকা অগ্রিম পেয়ে দানীবাবু অতঃপর চলে এলেন মিনার্ভা থিয়েটারে। সেখানে তখন গিরিশচন্দ্র আছেন। দানীবাবুর মাইনে ঠিক হল ষাট টাকা। মিনার্ভায় এসে প্রতাপাদিত্যের ভূমিকা নিলেন দানীবাবু। তারপর 'বলিদানে' দুলালচাঁদ সাজলেন।

১৯০৫ সাল। ঘোষিত হয়েছে বাঙলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হবে। দেশব্যাপী তখন প্রচণ্ড আলোড়ন। সে-সময়ে সিরাজদ্দৌলার ভূমিকায় অভিনয় করে দানীবাবু নতুন উন্মাদনা এনে দিলেন। তাঁর সুন্দর অভিনয় দেখে কেউ-কেউ নাকি উচ্ছ্বাসের মুখে এমন কথাও বলেছেন যে এবার দেশ স্বাধীন হলে দানীবাবুই নবাব হবেন!

'দুর্গেশনন্দিনী'তে দানীবাবু করতেন ওসমান, তারাসুন্দরী নিতেন আয়েষার ভূমিকা, বিদ্যাদিগ্‌গজ সাজতেন অর্ধেন্দুশেখর, আর বীরেন্দ্র সিংহ হতেন গিরিশ-

চন্দ্র। সকলেই চমৎকার অভিনয় করতেন। কিন্তু আয়েষা আর ওসমান যেন অন্য সকলকে ছাপিয়ে যান।

অনেকদিন পরের একটা ঘটনা এখানে নিবেদন করলে মন্দ হয় না।

১৯০৬ সালে 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনীত হয়েছে। তার প্রায় একযুগ পরে আইন সংক্রান্ত কী একটা পরামর্শ নিতে দানীবাবু একদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে এসেছেন। অন্দরমহল থেকে অনুরোধ এল—দানীবাবুকে একদিন ওসমানের অভিনয় দেখাতে হবে। শুধু তাই নয়, সঙ্গে আয়েষারূপে তারাসুন্দরীকেও চাই।

কিন্তু তা কেমন করে হবে! তারাসুন্দরী তখন স্টার থিয়েটারে, আর দানীবাবু তখন মনোমোহন থিয়েটারে। উপায় কি?

দেশবন্ধু ইচ্ছা করেছেন, অতএব উপায় হয়ে গেল। 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনীত হল একরাত্রি—দানীবাবু ওসমান, তারাসুন্দরী আয়েষা। খুশী হল দর্শকেরা। বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে দান করা হল। যাক সেসব কথা। আবার আগের কথায় ফিরে যাই।

'দুর্গেশনন্দিনী'র পর 'মীরকাসিম'। মীরকাসিম, বলা বাহুল্য, দানীবাবু। অন্যের কথা ছেড়ে দিই, দানীবাবুর মীরকাসিম দেখে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র অবধি খুশী। জগৎশেঠ, রাজবল্লভ প্রভৃতিকে গঙ্গায় ডুবিয়ে মেরে ফেলবার হুকুম দিচ্ছেন মীরকাসিম, এই দৃশ্যে দানীবাবুর অভিনয় দেখতে-দেখতে গিরিশচন্দ্র একেকদিন উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে অর্ধেন্দুশেখরকে বলতেন—ছাখ অর্ধেন্দু, ব্যাটা কী রকম expression দিচ্ছে!

কিন্তু যেদিন গিরিশচন্দ্র দানীবাবুর অভিনয় দেখে অসন্তুষ্ট হতেন, সেদিন কী বলতেন?

কিছুদিন বাদে আরেক থিয়েটারে 'পাণ্ডব-গৌরবে' ভীমের ভূমিকায় অভিনয় করছেন দানীবাবু। গিরিশচন্দ্র সে-অভিনয় দেখে সন্তুষ্ট হলেন না। পরদিন রিহার্সালের সময় দানীবাবুকে বললেন—হ্যাঁ রে দানী, তুই কাল কী অ্যাক্টো করছিলি—ভীমের না সিরাজদ্দৌল্লার?

অনেকদিন আগের আরেকটা ঘটনা মনে পড়ল এখানে।

তরুণ বয়সে দানীবাবু একবার মফস্বলে অভিনয় করতে গেছেন। সেখানকার কোন এক রাণী দানীবাবুকে সোনার মেডেল দিয়েছেন।

দানীবাবু সানন্দে এসে গিরিশচন্দ্রকে সেই খবরটুকু শোনালেন। খবর

শুনে গিরিশচন্দ্র বললেন—বাপু, এই কথাটা আমাকে বলতে তোমার লজ্জা হল না? রাণী-মহারাণীদের পয়সা আছে, তাই তাঁরা তোমাকে মেডেল দিয়ে তাঁদের টাকার বড়াই দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা তো রসের ধার ধারেন না। ওই মেডেলে যেটুকু সোনা আছে, ওর দাম শুধুই ততটুকু। এর চেয়ে যদি কোন সমঝদার তোমাকে একটি সামান্য ফুল দিয়ে তারিফ করতেন, তাহলে যথার্থই তুমি আনন্দ করতে পারতে—কারণ তার মূল্য অমূল্য।

তারপর ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১২ সাল। এই সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারে বিভিন্ন রসের ভূমিকায় অভিনয় করলেন দানীবাবু। এই সময়েই তাঁর খ্যাতি চূড়া স্পর্শ করল। এই সময়ে দানীবাবু সেজেছেন 'শাস্তি কি শান্তি'তে প্রসন্ন-কুমার, 'শঙ্করাচার্য্যে' শঙ্করাচার্য্য, 'অশোকে' অশোক, 'তপোবলে' বিশ্বামিত্র, ক্ষীরোদপ্রসাদের 'পলিনে' আলমাম্নুন, দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতনে' অমরসিংহ, 'সাজাহানে' ঔরংজেব এবং 'চন্দ্রগুপ্তে' চাণক্য।

প্রথম অভিনয় রাত্রে 'চন্দ্রগুপ্ত' দেখতে এসেছিলেন স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। চাণক্যের ভূমিকাভিনয় দেখে খুশী হয়ে তিনি এসে দানীবাবুকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন—দানী, তুমি সত্যিই ব্রাহ্মণ।

যেদিন যে-চরিত্র অভিনয় করতেন, সকালবেলা থেকে সেই চরিত্রের ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন দানীবাবু। 'দক্ষযজ্ঞে'র শিব বা 'শঙ্করাচার্য্যে'র শঙ্কর সাজবার আগে একশো ঘটি জল ঢেলে আসতেন মহাদেবের মাথায়। বলতেন —তাঁকে সন্তুষ্ট না করলে কেমন করে তাঁর চরিত্রে অভিনয় করব?

অভিনয় করে জীবনে অসামান্য খ্যাতি পেয়েছেন দানীবাবু, কিন্তু কোনদিন সেজন্যে অহঙ্কার করেন নি। বরং সবিনয়ে বলেছেন—আমি আর কী অভিনয় করেছি! বাপি আমাকে যা করে শিখিয়েছিল, কেউ তা রাস্তার ধার থেকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনলেও একজন বড় অভিনেতা হয়ে যেত।

হ্যাঁ, গিরিশচন্দ্রকে 'বাপি' বলে ডাকতেন দানীবাবু।

গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েকমাস পরে দানীবাবু মিনার্ভা থিয়েটারের ম্যানেজার হলেন। মিনার্ভার পর তিনি ম্যানেজার হলেন মনোমোহন থিয়েটারে। মাইনে আড়াইশো টাকা। কিন্তু দানীবাবু এই মাইনেয় সন্তুষ্ট নন। কিছুদিন পরে মনোমোহন থিয়েটারের মালিকের সঙ্গে দানীবাবুর নতুন চুক্তি হল। সেই চুক্তিবলে সাব্যস্ত হল—দানীবাবু অর্ধেক শেয়ার পাবেন।

মনোমোহন থিয়েটারে প্রচুর আয় হতে লাগল। আট বছরে নিজের শেয়ারে দানীবাবু পেলেন এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা।

কিন্তু তারপর একদিন হাওয়া-বদল হল। যুগ বদল হল। বাঙলা নাট্য-শালায় নতুন যুগ যিনি নিয়ে এলেন তাঁর নাম শিশিরকুমার ভাদুড়ী। কিন্তু শিশিরকুমারের কথা এখন নয়। আপাতত তিনকড়ির মুখোমুখি হই।

—:০:—

তেরো

এই কলকাতায়ই একটি পাপপঙ্কিল পরিবেশে তিনকড়ির জন্ম। তিনকড়ির মায়ের অবস্থা খুব ভাল নয়, খুব খারাপও নয়। মোটকথা, খাওয়া-পরা একরকম চলে যেত।

তা ছেলেবেলা থেকেই তিনকড়ির নাচগানের দিকে খুব টান। তিনকড়ির মায়ের সখীরা বলত—ওলো, তোর মেয়েটাকে ওস্তাদ রেখে গান শেখা না! ওর গলাটা বেশ মিষ্টি আছে।

কিন্তু মাসে মাসে ওস্তাদের মাইনে জোগান সোজা কথা নয়। বলে নিজেদেরই কষ্টে-সৃষ্টে চলে, তার উপর আবার ওস্তাদের মাইনে। ও হয় না।

তিনকড়িকে নিয়ে তার মা যে-বাড়িতে থাকে সেখানে আরও অনেক ভাড়াটে। তিনকড়িরা থাকে উপরতলার একখানা ঘরে; সেই ঘরের সামনে একফালি বারান্দা; সেই বারান্দার একপাশে রান্নাবান্নার কাজ চলে।

ভাড়াটেদের সকলের অবস্থাই খারাপ। কায়ক্লেশে দুবেলা পেট চলে। কারও-কারও তাও চলে না।

সেই বাড়ির নীচের তলায় একটি মেয়েমানুষ থাকে। তিনকড়ি তাকে 'দিদি' বলে ডাকে। তার অবস্থা খুবই খারাপ। কোন-কোনও দিন একেবারে নিরম্বু উপবাস যায় তার। তিনকড়ি লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার দিয়ে আসে দিদিকে। দিয়ে আসে নিজের খাবারের ভাগ থেকে। চুপ, চুপ। মা যেন টের না পায়।

কিন্তু একদিন হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেল তিনকড়ি। নিজের ভাগ থেকে দিদিকে খাবার দিয়ে উপরতলায় ফিরে আসছে, এমন অবস্থায় তিনকড়ির মা উঁচুগলায় বলল—ওরে হারামজাদি, অন্নসত্র খুলে বসেছিস। তাই তো ভাবি আমার মেয়ের চেহারার অমন দশা হচ্ছে কোত্থেকে। নিজে না খেয়ে খাবারগুলো রোজ রোজ কেন দিস?

তিনকড়ি কেঁদে ফেলল। বলল—রোজ রোজ দিই নাকি। যেদিন আমার অল্প খেলেই পেট ভরে যায়, শুধু সেদিন দিয়ে আসি।

—দেওয়া আমি তোমার বের করে দিচ্ছি। দাঁড়াও। দেখি, তোর সদাব্রত কেমন করে চলে। কাল থেকে তুই আমার সামনে বসে খাবি।

কাঁদতে কাঁদতে তিনকড়ি আস্তে আস্তে বলল—তাহলে দিদি ঠিক না খেতে পেয়ে মরে যাবে।

কে কোথায় না খেতে পেয়ে মরে যাবে, তার জন্যে আরেকজন কেঁদে মরে।

তারপর আরেকটি ঘটনা।

তিনকড়িদের বাড়ির কাছেই এক বাড়িতে কথকতা হচ্ছে। পালা—'সীতার বনবাস'। মায়ের সঙ্গে তিনকড়ি গিয়েছে সেই কথকতা শুনতে। বিনাদোষে শ্রীরামচন্দ্র সীতাকে শাস্তি দিচ্ছেন, তিনকড়ি এটুকু শুনেই তাড়াতাড়ি বাড়িতে পালিয়ে এল। রাজ-রাণী সীতা, তার কিনা বিনা দোষে এই দুর্গতি। শ্রীরামচন্দ্র তো ভগবান, তিনি এত নিষ্ঠুর কেন? সীতার দুঃখে বালিশে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল তিনকড়ি।

পরদিন তিনকড়ির মা বললেন—ঢঙ!

না, ঢঙ নয়। সত্যি।

ন্যাশনাল থিয়েটারে 'রাবণবধ' অভিনয় হচ্ছে। সমস্ত কলকাতা প্রশংসা-মুখর। কত বয়স তখন তিনকড়ির? এগারো-বারো বছরের বেশি না। তিনকড়ির মা যাবে 'রাবণবধ' দেখতে। তিনকড়ি বলল—আমিও তোমার সঙ্গে যাব। থিয়েটার দেখব।

—তুই কোথায় যাবি? না, তুই যাবি না।

তিনকড়ি কিছুতেই ছাড়ে না। তিনকড়ির মাও কিছুতেই ওকে নিয়ে যাবে না। নিরুপায় হয়ে তিনকড়ি কান্না শুরু করে দিল। চোখের জলের জয় হল শেষপর্যন্ত।

পরদিন তিনকড়ি বলল—মা, আমি থিয়েটার করব।

ভাল কথা। কিন্তু তিনকড়ি না জানে নাচতে, না জানে গাইতে। ওকে কে নেবে থিয়েটারে।

একটা কোন উপায় হয় না?

অন্তত পাঁচ-ছ বছর হয় নি। তারপরে একটা সুযোগ হয়ে গেল।

ওদের বাড়ির কাছাকাছি এক ভদ্রলোক থাকতেন। তিনি অভিনয় করতেন স্টার থিয়েটারে। তিনি একদিন তিনকড়িকে নিয়ে গেলেন স্টার থিয়েটারে। হাজির করলেন কর্তৃপক্ষের কাছে। বললেন—এই মেয়েটির মা আমাকে বড্ড ধরাধরি করছে। মেয়েটির নাকি খুব থিয়েটার করার ইচ্ছা। দেখুন তো।

কর্তাদের একজন তিনকড়িকে জিজ্ঞেস করলেন—কী, থিয়েটার করবি?

বুকের মধ্যে ভয়, গলা শুকিয়ে পাথর, তিনকড়ি ঘাড় নেড়ে অতিকষ্টে জবাব দিল—হুঁ।

—ও, আচ্ছা বেশ। রোজ আসিস কাল থেকে। যা, ওদিকে গিয়ে বসে-বসে ছাখ।

ওদিকে 'রূপ-সনাতন' নাটকের মহলা চলছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শেখান হচ্ছে। তিনকড়ি দেখতে লাগল, কেমন করে থিয়েটার করতে হয়।

তিনকড়ি রোজ থিয়েটারে আসে। দেখে। শোনে। ভাবে।

মাসখানেক পরে প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হল তিনকড়ি। অবতীর্ণ হল 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে একটি নির্বাক সখীর ভূমিকা নিয়ে। একটি চামরবীজনকারিণীর ভূমিকা। তারপর 'বিবাহ-বিভ্রাট' প্রহসন। তাতেও তিনকড়ির একটি নির্বাক বাসরসঙ্গিনীর ভূমিকা। 'চোরের উপর বাটপাড়ি' প্রহসনেও তিনকড়ি শুধু পরিচারিকা সেজে জলখাবারের রেকাবি নিয়ে আসে।

'রূপসনাতন' নাটকে একটি সখীর ভূমিকায় প্রথম মুখ ফোটে তিনকড়ির। সেই সখীর ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে একটি গান গাইল তিনকড়ি। গানটির প্রথম কলি—'দেখ লো ঐ রাইয়ের বেণী কাল-ভুজঙ্গিনী'। সেদিন দর্শকেরা খুশী হয়েছিল। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষও খুশী হয়ে তিনকড়িকে পুরস্কার দিয়েছিল একটি টাকা। বলেছিল—নাও, সন্দেশ খেয়ো।

কিন্তু থিয়েটার থেকে পাওয়া প্রথম পুরস্কারের সেই টাকাটা তিনকড়ি নাকি কোনদিন খরচ করে নি। সযত্নে রেখে দিয়েছে। মৃত্যু পর্যন্ত প্রথম পুরস্কারের সেই টাকাটি তিনকড়ি বাঁচিয়ে রেখেছে।

স্টারের পরে আরেকটা থিয়েটারে কিছুদিন কাজ করেছে তিনকড়ি। তার-পরেই বীণা থিয়েটার। সেখানে তিনকড়ির মাইনে সাব্যস্ত হল মাসিক কুড়ি টাকা। সে সময়ের একটা ঘটনা তিনকড়ির নিজের মুখে শুনি:

"আমি তখন বীণা-থিয়েটারে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে অভিনেত্রীরূপে কার্য্য করিতেছিলাম। ঠিক আমার মনে নাই, তবে যতটা মনে আছে তাহাতে আমার মনে হয়, আমার বয়স তখন ষোল কিম্বা সতের বৎসর, তখন বীণা-থিয়েটারে 'মীরাবাঈ' নাটকের অভিনয় চলিতেছিল। এই নাটকে আমি 'মীরাবাঈ'এর ভূমিকা অভিনয় করিতাম। তখন আমি দুই-তিন রাত্রির অধিক মীরার ভূমিকায় অবতীর্ণ হই নাই। সেই সময় একদিন—সেদিন থিয়েটারের বার নহে, আমি থিয়েটারে 'রিহার্সল' দিতে গিয়াছিলাম। যখন বাড়ী ফিরিলাম তখন রাত্রি দশটা কিম্বা এগারটা হইবে। বাটী ফিরিয়া দেখিলাম আমাদের ঘরে দুইটী ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। দুইটীই তরুণ যুবক, চেহারা দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহারা বড় ঘরের দুলাল। বেশভূষার পারিপাট্য যথেষ্ট, তখনকার দিনে নব্যবাবুদের যেরূপ বেশভূষা ছিল তাঁহারা উভয়েই পূর্ণমাত্রায় সেই সাজে সজ্জিত। হাতের অঙ্গুলিতে তিনচারিটা করিয়া আংটী, তাহাতে নীল, লাল, সাদা হরেক রকম পাথর বসান। বুকের উপর মোটা সোণার চেন।

দুইজন অপরিচিত ভদ্রলোককে গৃহের ভিতর বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, আমি গৃহের চৌকাঠের সম্মুখে আসিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। গৃহের ভিতরস্থিত সকলেই আমার পদশব্দে দরজার দিকে চাহিয়া ছিলেন। আমায় দরজার চৌকাঠের বাহিরে থমকাইয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া মা আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'আবার অমন করে দরজার গোড়ায় দাঁড়ালি কেন, ভেতরে আয়। মেয়ে যেন আমার ঢঙ।'

আমি ধীরে ধীরে গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত জড়সড়ভাবে মায়ের পাশটীতে যাইয়া চুপ করিয়া বসিলাম। সেই অপরিচিত ভদ্রলোক দুইটি বেশ তীব্র লালসা-মিশ্রিত দৃষ্টিতে আমার দিকে ঘন-ঘন চাহিতে লাগিলেন। আমি গৃহের ভিতর মায়ের পাশে উপবিষ্ট হইলে, মা সেই ভদ্রলোক দুইটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'এইটী আমার মেয়ে।'

সেই ভদ্রলোক দুইটী লালসা-কষায়িত মহোল্লাসে বলিলেন, 'আপনার মেয়েকে আমরা থিয়েটারে অনেকবার দেখেছি। মীরাবাঈ-এর অভিনয় বড় সুন্দর করে। সে যা-হোক আপনি যা বলছেন তাতেই আমরা রাজি আছি। তবে আমাদের কথা হচ্ছে এই, আপনার মেয়েকে কিন্তু থিয়েটার ছাড়িয়ে দিতে হবে।'

এই ভদ্রলোকটির কথায় আমি এতক্ষণে বেশ বুঝিলাম ইঁহারা কি উদ্দেশ্যে আসিয়া আমাদের গৃহে বসিয়াছেন। সেটুকু বুঝিবার বুদ্ধি আমার তখন বিলক্ষণই

হইয়াছিল। ইঁহাদের দেখিয়া পর্য্যন্তই কেমন আমি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিলাম, তাহার পর ইঁহাদের মুখে থিয়েটার ছাড়াইয়া লইবার কথা শুনিয়া আমার মুখখানি শুকাইয়া অতটুকু হইয়া গেল। তাঁহাদের কথার উত্তরে মা কহিলেন, 'আমার মেয়েটির থিয়েটার করবার বড় বাতিক। আর সবে সেদিন থিয়েটারে ঢুকেছে, যা-হোক শুনছি থিয়েটারে একটু সুখ্যাতিও হয়েছে, তাই এরি মধ্যে ছাড়াতে কেমন মন সরছে না। যা-হোক কিছু মাইনেও পাচ্ছে। তা দেখুন, আপনারা আসা-যাওয়া করুন, থিয়েটার ছাড়াতে আর কতক্ষণ লাগবে।'

তরুণযুগলের মধ্যে একজন এতক্ষণ চুপ করিয়া একটু হেলিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি এইবার উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, 'থিয়েটার না ছাড়ালে কিছুতেই হবে না। আপনার মেয়ে যদি দিনরাত থিয়েটারে থাকে, তাহলে আর আমরা আসি কখন? আপনি দুশো টাকা চেয়েছেন আমরা তা তো দিতে রাজিই আছি, তাছাড়া না হয় আমরা আপনার মেয়ে থিয়েটারে যা মাইনে পায় সেটাও ধরে দিচ্ছি। আপনি আপনার মেয়েকে থিয়েটার ছাড়িয়ে দিন। আর যদি আপনার অবিশ্বাস হয়, আমরা ছ-মাসের টাকাটা অগ্রিম দিতেও রাজি আছি। তবে আমাদের কথা হচ্ছে এই, আপনার মেয়েকে থিয়েটার ছাড়িয়ে দিতে হবে।'

বারবার থিয়েটার ছাড়াইয়া লইবার কথায় এই দুইটা লোকের উপর আমার যেন কেমন রাগ হইতে লাগিল। আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এই দুইটা লোককে কেউ ঘাড় ধরিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয় না? তাঁহাদের কথায়, আমি বেশ বুঝিলাম, মায়ের প্রাণ বেশ একটু নরম হইয়া পড়িল। আমার মায়ের মত স্ত্রীলোক অতগুলা টাকার লোভ কি ছাড়িতে পারেন! তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'কাল তো আপনারা আসছেন, তারপর সে যা-হোক হবে। থিয়েটার ছাড়াবার জন্যে কি আর আটকে থাকবে?'

সেই ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন বলিলেন, 'সে যা-হোক হবে বললে চলছে না। যা হবার এখনই একটা মীমাংসা হয়ে যাক। যদি আপনি আমাদের পাকা কথা দেন তাহলে কালই আমরা টাকাকড়ি নিয়ে আসতে পারি।'

মা বেশ সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'তা আসবেন আপনারা।'

সেই ভদ্রলোক দুইটী বেশ একটু মোলায়েম হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'তাহলে আজকে আমরা আসি, কাল সন্ধ্যের পর টাকাকড়ি নিয়ে আসব। আপনার মেয়ে যেন আবার কাল থিয়েটারে চলে না যায়।'

সেই ভদ্রলোক দুইটী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,

'সেও কি একটা কথা, আপনারা ভদ্রলোক আসবেন, আর ও থিয়েটারে যাবে!'

ভদ্রলোক দুইটী গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন, আমিও যেন দম ফেলিয়া বাঁচিলাম। তাঁহারা এমন কড়া আতর মাখিয়া আসিয়াছিলেন যে তাঁহারা চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু সমস্ত ঘরটা তখন সেই আতরের গন্ধে ভরভর করিতে লাগিল। তাঁহারা চলিয়া যাইবা মাত্র আমি মাকে বলিলাম, 'মা, আমি থিয়েটার কিছুতেই ছাড়ব না, তা তুমি আমায় যাই বল আর যাই কর।'

মা আমার কথার উত্তরে বেশ মিষ্টি কথায় বুঝাইয়া বলিলেন, 'ছি, এমন বেয়াড়াপনা কি করতে আছে! এত বড় একটা দাঁও কি হাতছাড়া করা যায়? ওরা হল মস্ত বড়লোক, ওদের আশ্রয়ে থাকলে তোর আর কি ভাবনা থাকবে? গয়নায় সমস্ত গা একেবারে মুড়ে যাবে। থিয়েটার করে কি এমন চতুষ্পদ প্রাপ্ত হবে বল।'

আমার কিন্তু এক কথা, আমি থিয়েটার ছাড়বো না।

মা আমাকে অনেক রকমে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝিতে না চাওয়ায় শেষে তিনি আমাকে যা তা বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভবী ভুলিবার নহে, আমি কিছুতেই থিয়েটার ছাড়িতে সম্মত হইলাম না। পরদিন প্রভাত হইতে বাড়ীর আর সবাই মিলিয়া একে একে আসিয়া আমাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন, থিয়েটার করিয়া কোনই লাভ নাই, থিয়েটার করিয়া কাহারও দুঃখ ঘুচিতে পারে না ইত্যাদি। আমি কাহারও কথার কোন জবাব দিলাম না, রাত্রি হইতেই একেবারে গুম খাইয়া গিয়াছিলাম। মা আমায় শেষে একথা বলিতেও ভুলেন নাই যে যদি আমি তাঁহার কথার অবাধ্য হই তাহা হইলে তিনি আর আমায় আস্ত রাখিবেন না। মা যদিও আমায় সেদিন দুই শতবার থিয়েটারে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি কাহাকেও কিছু না বলিয়া আমি থিয়েটারে চলিয়া গেলাম। রাত্রে বাড়ী আসিয়া শুনিলাম, সেই ভদ্রলোকেরা সন্ধ্যার পরই আসিয়াছিলেন এবং আমি থিয়েটারে চলিয়া গিয়াছি শুনিয়া তাঁহারা মহাবিরক্ত হইয়া মাকে দুই চারিটি শক্ত কথা শুনাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমার মনে হইল আমার যেন ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল।

আমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া মার নিষেধ সত্ত্বেও থিয়েটারে চলিয়া যাওয়ায় মা রাগিয়া একেবারে আগুন হইয়াছিলেন। আমি বাড়ী ফিরিবামাত্র তিনি একখানা বাকারী দিয়া আমাকে নিদারুণ প্রহার করিলেন। সেই প্রহারে

আমার জ্বর আসিয়া গেল। আমি তিনদিন জ্বরে বেহুস হইয়াছিলাম। জ্বর হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া আবার আমি নিয়মিত থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু উপরিলিখিত ঘটনার পর বহুদিন পর্য্যন্ত মা আমার সহিত ভাল করিয়া কথা কহেন নাই। আমি প্রায়ই শুনিতে পাইতাম, মা তাঁহার সমবয়স্কাদিগকে বলিতেছেন, 'অমন বেয়াড়া মেয়ের মুখ দেখতে আছে? এখন ভালকথা শুনছে না, এরপর শেষে পস্তাতে হবে। আমি তো ওকে আর কোন কথা বলব না, ওর যা ভাল বিবেচনা হয় তাই করুক। আমার কি?'

তথাপি ইহার পরেও মা আমাকে থিয়েটার ছাড়িয়া দিবার জন্য বহুবার বলিয়াছেন। কিন্তু ভগবান তখন আমায় কি সদ্‌বুদ্ধি দিয়াছিলেন জানি না, আমি শত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও কিছুতেই থিয়েটার ছাড়িতে রাজি হই নাই। মাতার অবাধ্য হইবার জন্য প্রহার তো যথেষ্টই খাইয়াছি, এমন কি, একবার মা আমায় দুইতিন দিন কিছু খাইতে পর্য্যন্ত দেন নাই, কিন্তু তবুও আমি থিয়েটার পরিত্যাগ করি নাই। নটনাথের নিতান্ত কৃপায় আমি যে কত কত গুরুতর প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিয়াছি, তাহা কেবল অন্তর্য্যামী জানেন, তাহা বলিয়া শেষ করিবার নহে।"

বীণা থিয়েটারের পরে তিনকড়ি এল এমারেল্ড থিয়েটারে। সেখানে বনিবনা হল না। এমারেল্ড থিয়েটার ছেড়ে দিল তিনকড়ি। চুপচাপ বসে রইল বাড়িতে।

সিটি থিয়েটারের কর্তা নীলমাধব চক্রবর্তী। তিনি এই সময়ে একদিন এলেন তিনকড়ির বাড়িতে। বললেন—চল, আমাদের থিয়েটারে কাজ করবে। মাইনে তুমি এমারেল্ড থিয়েটারে যা পেতে তাই পাবে।

তিনকড়ি এককথায় রাজী। সিটি থিয়েটারে অভিনয় করতে লাগল তিনকড়ি।

সিটি থিয়েটারে তখন 'বিবাহ বিভ্রাট' প্রহসনে ঝিয়ের ভূমিকায় অভিনয় করত জগত্তারিণী। কিন্তু সে-অভিনয় তিনকড়ির অপছন্দ। না, ও ঠিক হচ্ছে না।

একদিন আড়ালে নীলমাধববাবুকে ধরল তিনকড়ি। বলল—যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলতাম আপনাকে।

—কী কথা? বল, নির্ভয়ে বল।

তিনকড়ি বলল—ওই ঝিয়ের পার্টটা বোধ করি ঠিক হচ্ছে না। ওটা আমাকে করতে দিন একদিন !

নীলমাধববাবু হাসলেন। বললেন—খুব শক্ত পার্ট। ও তুমি পারবে না।

কিন্তু তিনকড়ি নিরস্ত হল না। বলল—পারব না? বেশ, আমার মুখে ভূমিকাটি একদিন শুনুন তবে। তারপর যা হয় বলবেন।

বেশ কথা। পরদিন নীলমাধববাবু তিনকড়ির মুখে শুনলেন সেই ঝিয়ের পার্ট। শুনে মুগ্ধ হলেন। যা ভেবেছিলেন, তা হয় নি। যা ভাবেন নি, তাই হয়েছে। নিখুঁত পার্ট করেছে তিনকড়ি।

সেদিন থেকে তিনকড়িই 'বিবাহ-বিভ্রাটে' ঝিয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে লাগল।

দেখতে-দেখতে পুজো এসে গেল। সিটি থিয়েটারের দল অভিনয় করতে গেল কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়িতে।

থিয়েটার হচ্ছে। কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের পাশে বসে আরেকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক থিয়েটার দেখছেন। উনি কে?

আর কে, স্বয়ং গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

অভিনয় শেষ হল। গিরিশচন্দ্র ভিতরে এলেন। থিয়েটারদলের আর সকলের সঙ্গে তিনকড়িও পদধূলি নিল গিরিশচন্দ্রের। এই প্রথম তিনকড়ি মুখোমুখি দেখছে গিরিশচন্দ্রকে!

অন্যান্য কথাবার্তার পর নীলমাধববাবুকে গিরিশচন্দ্র তিনকড়ির সম্পর্কে বললেন। বললেন—ওর চেহারাটি রঙ্গালয়ের উপযুক্ত। ওর গলাতেও সব-রকম স্বর আসে। ওকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়ো, নজর রেখ ওর উপর, ভবিষ্যতে ও বড় অভিনেত্রী হবে। আমার কথা মিথ্যে হবে না।

মিথ্যে হয় নি।

একদিন দুপুরে কে একজন ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হয়েছেন তিনকড়ির বাড়িতে। আপনি কে মশাই? কোত্থেকে এসেছেন? কেন এসেছেন?

—আমি এসেছি গিরিশবাবুর কাছ থেকে। গিরিশবাবু এখন মিনার্ভা থিয়েটারের অধ্যক্ষ। তোমাকে সেই থিয়েটারে নিয়ে যাবার জন্যে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন

স্বয়ং গিরিশচন্দ্রের কাছ থেকে ডাক এসেছে! তিনকড়ি উল্লসিত হল।

—সন্ধ্যের সময় গাড়ি আসবে। যেয়ো তুমি তাহলে।

—যাব।

গাড়ি এল যথাসময়ে। গাড়িতে আর দু চারজন অভিনেত্রী আছে। তিনকড়ি গাড়িতে উঠে বসতেই একজন জিজ্ঞেস করল—তুমি বুঝি ভাই আজ থেকে আমাদের থিয়েটারে ভর্তি হলে? আরেকজন বলল—তুমি আর কোন থিয়েটারে কাজ করেছ ভাই?

মুখ টিপে-টিপে হাসতে লাগল প্রশ্নকর্ত্রীরা। তাদের ভাবখানা—আমরা হলাম গিয়ে বড় থিয়েটারের বড় অভিনেত্রী!

গাড়ি এসে দাঁড়াল মিনার্ভা থিয়েটারের দরজায়। হাসতে-হাসতে দুলতে-দুলতে একে-একে ওরা নেমে গেল গাড়ি থেকে, সকলের শেষে তিনকড়ি নামল আস্তে-আস্তে। সকলের পিছনে সঙ্কুচিত পায়ে থিয়েটারের মধ্যে ঢুকল তিনকড়ি।

সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সেই ভদ্রলোকই জানালেন, গিরিশচন্দ্র এখনও আসেন নি। অপেক্ষা করতে হবে খানিকক্ষণ।

চুপচাপ বসে রইল তিনকড়ি। বড় থিয়েটার, এখানকার হালচালই আলাদা। সীন আঁকা হচ্ছে একদিকে। চার পাঁচজন লোক গোল হয়ে বসে আলাপ-টালাপ চালাচ্ছে একেক জায়গায়। একেকখানা লম্বা কাগজ হাতে নিয়ে অভিনেত্রীরা ঘুরে-ঘুরে পার্ট তৈরি করে যাচ্ছে। পরিপাটি সাজপোশাক, হাতে পানের ডিবা একজন এলেন—কে? ইনি সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী প্রমদা। তিনকড়ির দিকে আঙুল তুলে প্রমদা কাকে যেন জিজ্ঞেস করলেন—এটি কে? নতুন এল আজ?

সেই ভদ্রলোক এলেন। তিনকড়িকে বললেন—চল। গিরিশবাবু এসেছেন।

থিয়েটারের পিছনদিকে একখানা ঘর। সেখানে একখানা চেয়ারে বসে আছেন গিরিশচন্দ্র। তিনকড়ি গিয়ে প্রণাম করল তাঁকে।

আধঘণ্টাখানেক তিনকড়ির সঙ্গে নানাকথা বললেন গিরিশচন্দ্র। শুনতে শুনতে তিনকড়ির মনে হল তার আশা আছে, তার ভবিষ্যৎ আছে। তিনকড়ি সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখল।

তারপর গিরিশচন্দ্র একজন ভদ্রলোককে বললেন—এই মেয়েটির একখানা

এক বছরের এগ্রিমেণ্ট করে নাও। আর কাল থেকে এর বাড়িতে যাতে ঠিকমত গাড়ি যায় তার ব্যবস্থা করে দাও।

এক বছরের জন্যে চুক্তিপত্রে সই করে তিনকড়ি সেদিন বাড়ি ফিরে এল। বাড়ি এসে তিনকড়ির বারবার মনে হতে লাগল—গিরিশবাবু গুরু হবার উপযুক্ত ব্যক্তি। এমন মিষ্টিকথা আমি আর কখনও শুনি নি।

যা-হোক, মিনার্ভা থিয়েটারে কাজে বহাল হল তিনকড়ি। তারপর তিনকড়ির নিজের মুখ থেকে শুনি ঃ

"মিনার্ভা থিয়েটারে কার্য্যে বহাল হইবার পর আমি নিয়মিত প্রত্যহই যথাসময়ে উপস্থিত হইতেছিলাম। পাঁচছয় দিন কাটিয়া গেল, আমি থিয়েটারে কেবল যাইতাম ও চলিয়া আসিতাম। আমাকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিত না, আমিও কাহাকেও কোন কথা বলিতাম না! থিয়েটারে যেখানে 'রিহার্সল' হইত সেইখানে একটি পার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়া একমনে 'রিহার্সল' দেখিতাম ও শুনিতাম। গিরিশবাবুই প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে শিক্ষাদান করিতেন। তাঁহার সেই শিক্ষাপ্রণালী এমন সুন্দর যে অতি সহজেই সকলে তাহা আয়ত্ত করিতে পারিত। আমি বিভোর হইয়া গিরিশবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া তাহাই কেবল দেখিতাম শুনিতাম। পাঁচ ছয় দিন হইয়া গেল, তথাপি কেহ আমাকে কোন ভূমিকা দিল না, ভবিষ্যতে যে দিবে সেরূপ কোন লক্ষণও দেখিতেছিলাম না। কিন্তু সে বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলি নাই। শেষপর্য্যন্ত কি দাঁড়ায় তাহাই দেখিবার জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম। আর রোজই মনে মনে ভাবিতাম ইহারা আমাকে ইহাদের থিয়েটারে লইয়া আসিল কেন? যদি আমাকে কোন ভূমিকাই না দিবেন তবে আমাকে শুধু মাহিনা দিয়া আনিবার প্রয়োজন কি ছিল? আমি প্রত্যহই থিয়েটার হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় এই কথা ভাবিতাম বটে, কিন্তু মীমাংসা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতাম না।

একদিন সন্ধ্যার পর হইতেই 'রিহার্সল' আরম্ভ হইয়াছিল। প্রমদা তখন লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকা 'রিহার্সল' দিতেছিল। গিরিশবাবু বারবার তাহার ভুল সংশোধন করিয়া দিতে ছিলেন; কিন্তু তিনি যেমনটি দেখাইয়া দিতেছিলেন, প্রমদা কিছুতেই আর তেমনটি করিতে পারিতেছিল না। বহুবার ভুল সংশোধন করিয়া দিবার পরও প্রমদার যখন ভুল শোধরাইল না, তখন গিরিশবাবু বেশ একটু বিরক্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'না, তোর দ্বারা এ পার্ট হবার কোন আশা নেই।'

গিরিশবাবু মহাবিরক্তভাবে গম্ভীরমুখে হেট হইয়া বসিলেন। গিরিশবাবুর এই বিরক্তি-গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই বেশ একটু শঙ্কিত হইয়া পড়িল। সকলেই স্তব্ধ, কাহারও মুখে কোন কথা নাই। সমস্ত থিয়েটারটা যেন সহসা ধাক্কা খাইয়া নীরবতার ভিতর ডুবিয়া গেল। কেবল পরস্পর পরস্পরের 'মুখ চাওয়া-চাওয়ি' করিতে লাগিল। মিনার্ভা থিয়েটারে তখন প্রমদাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী! তাঁহার দ্বারা যদি এ পার্ট না হয় তো কাহার দ্বারা হইবে? গিরিশ-বাবুর কথায় প্রমদাও ঠোঁট ফুলাইয়া গুম খাইয়া বসিয়ছিল। তাহার মুখের উপর তখন সে ভাবটা বেশ ফুটিয়াছিল,—তাহার ভাবটা হইতেছে এই যে, 'আমার দ্বারা তো হবে না, দেখি আমার চেয়ে আর কে ভাল করতে পারে?'

গিরিশবাবু কিছুক্ষণ গুম খাইয়া বসিয়া থাকিবার পর সহসা বলিয়া উঠিলেন, 'এর দ্বারা যখন এ পার্ট হল না, তখন সেদিন যে নূতন অভিনেত্রীটি এসেছে তাকে ডাক দেখি, তার দ্বারা একবার চেষ্টা করে দেখা যাক কতদূর কি দাঁড়ায়।'

আমি গিরিশবাবুর অতি নিকটেই বসিয়াছিলাম, কাজেই গিরিশবাবুর সব কথাই আমার কানে বেশ স্পষ্টভাবেই প্রবিষ্ট হইল। আমি এই থিয়েটারে আসিয়া পর্য্যন্ত কোন ভূমিকা পাইতেছিলাম না বলিয়া মনে মনে বেশ একটু দুঃখিত হইয়া পড়িতেছিলাম। সেই সময় সহসা সুকঠিন প্রধান-ভূমিকাটি আমাকে প্রদান করিবার প্রস্তাব শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এত বড় একজন নামজাদা অভিনেত্রী যখন পারিতেছে না, তখন সেই ভূমিকা আমার দ্বারা হওয়া কি সম্ভব হইবে! এই সকল কথা আমি মনে মনে আলোচনা করিতেছি, এমন সময় আমার পার্শ্বেই যে অভিনেত্রীটি বসিয়াছিল সে ইঙ্গিতে আমার গা ঠেলিয়া বলিয়া দিল, 'যাও, গিরিশবাবু তোমায় ডাকছেন।'

আমি ধীরে ধীরে উঠিয়া গিরিশবাবুর সম্মুখে যাইয়া দাঁড়াইলাম। তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তখনও তাঁহার মুখের উপর হইতে সে গাম্ভীর্য্যের ভাব তিরোহিত হয় নাই। তিনি বেশ একটু গম্ভীর স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রমদা এখন যে পার্টটা 'রিহার্সল' দিচ্ছিল সে পার্ট ত শুনেছ? ঐ পার্টটা আমি তোমায় দিতে চাই,—কি বল করতে পারবে?'

আমি থিয়েটারে যেদিন হইতে প্রবিষ্ট হইয়াছি সেইদিন হইতে যখনই আমায় যে পার্ট প্রদান করা হইয়াছে আমি সেই পার্টটি সানন্দে গ্রহণ

করিয়াছি। কোনদিনই বলি নাই—এ পার্টটি আমার দ্বারা হইবে না। কাজেই গিরিশবাবুর কথার উত্তরে আমার দ্বারা হইবে না—একথা আমার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল না। আমি মৃদুস্বরে তাঁহার কথার উত্তরে বলিলাম 'পারবো কি না কি করে বলি বলুন,—তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

গিরিশবাবু প্রমদার নিকট হইতে লেডি ম্যাকবেথের পার্টটা চাহিয়া লইয়া আমাকে দিয়া বলিলেন, 'বল দেখি একটুখানি,—দেখি কেমন বলতে পার?'

আমি গিরিশবাবুর নিকট হইতে কাগজগুলি লইয়া মৃদুস্বরে বলিলাম, 'আমি কাল বলব, আজ আমি রাত্রে সমস্ত পার্টটা একবার ভাল করে পড়ে নেব।'

গিরিশবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'সে বেশ ভাল কথা। সমস্ত পার্টটা আজ রাত্রে বাড়ি গিয়ে ভাল করে পড়ে নিও। কাল আমি তোমায় বলাব।'

আমি লেডি ম্যাকবেথের পার্টটি লইয়া স্বস্থানে আসিয়া বসিলাম। বুকের ভিতর তখন আমার কেমন একটা যন্ত্রণা হইতেছিল, কেননা এই ভূমিকার ভালমন্দ অভিনয়ের উপর আমার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। গিরিশ-বাবু বড় মুখ করিয়া প্রমদার নিকট হইতে পার্ট ফিরাইয়া লইয়া আমাকে প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার সেই মুখ রক্ষা আমাকে যা করিয়া হউক করিতেই হইবে। 'রিহার্সল' ভাঙ্গিবার পর যথাসময়ে আমি বাড়ী ফিরিলাম। বাড়ী যাইয়া তাড়াতাড়ি দুটো খাইয়া লইয়াই আমি সেই পার্টটি লইয়া বসিলাম। বাড়ী ফিরিবার সময় প্রমদা আমাকে টিটকারি দিয়া দুই চারিটি কথা বলিয়া-ছিল,—সেই হইতে আমার কেমন জেদ হইয়াছিল তাহার মুখে চুণকালি লেপিয়া দিতেই হইবে। যেমন করিয়াই হউক এই পার্ট তাঁহার চেয়ে শতগুণে ভাল আমার করিতেই হইবে।

সমস্ত রাত্রের ভিতর আমার একটুকুও ঘুম হইল না। আমি সারারাত্রি জাগিয়া সেই পার্টটি আট দশবার পড়িয়া একরূপ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলাম। প্রমদা যখন লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকাটি 'রিহার্সল' দিত ও গিরিশবাবু যখন তাহাকে বলিয়া দিতেন তাহা আমি প্রত্যহই শুনিতাম। তাহার যেখানে যেখানে ভুল হইত গিরিশবাবু শুধরাইয়া দিতেন সেস্থানগুলিও আমার মনে ছিল। আমি সেইভাবে পাটটী কণ্ঠস্থ করিবার চেষ্টা করিলাম। সমস্ত রাত্রির

চেষ্টায় আমি সেই পার্টটি কতকটা আয়ত্ত করিলাম। পরদিন আমি যখন 'রিহার্সল' দিবার জন্য থিয়েটারে উপস্থিত হইলাম তখনও গিরিশবাবু আসেন নাই, একটু পরেই গিরিশবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার কিছুক্ষণ পরেই পার্ট বলাইবার জন্য আমার ডাক পড়িল। আমি গিরিশবাবুর সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

প্রমদার নিকট হইতে পার্টটি ফেরত লইয়া আমাকে দেওয়া হইয়াছে, সুতরাং আমি কিরূপ বলি সেইটুকু শুনিবার জন্য সেদিন 'রিহার্সল' স্থানে থিয়েটারের সমস্ত লোকই জড় হইয়াছিল। আমি গিরিশবাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, 'বল দেখি তোমার পার্টটি, শুনি কেমন তুমি বলতে পার?'

গিরিশবাবুর আদেশ পাইয়া আমি সেই পার্টটি বলিতে আরম্ভ করিলাম। আগাগোড়া বলা শেষ হইল। নটনাথের কৃপায় আমি গিরিশবাবুর মুখ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। থিয়েটারের সকলকেই একবাক্যে বলিতে হইয়াছিল, না, এ তৈরী হলে এ পার্ট প্রমদার চেয়ে অনেক ভাল করবে।

আমার লেখাপড়া জ্ঞান অতি অল্পই ছিল। কিন্তু সেই অল্প বিদ্যাবুদ্ধি লইয়াই গিরিশবাবুর শিক্ষায় ও কৃপায় আমি লেডী ম্যাকবেথের জটিল ভূমিকা সুন্দররূপে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এই লেডী ম্যাকবেথের অভিনয় করিয়াই আমার অভিনেত্রী জীবনের পথ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছিল।

সেইদিন হইতে আমি লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকা রীতিমতভাবে 'রিহার্সল' দিতে লাগিলাম। গিরিশবাবুও দিনরাত্র প্রভূত পরিশ্রমে আমাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অঙ্গ-ভঙ্গী, চলন-চালন, সমস্তই আমি তাঁহার কৃপায় শিখিতে পারিয়াছিলাম। গিরিশবাবুর ন্যায় শিক্ষক পাইয়াছিলাম বলিয়া, আজ আমি অভিনেত্রী। বঙ্গ-রঙ্গালয়ে আমি বহু অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সহিত অভিনয় করিয়াছি ও করিতেছি, কিন্তু যথার্থ গুরু বলিবার উপযুক্ত লোক আমি গিরিশবাবু ভিন্ন আর কাহাকেও দেখি নাই। নিষ্টকথায় অতি সরলভাবে এমন শিক্ষাপ্রণালী কেবল গিরিশবাবুতেই সম্ভব। কেবল তাঁহারই কৃপায় নিরক্ষর, নির্ব্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানশূন্যা আমিও অভিনেত্রী বলিয়া পরিগণিতা হইয়াছি।

১৮৯৩ সালের ২৮শে-জানুআরী—মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে মহাসমারোহে ম্যাকবেথের

প্রথম অভিনয় হইল। সেদিন রঙ্গালয়ে তিল ধরিবার স্থান ছিল না,—রঙ্গালয় লোকে লোকারণ্য। আমি লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলাম। গিরিশবাবু স্বয়ং ম্যাকবেথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নটনাথের কৃপায় ও নটগুরুর আশীর্ব্বাদে আমি রিহার্সলে যাহা করিয়াছিলাম অভিনয়কালে তাহা আমার আরো উতরাইয়া গেল। দর্শকগণের ঘন-ঘন করতালি বর্ষণে আমার ক্ষুদ্র হৃদয় আনন্দে একেবারে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে আমি সামান্যা অভিনেত্রী তিনকড়ি, আমি একেবারে লেডী ম্যাকবেথে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম।

অভিনয় ভাঙ্গিবার পর গিরিশবাবু আমায় আদরে পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, 'তোমার অভিনয় দেখে এখন আমার মনে হচ্ছে, আমার বই লেখা সার্থক হয়েছে। বাঙ্গালী দেখুক যে, বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চেও অভিনেত্রী আছে। এত সুন্দর এত নিখুঁত অভিনয় যে তুমি করতে পারবে একথা আমিও একবার ধারণা করতে পারিনি।'

গিরিশবাবুর এই প্রশংসাবাদে আনন্দে আমার দুচক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল,—আমি একেবারে নটগুরুর পদতলে লুটাইয়া পড়িলাম। তিনি তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, 'আমি তোমাকে আর বেশি কি আশীর্ব্বাদ করবো,—তবে এই আশীর্ব্বাদ করি যে তুমি যথার্থ অভিনেত্রী হও—এমন অভিনয় কর যে যতদিন থিয়েটার থাকবে ততদিন বাঙ্গালী তোমার কথা ভুলতে না পারে।'..."

'ম্যাকবেথে'র পর 'মুকুল-মুঞ্জরা'। তাতে তারার ভূমিকায় অভিনয় করলেন তিনকড়ি। সেই অভিনয় দেখে গিরিশচন্দ্র বিমুগ্ধ-বিস্ময়ে বললেন—বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে শ্রীমতী তিনকড়িই এখন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী।

'আবুহোসেনে' তিনকড়ির দাইয়ের ভূমিকা। 'জনা'য় তিনকড়িই জনা।

তারপর 'করমেতিবাই' নাটক। গিরিশচন্দ্রের এই নাটকে তিনকড়িকেই দেওয়া হল করমেতির ভূমিকা। করমেতি বিধবা।

কিন্তু 'করমেতিবাই'য়ের প্রথম অভিনয় রাত্রেই নাকি একটা কাণ্ড হয়েছিল।

প্রথম অভিনয় রাত্রি। রঙ্গালয়ে সেদিন প্রচুর দর্শক। থিয়েটার আরম্ভ হবার সময় পার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আরম্ভ হয় কই।

আরম্ভ হবে কি, ওদিকে সাজঘরে যে প্রচণ্ড গোলযোগ আরম্ভ হয়ে গেছে। খান কাপড় পরে বিধবার বেশে তিনকড়ি যে কিছুতেই রঙ্গমঞ্চে উঠতে চাইছে না। করমেতি বিধবা। শাঁখা-সিন্দূর শাড়ি-গয়না পরে তিনকড়ি করমেতির পার্ট করতে চাইছে নাকি? আশ্চর্য কথা।

নানাজনে নানাভাবে বোঝাচ্ছে তিনকড়িকে, কিন্তু তিনকড়ির সেই এক কথা—ও বেশে আমি কিছুতেই বেরোতে পারব না।

এদিকে সময় যে বয়ে যাচ্ছে। দর্শকরা অধৈর্য হয়ে উঠছে। হাততালি দিচ্ছে, শিস দিচ্ছে, কটুকাটব্য করছে। হুলস্থুল কাণ্ড।

মহাবিপদের কথা। গিরিশচন্দ্র ছুটে এলেন ভিতরে। রাগ করে বললেন—এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন অভিনেত্রী দিয়ে আমার কোন দরকার নেই। ও জাতই ওরকম, শিখিয়ে-পড়িয়ে একটু তৈরী করলেই সে মনে করে, আমি বুঝি কি একটা হলাম! যাক্ গে, কাউকে খোশামোদ করতে হবে না। নাপিত ডাক। আমিই আজ করমেতি সাজবো।

তিনকড়ি চুপ।

মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী তখন নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায়। অত্যন্ত রসিক মানুষ। তিনি বললেন—কিন্তু তিনকড়ি আজ বিধবার বেশে নামতে চাইছে না কেন তার কারণটা কেউ খুঁজে দেখেছ? কেউ একবার বাইরে গিয়ে দেখে এস তো বক্সগুলোয় কোন বাধা-বিঘ্ন আছে কি না।

সঙ্গে সঙ্গে একজন ছুটলো বক্সগুলো দেখে আসতে। খবর নিয়ে এল—আজ্ঞে, তিনকড়িবিবির বাবু বক্সে রয়েছেন।

বাবু? একটু বিশদ করি। অভিনেত্রীদের প্রণয়ী কিম্বা গান্ধর্বমতের স্বামীকেই থিয়েটারী ভাষায় 'বাবু' বলে।

তাই বল। তিনকড়িবিবির বাবু বক্সে বসে আছেন!

নাগেন্দ্রভূষণ গেলেন সেই বাবুর কাছে। বিনতভাবে তাকে খুলে বললেন ব্যাপারটা। বললেন—আপনি এখানে থাকলে কিছুতেই বিধবার বেশে করমেতির পার্টে নামবে না তিনকড়ি। এখন আপনি···

তিনকড়িবিবির বাবু হাসলেন। অবাক্যব্যয়ে বাড়ি চলে গেলেন। তিনকড়ির কানে সে-সংবাদ যেতে দেরি হল না। তখন আর কি, অপ্রতিবাদে

যথাযোগ্য সাজে করমেতির ভূমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণা হলেন তিনকড়ি।

সেদিন যারা দেখেছে, তারা অপার আনন্দ পেয়েছে তিনকড়ির অভিনয়ে। বলেছে—এমন অভিনয় আর কখনও দেখি নি।

এই মিনার্ভাতেই তিনকড়ি চিরকাল থাকেন নি। একাধিক থিয়েটারে কাজ করেছেন। জীবনে নানা নাটকে নানা ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তিনকড়ির অভিনেত্রীজীবনের বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ভূমিকা : জনা, করমেতি, অভিমন্যু, সুভদ্রা, গরব, লেডী ম্যাকবেথ, অন্নদা। ওসব ভূমিকা-অভিনয়ে তিনকড়ির তুলনা নেই।

কেবল অভিনয়ে নিপুণ নন, তিনকড়ি প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারিণী। কত তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য, কত তাঁর উদারতা। গিরিশচন্দ্র বলেছেন—শুধু অভিনয়কলায় অলৌকিক নৈপুণ্যের জন্যেই আমি তিনকড়িকে এত পছন্দ করি না, তাঁর হৃদয়ের গুণও যথেষ্ট। সেই গুণেই সে আমাকে এত মুগ্ধ করতে পেরেছে।

সন্দেহ কি, গিরিশচন্দ্রকে মুগ্ধ করতে পেরেছেন তিনকড়ি।

তা এই তিনকড়ির জন্যেই কিন্তু একবার প্রায় প্রাণ যেতে বসেছিল গিরিশচন্দ্রের। ভাগ্যের দয়ায় অবশ্যি শেষরক্ষা হয়েছিল। যার বলবুদ্ধিতে শেষ-রক্ষা হয়েছিল তাঁর নাম রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ঘটনাটা গোড়া বেঁধে বলি।

একজন বড়মানুষ—না, নামে কোন দরকার নেই—নজর দিয়েছেন তিনকড়ির দিকে। তিনকড়ির কাছে তিনি প্রস্তাব পাঠালেন—তুমি থিয়েটার ছেড়ে আমার কাছে এসে থাক। যত টাকা চাও, দেব। যা চাও, দেব।

বড়মানুষ মানে সাংঘাতিক বড়মানুষ। বিস্তর টাকাকড়ি আছে। পয়লা নম্বর লম্পট। তার একখানা বাগানবাড়ি আছে সিঁথিতে। সেখানে মাঝে-মাঝে মাইফেল বসে। সেই মাইফেলে গিরিশচন্দ্র যান, আর সব বাছা-বাছা নটনটীরা যান। রাজেনবাবু গিরিশচন্দ্রের প্রিয়পাত্র। সেই সুবাদে রাজেনবাবুরও নেমন্তন্ন হয়।

যা বলছিলাম। তিনকড়ি বড়মানুষটির প্রস্তাব নস্যাৎ করে দিলেন না, বলে দিলেন—দু-একদিন বাদে ভেবে-চিন্তে বলব।

গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ করলেন তিনকড়ি।

গিরিশচন্দ্র বললেন—না, থিয়েটার ছেড়ে যেয়ো না। থিয়েটারের দৌলতেই

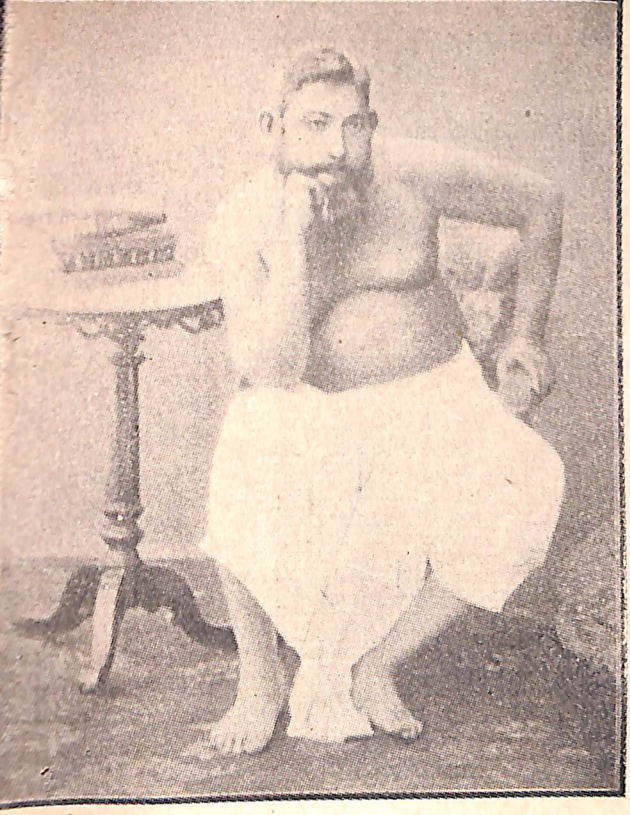

অভিনেতার ধ্যানে গিরিশচন্দ্র



চাণক্যরূপে দানীবাবু

'চিরকুমার সভা'য় রসিক রূপে অপরেশচন্দ্র



তিনকড়ি





আহ্লাদে আটখানা ভাবাভিনয়ে অর্ধেন্দুশেখর



আলমগীর রূপে শিশিরকুমার

তোমার নামযশ টাকাকড়ি। ও বড়মানুষের খেয়ালে তুমি যদি থিয়েটার ছাড় তো টাকাকড়ির দিকে হয়ত তোমার লাভ হবে, কিন্তু আর কোন লাভ হবে না।

তা সেই কথাই তিনকড়ি জানিয়ে দিলেন বড়মানুষটিকে। না, হবে না।

কিন্তু বড়মানুষ কি এত সহজেই হাল ছাড়ে। সোজাপথে হল না, অতএব তিনি বাঁকাপথে গেলেন। ভাবলেন, হঠাৎ কিছু করা নয়, আস্তে-আস্তে পথ পরিষ্কার করতে হবে। ভাবলেন, গিরিশচন্দ্রকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে না দিলে তিনকড়িকে পাওয়া যাবে না। ভাবলেন, গিরিশচন্দ্রকে শেষ করে দিতে হবে।

বড়মানুষ মনের ভাবনা মনে রাখলেন, মুখে পরম ভাল মানুষ সেজে রইলেন। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তার আচার-ব্যবহারে সৌজন্যের একবিন্দু অভাব নেই। আগে যেমন চলত, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তেমনি মাইফেল চলতে লাগল মাঝে-মাঝে।

দু-তিনমাস পরে একদিন আসল কাজের ব্যবস্থা করে ফেললেন বড়মানুষটি। সেদিনও সিঁথির বাগানবাড়িতে মাইফেলের আয়োজন হয়েছে, বন্ধু-বান্ধবদের যথারীতি নেমন্তন্ন করা হয়েছে। কিন্তু না, আজ আর সারারাতব্যাপী ফুর্তি-টুর্তি চলবে না। সারারাত হই-হল্লা করলে শরীর খারাপ হয়ে যায়, অতএব বড়মানুষ আজ নিয়ম করেছেন যে সকলেই রাত বারোটার মধ্যে চলে যাবে।

সকলেই রাত বারোটার মধ্যে চলে যাবে? না। বড়মানুষটি গিরিশচন্দ্রকে বলে রেখেছেন—তা বলে আপনি যেন চলে যাবেন না। একটা বিশেষ গোপন কথা আছে আপনার সঙ্গে।

সিঁথির বাগানবাড়িতে আসর বসেছে। নাচ হচ্ছে। গান হচ্ছে। আসরে আতরদান আছে, গোলাপফুল আছে। খাওয়া-দাওয়ার পরিপাটি ব্যবস্থা আছে। বন্ধু-বান্ধবেরাও সকলেই উপস্থিত। সকলেই উপস্থিত? না, অন্তত একজন এখনও অনুপস্থিত। রাজেনবাবু।

কেন কে জানে, সেদিন রাজেনবাবুর আসতে দেরি হয়েছে। সন্ধ্যার পর রাজেনবাবু বাগানবাড়ির ফটকে ঢুকলেন, ফটকে ঢুকে খানিকটা এগিয়ে এসেই দেখতে পেলেন মস্ত একটা গাছতলায় কয়েকজন গুণ্ডা কী যেন সলা-পরামর্শ করছে। ওদের মধ্যে একজন হাসতে-হাসতে এসে সেলাম করল রাজেনবাবুকে।

রাজেনবাবু বললেন—আরে, গোলাপ সিং যে!

এই গোলাপ সিং এককালে রাজেনবাবুর কাছে কাজ করত। অনেকদিন পরে দেখা, রাজেনবাবু গোলাপের কাঁধ ধরে একটু ঝাঁকুনি দিলেন। গোলাপ সিং কথা কইতে-কইতে রাজেনবাবুকে একটু নিরিবিলিতে নিয়ে এল। বলল—বাবু, একটা কথা বলি, আর কাউকে বলবেন না। আজ রাত বারোটার আগেই এখান থেকে চলে যাবেন, কিছুতেই থাকবেন না কিন্তু।

কেন? ব্যাপার কী?

আসল ব্যাপার গোলাপ সিং কিছুতেই খুলে বলতে রাজী হয় না। খুলে বললে নিমকহারামি হবে। কিন্তু রাজেনবাবুও কিছুতেই ছাড়বেন না—ব্যাপারটা তোমাকে বলতেই হবে।

গোলাপের মুখ থেকেই ব্যাপারটা টের পাওয়া গেল। সাংঘাতিক ব্যাপার। মাইফেলের আড়ালে আজ গিরিশ-হত্যার নিখুঁত আয়োজন করা হয়েছে। এই আয়োজনের কথা বড়মানুষটি নিজে আর তার অধীনস্থ আটজন গুণ্ডা ছাড়া আর কেউ জানে না। ভুল বলা হল। এখন আরেকজন জানেন—রাজেনবাবু।

বহুবার এই বাগানবাড়িতে এসেছেন রাজেনবাবু, এমন কি রাতও কাটিয়েছেন এখানে। তবু আজ একবার ঘুরে-ঘুরে বাড়িখানার চারদিক ভাল করে দেখে নিলেন। এদিকে রাত প্রায় সাড়ে-নটা। উপরে আসর চলছে পুরোদমে।

নীচের বড়ঘরে ঢুকে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন রাজেনবাবু। যেতে যেতে দেখলেন, এখানেও ব্যবস্থার ত্রুটি নেই। সিঁড়ির গোড়ায় চারজন গুণ্ডা মোতায়েন। অর্থাৎ, আজ আর গিরিশচন্দ্রের নিস্তার নেই।

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়লেন রাজেনবাবু। পকেটে হাত দিলেন একবার। যেন কী একটা মূল্যবান বস্তু হারিয়ে গেছে এমনিভাবে পকেট চাপড়াতে চাপড়াতে রাজেনবাবু সিঁড়ির গোড়া থেকে ফিরলেন। পুকুরের ধারের রাস্তা দিয়ে চাকরদের ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন রাজেনবাবু। ফকির কোথায়?

ফকির হচ্ছে একজন চাকরের নাম। গার্ডেনপার্টি অথবা মাইফেল—যেখানেই গিরিশচন্দ্র আর তিনকড়ি যান, ফকির বরাবর তাঁদের সঙ্গে আসে। কোথায় ফকির?

ভাগ্য ভাল বলতে হবে, ফকিরকে ঘাটের ধারে পাওয়া গেল। রাজেনবাবু

আড়ালে ডেকে নিলেন তাকে। বললেন—কোন একটা ছল-ছুতো করে এখনি এখান থেকে বেরিয়ে যা। এখনি একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে তুই এই বাগানের পেছনের গলিটার মোড়ে নিয়ে আয়। যতক্ষণ আমরা কেউ না যাই, তুই গাড়ির কাছ থেকে এক পা নড়বি না। খুব সাবধান।

ফকির চলে গেল। রাজেনবাবু হাঁটতে-হাঁটতে এসে আবার নীচের বড়ঘরে ঢুকলেন, সিঁড়ি পার হয়ে উপরতলায় এলেন। আসর জমজমাট। সেই বড়মানুষটি আসরে বসে আছেন গম্ভীরমুখে। বললেন—এত দেরি যে রাজেনবাবু?

তার পাশে বসলেন রাজেনবাবু। দুচার কথার পর রাজেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কই, ম্যানেজারবাবুকে দেখছি না যে!

ম্যানেজারবাবু মানে গিরিশচন্দ্র।

বড়মানুষটি বললেন—এখুনি উঠে গেলেন, বোধ হয় ছোটঘরে গেছেন। এখুনি এসে পড়বেন। বসুন না, গান শুনুন।

পাঁচসাত মিনিট বসে গান শুনলেন রাজেনবাবু। তারপর উঠলেন। উঠবার আগে গায়ের শালখানা রাজেনবাবু বড়মানুষটির পাশে এমনভাবে ফেলে গেলেন যেন বসবার জায়গাটুকু কায়েমি করে রাখা হল। রাজেনবাবু উঠে এলেন ছোটঘরে। সেখানে গিরিশচন্দ্র আর তিনকড়ি আছেন। সেখানে মদ মাংসের ব্যবস্থা আছে।

গিরিশচন্দ্র মহানন্দে বললেন—এস এস রাজু, এতক্ষণ কোথায় ছিলে হে?

রাজেনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে গিরিশচন্দ্রের হয়তো একটু দুর্ভাবনা হল। বললেন—কী ব্যাপার রাজেন?

রাজেনবাবু বললেন—খুব করে খেয়ে নিন। জীবনে আর তো খেতে হবে না।

—কী সব বলছ রাজু?

সব কথাই খুলে বললেন রাজেনবাবু। বললেন—রাত বারোটার পর আপনি আর তিনকড়ি ছাড়া আর সকলে এখান থেকে চলে যাবে। বিশেষ একটা গোপন কথা বলার অছিলায় আপনাকে যেতে দেওয়া হবে না। আপনাকে গোপনে এখানে খুন করে আপনার লাশ বাগানের একটা গর্তে পুঁতে রাখার জন্যে সেখানে একটা গাছ বসানোর ব্যবস্থা পর্যন্ত পাকা হয়ে আছে। তারপর তিনকড়ি ঠাকরুণের কথা। তা ওর অবশ্যি প্রাণের ভয় নেই।

গিরিশচন্দ্র কি তাহলে এই মুহূর্তে এখান থেকে পালিয়ে যাবেন ?

রাজেনবাবু বললেন—না, সে-উপায় নেই। সিঁড়ির গোড়ায় চারজন গুণ্ডা দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় পালাবেন ? আপনি এখন বন্দী।

শুনে তো তিনকড়ির প্রায় মূর্ছিত হবার দশা। বলা বাহুল্য, গিরিশচন্দ্রও ভয় পেলেন। কী করা যায়।

রাজেনবাবু গিরিশচন্দ্রকে বললেন—যা বলি তাই করুন। তা না হলে নিস্তার নেই।

তারপর রাজেনবাবু তিনকড়িকে বললেন—কেমন অভিনেত্রী আজ বোঝা যাবে। ভালমানুষের মত ওঘরে যাও, ওঘরে আমার শালখানা ফেলে রেখে এসেছি। ওঘরে বসে গান শুনতে-শুনতে আস্তে-আস্তে তুমি আমার শালখানা গায়ে জড়িয়ে নেবে, এমন ভাবে নেবে যেন শীতের জন্যেই তুমি শালখানা গায়ে জড়াচ্ছ, যেন কারও কোন সন্দেহ না হয়, বুঝেছ ?

তিনকড়ির না বুঝবার কথা নয়।

—শালখানা আমার বাবার। তোমাদের জন্যে আমি ওখানার মায়া ছাড়তে পারব না। তারপর যখন আমি ওঘরে ঢুকব, তুমি আস্তে-আস্তে উঠে অন্য দরজা দিয়ে এঘরে চলে আসবে। এমন ভাবে করবে যেন আমাকে ছাখো নি। তারপর যা হবার হবে। যাও, আর কথা নয়।

তিনকড়ি চলে গেল।

রাজেনবাবু গিরিশচন্দ্রকে বললেন—দেখুন, প্রাণ বাঁচানোর একটা মাত্র রাস্তা আছে। এই ঘরখানার পাশের বারান্দার শেষে পায়খানাটার উত্তরদিকে খড়খড়ির গরাদ নেই। ওখান দিয়ে আপনাকে নীচে নেমে যেতে হবে।

রোমহর্ষক উপন্যাসের নায়ককে এরকম কাজ করতে হয়। গিরিশচন্দ্র সভয়ে বললেন—ওকাজ আমি পারব না, বাবা।

তাহলে ? তাহলে তো রাজেনবাবুকেই গিরিশচন্দ্রকে পিঠে নিয়ে নামতে হয়। বেশ, তাই হবে। রাজেনবাবু বললেন—দেখি, আপনাকে বয়ে নিতে পারব কি না।

পরখ করবার জন্যে রাজেনবাবু পাঁজাকোলা করে একবার তুলে দেখলেন গিরিশচন্দ্রকে। পরখ করে ভরসা হল।

কিন্তু তিনকড়ি ? সেই কথাই বললেন গিরিশচন্দ্র—তাহলে তিনকড়ির কী হবে, রাজু !

এখানে রাজেনবাবু একটু রসিকতা করলেন—তার ওই বড়মানুষ ছাড়া গতি নেই।

তারপর বললেন—যদি আপনাকে নিয়ে নামতে পারি তাহলে তিনকড়িকে নিয়েও নামতে পারব।

পায়খানার দিকটা একবার ঘুরে দেখে এলেন রাজেনবাবু। না, কেউ নেই। সবাই আসরে মশগুল হয়ে আছে। এই সুযোগ। ওই খড়খড়ি দিয়ে গিরিশচন্দ্রকে পিঠে নিয়ে একটা আমগাছের ডাল বেয়ে আস্তে-আস্তে পাঁচিলের উপরে এলেন রাজেনবাবু। তারপর গিরিশচন্দ্রকে নামিয়ে দিলেন পাঁচিলের বাইরে। রাজেনবাবু বললেন—আপনি এই গলি দিয়ে নির্ভয়ে সোজা চলে যান, ফকির গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমি তিনকড়িকে নিয়ে আসি।

তিনকড়িকেও একই কায়দায় বাগানবাড়ির বাইরে নিয়ে এলেন রাজেনবাবু। তারপর রাজেনবাবু নিজেও পাঁচিলের উপর থেকে লাফিয়ে পড়লেন গলিতে।

রাত বারোটার আগেই ওঁরা কলকাতায় পৌঁছে গেলেন। সন্দেহ কি, রাজেনবাবুর বলবুদ্ধিতেই সেযাত্রা নিস্তার পেয়েছেন গিরিশচন্দ্র, নিষ্কৃতি পেয়েছেন তিনকড়ি।

জীবনে বিস্তর টাকাকড়ি রোজগার করেছেন তিনকড়ি। বাড়িতে অনেক ভাড়াটে ছিল তিনকড়ির। তারা একবার তিনকড়িকে বলল—তোমার তো টাকার ভাবনা নেই, ঘটা করে বাড়িতে একটা পুজো-টুজো কর।

তিনকড়ি ঘটা করে পুজো করতে রাজী হলেন না। বললেন—ভগবান আমাদের যে হীনস্থানে অতি হীন করে পাঠিয়েছেন, তাতে তাঁকে ডাকবারই আমাদের অধিকার নেই, তবে মন মানে না বলে তাঁকে ডাকতে হয়। এই হীনস্থানে তাঁকে কেমন করে আনি! পুজো এখানে তাঁর যা হবে তা তো জানাই আছে, মাঝখান থেকে লোকে হাসবে, বলবে, 'বেটির ভক্তি দেখে আর বাঁচিনে, আবার ঢঙ করে পুজো করা হয়েছে! এও একটা রোজগারের ফন্দি।' তার চেয়ে আমাদের মত দুর্ভাগাদের তাঁকে মনে-মনে ডাকাই ভাল। অনেক পাপ করেছি বলেই এখানে জন্মেছি, আর ঢঙ করে পাপ বাড়িয়ে লাভ কি।

গিরিশচন্দ্র তিনকড়ির শুধু নটগুরু নন, বলতে গেলে ধর্মগুরুও। তিনকড়ি একদিন গিরিশচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন—অনেক পাপ করেছিলাম তাই এই হীনস্থানে জন্ম হয়েছে। বলতে পারেন, কী কাজ করলে আর এখানে জন্মাতে হবে না?

গিরিশচন্দ্র বললেন—ভগবানের একনাম পতিতপাবন। যদি মনেপ্রাণে তাঁকে ডাকার মত ডাকতে পার তাহলে তিনি নিশ্চয়ই পতিতাকে চরণে আশ্রয় দেবেন।

—তেমন ডাক কী করে ডাকতে হয়? অসংখ্য লোক তাঁকে ডাকে, আমিও রোজ তাঁকে ডাকি, কিন্তু আমার মত দীনাহীনার ডাক কি তিনি শুনতে পান?

গিরিশচন্দ্র বললেন—তাঁর কাছে পাপীতাপী নেই, দীনাহীনা নেই। সকলের ডাক তাঁর কানে সমানভাবে বাজে বলেই তাঁর নাম ভগবান।

অন্তিমমুহূর্ত পর্যন্ত গিরিশচন্দ্রের একথা তিনকড়ি মনে করে রেখেছেন।

অনেকদিন আগের একটা ছোট্ট ঘটনা এখানে নিবেদন করি। সে-সময়ে তিনকড়ি মাঝে-মাঝে এসে মিনার্ভায় অভিনয় করে যেতেন। চুনিলাল দেব তখন মিনার্ভার অধ্যক্ষ ও স্বত্বাধিকারী।

মিনার্ভায় সেদিন 'জনা' হবে। তিনকড়ি জনা সাজবেন। 'জনা'য় সে সময়ে চুনিলাল প্রবীর সাজতেন। কিন্তু সেবার চুনিলাল একজন নতুন অভিনেতাকে বললেন—তুমি প্রবীর সাজ, আমি অর্জুন সাজব।

তাই হল। নতুন অভিনেতা অভিনয়ের দিন যথাসময়ে প্রবীর সেজে গিয়ে মঞ্চে দাঁড়ালেন! কনসার্ট বাজছে। আরেকটু বাদেই অভিনয় আরম্ভ হবে।

জনা সেজে মঞ্চে ঢুকে প্রবীরকে দেখে তিনকড়ি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এ কি! চুনিলাল কই? এ যে দেখি অচেনা-অজানা নতুন মুখ। নতুন অভিনেতাকে তিনকড়ি জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কে?

উত্তর হল—আমি প্রবীর।

তিনকড়ি বললেন—কেন? চুনিবাবুর কী হয়েছে?

নতুন অভিনেতাটি বললেন—চুনিবাবু অর্জুন সাজবেন।

—তা তো কথা ছিল না।—বলে তিনকড়ি তাড়াতাড়ি গেলেন চুনিলালের খোঁজে। এদিকে অভিনয় আরম্ভ হতে দেরি হয়ে যাচ্ছে, সমানে কনসার্ট বেজে যাচ্ছে। প্রবীররূপী নতুন অভিনেতাটি একভাবে স্তব্ধ হয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন। যাক, তিনকড়ি ফিরে এলেন। আড়ালে কার সঙ্গে কী কথা হয়েছে কে জানে

তিনকড়ি নতুন অভিনেতাটির সামনে বিরক্ত গলায় বললেন—নতুন লোকের সঙ্গে প্লে করা ঝকমারি।

তিনকড়ি যাই বলুন, নতুন অভিনেতা চমৎকার অভিনয় করলেন। নাম কি এই নতুন অভিনেতার? অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। উত্তরকালের বাঙলা নাট্যশালার একজন দিকপতি।

—:::◦:::—

চোদ্দ

থিয়েটার-পাড়া অর্থাৎ বিডন স্ট্রিটের কাছাকাছি বাড়ি ; মাঝে-মাঝে থিয়েটার দেখার সুযোগ জুটে যেত। আস্তে-আস্তে থিয়েটারের ওপর প্রচণ্ড টান হল। ইচ্ছা করে, রোজই থিয়েটার দেখি।

কিন্তু সে-ইচ্ছায় সায় দেবে কে। বিশেষত, অপরেশচন্দ্র তখন অল্পবয়সী, ছাত্র। ঘন-ঘন থিয়েটার দেখবার পয়সা কোথায় ?

নিজের ইচ্ছার জোরেই হোক কিম্বা ভাগ্যবলেই হোক, একটা চমৎকার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

বেঙ্গল থিয়েটারে তখন ঘটা করে 'প্রহ্লাদচরিত্র' অভিনীত হচ্ছে। প্রত্যেক রবিবার অপরাহ্ণে 'প্রহ্লাদচরিত্র' হয়। প্রায় প্রত্যেক রবিবারেই অপরেশচন্দ্র বন্ধুদের সঙ্গে বেড়ানোর নামে জুত করে থিয়েটার মায় থিয়েটারের অন্দরমহল পর্যন্ত দেখে আসে।

একজন হাড়ি কি ডোমের বাড়ির সীমানায় একটা ভাঙা পাঁচিল ; সেই পাঁচিলের পুবদিকেই বেঙ্গল থিয়েটার। ভাঙা পাঁচিলটির মালিক একজন বৃদ্ধা। তাকে নগদ দুটো পয়সা দিলেই পাঁচিলের উপর বসে থিয়েটার দেখতে দেয়। পাঁচিলটির আরও মজা আছে। পাঁচিলের উপর থেকে থিয়েটারের সদর-অন্দর পরিপাটি করে দেখা যায়।

নিতান্ত বালককালে অপরেশচন্দ্র বহুদিন ওই পাঁচিলের উপর থেকে বন্ধুদের সঙ্গে মহানন্দে 'প্রহ্লাদচরিত্র' দেখেছে। পাঁচিলের উপর থেকে একসঙ্গে দেখেছে থিয়েটারের সদর-অন্দর। দেখেছে, নারদ কেমন সুন্দর হুঁকোয় দম দিয়েই ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে স্টেজে ঢুকছেন।

মাঝে-মাঝে অবশ্যি এক-আধটু বিপদও হতো। কখনও-কখনও কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী ওদের হুঁকোর জল ঢেলে দেবার ভয় দেখিয়েছে। তখন, বলা বাহুল্য, পাঁচিল ছেড়ে অপরেশচন্দ্রকে সদলে অবাক্যব্যয়ে পালাতে হয়েছে।

তারপর একদিনের ঘটনা শুনুন।

অপরেশচন্দ্রের তখন বছর ষোলো বয়স।

বহুদিন বাদে রাস্তায় হঠাৎ এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে দেখা। নাম সুরেন্দ্রনাথ রায়। যথাবিহিত সাদর-সম্ভাষণের পর অপরেশচন্দ্র জিজ্ঞেস করল—কোথায় যাচ্ছিস ?

বন্ধুটি উত্তর দিল—আড্ডায়।

আড্ডা ! কিসের আড্ডা ! গাঁজার নাকি ?

অপরেশচন্দ্রের অজ্ঞতায় বন্ধুটি হেসে উঠল। বলল—থিয়েটারের আড্ডা।

—থিয়েটারের আড্ডা ? তুই পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিস নাকি ?

না, বন্ধুটি পড়াশোনা ছেড়ে দেয় নি। সে কলেজেও যায়, থিয়েটারের আড্ডায়ও যায়।

বন্ধুতে-বন্ধুতে দিব্যি কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় পেছন থেকে এক ঝাঁকামুটে অপরেশচন্দ্রের বন্ধুকে বলল—বাবু, কেতনা ঘড়ি দের্ করেগা ?

ঝাঁকামুটের ঝাঁকায় বায়া-তবলা।

বন্ধুটি অপরেশচন্দ্রকে বলল—এই ছাখ বায়া-তবলা, আড্ডায় বাজান হয়। জোড়াসাঁকোয় ছাইতে দিয়েছিলাম, নিয়ে যাচ্ছি। তুই কোথায় যাচ্ছিস ?

অপরেশচন্দ্র বলল—বেড়াতে যাচ্ছি।

বন্ধুটি বলল—আর বেড়াতে যায় না। চল, আমাদের আড্ডা দেখে আসবি।

কিন্তু আড্ডা ভদ্রলোকের যাবার জায়গা নয়, অপরেশচন্দ্রের সে-জ্ঞান আছে। —আড্ডায় আবার ভদ্রলোক যায় !

বন্ধুটি বিন্দুমাত্র রাগ করল না। শান্তভাবে বলল—না রে, সে রকম আড্ডা নয়, সত্যিই ভদ্রলোকের আড্ডা। কেউ নেশাখোর বা ছোটলোক নেই, সবাই ভদ্রলোক, সবাই শিক্ষিত। তাসপাশা না খেলে বিকেলে ঘণ্টা দুই অ্যাকটিং চর্চা করা যায়, মন্দ কি। ··চ' না, কথা কইতে-কইতে যাই, বেশি দূরে নয়।

কথা কইতে-কইতে আড্ডায় এসে পৌঁছল ওরা দুজন। শ্যামপুকুরের ধারে একটা বাড়ির দোতলায় এই আড্ডাস্থল। একটা হলঘর, চারদিকে শার্সি খড়খড়ি দেওয়া জানালা, ঘরের মেজেয় দু-খানা লম্বা মাদুর পাতা, সামনে টানা বারান্দা। ওরা দুজন যখন পৌঁছল, তখন একজন ভদ্রলোক বারান্দায় তামাক সাজছেন, আরেকজন ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে উচ্চকণ্ঠে গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটক 'চণ্ড' পড়ছেন।

ঝাঁকামুটের মাথা থেকে বায়া-তবলা নামিয়ে বন্ধুটি বলল—মশাই, একজনকে ধরে এনেছি। চেহারাটা যা-হোক মন্দ নয়, দেখুন দেখি কিছু বলতে পারে কি না।

অপরেশচন্দ্র চুপচাপ মাদুরে বসল। পাঠমগ্ন ভদ্রলোক বই থেকে চোখ তুলে অপরেশচন্দ্রের বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন—একেবারে নতুন, না অভ্যেস আছে?

বন্ধুটি বলল—না মশাই, সুবোধ ছেলে, কথাই কয় না। অনেকদিনের পর রাস্তায় দেখা, ধরে নিয়ে এলাম। দেখুন না যদি ঘষে-মেজে কিছু করে নিতে পারেন—দল তো পুরু করা চাই!

ভদ্রলোক বললেন—তা তো বটেই। আর নতুনই তো পরে পুনো হয়।

কথাবার্তা হচ্ছে, এর মধ্যে পাঁচ-ছজন আড্ডাধারী আড্ডায় এসেছেন। আড্ডায় বসেছেন।

যে-ভদ্রলোক 'চণ্ড' পড়ছিলেন, কথাবার্তা বলছিলেন, তিনি কে? আড্ডায় তাঁর কোন্ ভূমিকা? বন্ধুটি অপরেশচন্দ্রকে বলল—ইনিই রিহার্সাল-মাস্টার। অমৃত মিত্তিরের অ্যাকটিং তো শুনেছিস, আর শোন দেখি এঁর গলা!

রিহার্সাল-মাস্টারের নাম মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত। ইনি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভাইঝির ছেলে। পরমহংসদেবের একজন বিশিষ্ট ভক্ত। রিহার্সাল-মাস্টার 'চণ্ড' বইখানা অপরেশচন্দ্রের হাতে দিলেন। বললেন—একটু পড় দেখি।

যিনি বারান্দায় বসে তামাক সাজছিলেন, তিনি ততক্ষণে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছেন। অন্যান্য আড্ডাধারীরাও অপরেশচন্দ্রের পড়া শুনবার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠেছেন। অপরেশচন্দ্র 'চণ্ড' থেকে গড়গড় করে কয়েক পংক্তি পড়ে গেল।

রিহার্সাল-মাস্টার বললেন—এতে তো গলার ওজন বোঝা যাবে না, তুমি আমার সঙ্গে একবার চেঁচিয়ে বল দেখি।

একা-একা পড়া এককথা, কিন্তু আরেকজনের গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে পড়া আরেক। অপরেশচন্দ্র ইতস্তত করতে লাগল। অপরেশচন্দ্রের সঙ্কোচ দেখে বন্ধুটি ধমক দিয়ে উঠল—লজ্জা কি, বল না, মেয়েমানুষ তো নোস!

অপরেশচন্দ্র তথাপি চুপ। বন্ধুটি তখন অপরেশচন্দ্রের সামনে এসে দাঁড়াল; অপরেশচন্দ্রকে উৎসাহ দেবার জন্যে বলল—এই ত্যাখ, আমি বলছি:

কি বলিব মন্ত্রিবর, বিদরে হৃদয়
বলিতে সে সব কথা, তপ্ত লৌহসম
ধমনীতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়।

বন্ধুটি কুণ্ঠী কণ্ঠে ত্রিসপ্তমসুরে আবৃত্তি করে যাচ্ছে। প্রত্যেক ছত্রে পর্দায়-পর্দায় গলা চড়িয়ে 'বিদরে হৃদয়' বলে চিৎকার করতে লাগল বন্ধুটি।

রিহার্সাল-মাস্টার বন্ধুটিকে ধমক দিয়ে উঠলেন—থাম, থাম। তোকে আর চেঁচাতে হবে না।

এককথায় বন্ধুটি থামল না। বার দুই 'বিদরে হৃদয়' 'বিদরে হৃদয়' বলে তারপর চুপ করল।

রিহার্সাল-মাস্টার অপরেশচন্দ্রকে বললেন—তুমি একবার চেঁচিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে বল তো। তোমার গলাটা শুনে নিই।

তখন অপরেশচন্দ্র যথাসম্ভব উচ্চকণ্ঠে রিহার্সাল-মাস্টারের সঙ্গে দুচার ছত্র আবৃত্তি করল। অপরেশচন্দ্রের কণ্ঠস্বরের তারিফ করলেন রিহার্সাল-মাস্টার। বললেন—বেশ মিষ্টি গলা।

সেদিন থেকেই এই আড্ডার একজন নিয়মিত সভ্য হয়ে গেল অপরেশচন্দ্র।

গলা তৈরি না হলে বড় অভিনেতা হওয়া যায় না। কিন্তু শ্যামপুকুরের এই আড্ডায় গলা সাধা অসম্ভব, কেননা এই আড্ডার চতুর্দিকে ভদ্রলোকের বাড়ি। গলা সাধার নামে হবু-অভিনেতাদের পরিত্রাহি চিৎকার আশে-পাশের ভদ্রলোকদের নির্বিবাদে সহ্য করবার কথা নয়। তাহলে উপায়?

উপায় একটা বের করা হল। গলা সাধার জন্যে একটা নিঝঞ্ঝাট স্থান আবিষ্কার করা গেল। নতুন খালের ধারে পোলের নীচে সিমেন্ট দিয়ে খানিকটা পোস্তা বাঁধানো। চতুর্দিকে মাঠ, বন। গলা সাধার পক্ষে অতীব চমৎকার জায়গাটা।

গলা সাধার জন্যে বই ঠিক হল—'পলাশীর যুদ্ধ'। খাওয়া-দাওয়া সেরে দুপুরবেলা আড্ডার দলটা যায় খালের ধারে পোলের নীচে। দলের সঙ্গে থাকে হুকো, কল্কে, তামাক আর এক কুঁজো খাবার জল। হ্যাঁ, অপরেশচন্দ্র এই দলের একজন নিয়মিত সভ্য। সারাদুপুর গলা সাধার কসরত চলে। প্রাণপণে চিৎকার করতে হয়—দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে দাঁড়ার যবন!

গলার শির ফুলে যায়, ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে যায়, কিন্তু গলা সাধা থামান যায় না—দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে দাঁড়ারে যবন!

নতুন খালের মাঝিরা নৌকো থেকে অবাক হয়ে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, কখনও কখনও নৌকো ছেড়ে উঠে এসে দল বেঁধে ওদের ঘিরে দাঁড়ায়। স্বরসাধকেরা মাঝির দলকে শ্রোতা বিবেচনা করে দ্বিগুণ উৎসাহে চিৎকার করে—দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে দাঁড়ারে যবন।

দিনের পর দিন সারাদুপুর চলতো এই গলা সাধার কসরত। তারপর সন্ধ্যাকালে শ্যামপুকুরের আড্ডায় ফিরে এসে 'ফাইন অ্যাক্টিং' আরম্ভ হত।

শুধু অভিনয় শিখে কী হবে, যদি না একটা থিয়েটারবাড়ি পাওয়া যায়? কিন্তু থিয়েটারবাড়ি যোগাড় করা কি মুখের কথা! তার জন্যে টাকা চাই। টাকা কোথায়। কে টাকা দেবে।

অতএব, তক্কে-তক্কে থাক। দলের মধ্যে টেনে নিয়ে এস একজন টাকাঅলা লোক। ছাখো, কাকে ধরলে টাকা পাওয়া যাবে, একটা থিয়েটারবাড়ি যোগাড় করবার সুরাহা হবে।

অপরেশচন্দ্রের একজন বাল্যবন্ধুকে অবশেষে পাকড়াও করা গেল। কার্যোদ্ধারের পক্ষে বাল্যবন্ধুটি নিঃসন্দেহে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি।

বীণা থিয়েটার তখন ফাঁকা পড়ে আছে। সেই রঙ্গালয়টিই ভাড়া নেওয়া গেল। বীণা থিয়েটার ভাড়া নিয়ে শ্যামপুকুরের আড্ডার দল দেখা করল রাজকৃষ্ণ রায়ের সঙ্গে। তিনি এদের একবিন্দু উৎসাহ দিলেন না। বললেন—দেখুন, আপনারা ছেলেমানুষ; থিয়েটার না করাই ভাল। কারণ জায়গাটা খুব স্বাস্থ্যকর নয়। পরকালে নরক আছে শুনেছেন তো? ইহকালের নরক হল এই থিয়েটার। তবে তফাত এই, পরকালের নরক দুঃখের, আর ইহকালের এ নরক সুখের নরক! দুঃখের নরকে রক্ষা আছে, কিন্তু সুখের নরকে কোন কালেই নিষ্কৃতি নেই।

যা-হোক, বীণা থিয়েটার তো ভাড়া নেওয়া গেল। পৌষমাসের এক সন্ধ্যা বেলা শ্যামপুকুরের আড্ডার দল বীণা থিয়েটারে এসে ঢুকল। পথ স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। পরিত্যক্ত নাট্যশালাটি দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন। স্টেজের একপাশে একটা ভাঙা হারমোনিয়ম, দলের কে একজন সেটা টেনে নিয়ে মহোৎসাহে বাজাতে আরম্ভ করে দিল। উৎসাহের আতিশয্যে দলের কেউ সীন ধরে টানাটানি করে, কেউ দু-পা নেচে নেয়। থিয়েটারবাড়ির বুড়ো দারোয়ানের কাছ থেকে সমস্ত চাবি পাওয়া গেল, দখল পাকা হয়ে গেল।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। কিছুই দেখা যায় না। বুড়ো দারোয়ানকে আলোর

কথা বলতে সে একটা কেরোসিনের ডিবা এনে দিল। সাব্যস্ত হল, আজ আর বাড়ি গিয়ে কাজ নেই, এখানেই রাত কাটুক। দলের একজন তার বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে এল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে রাত দশটা বেজে গেল। খাওয়া-দাওয়ার পর দলের অনেকেই বাড়ি ফিরে গেল, কেবল তিনজন গেল না। অপরেশচন্দ্র আর দু-জন।

পৌষ মাসের প্রচণ্ড শীত, হুহু করে হাওয়া বইছে, বিছানা নেই। বুড়ো দারোয়ান একটা ছেঁড়া মাদুর দিয়ে গেল। কিন্তু কার সাধ্য দু-চোখের পাতা এক করে। অসংখ্য মশা!

রঙ্গমঞ্চে মশা, অডিটরিয়মে ইঁদুর। অডিটরিয়মে স্তূপাকৃতি বেঞ্চি আর ভাঙা চেয়ার। এই পরিবেশে কার ঘুম আসে! ঘুমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে তিনজনে উঠে বসল, ঘনঘন খেলো হুঁকোয় দা-কাটা তামাক টানতে লাগল। তিনজনেই বসে-বসে স্বপ্ন দেখতে লাগল—এই স্টেজে এরা অভিনয় করবে, এই অডিটরিয়মে শত-শত দর্শক মুগ্ধ হয়ে এদের অভিনয় দেখবে!

রাত দুটো কি তিনটে বাজল। পৌষের রাত্রের হুহু হাওয়া বইছে, পাতলা ব্যাপারে শীত মানে না। দা-কাটা তামাক ফেল হয়ে গেছে, শীতের দাপটে শরীরে কাঁপুনি উঠেছে। শরীর একটু গরম করবার উপায় কি।

উপায় ধাঁ করে মাথায় এসে গেল, মনে পড়ে গেল খালের ধারে পোলের নীচে গলা-সাধার কথা। আচ্ছা, একটু গলা সেধে দেখা যাক রক্ত গরম হয়ে শীত কমে কি না। পৌষ মাসের রাত্রের সেই শেষ প্রহরে তিনজনে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল—দাঁড়ারে দাঁড়ারে ফিরে দাঁড়ারে যবন!

কেরোসিনের ডিবার আলোটি অনেকক্ষণ আগে নিবে গেছে। পরিত্যক্ত নাট্যশালার বিষম অন্ধকারে তিনজন যুবক উচ্চকণ্ঠে তন্ময় হয়ে যবনকে ফিরে দাঁড়াতে বলছে!

কিন্তু যবনের বদলে অকুস্থলে এসে দাঁড়াল একজন পাহারাওয়ালা। তিনজন স্বরসাধকের মুখের উপর হাত-লণ্ঠনের আলো ফেলে পাহারাওয়ালা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পাহারাওয়ালা প্রতিরাত্রে এখানে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে নিজের 'ডিউটি' করে। আজ পাহারাওয়ালার ডিউটিতে ব্যাঘাত হচ্ছে।

অপরেশচন্দ্র পাহারাওয়ালাকে বলল—জমাদার সাহেব, আমরা অ্যাকটিং করতা হায়। তোম এত রাত্রে কি মনে করে আয়া?

দিনের পর দিন গেল, উদ্যোগ-আয়োজনে কোথাও কোন ত্রুটি রইল না। বিস্তর রিহার্সাল দেওয়া হল, প্লাকার্ড বের করা হল, অনেক সাজ-সরঞ্জাম তৈরি হল, কিন্তু হায়, থিয়েটার খোলা হল না। সর্বনাশ হল। এই দলের যিনি স্বত্বাধিকারী তিনিই অদৃশ্য হয়েছেন না, স্বত্বাধিকারীর কোন দোষ নেই। তাঁর অভিভাবকেরা থিয়েটারের কথা টের পেয়ে তাঁর থিয়েটার আসাই বন্ধ করে দিয়েছেন। স্বত্বাধিকারীর অভাবে দলের মধ্যে গোলমাল আরম্ভ হয়ে গেল, টাকার টানাটানি দেখা দিল, বাড়িভাড়া বাকি পড়ল, থিয়েটারবাড়িটি হাতছাড়া হয়ে গেল, এবং শেষপর্যন্ত, দুঃখের কথা, দলটি ভেঙে গেল।

দল ভাঙল, কিন্তু অপরেশচন্দ্র ভাঙলেন না। কয়েকমাস পরে অপরেশচন্দ্র অভিনয় শিখবার জন্যে গেলেন মহেন্দ্রলাল বসুর কাছে। মহেন্দ্রলাল তখন এমারেল্ড থিয়েটার ইজারা নিয়ে চালাচ্ছেন। অধিকাংশ সময় মহেন্দ্রলালের বাড়িতে গিয়ে অপরেশচন্দ্র অভিনয় শেখেন।

সে-সময়ের এমারেল্ড থিয়েটারের অন্দরমহলের একটু খবরাখবর করি।

সন্ধ্যার আগে অভিনেত্রীরা এসে গানের মহলায় বসে। সন্ধ্যায় রিহার্সাল আরম্ভ হয়। সন্ধ্যার পর বাবুদের আগমন ঘটে। স্টেজে মাদুর পেতে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা একসঙ্গে বসে। গড়গড়ায় তামাক চলে। হাতে-হাতে পানের খিলি। আর যদি গলা ভেজানোর দরকার হয় তো মধ্যে-মধ্যে উইংসের আড়ালে যেতে হয়—মদের ব্যবস্থা আছে সেখানে। রাত বেড়ে উঠলে উইংসের আড়াল থেকে বোতল-গেলাস সটান স্টেজের উপর চলে আসে। আসরে খিস্তি-খেউড়েরও খুব কার্পণ্য নেই। একটা উদার বিশৃঙ্খলা।

রিহার্সাল কিম্বা অভিনয় সাঙ্গ হলেও দু-চারজন অভিনয়শিল্পীর বাড়ি যাওয়ার নাম নেই। কী হবে এত রাত্রে বাড়ি গিয়ে। তার চেয়ে এখানেই অষ্টপ্রহর থাক, ছোট কল্কের বড় তামাক খাও, মদে টুপ-ভুজঙ্গ হও। নেশায় কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না, কেউ ভাঙা বেঞ্চে বসে আছে, কেউ স্টেজের একপাশে ধ্যানস্থ। আরেকজন গাড়িবারান্দার নীচে কেন? বলবেন না মশাই, পাহারাওয়ালা ওকে ওখানে ফেলে রেখে গেছে।

পরদিন বেলা বারোটা নাগাদ নেশাখোরদের চৈতন্য হল। শরীরের এখন যা শ্রী, বাড়ি যাওয়া যায় না। কিন্তু পকেটে তো কানাকড়িও নেই, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কোথায় হবে? চল, ম্যানেজারের বাড়ি যাই। ম্যানেজারের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার থিয়েটারে। সারাদুপুর থিয়েটারেই বিশ্রাম।

বিকেলে অভিনেত্রীদের নিয়ে আসবার জন্যে থিয়েটার থেকে গাড়ি যাচ্ছে, মহাপ্রভুরাও বিশ্রামপর্ব সেরে সাজগোজের যোগাড়ে লাগলেন। মাথা ধুয়ে এসে টেরি কাটলেন, কোঁচানো কাপড় পরলেন, পায়ে পাম্পশু দিলেন, গায়ে ডবলব্রেস্ট শার্টের উপর বুকখোলা ওয়েস্টকোট চাপালেন, পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা করলেন—এককথায় পুরোপ ক্কা নটবর হয়ে রইলেন।

বলা বাহুল্য, সমস্ত অভিনেতার সঙ্গেই এই বর্ণনার মিল নেই। কিন্তু সকল দলের মধ্যেই, বলা বাহুল্য হবে না, এ রকম দু-চারজন অভিনেতা অনায়াসলভ্য।

একেকদিন অপরেশচন্দ্র শিক্ষার্থী হিসেবে এমারেল্ডের রিহার্সালের আসরে আসতেন। একদিন সেখানে একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল। সেদিন অপরেশ-চন্দ্র নতুন একখানা আলোয়ান গায়ে দিয়ে রিহার্সালের আসরে এসেছেন। একজন বিখ্যাত অভিনেতা, নাম বলা যাবে না তাঁর, অপরেশচন্দ্রকে বললেন—তোমার আলোয়ানখানা একবার দাও তো ভাই। আমি চট করে ঘুরে আসি।

অবাক্যব্যয়ে অপরেশচন্দ্র আলোয়ানখানা খুলে দিলেন। বিখ্যাত অভিনেতা আলোয়ানখানা নিয়ে চট করে ঘুরে আসতে গেলেন।

গেলেন তো গেলেন, আর ফিরে আসবার নামগন্ধ নেই। রিহার্সাল ভাঙল, আসর প্রায় শূন্য, রাত বারোটা বেজে গেল, অপরেশচন্দ্র বসে রইলেন।

মহেন্দ্রলাল অপরেশচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি যে এখনও বসে আছ?

অপরেশচন্দ্র আলোয়ানের কথা খুলে বললেন মহেন্দ্রলালকে। সব শুনে মহেন্দ্রলাল বললেন—এই মাটি করেছে! আলোয়ান কি আর ফেরত পাবে! সেটা এতক্ষণে মদের দোকানে জমা হয়ে গেছে।

—বলেন কি?

—আর কি। তা যাক, আজ আর কষ্ট করে কাজ নেই, কাল দুপুরে তুমি একবার···

পরদিন দুপুরে মহেন্দ্রলালের কথামত অপরেশচন্দ্র সেই বিখ্যাত অভিনেতার খোঁজে যেখানে গেলেন সেটা ভদ্রলোকের এলাকা নয়। যথাস্থানে সেই বিখ্যাত অভিনেতার দেখা পাওয়া গেল। যথাস্থানে সেই বিখ্যাত অভিনেতা বহাল তবিয়তে বিরাজ করছেন। আশ্চর্য, অপরেশচন্দ্রকে দেখে তিনি বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত হলেন না, বললেন—আরে, এস, এস; ভাগ্যিস আলোয়ানখানা এনে ছিলাম, তাই এখানে পদার্পণ হল!

অপরেশচন্দ্রের আলোয়ানখানা আদায় হয়েছিল। কিন্তু কী উপায়ে হয়েছিল, দয়া করে কেউ সে-প্রশ্ন করবেন না।

অপরেশচন্দ্রের কিছুই ভাল লাগছিল না—বাড়ি না, এমারেল্ড থিয়েটার না, বোধ হয় কলকাতাও না। কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন অপরেশচন্দ্র। পশ্চিমের দিকে। প্রায় আটমাস বাদে আবার কলকাতায় ফিরে এলেন, দেখলেন সেই পুরোনো ভাঙা দলে আবার জোড়া লেগেছে, আবার চলছে রিহার্সাল, আবার দেখা যাচ্ছে সাধারণ রঙ্গালয়ের স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্নই !

বছরের পর বছর কেটে গেল, আখড়ার পর আখড়ায় মহলা দেওয়া হল, শখের থিয়েটারও করা গেল কখনও-কখনও, কিন্তু অপরেশচন্দ্র এখনও কোন সাধারণ রঙ্গালয়ের সংস্রবে আসতে পারলেন না।

মনোমোহন পাঁড়ে অপরেশচন্দ্রের বাল্যবন্ধু। একদিন মনোমোহনই অপরেশ-চন্দ্রকে মিনার্ভায় নিয়ে এলেন। দিনরাত্রির অধিকাংশ সময় অপরেশচন্দ্র থিয়েটারেই থাকেন, নানারকম কাজকর্ম করেন। অপরেশচন্দ্র প্রায় বারোবছর পর্যন্ত সাধারণ রঙ্গালয়ের স্বপ্ন দেখেছেন; সে-স্বপ্ন বোধ করি মিথ্যে হয়ে যাবার নয়।

চুনিলাল দেব তখন মিনার্ভার কর্মকর্তা।

হঠাৎ একদিন প্রস্তাব উঠল, অপরেশচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা'য় নবকুমার সাজবেন। খবর শুনে মিনার্ভা দলের অনেক অভিনেতা ক্ষুণ্ণ হল। বলতে গেলে, তখন পর্যন্ত অপরেশচন্দ্র একজন অ্যামেচার অভিনেতা। আর উনি কি না পয়লা চোটেই পাবলিক থিয়েটারে হিরোর পার্ট নিয়ে নামবেন !

অসন্তুষ্ট দলের দু-চারজন অভিনেতা চুনিলালকে গিয়ে বলল—তাহলে আমাদের আর মর্যাদা থাকে না। অপরেশচন্দ্রকে যদি নবকুমারের পার্ট দেওয়া হয় তো আমরা একসঙ্গে মিনার্ভা ছেড়ে চলে যাব।

চুনিলাল বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। বললেন—অপরেশচন্দ্রই ও-পার্ট করবেন। তাতে যাদের আপত্তি আছে তারা মিনার্ভা ছেড়ে চলে যেতে পারেন।

'কপালকুণ্ডলা'য় নবকুমারের ভূমিকা নিয়েই প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করলেন অপরেশচন্দ্র। সুন্দর অভিনয় করলেন।

কিন্তু মিনার্ভায় দীর্ঘদিন থাকতে পারেন নি অপরেশচন্দ্র। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকাভিনয় আরম্ভের কিছুদিন আগে অপরেশচন্দ্রকে মিনার্ভা ছাড়তে হল।

গভীর দুঃখে অপরেশচন্দ্র তখন মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলেন—না, জীবনে আর থিয়েটার নয়। আর কখনও কোন রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে আসব না।

অপরেশচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা শুনে নটদেবতা নিশ্চয়ই অলক্ষ্যে হেসেছেন। তুমি তো প্রতিজ্ঞা কর, কিন্তু তোমার সকল প্রতিজ্ঞাপূরণের কর্তৃত্ব কি তোমার হাতে?

অপরেশচন্দ্র সে-প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেন নি। কিছুকাল পরে তাঁকে স্টারে আসতে হল। স্টার থেকে অতঃপর কোহিনুর থিয়েটার। কোহিনুর থেকে স্টার। আবার স্টার থেকে কোহিনুর।

তারপর আবার কোহিনুর থেকে বিদায় নিলেন। এবার আর কোন থিয়েটারে চাকরি নিলেন না, অপরেশচন্দ্র 'বাণী থিয়েটার' নামে নিজেই একটা নতুন দল গড়ে তুললেন।

বাণী থিয়েটার প্রথমে বেঙ্গল থিয়েটারের স্টেজ ভাড়া নিয়ে 'রিজিয়া' ও 'বরুণা' অভিনয় করল। শুনতে পাই, সে-রাত্রে এত বেশি টিকিট বিক্রি হল যে আর কেউ বাণী থিয়েটারকে স্টেজ ভাড়া দিতে রাজী হল না।

তখন আর কি করা যায়, বাণী থিয়েটার কটকে চলে গেল অভিনয় দেখাতে। বাণী থিয়েটার কটকে অভিনয় আরম্ভ করল, সঙ্গে-সঙ্গে বৃষ্টির পালা শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেকদিন বৃষ্টি। খুব সামান্য টিকিট বিক্রি হল। তবু একমাস দশদিন কটকে অভিনয় দেখাল বাণী থিয়েটার। লাভ তো দূরের কথা, অপরেশচন্দ্রের দেনা হল দেড় হাজার টাকা।

এবার কলকাতায় ফিরে এসে অপরেশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটারে ঢুকলেন।

বছরখানেক বাদে অপরেশচন্দ্রকে আবার দেখা গেল কোহিনুর থিয়েটারে। কিছুদিন পরে অপরেশচন্দ্র ফের মিনার্ভায় এলেন। এবং মিনার্ভা ছাড়লেন। কিছুকাল চুপচাপ বাড়িতে বসে রইলেন।

তারপর যখন উপেন্দ্রকুমার মিত্রের হাতে মিনার্ভার কর্তৃত্ব এল, তখন অপরেশচন্দ্র মিনার্ভার ম্যানেজার হলেন। সিকি বখরায় ওয়ার্কিং-পার্টনার হিসেবে ম্যানেজার হলেন অপরেশচন্দ্র। এসব ১৯১৫ সালের কথা।

সেই ম্যানেজারির আয়ু বছর তিনেক বাদে শেষ হয়ে গেল। তারপর অপরেশচন্দ্রকে চলে আসতে হল স্টার থিয়েটারে।

গিরীন্দ্রমোহন মল্লিক সেসময়ে স্টার ইজারা নিয়ে চালাচ্ছেন। মিনার্ভায় যেমন ছিলেন, স্টারেও তেমনি ওয়ার্কিং-পার্টনার হিসেবে ম্যানেজারি নিয়ে

এলেন অপরেশচন্দ্র। কিছুকাল বাদে গিরীন্দ্রমোহন স্টার ছেড়ে দিলেন। অতঃপর স্টার ইজারা নিলেন স্বয়ং অপরেশচন্দ্র। দিনের পর দিন গেল, কিন্তু অপরেশচন্দ্র টাকাকড়ির দিকে তেমন সুবিধা করতে পারলেন না। বরং অসুবিধায় পড়লেন। কিছু ধার-দেনা হয়ে গেল। তারপর স্টারের আসরে এল আর্ট থিয়েটার।

কিন্তু আর্ট থিয়েটারের কথা এখন নয়।

আর্ট থিয়েটারের জন্মের বহুকাল আগে ক্লাসিক থিয়েটার জন্মেছে এবং মরেছে। কী নামডাক ছিল একদিন ক্লাসিক থিয়েটারের! ক্লাসিক থিয়েটারের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা আছে অমরেন্দ্রনাথের নাম।

——;*:——

পনেরো

ডাকনাম কালু। পোশাকী নাম অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

সেদিন বাগবাজার বোসবাড়িতে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র অভিনয়। ঠিক যে-সময় অভিনয় আরম্ভ হল, তখনই মামাবাড়িতে অমরেন্দ্রনাথের জন্ম। পরবর্তীকালে অমরেন্দ্রনাথ হাসতে-হাসতে বলতেন—আমার জন্ম থিয়েটার-লগ্নে। আমি থিয়েটার করব না তো কে থিয়েটার করবে?

অমরেন্দ্রনাথের বাবার নাম দ্বারকানাথ দত্ত। রেলির বাড়ির মুৎসদ্দি ছিলেন তিনি। চার ছেলে তাঁর। ধীরেন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ, অমরেন্দ্রনাথ, বিজয়েন্দ্রনাথ।

বাড়িতে প্রায়ই শখের যাত্রা হত। ছেলেবেলায় মুগ্ধ হয়ে সেই যাত্রা দেখত অমরেন্দ্রনাথ। আহা, অভিনয়ের মত এমন প্রাণকাড়া বস্তু ত্রিসংসারে আর কী হতে পারে।

যাত্রা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যেত অমরেন্দ্রনাথ। একদিন যাত্রার পালা হচ্ছে—দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। বাবার পাশে বসে যাত্রাভিনয় দেখছে অমরেন্দ্রনাথ। যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের দৃশ্য এল, তখন আর অমরেন্দ্রনাথ স্থির থাকতে পারল না, চিৎকার করে বলল—বাবা, বাবা, একে রক্ষা করুন।

মায়ের কাছ থেকে পুজোর ভাসানের দিন পয়সা নিয়ে বাখারির তীর-ধনুক কিনত অমরেন্দ্রনাথ। সমবয়সীদের সঙ্গে তীর-ধনুক নিয়ে যাত্রায় যে-রকম দেখেছে সে-রকম যুদ্ধের অভিনয় করত। এই যুদ্ধের অভিনয়ে একদিন একটা কেলেঙ্কারি পর্যন্ত হয়ে গেছে। অমরেন্দ্রনাথের তীর একটি বালকের কপালে বিঁধে গিয়েছে, দরদর করে রক্ত পড়েছে ক্ষতস্থান থেকে। মা সেদিন প্রচণ্ড প্রহার দিয়েছেন অমরেন্দ্রনাথকে। তার ব্যথা অল্পদিনে মিলিয়ে যাবার কথা নয়।

যথাসময়ে অমরেন্দ্রনাথের হাতেখড়ি হয়ে গেল। তারপরে ইস্কুলেও ভর্তি করে দেওয়া গেল যথারীতি। তার কিছুদিন পরেই দ্বারকানাথ চোরবাগান ছেড়ে হাতিবাগানের নতুন বাড়িতে উঠে এলেন। সেই বাড়ির পিছন দিকে

একটা ছোটগলিতে কটন ইনস্টিটিউশন। সেই ইস্কুলে ভর্তি করা হল অমরেন্দ্রনাথকে।

কিন্তু ভর্তি হলে হবে কি, ইস্কুলের লেখাপড়ায় অমরেন্দ্রনাথের তেমন মন নেই। 'নাহি জানি ভাই রে লক্ষ্মণ! এই কি রে রাজ্যসুখ?'—এই লাইনটি প্রায়ই শোনা যাচ্ছে কটন-ইনস্টিটিউশনে অমরেন্দ্রনাথের মুখে। সময় পেলেই অমরেন্দ্রনাথ সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে নানারকম অভিনয়ে মেতে থাকে। ইস্কুলের বই না পড়ে নাটক পড়ে।

বাড়ির কেউ টের পেলে শাস্তি পেতে হবে, মনের মধ্যে সে-ভয় আছে। তাই নাটক পড়তে হয় লুকিয়ে, সকলের চোখের আড়ালে। নাটক পায় কোথায়? কেনে। জলপানির পয়সা বাঁচিয়ে কেনে।

হাতিবাগানে ওদের বাড়ির কাছে স্টার থিয়েটারের নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে তখন। ইস্কুল থেকে বাড়ি এসে জামা-কাপড় বদলেই অমরেন্দ্রনাথ চুপচাপ চলে যায় অকুস্থলে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখে একটা শূন্যস্থান কেমন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে, সুন্দর হয়ে ওঠে। থিয়েটার! অমরেন্দ্রনাথ ভাবে। তার মনে হয় এই বাড়ির সঙ্গে তার অনন্তকালের আত্মীয়তা।

তারপর একদিন বেঙ্গল-থিয়েটারের দলের 'দুর্বাসার পারণ' নাটকাভিনয় দেখবার সৌভাগ্য হয়ে গেল অমরেন্দ্রনাথের। সেই তার প্রথম থিয়েটার দেখা। চমৎকার লাগল। আচ্ছা, 'দুর্বাসার পারণ' নাটকখানা একবার পড়তে পাওয়া যায় না?

অমরেন্দ্রনাথের বয়স তখন তেরো বছরের বেশি নয়। কটন ছেড়ে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে পড়ে তখন। ইস্কুল-ফিরতি পথে একদিন গাড়ি থামিয়ে গুরুদাসবাবুর দোকানে ঢুকে পড়ল। কী? না, 'দুর্বাসার পারণ' নাটকখানার দাম কত?

আলাদা পাওয়া যায় না ও-নাটক। কিনতে হলে একখণ্ড গ্রন্থাবলী কিনতে হয়। দাম দু-টাকা।

সেসময়ে অমরেন্দ্রনাথের হাত খরচ দৈনিক চারপয়সা বরাদ্দ। কোথায় পাবে একসঙ্গে দু-টাকা। কিন্তু যে করেই হোক 'দুর্বাসার পারণ' পড়তে হবে, অবিলম্বে যোগাড় করতে হবে নগদ দুটো টাকা। এখন কথা হল, নগদ দুটো টাকা পাওয়া যাবে কোথায়?

ঠিক আছে। মা টাকাকড়ি বাক্সে রাখেন না, রাখেন বিছানার তোশকের

নীচে। অমরেন্দ্রনাথ সেখান থেকে দুটো টাকা সরিয়ে ফেলল। পরদিন কিনে আনল 'দুর্বাসার পারণ'। সেদিনই পড়ে ফেলল একটানে।

কিন্তু ইস্কুলের লেখাপড়া যে একেবারেই করে না, সেদিকে দশা হবে কি। মেজদা একদিন প্রচণ্ড মার দিলেন সেজন্যে। তাতে কোন ফল হল না। নাটকই পড়ে। দেখে-শুনে মেজদা একদিন নাটকগুলো জড়ো করলেন বাড়ির উঠোনে, আগুনে ভস্ম করে দিলেন। অমরেন্দ্রনাথ সেদিন অনাহারে থেকেছে। আকুল হয়ে কেঁদেছে।

কয়েকদিন পরে স্টার থিয়েটার খুলল। স্টারে প্রথম রজনীতে 'নসীরাম' অভিনীত হবে।

স্টার থিয়েটারে 'নসীরাম' দেখতে বাড়ির অনেকেই যাচ্ছে, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের বুঝি যাওয়া হবে না। মেজদার বারণ।

অমরেন্দ্রনাথ বাবার কাছে গেল, মায়ের কাছে গেল। অনেক কান্নাকাটি অনেক সুপারিশের পর শেষপর্যন্ত মেজদা মত দিলেন। আচ্ছা, যা।

সেদিন থিয়েটারে গিয়ে কী দেখল অমরেন্দ্রনাথ, মনে আছে?

'সেদিন শুক্রবার, মনে আছে সেদিন ফুলদোল। হাতিবাগানের বাড়িতে ষ্টারের প্রথম অভিনয় রজনী। আমরা অভিনয় দেখিতে থিয়েটারে প্রবেশ করিলাম। রঙ্গালয়ের সাজ সজ্জা ইন্দ্রালয় তুল্য। নয়ন-মন-বিভ্রমকারী সুরম্য ভবন, অসংখ্য অসংখ্য উজ্জ্বল আলোকমালা ও সুপরিচ্ছদধারী নানা শ্রেণীর সহস্র সহস্র শ্রোতার সমাগম প্রভৃতি দেখিয়া আমি বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইলাম। ভাবিলাম আমি কোথায় আসিয়াছি! এত শোভা, এত সৌন্দর্য্য, নয়নাভিরাম এমন উজ্জ্বল দৃশ্য এই প্রথম আমার চক্ষুর উপর উদ্ভাসিত হইল। ভাবিলাম যবনিকার বাহিরে রঙ্গপীঠেই যখন এত মাধুরী, না জানি যবনিকার অভ্যন্তরে—রঙ্গমঞ্চে আরও কত অপার্থিব দৃশ্য-লহরী প্রচ্ছন্ন আছে।'

অভিনয় দেখে বাড়ি ফিরে এল অমরেন্দ্রনাথ, কিন্তু মন পড়ে রইল অভিনয়ের দিকে। অভিনেতা হতে হবে। সেদিনের সেই বালকের মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে রইল একটি বিশাল বাসনা—অভিনেতা হতে হবে, অভিনেতা হতে হবে।

প্রাণের কথা একদিন নির্জনে অমরেন্দ্রনাথ একজন বন্ধুর কাছে বলল—ভাই, সেদিন আমি স্টার থিয়েটারে গিয়েছিলাম। যা দেখলাম, তা মুখে বলবার নয়। আমার অ্যাক্টার হবার খুব ইচ্ছে। কী করলে অ্যাক্টার হওয়া যায় বলতে পার?

বন্ধুটি সবজান্তা। বলল—সামান্য কথা। একটা থিয়েটার খোল, তাহলেই অ্যাক্টার হতে পারবি।

কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের মত একজন নাবালকের পক্ষে একটা থিয়েটার খোলা কি সামান্য কথা হল? অজস্র টাকা লাগে একটা থিয়েটার খুলতে। অত টাকা অমরেন্দ্রনাথ কোথায় পাবে?

কিন্তু অভিনেতা হতে হবে, অভিনেতা হতে হবে। দিবারাত্র ওই এক চিন্তা অমরেন্দ্রনাথের।

লেখাপড়া একরকম বন্ধ হল। ইস্কুলে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হল। কুসঙ্গীদের সঙ্গে মেশে। নাট্যচর্চা করে।

কালুকে কি কিছুতেই সুপথে ফেরানো যাবে না? সে কি নাট্যচর্চা নিয়েই থাকবে, কুসঙ্গী নিয়েই দিন কাটাবে? লেখাপড়া শিখবে না?

কালু যে দিনে-দিনে হাজার দুষ্কর্মের কর্তা হয়ে উঠল।

হীরেন্দ্রনাথ একদিন বাড়ির উঠোনে লোহার থামের সঙ্গে বেঁধে কঠোর শাস্তি দিলেন কালুকে। হুকুম দিলেন—আজ রাত্রে কালুর খাওয়া বন্ধ।

দ্বারকানাথ তখন দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী। তিনি হীরেন্দ্রনাথকে বললেন—যে উচ্ছন্নে যাবার সে যাবেই। অযথা মারধোর করে লাভ কি। নিজেই শেষে কষ্ট পাবে।

হীরেন্দ্রনাথ চুপ করে রইলেন। পিতৃবাক্যের তিলতম অন্যথা করলেন না হীরেন্দ্রনাথ, আর কোনদিন ভাইকে শাসন করলেন না তিনি। ফলে, অমরেন্দ্রনাথের অধঃপতনের পথ অবিঘ্নিত হয়ে উঠল। কোথাও আর কোন বাধা-বারণ রইল না।

১৮৮৯ সালে দ্বারকানাথ মারা গেলেন।

অতঃপর রেলির বাড়িতে একটা চাকরিতে লাগান হল অমরেন্দ্রনাথকে। ধীরেন্দ্রনাথ—মানে অমরেন্দ্রনাথের বড়দাদা—তখন রেলির বাড়িতে মুৎসদ্দি।

অমরেন্দ্রনাথ আপিসে চাকরি করে, আর বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে চুটিয়ে থিয়েটার দেখে।

অঘোরনাথ পাঠক নামজাদা অভিনেতা। সেসময়ে তিনি থিয়েটারে অভিনয়ও করেন, আবার রেলির আপিসে চাকরিও করেন। অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল অঘোরনাথের। অঘোরনাথের মুখে থিয়েটারের অন্দরমহলের নানারকম গল্প শুনতে পাওয়া যায়, শুনে অমরেন্দ্রনাথ তো মুগ্ধ। একদিন

অঘোরনাথকে ধরে বসল—আমাকে থিয়েটারের অন্দরমহলে নিয়ে যেতে হবে।

অঘোরনাথ রাজী হলেন না। বললেন—ওরে বাবা! বলিস কি রে কানু! তুই বড়বাবুর ভাই—আর তোকে আমি থিয়েটারের ভেতরে নিয়ে যাব? শেষে বড়বাবু ভাবুক, পাঠকই আমার ভাইয়ের মাথা খেলে, আর আমার চাকরির দফাও গয়া হোক। না বাবা, সেসব কাজ আমাকে দিয়ে হবে না।

যা হবার ঠিকই হবে।

চল, ইয়ার-বন্ধু নিয়ে হই-হল্লা করি, সলা-পরামর্শ করে দেখি কেমন করে একটা থিয়েটার খোলা যায়।

আত্মীয়-স্বজনেরা একেবারে চোখ বুজে নেই। সবই দেখছেন-শুনছেন তারা, কিন্তু ভেবে উঠতে পারছেন না কোন পন্থায় অমরেন্দ্রনাথের স্বভাব ফেরানো যায়, কেমন করে বংশের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা যায়।

নানারকম পরামর্শ করে শেষপর্যন্ত সাব্যস্ত হল অমরেন্দ্রনাথের বিয়ে দেওয়া হোক। বিয়ে হলেই নির্ঘাত বিশুদ্ধ হবে, বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হবে না।

পনেরো বছর বয়সে অমরেন্দ্রনাথের বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের পর প্রায় দু-বছর অবশ্যি অমরেন্দ্রনাথ দিব্যি ভালোমানুষ হয়ে থেকেছে, কিন্তু তারপর? তারপর তো দেখি অমরেন্দ্রনাথ ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে থিয়েটারে গিয়ে রাতের পর রাত মজা করে অভিনয় দেখে।

অভিনয় তো দেখা হল, কিন্তু···। কিন্তু যবনিকার অন্তরালে কী আছে, কী?

ইয়ার-বন্ধুদের অমরেন্দ্রনাথ বলল—ভাই, যারা থিয়েটারে অভিনয় করে তারা কেমন ভাগ্যবান। ওদের সঙ্গে আমার আলাপ করতে খুব ইচ্ছা করে।

দলের এক মাতব্বর ছোকরা বলল—সামান্য কথা। আগে কিছু টাকা যোগাড় কর, তারপর আমাকে বল কোন অভিনেত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে চাও।

অমরেন্দ্রনাথ বলল—পারবে? বেশ, তাহলে কত টাকা দরকার বল, আমি যোগাড় করব।

—দু-দশ টাকার কাজ নয়, টাকা কিছু বেশি লাগবে। অন্তত পঞ্চাশ টাকা দরকার। তারপর—বন্ধুটি গম্ভীরমুখে বলল—তারপর আমি দেখে নেব কে কত বড় অ্যাকট্রেস।

কিন্তু, পঞ্চাশটাকা ?

বন্ধুটি বলল—কি হে, টাকার অঙ্ক শুনে তুমি যে একেবারে চুপসে গেলে। তুমি পঞ্চাশ টাকা শুনেই ঘাবড়ে গেলে ? আর একজন লোক এর জন্যে একদিনে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করেছে, জান ?

কিন্তু, পঞ্চাশ টাকা ! নগদ টাকা আপাতত হাতে না থাক, দামী আংটি আছে, চেন আছে। ভেবেচিন্তে ঠিক করা গেল, ওই আংটি আর চেন বেচেই টাকার যোগাড় করতে হবে। একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে আলাপ করতে হবে।

পরদিন সকালবেলা অমরেন্দ্রনাথ আংটি আর চেন নিয়ে আড্ডায় এসে উপস্থিত। কী, টাকার যোগাড় হল ?

অমরেন্দ্রনাথ আংটি আর চেন দেখাল। এই আংটি আর চেন বেচে টাকার যোগাড় হতে কতক্ষণ ? অমরেন্দ্রনাথ মনের কথা খুলে বলল।

ইয়ার-বন্ধুরা সমস্বরে বলে উঠল—ভাই, তোমার ক্ষমতা আছে। তুমি পারবে।

কিন্তু একেবারে বেচে না দিয়ে আপাতত আংটী-চেন বন্ধক রেখেও তো টাকার যোগাড় করা যেতে পারে। পরে সুবিধা-সুযোগ পেলে আবার আংটি-চেন ফিরিয়ে নেবার একটা রাস্তা খোলা থাকে তাহলে। আচ্ছা, তাই হোক।

বন্ধক রাখা হল আংটি-চেন। পাওয়া গেল একশো টাকা। পাকা কথা হয়ে রইল, রাত্রে ইয়ার-বন্ধুরা অমরেন্দ্রনাথকে নিয়ে একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে আলাপ-টালাপ করতে যাবে।

একজন অভিনেত্রীর কাছে যাওয়া হচ্ছে, অতএব জামাকাপড় ফিটফাট হওয়া দরকার। কিন্তু ইয়ার-বন্ধুদের দু-একজন সেদিকেও ঢু-ঢু। তাতে কী। অমরেন্দ্রনাথ বলে দিল, ওই টাকা থেকেই যেন তারা দরকারী জামাকাপড় কিনে নেয়। আচ্ছা, আচ্ছা।

সন্ধ্যার পর তো সেজেগুজে সকলে এল যথাস্থানে। এখন কথা, কোন অভিনেত্রীর বাড়ি যাওয়া যায় ? দেখা যাক একেকজন করে। কিন্তু হায়, যেখানেই যায় সেখান থেকেই বিমুখ হয়ে ফিরে আসতে হয়। সকলেরই বাবু-টাবু আছে ; কে এদের ঘরে নিয়ে বসাবে ?

দু-চার দরজা থেকে ফিরে আসবার পর অমরেন্দ্রনাথের ভয় হল একটু। বলল—থাক ভাই, আজ আর কোথাও যাবার দরকার নেই। চল, বাড়ি যাই।

কিন্তু ইয়ার-বন্ধুদের তখন ভারি দায় পড়েছে বাড়ি ফেরবার। বাড়ি তো ফিরতেই হবে একসময়। তা বলে যে-কাজে আসা হয়েছে সে-কাজ না মিটিয়ে বাড়ি ফেরার কোন অর্থ হয় না।

অনেক ঘোরাঘুরির পর একটি ঘরের দরজা অবারিত হল। না, থিয়েটারের কোন অভিনেত্রী নয়। তবে এই মেয়েটি নাকি একবার অভিনেত্রী হবার জন্যে কোন এক থিয়েটারের দ্বারস্থ হয়েছিল। ব্যস, ওই যথেষ্ট।

ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে সেই মেয়েটির ঘরে ঢুকল অমরেন্দ্রনাথ। ঘরের মধ্যে ফরাশ পাতা। সেই ফরাশের এককোণে চুপচাপ বসে পড়ল অমরেন্দ্রনাথ। তার বুকের মধ্যে তখন একবিন্দু সাহস নেই, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। একটু পরেই একজন চাকর এসে মস্ত একটা কল্কে বসিয়ে দিয়ে গেল মস্ত একটা জরিদার গুড়গুড়িতে। অমরেন্দ্রনাথের একজন বন্ধু সেই গুড়গুড়ির মস্ত নলটা তুলে নিয়ে আস্তে-আস্তে তামাক টানতে লাগল।

নায়িকা ঢুকল তখন এই ঘরের মধ্যে। ফরাশের মধ্যিখানে বসে মৃদু হেসে মেয়েটি বলল—নিন, একটা পান খান।

অধঃপতনের পথ অতীব মসৃণ। তার ইতিবৃত্ত মামুলী। তার বিস্তারিত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

স্টার থিয়েটারে 'চন্দ্রশেখর' অভিনীত হচ্ছে। শৈবলিনীর ভূমিকায় অপরূপ অভিনয় করলেন তারাসুন্দরী। তারাসুন্দরীর সেই অভিনয় দেখে অমরেন্দ্রনাথ বিমুগ্ধ। এই মুগ্ধতার ফল অনেকদূর গড়াল। ক্রমশ রাত্রে বাড়ি ফেরা বন্ধ হল অমরেন্দ্রনাথের।

তারপর অমরেন্দ্রনাথ একদিন বউকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিল; বলতে গেলে একরকম সম্পর্ক চুকিয়ে দিল দাদাদের সঙ্গে। অমরেন্দ্রনাথ হাতিবাগানের বাড়ি ছেড়ে চলে এল মানিকতলায়।

মানিকতলায় বাগমারী রোডে পৈতৃক একখানা বাগানবাড়ি আছে। সেখানেই বাসা নিল অমরেন্দ্রনাথ। নাট্যচর্চা চলতে লাগল মহোৎসাহে। উৎসাহদাতা বান্ধবেরা আছেন। নতুন থিয়েটারের দলের নাম ঠিক হল—ইণ্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব। কোন বই অভিনয় করা হবে? 'পলাশীর যুদ্ধ'।

অভিনেত্রী? আরে, তৈরি অভিনেত্রী তো হাতেই আছে। অভিনেত্রীর রূপে মুগ্ধ হয়েই সেসময়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে অমরেন্দ্রনাথ। এই বাগানবাড়িতেই করমচাঁদ জহুরীর কাছ থেকে সেসময়ে বাকিতে দেড়হাজার টাকার

গহনা কিনেছে। পরে সেই দেনা শোধ করতে গিয়ে প্রায় জেলে যাবার দশা হয়েছিল।

হ্যাঁ, অমরেন্দ্রনাথ বাগানে মেয়েমানুষ নিয়ে আছে। এসব খবর গোপন থাকে না। অমরেন্দ্রনাথের মা তখন দুঃখ করে বলেছিলেন ঃ সুন্দরী স্ত্রী ফেলে ওখানে একটা বাঁদর মাগী নিয়ে আছে!

তারাসুন্দরীর অভিনয়-নৈপুণ্য মুগ্ধ করেছিল অমরেন্দ্রনাথকে। মুগ্ধ করবার মত অভিনয় প্রতিভা ছিল বই কি তারাসুন্দরীর। কিন্তু সে-শক্তি তো তারাসুন্দরী একদিনে অর্জন করে নি। অনেকদিন লেগেছে। অনেকদিন আগের কথায় যাই।

তখন এমারেল্ড থিয়েটার ছেড়ে স্টার থিয়েটারে এসেছেন গিরিশচন্দ্র। একদিন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবির সামনে প্রণাম করেই গিরিশচন্দ্র তাকিয়ে দেখলেন, একটি মেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, অবাক চোখে তাকিয়ে আছে তাঁর মুখের দিকে।

গিরিশচন্দ্র মৃদু হেসে বললেন—তুই কে রে?

মেয়েটি মাথাটি একটু নিচু করল। বলল—আমি তারা।

গিরিশচন্দ্র বললেন—তুই বুঝি গোপাল সাজিস?

হুঁ। 'সরলা' নাটকে তারাসুন্দরী গোপাল সাজে।

তারাসুন্দরীর মাথায় হাত রাখলেন গিরিশচন্দ্র। কাছেই বসেছিলেন অমৃতলাল মিত্র; গিরিশচন্দ্র বললেন—অমৃত, এই মেয়েটাকে যত্ন করিস। এর কিছু হবে।

এই অমৃতলাল মিত্রই তারাসুন্দরীর প্রথম গুরু। তারাসুন্দরীকে থিয়েটারে নিয়ে আসেন বিনোদিনী। তারাসুন্দরী বিনোদিনীর বাড়ির কাছাকাছি থাকত। উপরন্তু, তারাসুন্দরীর মায়ের সঙ্গে বিনোদিনীর মায়ের আলাপ-অন্তরঙ্গতা ছিল। বয়সে তারাসুন্দরী বিনোদিনীর থেকে প্রায় সতেরো-আঠার বছরের ছোট।

থিয়েটারে ঢুকেই কি তারাসুন্দরী 'সরলা'য় গোপাল সেজেছে? না, তা নয়।

বিনোদিনীর সঙ্গে দিনের পর দিন থিয়েটারে এসেছে তারাসুন্দরী। নিতান্ত বালিকা তখন। 'চৈতন্যলীলা'য় কয়েকবার বালক সেজেছে।

বিনোদিনী একদিন থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। যার সঙ্গে থিয়েটারে আসা, সে-ই যদি বন্ধ করে তো তারাসুন্দরীর আর উপায় কি। তারাসুন্দরীকেও বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকতে হল।

তারাসুন্দরী যে আবার স্টার থিয়েটারে এসেছে, সেজন্যে ধন্যবাদ দিতে হয় নীলমাধব চক্রবর্তীকে। নীলমাধব চক্রবর্তীর আগ্রহেই হয়েছে সেটুকু। তারাসুন্দরীর মায়ের অবশ্যি আপত্তি ছিল কিন্তু বিনোদিনীর কথায় সে-আপত্তি শেষপর্যন্ত রইল না। একদিন সন্ধ্যার আগে অঘোরনাথ পাঠক নিজে গিয়ে বাড়ি থেকে তারাসুন্দরীকে হাত ধরে থিয়েটারে নিয়ে এলেন। ন-বছর বয়স তখন তারাসুন্দরীর।

'নসীরাম' নাটকে তারাসুন্দরী একটী ভীলবালক সেজেছে। আর, তারপরেই 'সরলা'য় এই গোপাল। কিন্তু এ তো সবই দেখছি বালকের ভূমিকা!

তারাসুন্দরী প্রথম বালিকার ভূমিকা পেল 'হারানিধি' নাটকে। 'হারানিধি'তে তারাসুন্দরী হেমাঙ্গিনী। কিন্তু হেমাঙ্গিনীকে তো গান গাইতে হবে, তারাসুন্দরী কি গান জানে? না, গান তারাসুন্দরী একেবারেই জানে না। তাহলে?

সেসময়ে স্টার থিয়েটারের সঙ্গীতাচার্য রামতারণ সান্যাল। অমৃতলাল বসু বললেন—রামতারণবাবু, এই মেয়েটাকে একটু গান শেখাতে হবে।

তারাসুন্দরীকে রামতারণ সান্যাল গান শিখিয়েছেন, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় নাচ শিখিয়েছেন।

স্টার থিয়েটারে নানা নাটকে নানা ভূমিকায় অভিনয় করছে তারাসুন্দরী। সুনাম হচ্ছে।

'চন্দ্রশেখর' অভিনীত হবে। তারাসুন্দরীকে শৈবলিনীর ভূমিকা দেওয়া হল। অমৃতলাল বসু তারাসুন্দরীকে বললেন—এই ভূমিকাটি অভিনয়ের ওপর তোমার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এই ভূমিকায় যদি তুমি সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় করতে পার তাহলে তোমার আর মার নেই।

তা অনবদ্য অভিনয় করলেন তারাসুন্দরী।

কিন্তু মাত্র তিনরাত্রি অভিনয় করেই তারাসুন্দরী থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। কিছুকাল পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চে তারাসুন্দরীর দেখা নেই।

সেই কিছুকালের কথা এখন চাপা থাক। অনেককাল পরের আরেকটা ঘটনা বলি বরং।

গিরিশচন্দ্র তখন মিনার্ভা থিয়েটারের অধ্যক্ষ। 'করমেতিবাঈ' হচ্ছে মিনার্ভায়। কিন্তু নাম ভূমিকা যার, তার অনুপস্থিতিতে গিরিশচন্দ্র একবার বিপদে পড়লেন। অগত্যা ডেকে পাঠালেন তারাসুন্দরীকে। গিরিশচন্দ্রের কথায় তারাসুন্দরী দু-রাত্রি করমেতিবাঈ সাজলেন। আর, অভিনয়ান্তে গিরিশচন্দ্র তারাসুন্দরীর

পিঠ চাপড়ে বললেন—বেটি, তুই আমার মুখ রক্ষা করেছিস। আমার আশীর্বাদে কালে তুই একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হবি।

গিরিশচন্দ্রের আশীর্বাদ ব্যর্থ হয় নি। কালে তারাসুন্দরী নিঃসন্দেহে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হয়েছেন। জীবনে অনেক থিয়েটারের সংস্রবে এসেছেন, অনেক ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। বঙ্গরঙ্গালয়ের ইতিবৃত্তে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে তারাসুন্দরীর কয়েকটী ভূমিকাভিনয়—'দুর্গেশনন্দিনী'র আয়েষা, 'চন্দ্রশেখরে'র শৈবলিনী, 'হরিশ্চন্দ্রে'র শৈব্যা, 'রামানুজে'র রামানুজ, 'বলিদানে'র সরস্বতী, 'রিজিয়া'র রিজিয়া।

বিপিনচন্দ্র পাল বলেছেন—ইউরোপ ও আমেরিকার কোন রঙ্গমঞ্চে তারার রিজিয়ার অভিনয়ের মত অভিনয় আমি দেখি নি।

উত্তরকালে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চের গৌরবাস্পদা অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরীর যশোমুকুটে অভিনয় সাফল্যের যতগুলি রত্ন আছে, এই রিজিয়ার ভূমিকায় অভিনয় নৈপুণ্য তন্মধ্যে মধ্যমণি স্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তখন এবং এখনও রিজিয়া বলিতে তারাসুন্দরীকেই বুঝায়। এ ভূমিকায় এ পর্যন্ত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইবার সাহসও কেহ করেন নাই।

তারাসুন্দরীর মস্ত ভক্ত ছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রায়ই তিনি বলতেন---তারাসুন্দরীর মৃত্যুর পর আমি যদি বেঁচে থাকি তো ওঁর ওপর খুব ভাল একটী কবিতা লিখব।

শাখা-পল্লব ছেড়ে মূলে যাই। মানিকতলায় বাগমারী রোডের সেই বাগান-বাড়িতে যাই। অমরেন্দ্রনাথের কাছে যাই।

সংক্ষেপে সারি এখানে। বাগানবাড়িতে আমোদ-ফুর্তির বন্যা বয়েছে, টাকা উড়েছে পাখা মেলে। অমরেন্দ্রনাথ রেলির আপসের চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি ভাগাভাগি করে অমরেন্দ্রনাথ যা পেয়েছে, তা ওই বাগান-বাড়িতেই নিঃশেষে উড়িয়ে দিয়েছে। ওই বাগানবাড়িও ছেড়ে দিতে হয়েছে পেষপর্যন্ত। সেসব কথা বিস্তারিত করে লাভ কী।

কিছুকাল পরে 'ইণ্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব' নিয়ে আবার উঠে পড়ে লাগলেন অমরেন্দ্রনাথ। দেখতে পাচ্ছি, মিনার্ভা থিয়েটারের স্টেজ ভাড়া নিয়ে

একরাত্রে 'পলাশীর যুদ্ধ' অভিনয় করা হচ্ছে। সিরাজের ভূমিকায় নেমেছেন অমরেন্দ্রনাথ। অভিনেতারূপে এই প্রথম রঙ্গমঞ্চে নেমেছেন, কিন্তু অভিনয় করছেন চমৎকার।

চতুর্থ-অঙ্ক অভিনয়ের শেষে স্বয়ং গিরিশচন্দ্র এসে দাঁড়ালেন অমরেন্দ্রনাথের সামনে। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে আরেকজন ভদ্রলোক কে?

গিরিশচন্দ্র বললেন—অমর, কে এসেছেন বল তো।

অমরেন্দ্রনাথ কেমন করে বলবেন!

গিরিশচন্দ্র বললেন—ইনিই কবি নবীনচন্দ্র।

হ্যাঁ। নবীনচন্দ্র সেন। দেশবিখ্যাত কবি। 'পলাশীর যুদ্ধে'র রচয়িতা। আনন্দে আত্মহারা হলেন অমরেন্দ্রনাথ। প্রণাম করলেন নবীনচন্দ্রকে।

নবীনচন্দ্র আশীর্বাদ করলেন অমরেন্দ্রনাথকে। বললেন—নাট্যজগতে একদিন তোমার বহু উচ্চে স্থান হবে। তুমি বঙ্গবাসীর পরম আদরের সামগ্রী হবে।

অমরেন্দ্রনাথ হাসলেন।

তারপর করিন্থিয়ান স্টেজ ভাড়া নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ আরও একবার 'পলাশীর যুদ্ধ' অভিনয় করলেন। বেঙ্গল থিয়েটারের স্টেজে 'বিষাদ' অভিনয় করলেন একরাত্রে। 'বিষাদে' অলর্ক সাজলেন অমরেন্দ্রনাথ, সরস্বতী সাজলেন তারাসুন্দরী। সে-রাত্রে নবীনচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে গিরিশচন্দ্র এসেছিলেন 'বিষাদ' দেখতে। তারাসুন্দরীর সরস্বতী দেখে খুশী হলেন গিরিশচন্দ্র, তারাসুন্দরীকে আদর করে বললেন—আজ আমার 'বিষাদ' লেখা সার্থক হল।

কিন্তু এরকম ভাড়া নিয়ে থিয়েটার করে অমরেন্দ্রনাথের তৃপ্তি নেই। যদি নিজস্ব একটা স্থায়ী থিয়েটার না হয় তাহলে আর সুখ কী।

গোপাললাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটার তখন বন্ধ হয়ে আছে। অমরেন্দ্রনাথ গেলেন গোপাললালের কাছে। কী? না, অমরেন্দ্রনাথ এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া নিতে ইচ্ছুক।

গোপাললাল ধীরেন্দ্রনাথের বিশিষ্ট বন্ধু। অতএব অমরেন্দ্রনাথ গোপাললালের অচেনা নয়। গোপাললাল বললেন—তুমি ধীরেনের ছোট ভাই না? থিয়েটার আমি তোমাকে ভাড়া দেব না। তোমাকে এভাবে জীবন নষ্ট করতে দেব না।

অমরেন্দ্রনাথ তখন অন্যপথে গেলেন। শ্যামাধব রায় গোপাললালের অন্তরঙ্গ বন্ধু। শ্যামাধবকে ধরে পড়লেন অমরেন্দ্রনাথ। শ্যামাধবের মধ্যস্থতায় গোপাল-লাল শেষপর্যন্ত রাজী হলেন।

অমরেন্দ্রনাথ ভাড়া পেলেন এমারেল্ড থিয়েটারের বাড়ি।

থিয়েটার-বাড়ি তো যোগাড় হল, কিন্তু শুধু বাড়ি হলেই কি থিয়েটার হয়। অভিনেতা-অভিনেত্রী কোথায়? টাকা ছাড়া অভিনেতা-অভিনেত্রী পাওয়া যায় না, কিন্তু টাকা? টাকা কই?

সত্যিই অমরেন্দ্রনাথের তখন বিপুল অর্থাভাব। এককালে তো দু-হাতে পৈতৃক পয়সা উড়িয়েছেন। এখন? বাড়ি ভাড়া নেবার আগে যারা আশা দিয়েছিল, তারা আর দেখা দেয় না। মহাবিপদ!

বিশবছর বয়স তখন অমরেন্দ্রনাথের।

সুদিনের বন্ধুরা দুর্দিনে প্রায় সকলেই উধাও হয়ে গেছেন। কিন্তু সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যান নি। তিনি আছেন অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে-সঙ্গে।

অমরেন্দ্রনাথ হতাশ হলেন না। বিপুল উদ্যমে তিনি অহোরাত্র পরিশ্রম করতে লাগলেন। থিয়েটার খুলতেই হবে।

নতুন থিয়েটারের নাম রাখা হল—ক্লাসিক থিয়েট্রিক্যাল কোং। ঠিকানা সেই এমারেল্ড থিয়েটারের বাড়ি, ৬৮-নম্বর বিডন স্ট্রীট। সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহেন্দ্রলাল বসু, অঘোরনাথ পাঠক, গোবর্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ দাস, ধর্মদাস সুর, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী, নয়নতারা, শরৎসুন্দরী, সরোজিনী প্রভৃতিকে নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ কাজ আরম্ভ করে দিলেন।

ক্লাসিকে প্রথম অভিনয় হল ১৮৯৭ সালের ১৬ই এপ্রিল। প্রথমরাত্রে অভিনীত হল 'নল-দময়ন্তী' ও 'বেল্লিকবাজার'। তারপর একের পর আরেক নাটকের ব্যবস্থা হল ক্লাসিকে। পাঁচ-ছ মাসের মধ্যে নানারসের নানা নাটকের সুন্দর অভিনয় হয়েছে, কিন্তু হায়, দর্শকের ভিড় হয় নি।

দর্শকের ভিড় হবে কোত্থেকে। হাতিবাগানে স্টার চলছে তখন বিপুল বিক্রমে। স্টারের ওপর লোকের তখন অগাধ বিশ্বাস। সে-সময়ে ধারাপাতের অভিনয় করলেও বোধ করি স্টারে দর্শকের অভাব হবার কথা নয়। কে আসবে স্টার ছেড়ে ক্লাসিকে থিয়েটার দেখতে। কে আসবে পয়সা খরচ করে নতুন থিয়েটারে। করে দায় পড়েছে যাচাই করে দেখবার।

দর্শক না হলে থিয়েটার চলে না। কিন্তু দর্শককে আকর্ষণ করা যায় কোন মন্ত্রবলে ?

একেকদিন ক্লাসিক থিয়েটারে দর্শকের অভাব একেবারে মর্মান্তিক হত। শুনতে পাই, সেসব দিনে রাস্তা থেকে লোক ডেকে আনতে হত। ক্লাসিকের কোনও-কোনও অভিনেতা থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়ে করজোড়ে পথের থেকে ভদ্রলোকদের ডেকে এনে বিনি পয়সায় দর্শকদের আসনে বসিয়ে দিতেন। এভাবে যদি দর্শকদের মুখে-মুখে থিয়েটারের সুখ্যাতি ছড়ায়, যদি একদিন সুদিনের মুখ দেখা যায় !

চমৎকার অভিনয় হচ্ছে ক্লাসিকে, কিন্তু তাতে কি, দর্শকসংখ্যা একেবারেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়। দর্শকের ভিড় না হলে থিয়েটার চলবে কিসের জোরে ? শেষপর্যন্ত ক্লাসিক অকালে বন্ধ হয়ে যাবে নাকি ?

তারপর ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা'। ক্লাসিকে 'আলিবাবা'র প্রথম অভিনয় হল ১৮৯৭ সালের ২০শে নভেম্বর। 'আলিবাবা'য় অমরেন্দ্রনাথ নিয়েছেন হুসেনের ভূমিকা। হরিভূষণ ভট্টাচার্য কাসিম, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ আলিবাবা, নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু আবদালা, কুসুমকুমারী মর্জিনা, ভূষণকুমারী সাকিনা, রাণীসুন্দরী ফতিমা।

'আলিবাবা'র প্রথম অভিনয় রজনীতে দর্শকসংখ্যা খুব বেশি হয় নি, কিন্তু অভিনয় হল চমৎকার। আর সেই অভিনয়ের সুখ্যাতি যথাসময়ে ছড়িয়ে পড়ল দিগ্বিদিকে। তারপর 'আলিবাবা' দেখবার জন্যে ক্লাসিকে দর্শকেরা ক্রমশ ভিড় বাড়াতে লাগল। শেষপর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়াল যে ক্লাসিক থেকে বিস্তর দর্শককে স্থানাভাবে ফিরে যেতে হয়। ক্লাসিকের তখন জয়জয়কার। নাট্য-প্রেমিকমাত্রেই তখন ক্লাসিক আর অমরেন্দ্রনাথের গুণগানে শতমুখ। এক 'আলিবাবা'র দৌলতেই অমরেন্দ্রনাথ লাখটাকার ওপরে লাভ করলেন।

'আলিবাবা'র সূত্রে বিশেষ করে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের নাম মনে আসে। নৃপেন্দ্রচন্দ্র 'আলিবাবা'য় শুধু আবদালার ভূমিকায় অভিনয় করেন নি, 'আলিবাবা'য় তিনি নাচ শিখিয়েছেন। বাঙলা নাট্যশালার ইতিহাসে নৃত্যশিল্পের অধ্যায়ে নৃপেন্দ্রচন্দ্রের নাম অক্ষয় হয়ে আছে।

নৃপেন্দ্রচন্দ্রের আগে বাঙলা নাট্যশালার বিশেষ করে বলবার মত আর চারজন নৃত্যাচার্যের নাম আছে : রামতারণ সান্যাল, বেণীমাধব অধিকারী, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু)।

দর্শকদের অকুণ্ঠ ভালবাসা পেয়েছেন নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু। লোকে তাঁকে ভালবেসে বলত, নেপা বোস। নেপা বোসের ড্যান্সের নামে উন্মুখ হত সকলে।

গিরিশচন্দ্র যখন মিনার্ভার অধ্যক্ষ, তখন তাঁর সঙ্গে একদিন নৃপেন্দ্রচন্দ্রের আলাপ-পরিচয় হল। নৃপেন্দ্রচন্দ্র তখন পর্যন্ত বাঙলা নাট্যশালার কেউ নয়। কোথায় আলাপ-পরিচয় হল? বাড়িতে নয়, থিয়েটারে নয়, ট্রামে।

উত্তরকালে গিরিশচন্দ্র বলেছেন: "ট্রামগাড়ীতে নৃপেন্দ্রের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। আমি ট্রাম-গাড়ীতে যাইতেছি,—বিনা প্রয়োজনে নৃপেন্দ্র সেই গাড়ীতে উঠিল। এক পয়সার পান কিনিয়া মহা আদরের সহিত আমায় প্রদান করিল। আমি একটী গ্রহণ করিলাম, সিগারেট দান কোনওরূপে এড়াইলাম। আমি বহুবাজার ষ্ট্রিটে দন্তচিকিৎসক এন, চক্রবর্ত্তীর ডাক্তারখানায় যাইব, নির্দ্দিষ্ট স্থান না জানিয়া নামিয়াছি, নৃপেন্দ্রও আমার সঙ্গে সঙ্গে নামিল। আমায় ডাক্তারখানা খুজিয়া দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিল। পথে নৃপেন্দ্রের পরিচয় পাই। নৃপেন্দ্র হোগলকুড়িয়ানিবাসী বিখ্যাত সদরমেট ৺হরিশচন্দ্র বসুর পুত্র।··· নৃপেন্দ্রচন্দ্র বড় শিষ্ট শান্ত ছেলে ছিলেন না। নৃপেন্দ্রের মাতৃভক্তি অপরিসীম। এই সময়ে আমার গ্রহ, জিজ্ঞাসা করিলাম, "কখনো থিয়েটার টিয়েটার করিয়াছ?" আর যাব কোথায়? বর্ষাকালীন বারিবর্ষণের ন্যায় ঝর্‌ঝর্ করিয়া পরিচয় করিতে লাগিল। "কাপ্তেন বেল" তাহাদের প্রাইভেট থিয়েটারের শিক্ষক ছিলেন। "বিষাদ" নাটকের রিহারর্সাল হয়। নৃপেন্দ্র তাহাতে মাধব আর সোহাগী সাজে। "বেলবাবু" খুব খুসী হন। অমর দত্তের (সুযোগ্য অভিনেতা ও নাট্যকার শ্রীমান অমরেন্দ্রনাথ দত্ত) সহিত তাহার কুটুম্বিতা আছে। চুণী, নিখিল, দানি—অমরের বাগানে যায়। আমরা সব যেন ভাই ভাই। এবম্বিধ পরিচয়রাশি বৃষ্টি হইল। তাহার থিয়েটারের খুব সখ বুঝিয়া আমি মিনার্ভা থিয়েটারে যাইতে বলিলাম। অবকাশ মত অনেকবার নৃপেন্দ্রের মুখে তাহার উপরোক্ত পরিচয় শুনিতাম ও লোক ডাকিয়া শুনাইতাম। পরিচয়ের ভঙ্গীতে সকলে হাসিত।

মিনার্ভায় নেপেন আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত।···নৃত্যশিক্ষকের অভাব হওয়াতে আমি নেপেনকে বলিলাম, "তুমি যে সকল নাচ দেখিয়াছ, শিখিয়াছ কি?" নেপেন বলিল, "খাসা শিখিয়াছি।" আমি বলিলাম, "ঐ সকল শিখাইতে পার?"

পার ?" নেপেন উত্তর করিল—"হ্যাঁ, তিনের পা, পাঁচের পা, সাতের পা সব জানি। আমি "তারার" নিকট বাগানে শিখিয়াছি।" ('তারা' প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী)। আমি নেপেনকে বলিলাম, "দেখ, তিনের পা, পাঁচের পা ছাড়িয়া দাও, যাত্রায় মন্দিরাতে তাল দিতে দেখিয়াছ কি ? যদি দেখিয়া থাক, বুঝিবার চেষ্টা করো,—তবলায় যে বোল চলিতেছে, মন্দিরা তাহার অনুকরণ করিবার প্রয়াস পায়। তবে তবলার এক আওয়াজ, মন্দিরার এক স্বতন্ত্র আওয়াজ। যেরূপ মন্দিরায় বাজনার বোল অনুকরণ করে, পায়ের ঘুঙ্গুরেও যে সেইরূপ বোল বাহির করিতে পারে, তাহারই যথার্থ নৃত্য। মন্দিরা লইয়া হাতে তাল দেয়, ঘুঙ্গুরে পায়ে তাল দেয়। ইহাতে বিভিন্ন পদবিক্ষেপে মন্দিরার ন্যায় বুলি বলে।" নেপেন নাচ সম্বন্ধে আমার এই কথাগুলি বুঝিল। বলিল, "দেখি, আমি নাচ শিখাইতে পারিব।" আমিও তাহার চক্ষের জ্যোতি দেখিয়া বুঝিলাম, নেপেন আমার বাক্য অনুধাবন করিয়াছে। নেপেনের সহিত নৃত্য সম্বন্ধে প্রায়ই নানারূপ আলাপ হইত। নেপেন বুঝিল, যাহাতে অঙ্গসৌষ্ঠব সুন্দররূপে প্রদর্শিত হয়, সেই সকল নৃত্যের ভাব-ভঙ্গী। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব নৃত্য করিতেন, লোকে মুগ্ধ হইত। নৃত্য সামান্য কলা-বিদ্যা নয়—মনোযোগের সহিত নেপেন এই সকল কথা শুনিত।

ইহার পর আমি ষ্টার থিয়েটারে আসি। নেপেন মাঝে মাঝে দেখা করিত, নাচের কথাও হইত। শুনিলাম, ক্লাসিক থিয়েটারে "আলিবাবা" হইতেছে, কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়া আমায় শুনাইত, "নেপেন নাচ শিখাইতেছে।"...'আলিবাবা'র নৃত্যশিক্ষা সম্বন্ধে নেপেনের উপর বিদ্রূপ শুনিয়া আমার মনে উদয় হইল, নেপেনের শিক্ষা বিদ্রূপ করিবার নয়। ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার 'আলিবাবা'র পাণ্ডুলিপি আমায় দেখাইয়াছিলেন, রঙ্গালয়ের অভিনয়োপযোগী পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীমান অমরেন্দ্রনাথও পরিবর্ত্তিত পাণ্ডুলিপি আমার নিকট আনেন ; আমার সামান্য সাহায্যও লন। নেপেনের সহিতও নৃত্য সম্বন্ধে আমার দুই এক কথা হয়। তাহাতে আমি বুঝিয়াছিলাম, নেপেন গানের ভাব বিশেষ অনুধাবন করিয়াছে, অতএব তাহার নৃত্য-গঠনের হাবভাব উপযোগী হইবার সম্ভাবনা। যাহা বুঝিয়াছিলাম, কার্য্যে তাহা শতগুণে প্রস্ফুটিত দেখিলাম। 'আবদালা' ও 'মর্জ্জিনা' অদ্যাবধি দর্শকের নিকট নূতন।...'আলিবাবা'র পর নেপেন দর্শকের নিকট বিশেষ পরিচিত হইল। পূর্ব্বে যাহারা নেপেনের নাম শুনিয়া বিদ্রূপ করিতেন, তাঁহারা বিশেষরূপে বুঝিলেন যে, নেপেন বিদ্রূপের অবস্থা অতিক্রম করিয়াছে। যত প্রকার নৃত্য ইতিপূর্ব্বে চলিয়া আসিতেছিল, নেপেনের

নৃত্যের প্রথা তাহা হইতে কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। রঙ্গালয়ের নিম্নশ্রেণীস্থ অভিনেত্রীগণ প্রায় একস্থানে স্থায়ী নয়; কিন্তু তাহাদের লইয়াই সখীর কার্য্য চালাইতে হয়। প্রত্যেক গীতিনাট্যে নূতন লোককে শিখাইয়া কার্য্যোপযোগী করিতে হয়, ইহা নৃত্য-শিক্ষকের সামান্য বাধা নয়; কিন্তু নেপেনের উদ্যমে কেবল যে প্রত্যেক বাধা অতিক্রমিত হইত, তাহা নয়,—প্রতিবারই কোন না কোন নূতন ঢং দর্শক দেখিতে পাইতেন।···কার্য্যকালে নেপেন ক্লান্তি কাহাকে বলে—জানে না। ছাত্রী ক্লান্তা, সঙ্গতদার সকলে ক্লান্ত, তাহাদের ক্লান্তিতে কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা নেপেনকে অনুরোধ করেন, "অদ্য শিক্ষা বন্ধ কর।" নেপেন ছাড়িবার পাত্র নয়, বলে—"কাঁচা থাকিলে, আজিকার সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইবে, যাহা শিখাইলাম, সব ভুলিয়া যাইবে।" যখন নৃত্য-শিক্ষা বন্ধ হইল, নেপেন নিশ্চিন্ত নয়, কোন্ অংশে কোন্ শিক্ষা বাকী আছে, যে ঢংয়ে যে নৃত্য শিখাইয়াছে, তাহার কোনও প্রকার উন্নতি করা যায় কি না—নেপেন এই চিন্তায় মগ্ন রহিল। যতদিন না গীতিনাট্য বা প্রহসন সাধারণ-সমক্ষে অভিনীত হইল, ততদিন নেপেন নিশ্চিন্ত নয়, অভিনয়ের রাত্রিতেও যোগ্যা ছাত্রীকে কোন না কোন উপদেশ প্রদানে ব্যস্ত। Wingএর পাশে থাকিয়া শিক্ষা দিবার সময় যেমন নৃত্য করিয়া শিখাইত, সেইরূপ নৃত্য করিয়া অভিনেত্রীগণকে দেখাইতে আরম্ভ করে। সদাই সতর্ক—যেন কোনরূপ ভুল না হয়। নেপেনের তাড়নায় সঙ্গীতাচার্য্য বিব্রত, নেপেনের মনোমত সুর তাল না হইলে অনর্থ করিবে। সঙ্গতকারীরা নেপেনের ছাত্রীগণের ন্যায় বিব্রত, পান হইতে চূণ খসিলে নেপেনের কাছে রক্ষা নাই। কার্য্য সফল করিবার চেষ্টা নেপেনের অপরিসীম। কথা আছে, চেষ্টা করিলে ভগবান সহায় হন, নেপেনের কার্য্যের সফলতা তাহা প্রমাণ করে। নৃত্য-শিক্ষকের তাল-লয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকে, কিন্তু কেবল তাল-লয় দেখিয়াই নেপেন ক্ষান্ত নয়। কোন্ নৃত্যে কোন্ ঢং দিলে নৃত্য সুন্দর হইবে, কোন পরিচ্ছদে অঙ্গ বিকাশ পাইবে, কিরূপ দৃশ্যপটে ও প্রত্যেক দৃশ্যে কোথা হইতে প্রবেশ ও প্রস্থান করিলে—দর্শকের আনন্দপ্রদ হইবে, ইহা লইয়া নেপেন দিবারাত্র ব্যস্ত। ষ্টেজ-ম্যানেজার, দৃশ্যপট ঠিক করিয়াছেন কি না, যাহার উপর পরিচ্ছদ প্রস্তুতের ভার, তাঁহার কোন ত্রুটী আছে কি না, নেপেন তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করে। ত্রুটী দেখিলে—কাহারও সহিত কলহ করিতে নেপেন পশ্চাদ্‌পদ নয়। সুতরাং রঙ্গালয়ে নেপেন যে কেবল নৃত্য-শিক্ষক তাহা নয়, সকল বিষয়েরই ভার নেপেন স্বইচ্ছায় নিজ মস্তকে লয়;···অভিনয় শক্তিতেও নেপেন সাধারণের নিকট বিশেষ

পরিচিত, হাস্যরসোদ্দীপক নিম্নস্তরের ভূমিকায় নেপেনের অভিনয় অতি সুন্দর। দ্বৈতগীতের নৃত্য-গীতে তো বিশেষ পারিপাট্য প্রকাশ করে, সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ও অতি উৎকৃষ্ট হয়। "ফকুড়ে", "নিমচাঁদ", "দেলদার", পাণ্ডব-গৌরবে "ঘেসেড়া" সাজে যিনি নেপেনকে দেখিয়াছেন, তিনি কখনও ভুলিবেন না। 'হরে', 'মন্দানিল', 'হামজাদ', 'চপল', 'মান্‌কে', 'অঞ্জন', 'পরভেজ', 'তাহবর খাঁ'—প্রভৃতি কতকগুলি ভূমিকার অভিনয় অতুলনীয় বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। গুরু-গম্ভীর (Serious Part) ভূমিকায়ও নেপেনের "রঙ্গরাজ" ও "গঙ্গাজী" দর্শকগণকে চমকিত করিয়াছিল। বহু দর্শক যখন টিকিট ক্রয় করেন, নেপেন সম্প্রদায়ভুক্ত আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন।..."

আবার 'আলিবাবা'র সময়ে ফিরে যাই। হ্যাঁ, সেই সময় থেকে ক্লাসিক চলতে লাগল বিপুল গৌরবে। নাট্যামোদীর মুখে অমর দত্ত আর ক্লাসিক ছাড়া অন্য কোন কথা নেই।

—:•:—

ষোলো

১৮৯৮ সালের মার্চের গোড়ার দিকে কলকাতায় প্লেগ দেখা দিল। দেখতে-দেখতে প্লেগের দৌরাত্ম্য বেড়ে গেল, বহু লোক পালাতে লাগল কলকাতা ছেড়ে। এই প্লেগের জন্যে স্টার থিয়েটারে দেড়মাস অভিনয় বন্ধ ছিল। ক্লাসিক কিন্তু খোলা।

কলকাতায় মড়ক লেগে গেল একেবারে। প্লেগ যে-বাড়িতে ঢুকছে সে-বাড়ি একেবারে উজাড় হয়ে যাচ্ছে। চিকিৎসা নেই, সেবা নেই, শুশ্রূষা নেই। প্লেগে যে মরে তার সৎকার হওয়া পর্যন্ত দুর্ঘট। প্লেগের মড়াকে কেউ সহজে কাঁধ দিতে চায় না।

অমরেন্দ্রনাথ শুধু অভিনেতা নন, তিনি বিশাল হৃদয়ের অধিকারী। এই সময়ে চিকিৎসার জন্যে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছেন অনেককে, নিজে লোকজন নিয়ে অনেক প্লেগের মড়া সৎকার করেছেন।

অভিনয়ান্তে একদিন অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক থেকে টমটম হাঁকিয়ে বাড়ি ফিরছেন। সঙ্গে আছেন স্বনামধন্য পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাতুবাবুর বাজারের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখা গেল একটি বুড়ী আকুল হয়ে কাঁদছে। হয়েছে কী? অসাধারণ কিছু নয়, বুড়ীর একমাত্র ছেলেটি প্লেগে মারা গেছে, কিন্তু সৎকারের জন্যে কেউ এগিয়ে আসছে না।

পাঁচকড়ি টমটম থামিয়ে নামবার উদ্যোগ করলেন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ পাঁচকড়ির হাতে ঘোড়ার রাস দিয়ে নিজেই তাড়াতাড়ি টমটম থেকে নেমে গেলেন। পাঁচকড়ি অনেক বারণ করলেন অমরেন্দ্রনাথকে কিন্তু কে কার বারণ শোনে। অমরেন্দ্রনাথ এগিয়ে যেতে লাগলেন বুড়ীর কাছে, পাঁচকড়িও টমটম থেকে নেমে অমরেন্দ্রনাথের পিছু-পিছু চললেন।

আগাগোড়া ঘটনা শুনে অমরেন্দ্রনাথ অবিলম্বে ক্লাসিক থেকে লোক আনালেন। তারপর অমরেন্দ্রনাথ নিজেও সেই শবের সঙ্গে-সঙ্গে শ্মশানঘাটে গেলেন। শ্মশানঘাট থেকে অমরেন্দ্রনাথ সে-রাত্রে বাড়ি ফিরলেন সাড়ে-চারটের সময়।

না, শুধু প্লেগের সময়ে নয়, অন্য সময়েও অমরেন্দ্রনাথ অকৃপণহস্ত, উদারহৃদয়, সেবাব্রতী।

দামোদরের ভীষণ বানে বর্ধমান জেলা যখন ডুবে গিয়েছিল, তখন কী? তখন কত বন্যাপীড়িত মানুষ নিরাশ্রয় হয়েছে কে তার হিসেব রাখে। না, কেউ-কেউ নিশ্চয়ই হিসেব রাখে। যেমন অমরেন্দ্রনাথ। সেসময়ে দেখতে পাচ্ছি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ নিজের গাড়িতে চিড়া মুড়কির বস্তা আর কাপড়ের বস্তা নিয়ে অকুস্থলে হাজির হয়েছেন।

একদিন জলধর সেন ক্লাসিকে অভিনয় দেখতে এসেছেন। অভিনয় শেষ হবার পর অমরেন্দ্রনাথ জলধরকে বললেন—চলুন দাদা, আমার সঙ্গে চলুন। আপনাকে আপনার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাই।

শীতকাল। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। গরম জামা-কাপড় গায়ে আছে, কিন্তু তাতেও শীতকে বাগ মানানো যাচ্ছে না। গাড়িতে উঠবার মুহূর্তে দুজনেরই চোখ পড়ল ফুটপাথে; দেখা গেল একজন বুড়োমানুষ একখানা ছেঁড়া কাপড় গায়ে জড়িয়ে ফুটপাথের ওপর থরথর করে কাঁপছে।

অমরেন্দ্রনাথ জলধরকে বললেন—দেখছেন দাদা, আমাদের দেশের অবস্থা দেখছেন—এই দারুণ শীতে এই বৃদ্ধ একখানা শীতবস্ত্রের অভাবে মৃতপ্রায় হয়ে আছে। অবস্থা যা দেখছি তাতে বোধ হয় যে অল্পক্ষণ পরে ঠাণ্ডায় ও মরে যেতে পারে। তবুও শুনি কি না যে আমাদের দেশের অবস্থা আগেকার চেয়ে ভাল হয়েছে!

অমরেন্দ্রনাথ নিজের গা থেকে দামী শালখানা খুলে নিয়ে অকাতরে সেই বৃদ্ধকে দান করে দিলেন।

আরেকদিন। সেদিন মজিলপুরে একটা সাহিত্যিক সম্মিলনী। সেই উপলক্ষ্যে আমন্ত্রিত হয়েছেন কলকাতার নামজাদা সাহিত্যিকেরা। জলধর সেন যাচ্ছেন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় যাচ্ছেন। আগের দিন সাব্যস্ত হয়েছে, জলধর আর পাঁচকড়ি সম্মিলনীর দিন দুপুরে এগারোটায় ক্লাসিকে আসবেন, সেখান থেকে অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে একত্র হয়ে স্টেশনে যাবেন।

জলধর সেন ঠিক এগারোটায় ক্লাসিকে এলেন। থিয়েটারে লোকজন দেখা যাচ্ছে না, দেখা যাচ্ছে কে একটি স্ত্রীলোক ঘোমটা টেনে বসে আছে। জলধর সেন অমরেন্দ্রনাথের ঘরের দিকে এগোতে লাগলেন। সেই স্ত্রীলোকটি এসে জলধর সেনকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কি অমরবাবু?

—কেন ?

একটি দুঃখের কাহিনী বললেন স্ত্রীলোকটি। তিনি একটি ভদ্রঘরের দরিদ্র বিধবা স্ত্রীলোক। একটি মাত্র ছেলে তার। সেই ছেলেটি জ্বরবিকারে শয্যাশায়ী। যথাসর্বস্ব বিক্রি করে বন্ধক রেখে ভদ্রমহিলা এতদিন ছেলের চিকিৎসা চালিয়েছেন, এখন আর কোন সম্বল নেই। এদিকে মহাবিপদ, ডাক্তার বলে গেছে আজই অক্সিজেন না দিলে ছেলেটি আর বাঁচবে না। অক্সিজেন ও অন্যান্য ওষুধ আনতে প্রায় চল্লিশটাকা দরকার, কিন্তু টাকা কোথায় ? ভদ্রমহিলা কখনও ঘরের বাইরে আসেন নি কিন্তু আজ ছেলের প্রাণের মায়ায় ভদ্রমহিলাকে ঘরের বাইরে ছুটোছুটি করতে হচ্ছে। ভদ্রমহিলা অনেকের কাছে ঋণ চেয়েছেন, ভিক্ষা চেয়েছেন, কিন্তু কোথাও কিছু জোটে নি। পাড়ার একজন বুড়োমানুষ বলে দিয়েছেন—অমরবাবু খুব দয়ালু লোক, তাঁর কাছে বিপদ জানালে কখনও বিফল হতে হয় না। ভদ্রমহিলা তাই অমরেন্দ্রনাথের কাছে ছুটে এসেছেন।

জলধর সেন সব শুনলেন। সব শোনালেন এসে অমরেন্দ্রনাথকে। অমরেন্দ্রনাথ তন্মুহূর্তে ভদ্রমহিলার কাছে চলে এলেন। কথাবার্তা বললেন তার সঙ্গে। তারপর জলধর সেনকে বললেন—দাদা, আমি আজ আপনাদের কাছে বড় লজ্জায় পড়লাম। আমি আপনাদের সব মজিলপুরে নিয়ে যাব বলেছিলাম, আর আমাদের পথ খরচ বাবদ পঞ্চাশটি টাকাও রেখেছিলাম। কিন্তু এই ভদ্রমহিলার মুখে সব শুনে বুঝলাম যে অন্তত চল্লিশটাকার কম এর ছেলের জন্যে অক্সিজেন ও অন্যান্য ওষুধের ব্যবস্থা হতে পারে না। তাই একে আমি চল্লিশটি টাকা, আর ধরুন পথ্যের জন্যেও পাঁচটা টাকা—এই মোট পয়তাল্লিশ টাকা দিচ্ছি—আজ আর আমাদের মজিলপুর যাওয়া হল না।

ভদ্রমহিলার হাতে পাঁচটি টাকা দিলেন অমরেন্দ্রনাথ। বললেন—মা, আপনি কেন কষ্ট করে এতদূর এলেন। আপনি ভদ্রঘরের স্ত্রী, আমার কাছে খবর পাঠিয়ে দিলে আমি লোক পাঠিয়ে আপনার সব ব্যবস্থা করে দিতাম। তা যা হোক, আপনি পাঁচটি টাকা আলাদা করে রেখে দিন, বেদানা কি দুধের দরকার হলে আপাতত এতে চালাবেন। তারপর—আমার লোক আপনার বাড়ি দেখে আসছে, তাকে দিয়ে আমি অন্য যা দরকার হয় জেনে পাঠিয়ে দেব। যতদিন না আপনার ছেলে ভাল হয়, ততদিন যা দরকার আমায় জানাবেন।

অমরেন্দ্রনাথ নিজের একজন কর্মচারীকে ডেকে পাঠালেন। সেই কর্মচারীর

হাতে চল্লিশটি টাকা দিয়ে অমরেন্দ্রনাথ বললেন—তাড়াতাড়ি গাড়ি জুতিয়ে একে সঙ্গে করে নিয়ে ওষুধ কিনে এর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এস।

ভদ্রমহিলা কাঁদতে-কাঁদতে দু হাত তুলে অমরেন্দ্রনাথকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

তারপর পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এসে উপস্থিত। আদ্যন্ত ঘটনা শুনে তিনি বললেন—আমাদের যাওয়া বন্ধ থাকতে পারে না। যে রকম করে হোক, আমরা যাবই।

অমরেন্দ্রনাথ বললেন—তা আর কেমন করে হবে। ক্যাশিয়ার বা অন্য কোন কর্মচারী এবেলা আর থিয়েটারে আসবে না। এদিকে আমার হাতে তো সম্বল মাত্র পাঁচটি টাকা। যাওয়া হবে কেমন করে?

আচ্ছা, জলধর সেনের পকেটে কিছু নেই? অমরেন্দ্রনাথ সেই কথাই জিজ্ঞেস করলেন—দাদা, আপনার কাছে কি কিছু হবে?

জলধর সেন বললেন—আমি তোমার মত আমীর লোকের সঙ্গে যাব জানি, তাই সঙ্গে কিছু আনি নি। তা যাক, আমরা ওই পাঁচটাকাতেই যাব, চল, আমরা থার্ডক্লাস করে যাই।

মহানন্দে থার্ডক্লাসে ওঠা গেল। অমরেন্দ্রনাথ কিন্তু দুঃখ করে বলতে লাগলেন—আমি আজ আপনাদের বড়ই কষ্ট দিলাম।

জলধর সেন বললেন—ভায়া, কষ্ট কিছু নয়। তুমি আমাদের ফার্স্টক্লাস করে নিয়ে যেতে, হোটেলে খাওয়াতে। তাতে আমাদের যা আনন্দ হতো, তোমার এই মহৎ কাজের জন্য আমাদের তার চেয়ে শত-সহস্র গুণ বেশি আনন্দ হয়েছে।

পরবর্তীকালে জলধর সেন বলেছেন:

'অমরবাবু দানের সময় কখনও পাত্রাপাত্র নির্বাচন করত না, সকলের প্রার্থনা সে পূর্ণ করত। শুধু হৃদয়ের দিক দিয়ে দেখলেই (অভিনয়াদি অন্য গুণের কথা ছেড়ে দি) তার তুলনা নেই; কবির ভাষায় বলতে হয়—তোমারি তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে!'

১৮৯৮ সালের শেষার্ধে অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে ক্লাসিকে নিয়ে এলেন। সগৌরবে ক্লাসিক চলছে।

১৯০০ সালের ১৭ই ফেব্রুআরি ক্লাসিকে 'পাণ্ডব গৌরব' প্রথম অভিনীত হয়।

'পাণ্ডব-গৌরব' গিরিশচন্দ্রের নাটক। প্রথমে গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, 'পাণ্ডব গৌরবে' দানীবাবু ভীম সাজবে, অমরেন্দ্রনাথ শ্রীকৃষ্ণ সাজবে।

কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ রাজী হন নি। বলেছেন—দানী কেন, আমিই ভীম সাজব।

গিরিশচন্দ্র বলেছেন—সে কি কথা। তোমার জন্যেই আমি বড় করে শ্রীকৃষ্ণের পার্ট লিখেছি। তুমি শ্রীকৃষ্ণের পার্ট কর, দানী ভীমের পার্ট করুক।

'পাণ্ডব-গৌরবে' ভীম নায়ক। অমরেন্দ্রনাথ নায়কের ভূমিকা চেয়েছেন। বলেছেন—দানীও ভীমের পার্ট বলুক, আমিও ভীমের পার্ট বলি। তুলনায় যে ভালো বলবে, তাকেই ভীমের পার্ট দেওয়া হবে।

দুজনেই ভীমের পার্ট বললেন। ভীমের পার্ট দানীবাবুর চেয়ে অমরেন্দ্রনাথেরই ভালো হল। গিরিশচন্দ্র অমরেন্দ্রনাথকে বললেন—তুমিই ভালো পার্ট বলেছ, সন্দেহ নেই।

বলা বাহুল্য, অমরেন্দ্রনাথই ভীম সেজেছেন 'পাণ্ডব-গৌরবে'।

কবি নবীনচন্দ্র সেন একদিন সস্ত্রীক এসে 'পাণ্ডব-গৌরব' দেখে গিয়েছেন। তিনি লিখেছেন : 'অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছি। কৃষ্ণসঙ্গিনীগণের গীত শ্রবণে আমরা (সস্ত্রীক) কেবল কাঁদিয়াছি। গিরিশের আমরা গোলাম হইয়া রহিলাম।'

'পাণ্ডব-গৌরব' রচনার কয়েকদিন আগে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের একটু অপ্রীতিকর বাক-বিতণ্ডা হয়েছিল।

ক্লাসিকের বিপুল জনপ্রিয়তা। প্রবল প্রতিপত্তি।

গিরিশচন্দ্র একদিন অমরেন্দ্রনাথকে বলেছেন—আমার জন্যেই তোমার থিয়েটার এমন চলছে। আমি না থাকলে ক্লাসিক এমন জমজমাট হতো না। আমাকে তোমার লাভের একটা অংশ দিতে হবে।

গিরিশচন্দ্রের দাবি অমরেন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারলেন না। বললেন—আপনি আমার থিয়েটারের, শুধু আমার থিয়েটারের কেন, বাঙলার নটকুলশিরোমণি। কিন্তু আপনার কি আমার কাছে লভ্যাংশের দাবি করা উচিত? ব্যবসায়ে দুর্দিন আসতে কতক্ষণ? তখন আমি কেমন করে চালাব? আর তাছাড়া ভেবে দেখুন, আমার থিয়েটারের এই নামডাকের মূলে আপনার দান সত্যি-সত্যি খুব বেশি নয়! না, আমায় মাপ করবেন, লাভের অংশ আমি আপনাকে দিতে পারব না।

গিরিশচন্দ্র অসন্তুষ্ট হয়েছেন নিশ্চয়ই। মহাসমারোহে 'পাণ্ডব গৌরব' অভিনীত

হতে লাগল ক্লাসিকে। আর গিরিশচন্দ্র ১৯০০ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি ক্লাসিক ছেড়ে মিনার্ভায় চলে গেলেন।

কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব তখন অমরেন্দ্রনাথকে বোঝালেন—গিরিশবাবুর এটা খুব অন্যায় হয়েছে। আপনি গিরিশবাবুর নামে মামলা করুন।

বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে অমরেন্দ্রনাথ হাইকোর্টে গিরিশচন্দ্রের নামে মামলা করলেন। সেই মামলায় অমরেন্দ্রনাথ জয়ী হতে পারেন নি।

ওদিকে মিনার্ভায় গিয়ে গিরিশচন্দ্র 'সীতারাম' অভিনয়ের আয়োজন করলেন। নাম ভূমিকায় স্বয়ং গিরিশচন্দ্র।

পরের সপ্তাহেই ক্লাসিকেও 'সীতারাম' খোলা হল। এখানে সীতারাম স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ।

অমরেন্দ্রনাথ বিজ্ঞাপন দিলেন ঃ ক্লাসিকের সীতারাম দৃপ্ত যুবা, স্থবির নহে।

শুধু এটুকুতেই শেষ নয়। দুই থিয়েটারে সীতারামের অভিনয়সূত্রে সে-সময়ে ছাপার অক্ষরে যে-সব শব্দ ও ব্যঙ্গচিত্র প্রচারিত হয়েছে, বাঙলা নাট্যশালার ইতিবৃত্তে তা একটি কলঙ্কিত অধ্যায়ের সাক্ষী। ক্লেশকর, কুশ্রী।

গিরিশচন্দ্রের নামে নানারকম ছড়া ছাপিয়ে বিলি করছেন অমরেন্দ্রনাথ। সোনার সঙ্গে যেমন সোহাগা, ছড়ার সঙ্গে তেমনি ব্যঙ্গচিত্র। একটা দাঁড়িপাল্লার একদিকে অমরেন্দ্রনাথ, আরেকদিকে গিরিশচন্দ্র; দাঁড়িপাল্লার যেদিকে গিরিশচন্দ্র সেদিক হাল্কা, যেদিকে অমরে নাথ সেদিকে ভার—অর্থাৎ গিরিশচন্দ্রের চেয়ে অমরেন্দ্রনাথের ওজন বেশি। টাগ-অফ-ওয়ারের ছবির; দড়ি নিয়ে দু দলে টানাটানি হচ্ছে, অমরেন্দ্রনাথের দল হেলায় হারিয়ে দিচ্ছে গিরিশচন্দ্রের দলকে। ব্যঙ্গচিত্র!

গিরিশচন্দ্রকে লক্ষ্য করে অমরেন্দ্রনাথ লিখলেন ঃ নট, নর্ত্তকী ও নাপিত—তিন চল্লিশের পার হইলেই কাজের বার হইয়া যায়।

মিনার্ভাও অবশ্যি নিঃশব্দ থাকে নি। মিনার্ভা ঘোষণা করেছে ঃ

Our representation, We feel bold to say, will prove to them that howling is not acting and that such a subject, at once serious and sublime ought not to be handled by quacks who will unscrupulously lay their hands on the most complicated cases without possessing the requisite qualification of even a common-place amateur.

অমরেন্দ্রনাথ জবাব দিলেন ঃ

We do not know—rather we are not ambitious of making a gigantic preface, but to appeal to our patrons and friends with due courtesy and dignity to come and see our

performances and then compare ! No doubt they will find a difference of Heaven and Hell ! No more for the present ! Now good bye !

এ বিষয়ে মিনার্ভার বক্তব্য ঃ

N. B. It has been said that there is a difference of Heaven and Hell ! Aye ! Let us hope so at least.

মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী তখন নরেন্দ্রনাথ সরকার। 'সীতারামে' অভিনয়ের পর অমরেন্দ্রনাথ 'থিয়েটার' নামে একখানা প্রহসন লিখলেন। 'থিয়েটারে' ব্যঙ্গের লক্ষ্য গিরিশচন্দ্র আর নরেন্দ্রনাথ।

১৯০০ সালের আগস্ট মাসের কথা। এক রবিবার রাত্রে অমরেন্দ্রনাথ নৃত্য-শিক্ষক আর সঙ্গীত-শিক্ষককে বললেন—এই সোমবার দিনের বেলা থেকেই 'থিয়েটারে'র রিহার্সাল আরম্ভ করুন। সামনের শনিবারেই 'থিয়েটার' অভিনয় করতে হবে।

সোমবার পুরোদমে মহলা আরম্ভ হয়ে গেল। অমরেন্দ্রনাথ দুপুর তিনটে নাগাদ এসে দেখলেন, 'থিয়েটারে'র নাচগানের মহলা চলছে। তারপর কী একটা কাজে বেরিয়ে গেলেন অমরেন্দ্রনাথ। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে দেখলেন, আবার 'থিয়েটারে'র নাচগানের মহলা চলছে। ব্যাপার কী ? বেলা তিনটে পর্যন্ত মেয়েরা মহলা দিয়েছে, আবার সন্ধ্যার সময় ওদের বাড়ি থেকে মহলায় আনা হয়েছে ? বিন্দুমাত্র বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই ?

ডাক নৃত্যশিক্ষককে।

নৃত্যশিক্ষক বললেন—আজ্ঞে, সামনের শনিবার 'থিয়েটার' খুলতে হবে। এসময়ে যদি এরা বাড়ি যায়, তাহলে···

অর্থাৎ, এদের আদৌ থিয়েটার থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় নি। বাড়ি যায় নি। এরা থিয়েটারেই আছে তখন থেকে। তাহলে···

অমরেন্দ্রনাথ বললেন—তাহলে এদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কী রকম হয়েছে ?

নৃত্যশিক্ষক বললেন—বাজার থেকে জলখাবার এনে দেওয়া হয়েছে। তাই খেয়েছে সবাই।

অমরেন্দ্রনাথ বললেন—এক্ষুনি ওদের ছেড়ে দাও। কাল-পরশু সারারাত অভিনয় করেছে, এখনও এদের পেটে ভাত পড়ে নি। শুধু বাজারের জলখাবার খেয়ে মানুষ কখনও এরকম কষ্ট করতে পারে ! কাল থেকে সবাই যেন খাওয়া-

দাওয়া সেরে রিহার্সালে আসে। এভাবে উপোস করে কাউকে রিহার্সাল দিতে হবে না। তাতে যদি এই শনিবারে 'থিয়েটার' না হয় তো না হল।

তন্মুহূর্তে ঠিকাগাড়ি ডাকিয়ে মেয়েদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন অমরেন্দ্রনাথ। বলা বাহুল্য হবে না, 'থিয়েটার' সেই শনিবার অভিনয় করা হল না, এক সপ্তাহ পিছিয়ে দিতে হল! ক্লাসিকে 'থিয়েটারে'র প্রথম অভিনয় হয় ১৯০০ সালের ২৫শে আগস্ট।

এখানে বলে রাখা ভাল, অমরেন্দ্রনাথ আবার গিরিশচন্দ্রের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন যে গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে বিবাদ করা তাঁর পক্ষে নিতান্ত ধৃষ্টতার কাজ হয়েছিল। মনে রাখা দরকার, গিরিশচন্দ্র ক্ষমা করেছিলেন অমরেন্দ্রনাথকে, আবার ক্লাসিকে এসেছিলেন। সেসব কথা তো অনেক আগেই বলা হয়েছে।

সেসময়ে ক্লাসিক সবচেয়ে জনপ্রিয় নাট্যশালা। চতুর্দিকে ক্লাসিকের প্রশংসা। না, শুধু প্রশংসা নয়। নিন্দাও আছে। কে না জানে, যেখানে প্রশংসা সেখানেই নিন্দা। কিন্তু নিন্দায় ক্লাসিকের ভয় নেই।

১৯০৩ সালের গোড়ার দিকের একখানা হ্যাণ্ডবিল থেকে তুলে দিচ্ছি ঃ

"ক্লাসিকের কয়েকটী আত্মকথা মাত্র !!

কার্য্যক্ষেত্রে অহর্নিশি কি চিন্তা করিবে? আত্মোন্নতি! আজ "অমর-রঙ্গে" নট-নটীগণের "মণিকাঞ্চন যোগ"—এই যোগে সুযোগে ক্লাসিকের উন্নতি, আর উন্নতি কি না তাহার নিদর্শন—সহৃদয় দর্শকবৃন্দ!

ভগবৎ কৃপায়, দর্শকগণের দয়ায়, আর সম্প্রদায়ের কার্য্যকারিতায়, ক্লাসিক আজ নাট্যজগতের শ্রেষ্ঠ সামায়!! ইহাতে অনেকের চক্ষু টাটায়!! নিন্দুকের সিন্দুকভরা নিন্দায় আমরা ভীত নহি!

মহাকবি তুলসীদাস উপদেশ দিয়াছেন—

হস্তী চলে বাজারমে, কুত্তা ভুখে হাজার।
সাধুনকে দুর্ভাব নহি, যত্ত নিন্দে সংসার॥

যেমন নগরের মধ্য দিয়া হস্তী গমন করিলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হাজার হাজার কুকুর চীৎকার করিতে থাকে, হস্তী তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করে না; তেমতি সাধুব্যক্তিকেও নিন্দুকেরা যত নিন্দা করুক না, তাঁহার মন কিছুতেই বিচলিত হয় না!!

স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলিয়াছেন, কাঁচা ময়দা গরম ঘৃতে ফেলিয়া

দিলে যেমন ছকৃছকৃ শব্দ করিয়া আড়ম্বর করে, এবং যে পরিমাণে ভাজা হইতে থাকে, সেই পরিমাণে শব্দের হ্রাস হইয়া আসে, সেইরূপ মনুষ্য অল্প জ্ঞান পাইয়া প্রথমতঃ বাচালতা ও বক্তৃতা দ্বারা আড়ম্বর করিয়া থাকে কিন্তু জ্ঞানের গভীরতা জন্মিলে আর আড়ম্বর করে না !!

আমরা মহাকবি তুলসীদাস ও ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া বলি—

দেবদ্বয় তোমাদের উপদেশে যেন তাহাদের উপদেশ হয় ! পশু জন্ম পরিত্যাগ করিয়া যেন পরম পবিত্র মানব জন্ম পায় !

হরিবোল ! হরিবোল !! হরিবোল !!!"

সেসময়ে মিনার্ভার অত্যন্ত দীনদশা। ১৯০৩ সালের ১০ই মে অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভা ইজারা নিলেন। অমরেন্দ্রনাথ সাব্যস্ত করলেন, তিনি একাই একসঙ্গে দুই থিয়েটার চালাবেন। ক্লাসিক আর মিনার্ভা। তাই হল। ৭ই নভেম্বর মিনার্ভায় 'রঘুবীর' হল। স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ রঘুবীর।

অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভার ম্যানেজার বহাল করেছিলেন দুর্গাদাস দে-কে ; আর অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজার মতীন্দ্রনাথ সরকারকে। কিন্তু দুর্গাদাসের সঙ্গে খুব বেশি দিন অমরেন্দ্রনাথের বনিবনাও রইল না। শেষপর্যন্ত গোলমাল এমন পেকে উঠল যে অমরেন্দ্রনাথকে পুলিস ডাকতে হল, মিনার্ভা থিয়েটারের পোশাক-টোশাক নিয়ে আসতে হল ক্লাসিক থিয়েটারে।

এই মিনার্ভার জন্যে বিস্তর লোকসান দিয়েছেন অমরেন্দ্রনাথ। এই মিনার্ভার জন্যেই মনোমোহন পাঁড়ের কাছ থেকে কয়েক হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। মিনার্ভা নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ ব্যতিব্যস্ত।

বন্ধুদের আসরে অমরেন্দ্রনাথ একদিন বললেন—কেউ যদি বিনামূল্যে আমার কাছ থেকে মিনার্ভার লিজ নিতে রাজী থাকেন তো আমি এই মুহূর্তে দিয়ে দিতে রাজী আছি।

আসরে উপস্থিত ছিলেন মনোমোহন পাঁড়ে। তিনি বললেন—বিনামূল্যে কেন, আপনি আমাকে মিনার্ভা লিজ দিন, আপনার কাছে আমার যে-টাকা পাওনা আছে তা আর দিতে হবে না। মিনার্ভার যা ব্যবস্থা করবার আমি করব, মিনার্ভা সম্পর্কে আপনার আর কোনরকম দায়-দায়িত্ব থাকবে না।

অমরেন্দ্রনাথ সাগ্রহে বললেন—এক্ষুনি।

১৯০৪ সালে লেখাপড়া করে মিনার্ভা ইজারা নিলেন মনোমোহন পাঁড়ে। মনোমোহনের কথা মিনার্ভার কথা, আগেও খানিক বলা হয়েছে, পরেও খানিক বলা হবে। কিন্তু এখন অমরেন্দ্রনাথের কথা, ক্লাসিকের কথা।

ক্লাসিকে অমরেন্দ্রনাথ নানা নাটকে নানা ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত ভূমিকাগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: 'হরিরাজে' হরিরাজ, 'হারানিধি'তে অঘোর, 'আলিবাবা'য় হুসেন, 'প্রফুল্লে' ভজহরি, 'পাণ্ডবগৌরবে' ভীম, 'ভ্রমরে' গোবিন্দলাল।

অমরেন্দ্রনাথের গোবিন্দলাল দেখে স্বনামধন্য কবি নবীনচন্দ্র সেন একখানা চিঠি লিখেছেন অমরেন্দ্রনাথকে। চিঠিখানা তুলে দিচ্ছি:

"ভাই অমর!

পূজ্যপাদ বঙ্কিমবাবুর "কৃষ্ণকান্তের উইল" পরিবর্ত্তিত করিয়া গত শনিবার 'ভ্রমর' নাম দিয়া—যে অভিনয় করিয়াছ, তাহা দেখিয়া যারপরনাই পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

মনে পড়ে কি সেইদিন—যে দিন প্রথম তোমাকে রঙ্গমঞ্চে—"সিরাজে"র অংশ লইয়া অবতীর্ণ হইতে দেখি, সেইদিন তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, নাট্য-জগতে একদিন তোমার বহু উচ্চে স্থান হইবে, তুমি সমগ্র বঙ্গবাসীর আদরের সামগ্রী হইবে। তখন আমার কথা শুনিয়া হাসিয়াছিলে, কিন্তু এখন আমার সে সময়ের গণনা সত্য হইয়াছে কি?

"A nation is known by its Theatre"—কথাটা বড়ই ঠিক। আমাদের যেমন দেশ, থিয়েটারের প্রতি লোকের শ্রদ্ধাও তদ্রূপ! তোমার অবিদিত নাই,—অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি যাঁহারা বিদ্বান বলিয়া অভিমান রাখেন, তাঁহারা থিয়েটারের নাম শুনিলে নাসিকা কুঞ্চিত করেন! কিন্তু সত্য বলিতে কি তাঁহারা যত বড় লোকই হউন, আমি তাঁহাদের প্রশংসা করিতে পারি না। তুমি সুখী হও, তুমি জয়ী হও, রঙ্গভূমির প্রতি ভালবাসা তোমার অক্ষয়—অমর—অজর হউক!—

তোমার

নবীন"

ক্লাসিক থিয়েটারের জন্যে বলতে গেলে প্রাণপাত করেছেন অমরেন্দ্রনাথ। সুফলও পেয়েছেন অবশ্যি। কী বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল ক্লাসিকের। একবার, মনে আছে, প্রচণ্ড বর্ষা; সেই বর্ষায় হাটবাজার বন্ধ, অন্য সব থিয়েটার বন্ধ

কিন্তু ক্লাসিক খোলা ; টিনের ছাদ দিয়ে বর্ষার জল পড়ছে, বসবার জায়গায় পর্যন্ত এক হাঁটু জল, তবুও ক্লাসিকে দর্শকেরা ছাতা মাথায় দিয়ে বেঞ্চে-চেয়ারে পা তুলে বসে থিয়েটার দেখেছে।

এই ক্লাসিক থিয়েটারের দৌলতে অমরেন্দ্রনাথ কয়েক লক্ষ টাকা আয় করেছিলেন. কিন্তু সব টাকা কোথায় তলিয়ে গেল, উপরন্তু অঢেল দেনা। দুর্ভাগ্য, অন্তরঙ্গ বন্ধুরাই দুঃসময়ে বঞ্চনা করেছেন অমরেন্দ্রনাথকে। কিম্বা বলি; তারা বঞ্চনা করেছেন বলেই দুঃসময় এসেছে।

বন্ধুর শত্রুতাই নিদারুণ। মামলা-মোকদ্দমা হল ক্লাসিকের নামে। হাইকোর্টের বিচারে রিসিভার বসল ক্লাসিকে। অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক ছেড়ে দিলেন। ভাবলেন জীবনে আর কখনও থিয়েটার করবেন না।

কিন্তু কিছুদিন পরে দেখতে পাচ্ছি অমরেন্দ্রনাথ হ্যারিসন রোডের কর্জন থিয়েটার ভাড়া নিয়ে গ্র্যাণ্ড থিয়েটার খুলেছেন। তখনও অমরেন্দ্রনাথ জনপ্রিয় অভিনেতা। অমরেন্দ্রনাথ নিজেও নিশ্চয়ই সেকথা জানতেন। মর্মে-মর্মে জানতেন। তাই তিনি সেসময়ে একদিন জনসাধারণের উদ্দেশে লিখেছেন : আমার বিশ্বাস আমি যদি বনে গিয়া থিয়েটার খুলি সেখানেও আপনাদের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইব না।

কিন্তু গ্র্যাণ্ড থিয়েটার জমে উঠতে না উঠতেই অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক থিয়েটারের রিসিভার অতুলচন্দ্র রায়ের অনুরোধে ক্লাসিক থিয়েটারে চলে এলেন। চলে এলেন ক্লাসিক থিয়েটারের ম্যানেজার হয়ে। মাইনে পাঁচশো টাকা। থিয়েটার থেকে অমরেন্দ্রনাথ এই প্রথম মাইনে নিচ্ছেন !

কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ ম্যানেজার হয়ে এসেও ক্লাসিক থিয়েটারের ভাগ্য ফেরাতে পারলেন না। ক্লাসিক থিয়েটারের ভাগ্য রইল অন্ধকার হয়ে।

কেন ? আর কেন, ওদিকে মিনার্ভা যে তখন জমজমাট। গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, দানীবাবু, তিনকড়ি, তারাসুন্দরী প্রভৃতি তখন মিনার্ভা আলো করে আছেন। লোকলক্ষ্মী তখন মিনার্ভার প্রতি প্রসন্ন।

ক্লাসিক ছেড়ে অমরেন্দ্রনাথ আবার কর্জন থিয়েটারে এলেন। আবার 'নিউ ক্লাসিক' নামে নতুন একটা থিয়েটার খুললেন সেখানে। কিন্তু কয়েকরাত্রি অভিনয় করবার পরেই কঠিন অসুখে পড়লেন অমরেন্দ্রনাথ। ওদিকে পাওনাদারেরাও উঠে পড়ে লেগেছে। নিরুপায় হয়ে অমরেন্দ্রনাথ তখন দেউলিয়া খাতায় নাম লেখালেন।

রোগশয্যায় অমরেন্দ্রনাথ মৃতকল্প হয়েছিলেন সেবার। কিন্তু শেষরক্ষা হল, আরোগ্য লাভ করলেন আস্তে-আস্তে। সুস্থ হয়ে সাব্যস্ত করলেন---যদি অন্তত শ-দুই টাকার একটা চাকরি কোথাও যোগাড় করতে পারি তাহলে আর থিয়েটারের কাজে যাব না।

কিন্তু কোথায় চাকরি। কলকাতায় কোন সুবিধা হল না, খবর পাওয়া গেল, বোম্বাইতে একটি চাকরি পাওয়া যেতে পারে। খবর পেয়ে বোম্বাই চলে গেলেন, কিন্তু বোম্বাইয়ের চাকরি পছন্দ হল না। কলকাতায় ফিরে এলেন।

তারপর স্টার থিয়েটার। মিনার্ভার দাপটে বনেদী স্টার পর্যন্ত তখন টলমল করছে। অত্যন্ত দীনদশায় এসে দাঁড়িয়েছে স্টার থিয়েটার।

অমরেন্দ্রনাথ স্টারে অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজার হয়ে এলেন। স্টারে 'চন্দ্রশেখর' অভিনয়ের আয়োজন হল। 'চন্দ্রশেখরে' প্রতাপের ভূমিকা নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম স্টারে অবতীর্ণ হলেন।

অমরেন্দ্রনাথ মাস-দুয়েক রইলেন স্টার থিয়েটারে।

গিরিশচন্দ্র সদ্যোজাত কোহিনুর থিয়েটারে চলে যেতে ভারি বিপদে পড়ে গেল মিনার্ভা। মিনার্ভার কর্তৃপক্ষ স্টার থেকে অমরেন্দ্রনাথকে মিনার্ভায় নিয়ে এলেন। অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভার অধ্যক্ষ।

অর্ধেন্দুশেখর মিনার্ভায় ছিলেন না? হ্যাঁ, ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি মিনার্ভা ছেড়ে বাড়িতে বসে আছেন। অমরেন্দ্রনাথের ওপর নাকি অর্ধেন্দুশেখরের আস্থা নেই। অমরেন্দ্রনাথ যদি দুর্ব্যবহার করে তাঁর সঙ্গে, এই আশঙ্কাতেই নাকি অর্ধেন্দুশেখর মিনার্ভার সংস্রব ছেড়েছেন।

অমরেন্দ্রনাথ দুঃখিত হলেন। অবশ্যি, এককালে অমরেন্দ্রনাথেরও ভুল ধারণা ছিল অর্ধেন্দুশেখর সম্পর্কে। জীবনে অমরেন্দ্রনাথ প্রথম যখন আত্মীয়-স্বজনের মায়া-মমতা ছেড়ে নাট্যলোকে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন একে-একে প্রায় সকল নাট্যরথীর সাহায্যই তিনি নিয়েছিলেন, কেবলমাত্র অর্ধেন্দুশেখরের সংস্রবে আসেন নি। পরবর্তীকালে সে-অপরাধ অমরেন্দ্রনাথ সবিনয়ে স্বীকার করেছেন।

সে-অপরাধ অর্ধেন্দুশেখর কি ক্ষমা করেন নি? করেছেন বইকি।

অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভার অধ্যক্ষ, অর্ধেন্দুশেখর মিনার্ভা ছেড়ে বাড়িতে বসে আছেন। একদিন মনোমোহন পাঁড়েকে সঙ্গে নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ সরাসরি অর্ধেন্দুশেখরের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত। অর্ধেন্দুশেখর স্নান করছিলেন তখন,

অমরেন্দ্রনাথ একেবারে কলের কাছে গিয়ে বললেন—সাহেব! আমি এসেছি।

অর্ধেন্দুশেখর তাকিয়ে একটু হাসলেন। বললেন—কে, অমর! আজ আমার কী ভাগ্যি!

তারপর ঘরে এসে বসলেন সকলে। মনোমোহন অর্ধেন্দুশেখরকে বললেন—সাহেব, অমরবাবু আপনাকে নিতে এসেছেন। আজ থেকে আপনাকে থিয়েটারে যেতে হবে।

সরলস্বভাব অর্ধেন্দুশেখর বললেন—তার আর কথা কি। অমর যখন এসেছে, তখন নিশ্চয়ই যাব।

সেদিনই থিয়েটারে এলেন অধেন্দুশেখর। বলা বাহুল্য, এছাড়া আর কখনও অর্ধেন্দুশেখর আর অমরেন্দ্রনাথ একসঙ্গে এক থিয়েটারে কাজ করেন নি। কিন্তু সেবার ক-মাস দুজনে একসঙ্গে পরম সুখে ছিলেন। একবিন্দু মনোমালিন্য ঘটে নি, কোন বিকার-বিক্ষোভের বাষ্পমাত্র ওঠে নি।

সেসময়ে অমরেন্দ্রনাথ বারংবার অর্ধেন্দুশেখরকে বলেছেন—সাহেব, আপনার মত সরলপ্রাণ খুব কমই দেখেছি।

বেশ কয়েকমাস মিনার্ভায় ছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। তারপর অমরেন্দ্রনাথ আবার স্টারে চলে এলেন। অমরেন্দ্রনাথ আসবার পরে স্টার আবার সুদিনের মুখ দেখল। এবার একটানে প্রায় তিন বছর স্টারেই রইলেন অমরেন্দ্রনাথ। তারপর স্টারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য হল। অমরেন্দ্রনাথ স্টার ছেড়ে দিলেন।

অনাথনাথ দেব বিখ্যাত জমিদার, বিডন স্ট্রীটে থাকেন। তাঁকে গিয়ে ধরলেন অমরেন্দ্রনাথ। অনাথনাথ অমরেন্দ্রনাথের জন্য বিস্তর টাকাকড়ি খরচ করে পুরনো বেঙ্গল থিয়েটার ভেঙে নতুন একটা থিয়েটার তৈরি করে দিলেন। সেই নতুন থিয়েটারের নাম হল গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার।

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রথম যেদিন খোলা হল, সেদিন বিকেল পাঁচটার আগেই থিয়েটারের সমস্ত টিকিট বিক্রি হয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলা প্রচণ্ড ভিড়। টিকিট আর নেই, তথাপি টিকিট ঘরের সামনে বিস্তর লোক সমস্বরে বলছে—মশাই, একখানা টিকিট দিতেই হবে। আমরা বসতে চাই না, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে থিয়েটার দেখব।

টিকিট কেটে যারা ভেতরে ঢুকেছে, তারাও সকলে এককথায় বসবার আসন

পায়নি। চেয়ারের জন্যে অনেকেই গেট-কীপারকে তাগাদা দিচ্ছে—কই মশাই, বসবার চেয়ার কোথায় আমাদের ?

দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন। চেয়ার ভাড়া করে আনতে গেছে, এখুনি এসে পড়বে। এই এল বলে।

প্রথম দিনেই গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার মাতিয়ে দিল দর্শকদের। অমরেন্দ্রনাথ মাসকয়েক চালালেন গ্রেট ন্যাশনাল।

তারপর হল আরেক কাণ্ড। অমন যে এককালের প্রবল প্রতাপান্বিত স্টার, তার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। স্টারের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নতুন বন্দোবস্ত হল যে এবার থেকে স্টারের সম্পূর্ণ ভার নেবেন অমরেন্দ্রনাথ, কেবলমাত্র ভাড়াবাবদ অমরেন্দ্রনাথ প্রতিরাত্রের বিক্রির টাকা থেকে এক-চতুর্থাংশ কমিশন দেবেন। এতকাল অমৃতলাল বসু স্টারের ম্যানেজার ছিলেন, এখন থেকে অমৃতলাল নাট্যাচার্য হবেন আর অমরেন্দ্রনাথ কর্মকর্তা।

অনাথনাথ বাবু ? তিনি যে অমরেন্দ্রনাথের জন্যেই টাকাকড়ি খরচ করে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার খুলেছিলেন, এখন ? অমরেন্দ্রনাথ হঠাৎ সুযোগ পেয়ে গ্রেট ন্যাশনাল ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন, এটা কি খুব ভালো কথা হল ?

বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শে অনাথনাথ সাব্যস্ত করলেন, উনি মামলা করবেন অমরেন্দ্রনাথের নামে। এটর্নিকে খবর দেওয়া হল। এটর্নি এলেন যথাসময়ে। এটর্নিকে মামলার কাগজপত্র বুঝিয়ে দিচ্ছেন অনাথবাবু, এমন সময় অকুস্থলে অমরেন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত। হাসতে হাসতে অমরেন্দ্রনাথ বললেন—শুনলাম আপনি নাকি আমার নামে মামলা করবেন ?

অমরেন্দ্রনাথের একটা মস্ত গুণ সামনাসামনি কেউ তাঁকে বে-কায়দায় ফেলতে পারে না, কেউ তাঁর বিরুদ্ধাচারী হতে পারে না। জীবনে অনেকেই তাঁর মনোহারিণী শক্তিতে বশীভূত হয়েছে।

এটর্নির সামনেই অনাথনাথ অমরেন্দ্রনাথকে বললেন না, ওসব মিথ্যেকথা। আমি কি তোমার নামে মামলা করতে পারি ? কিন্তু কাজটা কি তোমার ভালো হয়েছে ভায়া !

অমরেন্দ্রনাথ হাসতে-হাসতে বললেন—আমি আপনার পুত্রতুল্য। আপনি তো সবই জানেন। এখানে থিয়েটার খোলা অবধি আমাকে কেবল লোকসানই দিতে হচ্ছে। এখানে লোকের বসবার যে জায়গা আছে তাতে আমার থিয়েটার কিছুতেই চলতে পারে না। এখানে থিয়েটার করলে আমার লোকসান হবেই।

তবে আপনি যদি বলেন, লোকসান হলেও তোমাকে এই থিয়েটারেই থাকতে হবে তাহলে অবশ্যি আমাকে থাকতেই হবে। আমি কী করবো, বলুন? তাছাড়া দেখুন দশ-বিশ হাজার টাকা আপনার কাছে কিছুই নয়। আপনার থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি। কিন্তু আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন, আমি একেবারে মারা পড়ি।

অনাথনাথবাবু হার মানলেন। বললেন—এখানে আমি তোমাকে লোকসান দিয়ে থাকতে বলতে পারি না। আমার বাড়ি পড়ে থাকবে না। যাতে তোমার সুবিধে হয়, তাই কর। তবে এটা তুমি জেনে রাখ, তোমার নামে আমি মামলা করব না।

১৯১১ সালের শেষের দিকের কথা। অমরেন্দ্রনাথের অধিনায়কত্বে স্টার যেদিন প্রথম খুলল, সেদিন অভিনয় আরম্ভ হবার আগে অমৃতলাল বসু রঙ্গমঞ্চ থেকে দর্শকবৃন্দকে বললেন: "আমি এখন বুড়ো হয়েছি, আমার মরবার বয়স হয়েছে; যদি বলেন যে, 'মর নাই কেন?' তাহলে তার উত্তরে বলব, 'সেটা আমার বজ্জাতি। আমি আর এখন থিয়েটার চালাতে অক্ষম। সেই জন্য শ্রীমান অমরেন্দ্রনাথ দত্তের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করলাম। আর অমরবাবুর মতন যোগ্য ব্যক্তি কোথায় পাব যার হাতে আমাদের বড় আদরের বড় সাধের ষ্টার থিয়েটারের ভার দিয়ে যাই।...অমরবাবুই এখন নাট্যজগতে যোগ্য ও যথার্থ উপযুক্ত পরিচালক। তাঁহার মত থিয়েটার পরিচালনের শক্তি আর কারো নেই। আর তার মত উদার, সৎবংশজাত, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে লাভ ক'রে নাট্যজগৎ ধন্য। আমরাও তাঁর মতন লোকের হাতে ষ্টার থিয়েটারের ভার দিতে পেরে ভগবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত।..."

স্টার থিয়েটার চলতে লাগল সগৌরবে। অতঃপর একটানে ১৯১৫ সালের ১২ই ডিসেম্বরের স্টারে চলে আসি। সেদিন 'সাজাহান' অভিনীত হবার কথা। আগেই বিজ্ঞাপিত হয়েছে, 'সাজাহানে' ঔরংজেব সাজবেন অমরেন্দ্রনাথ।

থিয়েটারে প্রচণ্ড ভিড় হয়েছে। শরীর খুব অসুস্থ, তবুও অমরেন্দ্রনাথ দর্শকদের নিরাশ করতে চাইলেন না। ঔরংজেবরূপে রঙ্গমঞ্চে নামলেন। কিন্তু তৃতীয় অঙ্ক শেষ হবার আগেই তাঁর মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল, আর অভিনয় করতে পারলেন না তিনি। রঙ্গমঞ্চে ঔরংজেবের অসমাপ্ত ভূমিকাই অমরেন্দ্রনাথের ইহজীবনের শেষ অভিনয় হয়ে রইল।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: 'আমাদের কালু—ছেলেবেলা হইতে

যাহাকে দেখিয়াছি,—প্রথম যৌবনে যাহাকে শাসনে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি,—পরে যাহার অধীনে চাকরী লইয়া 'রঙ্গালয়' সম্পাদন করিয়াছি,—সেই কেলো,—সেই অমর, চল্লিশ বছর হইতে না হইতেই চলিয়া গেল! বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইয়া মনিবের উপর হুকুম চালাইবার অধিকার আমরা কেবল অমরেন্দ্রনাথের কাছেই পাইয়াছিলাম। তাহার অগ্রজের সখা বলিয়া অমরেন্দ্রনাথ আমাদিগকে ঠিক অগ্রজের ন্যায় ভয় করিত, ভক্তি করিত।...থিয়েটারের কার্য্যে অমরেন্দ্রনাথ অনেক নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তক। অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটারের মুখপত্র স্বরূপ একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করিয়াছিল, বাঙ্গালা থিয়েটারের জন্য একটা 'লিটারেচর' সৃষ্টি করিবার আয়োজন করিয়াছিল। যে হিসাবে সোমপ্রকাশের ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও হিন্দু পেটরিয়টের ৺কৃষ্ণদাস পাল আমাদের স্মরণযোগ্য, সেই হিসাবে অমরেন্দ্রনাথ আমাদের স্মরণযোগ্য।...'

হ্যাঁ, জীবনে তিনখানা সাময়িকপত্র বের করেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ—'সৌরভ', 'রঙ্গালয়', 'নাট্যমন্দির'। 'সৌরভ' মাসিক সাহিত্যপত্র, সম্পাদক গিরিশচন্দ্র। 'রঙ্গালয়' নাট্যশালার সাপ্তাহিক মুখপত্র, সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। 'নাট্যমন্দির' নাট্যশালার মাসিক মুখপত্র, প্রথম সম্পাদক স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ।

একজন নাট্যবোদ্ধা লিখেছেন: 'স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত বহু অর্থ ব্যয় করে আমাদের নাট্যশালার দৃশ্যপটে ও সাজসজ্জায় নূতনত্ব আনবার জন্য যত্নবান হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম সংস্কারক বলা চলে তাঁকেই। ক্লাসিক থিয়েটারের আমল থেকেই' 'ঠ্যালা সীন,' 'কাটা সীন', 'বক্স সীন,' পরিবর্ত্তনীয় 'উইংস' ও 'প্রোসিনিয়ম এবং 'যবনিকা' হিসাবে প্রথম 'কার্টেন' ব্যবহার হয়। রঙীন আলো, স্পট লাইট প্রভৃতিরও প্রচলন হয়।...

ষ্টেজে তখন কেরোসিনের প্যাকিং বাক্স কেটে তৈরী করা রঙীন কাপড় মোড়া নকল আসবাবপত্র ব্যবহার হত। অমরেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম ষ্টেজে আসল সরঞ্জামের ব্যবহার প্রবর্ত্তন করেন। খাট, আলমারি, টেবিল, চেয়ার, সোফা আয়না, ছবি ইত্যাদি ষ্টেজের উপর সাজিয়ে এই সময় থেকেই রঙ্গমঞ্চকে এক বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা চলতে লাগল। স্টার, মিনার্ভা, ন্যাশানাল প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যশালাগুলির মধ্যে বেশ একটা প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গেল। বারুণী পুকরিণী থেকে সিক্তবসনা রোহিণীকে তুলে নিয়ে এল গোবিন্দলাল তার জামা কাপড় ভিজিয়ে। শৈবলিনী ও প্রতাপ গঙ্গায় সাঁতার কেটে উঠতে লাগল ভিজে কাপড় পরে। জলপ্রপাত ও ঝরণার দৃশ্যে ঝরঝর করে জল ঝরতে লাগল

ষ্টেজের উপর! ভীমা পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দেবার সময় জল ছিটিয়ে পড়তে সুরু হল। ...আকাশে উড়ে যাওয়া, শূন্যমার্গে দেবতার আবির্ভাব, ফোয়ারা থেকে জল ওঠা, সূর্য্যাস্ত, চন্দ্রোদয়, ঝড়বৃষ্টি, বজ্রাঘাত ও বিদ্যুৎচমক, ট্রেনের শব্দ প্রভৃতি ধ্বনি, রিভলভার ও পিস্তলের সশব্দে অগ্নি ও ধূম উদ্গীরণ, রঙ্গমঞ্চে কুকুর, বিড়াল, পাখী, পায়রা প্রভৃতি জীবজন্তু ও পশুপক্ষীর আবির্ভাব এই সময় থেকেই সুরু হয়েছিল।'

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

"অমরবাবু নায়কের অংশে প্রভূত যশ অর্জ্জন করেন, তাঁর চেহারা, তাঁর ভঙ্গী, তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ সবই অনুকূল ছিল। তৎসত্ত্বেও তিনি প্লে-র সমবেত স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারতেন এইটাই ছিল তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। আমি কয়েকটি প্রমাণ দিচ্ছি। তাঁর রচিত অপেরা ও গান উচ্চ সাহিত্য পদবাচ্য না হয়েও অদ্ভুত রকমের সার্থক হত। তাঁর serio-comic অভিনয় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, যা দেখলে মনেই হত না যে অভিনেতা একজন সহজাত নায়ক। তাঁর রঙ্গমঞ্চ, বিশেষত ক্লাসিকের রঙ্গমঞ্চ ও auditorium এমন ধরণের ছিল যেটা নট ও দর্শকের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস করত। অধীন অভিনেতাদের সম্মান ও মাইনে বাড়াবার অর্থও তাই। তাঁর হ্যাণ্ডবিল, তাঁর থিয়েটারে দর্শকের অনাড়ম্বরভাব (ফষ্টি-নষ্টি পর্য্যন্ত সেখানে হত) যাঁদের স্মরণ আছে তাঁরাই বলবেন যে তিনি দর্শককে ঠিক দর্শক হিসেবে দেখতেন না। বয়োবৃদ্ধরা ভীষণ চটতেন, তাঁদের মতে অমরবাবু রঙ্গালয়ের গাম্ভীর্য্য ও ভদ্রতা নষ্ট করছেন। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে ঐ রুচি বৈলক্ষণ্যের যথার্থ হেতু ধরা পড়বে। একবার অমরবাবু হ্যাণ্ডবিলে লিখেছিলেন যে তিনি বনের মধ্যে থিয়েটার করলেও লোকে কাতারে কাতারে আসবে। এর মধ্যে দম্ভ নিশ্চয় ছিল। কিন্তু সেটা কেবল রক্তের নয়। তার মূলে ছিল দর্শকের মনের ওপর তাঁর সহজ অধিকার। সহজ অধিকার বড় অভিনেতা মাত্রেরই থাকে। এটা তার চেয়েও বেশী অহঙ্কার। সে অহঙ্কারের প্রেরণা এই যে তিনি জন-সাধারণের মন জয় করেছিলেন। জনসাধারণ দর্শকের চেয়ে ব্যাপক সংজ্ঞা, দর্শক রঙ্গমঞ্চের মধ্যেকার সমষ্টি, জনসাধারণ দর্শনের পরেও থাকে। এই জনসাধারণ গোটাকয়েক জিনিষ চায়, রঙ্গমঞ্চের কাছ থেকে সেই সব জিনিষের তীব্রতর অভিজ্ঞতা প্রত্যাশা করে, এবং এই সব প্রত্যাশা নিয়ে তারা রঙ্গালয়ে আসে। সাধারণের তীব্রতা আনে 'play'। লোকের play-sense থাকতেও পারে, নাও পারে, কিন্তু তারা যখন দর্শক হয়, তখন তাঁরা playই প্রত্যাশা করে।

যে নট কিংবা নাট্যকার সেটা পূরণ করে তারই play sense আছে। বড় অভিনেতাদের মধ্যেও অনেকের এটি থাকে না। অমরবাবুর ছিল।...

অমরবাবুর সমগ্র ব্যবহারে, অতএব রঙ্গালয়ে একটা প্রতিভার ছাপ ছিল। রঙ্গালয়ের অমরেন্দ্রনাথ ও বাইরের জগতের অমরেন্দ্রনাথ একই ব্যক্তি, তেজে, আত্মবিশ্বাসে, সরলতায়, উদারতায়, যেমন অসংযম, অবিমৃষ্যকারিতা প্রভৃতি অসদ্‌গুণে ...

তাঁর আবৃত্তির ভদ্র উচ্চারণে, তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনায় যেমন তাঁর ব্যক্তিগত আভিজাত্য ধরা প ড়ত, তেমনই নটনটীদের প্রতি সক্রিয় ভালবাসার, ঘোষণাপত্রের ভাষায়, রঙ্গালয়ের সাজ-সজ্জার আড়ম্বরে, তাঁর 'বাবু' নামে তাঁর প্রতি অন্যের ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধায় যেটা ছিল সেটা তাঁর নিজস্ব, অর্থাৎ দিলদরিয়া মেজাজ। আরেকটি কথা তার প্রমাণ আমার নিজের কাছে—তাঁর সমগ্র অভিনয় দেখে আমার মনে হত—একটা অতিরিক্ত শক্তি—ঐশী নয়, নিয়তি বোধ হয়, তাঁর ওপর কাজ করছে। একটা অন্ধভাব, স্বপ্নমাখা জড়তা তাঁর অভিনয়ে ছিল। মধ্যে মধ্যে জেগে উঠতেন, তখন কণ্ঠে হুঙ্কার আসত, সেটা বেশী হত একটু, কিন্তু ঝোঁকটা যেন স্বপ্ন ভাঙ্গবার পরের, কোনো অদৃশ্য শক্তিকে যুদ্ধং দেহি আহ্বানের। সেইজন্যই বোধ হয় তাঁর চ্যালেঞ্জ, Defiance, অভিমান প্রভৃতি মনোভাবমূলক অভিনয় অত্যন্ত ভাল হত। জীবনেও ঠিক দেখি, যেন একটা অদৃশ্য শক্তি তাঁকে নিয়ে চলেছে, তিনি কখনও সজ্ঞান, কখনও অজ্ঞান। সম্পূর্ণ জ্ঞানী নন, তাই তিনি মহান নন, আবার নিয়তি তাঁকেই বেছে নিলে এবং তিনিও বিদ্রোহ করছেন এই জন্যই তিনি অসাধারণ। সে যাই হোক, অমরবাবুর জীবনে ও কর্ম্মে কোন ভেদ ছিল না, তাই ভদ্র সংস্কার ভেঙ্গেও তিনি ভদ্র, যদিও দুঃসাহসী। জীবিত থাকলে এই অসাবধানী পুরুষ অ-সহযোগ আন্দোলনে যোগ দিতেন এবং পরে ওয়ার্দ্ধা কিংবা কাশীবাসী হতেন।

আমাদের বয়সী লোকেরা এক রকম অমর দত্তের যুগের লোক। মুস্তাফী মহাশয়, গিরীশ বাবু, অমৃত মিত্তিরকে আমরা অভিনয় করতে দেখেছি বটে, কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহের পরিচয়ে তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ একটু দূরই ছিল। অমৃতলাল বসুকে আমরা প্রধানত নাট্যকারই জানতাম, যদিও তাঁর নিমচাঁদ, ঠাকুর্দা প্রভৃতির অভিনয় খুবই ভাল লাগত। আমাদের সময় দুজন মাত্র নট দর্শকের মন জয় করেছিলেন, দানি বাবু ও অমর বাবু। নটীদের মধ্যে প্রথমে তিনকড়ি, পরে তারাসুন্দরী এঁরাই সত্যকারের প্রথম শ্রেণীর, অন্যের পটুত্ব ছিল,

বিশেষ অংশের। সহরের যুবক-সম্প্রদায়, গ্রামের লোক ও ডেলী প্যাসেন-জারদের মধ্যে তর্ক উঠত দানিবাবু বড় না অমরবাবু বড়! সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বাইরে অনেক ভাল অভিনেতা ছিলেন, তাঁরাও হয় অমরবাবু না হয় দানি বাবুর ঢঙে অভিনয় করতেন।…”

---০:০*০:০---

সতেরো

অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কয়েক বছরের মধ্যে স্টার থিয়েটারে কয়েকবার কর্তাবদল হল। ১৯২০ সালে, দেখতে পাচ্ছি, স্টার থিয়েটার ইজারা নিয়ে চালাচ্ছেন অপরেশচন্দ্র। তাঁকে সাহায্য করছেন প্রবোধচন্দ্র গুহ ও তারাসুন্দরী।

যে যাই করুক, স্টার থিয়েটারে আর সুদিনের দেখা নেই। দিনের পর দিন অবস্থা বরং খারাপ হচ্ছে।

ওদিকে আরেক শোক-সংবাদ বলা হয় নি, গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর অল্পকাল পরে মহেন্দ্রকুমার লোকান্তরিত হলেন। অনেক আগেই বলা হয়েছে, মহেন্দ্রকুমার মিনার্ভা চালাচ্ছিলেন। মহেন্দ্রকুমারের মৃত্যুর পর মনোমোহন পাঁড়ে এসে মিনার্ভা চালাতে লাগলেন।

মহেন্দ্রকুমারের ভাইয়ের নাম উপেন্দ্রকুমার। তিনি মনোমোহনের নামে মামলা করলেন। আদালতে মামলা চলছে, চলুক, তা বলে মিনার্ভা বন্ধ হয়ে নেই। মিনার্ভায় অভিনয় চলছে।

আরও একটা বলবার মত ঘটনা আছে। কোহিনুরের থিয়েটারবাড়ি বিক্রি হয়ে গেল। কিনে নিলেন মনোমোহন পাঁড়ে। দাম লাগল একলাখ এগারো হাজার টাকা।

মনোমোহন পাঁড়ে প্রথমে কিছুদিনের জন্যে বাড়িটি ভাড়া দিয়ে দিলেন এলফিনস্টোন বায়স্কোপ কোম্পানিকে; তারপর ১৯১৫ সালের ৭ই আগস্ট কোহিনুরের বাড়িতে মিনার্ভা থিয়েটারের নামে 'কালাপাহাড়' আর 'রূপের ফাঁদে'র অভিনয় হল। কোহিনুরের বাড়িতে মিনার্ভার নামে পর-পর আরও কয়েকখানা পালার অভিনয় হল।

কোহিনুরের বাড়িতে নতুন মিনার্ভা খোলা হল, তাহলে আদি মিনার্ভার কী গতি হবে? উপেন্দ্রকুমার হাইকোর্টে দরখাস্ত করলেন। হাইকোর্ট থেকে

মনোমোহন পাঁড়েকে হুকুম দেওয়া হল, 'মিনার্ভা' নাম বাইরে কোথাও ব্যবহার করা চলবে না।

অতএব নতুন থিয়েটারের নতুন নাম রাখলেন মনোমোহন পাঁড়ে। নিজের নামে থিয়েটারের নাম হল। মনোমোহন থিয়েটার। ১৯১৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর মনোমোহন থিয়েটারে প্রথম অভিনয় হল।

আর মিনার্ভা থিয়েটার চালাতে লাগলেন উপেন্দ্রকুমার মিত্র।

তারপর ১৯২১ সালের গোড়ার দিকে চলে আসি।

না, বাঙলা নাট্যশালা নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই। তিনটি বাঙলা নাট্যশালা তখন কলকাতায়---মনোমোহন, স্টার ও মিনার্ভা। কিন্তু কোথাও কোনও সৃজনপিপাসু সক্ষম নাট্যশিল্পীর আবির্ভাব নেই। দানীবাবু তখন নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বিখ্যাত অভিনেতা, কিন্তু তিনি জরাজর্জর, নতুনত্বহীন। তাঁর নামের জোরেই যদিও মনোমোহন থিয়েটারে দু-পয়সা আয়-আদায় হচ্ছে, কিন্তু সন্দেহ নেই, দানীবাবু তখন তাঁর নিজেরই অতীতের প্রেতাত্মা, নিজেকেই দানীবাবু নিজে বারংবার অনুকরণ করে যাচ্ছেন। বাঙলা নাট্যশালায় তখন অলীক কুনাট্য রঙ্গ।

বাঙলা নাট্যশালার এই দুর্দশার দিনে পারসী ম্যাডান কোম্পানি একটা বাঙলা থিয়েটার খুলে ফেলল --বেঙ্গলী থিয়েট্রিক্যাল কোং। ম্যাডান কোম্পানি ভাবল, ফষ্টি-নষ্টি দেখিয়ে বাঙলা দেশ থেকে দিব্যি দু-পয়সা রোজগার করা যাবে। কিন্তু ম্যাডান কোম্পানি ভুল ভেবেছিল। ফষ্টি-নষ্টি দেখিয়ে বাঙালী দর্শককে ভোলান গেল না। ম্যাডান কোম্পানির বাঙলা থিয়েটার ডুবে যায় আর কি।

ম্যাডান কোম্পানির তখন চোখ পড়ল শিশিরকুমারের ওপর। হ্যাঁ, শিশির-কুমার ভাদুড়ী।

শিশিরকুমারের বাবার নাম হরিদাস ভাদুড়ী। শিশিরকুমারের জন্মদিন ২রা অক্টোবর, ১৮৮৯ সাল।

ছেলেবেলা থেকেই শিশিরকুমারের থিয়েটার দেখার অভ্যাস। বাড়িতে না জানিয়ে। লুকিয়ে-লুকিয়ে। সঙ্গী হত এক জ্যেঠতুতো ভাই, নাম গিরীন ভাদুড়ী। থিয়েটার দেখার পয়সা পাওয়া যেত কোথায়? আর কোথায়, জলখাবারের পয়সা জমিয়ে থিয়েটার দেখতে হত। এমন কায়দায় বিছানা সাজিয়ে রেখে যেত যেন দু-ভাই বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে!

অবশ্যি এ-চালাকি চিরকাল চলে না। একদিন ধরা পড়ে যেতে হয়। ধরা পড়ে যেতে হল।

শিশিরকুমারের বাবা ছিলেন এক্সিকুটিভ ইঞ্জিনিয়ার। জ্যোতিষ জানতেন। সব জেনে-শুনে তিনি বললেন----বাধা দিয়ে কোনও লাভ নেই। ভবিষ্যতে ও একজন নামী অভিনেতা হবে।

ভবিষ্যতের কথা এখন নয়। এখন তো একদিন থিয়েটার দেখতে গিয়ে মহাবিপদ। পয়সা কম পড়েছে। যা পয়সা পকেটে আছে, তাতে দু-খানা টিকিট হয় না।

তখন অগত্যা টিকিটঅলাকে ধরে পড়ল দু-ভাই।---আজ আমাদের থিয়েটারে ঢুকিয়ে দিন। পয়সা কম পড়েছে, পরে একদিন এসে টিকিটের বাকি দাম শোধ করে দেব।

এ তো ভারি আশ্চর্য কথা। টিকিটঅলা দু-ভাইকে ধরে নিয়ে গেল ম্যানেজারের কাছে। ওই থিয়েটারের ম্যানেজার তখন অমৃতলাল বসু। যেমন থাকবার কথা, অমৃতলাল গড়গড়া নিয়ে বসে আছেন।

অমৃতলাল দু-ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন----এত অল্প বয়সে থিয়েটার ছাখ তোমরা, টিকিটের পয়সা পাও কোথায় ?

আমরা জলখাবার খাই না। জলখাবারের পয়সা জমিয়ে থিয়েটার দেখি।

অমৃতলাল বললেন----না, আর কখনও এভাবে থিয়েটার দেখতে আসবে না। এত অল্প বয়সে থিয়েটার দেখা ভাল নয়। জলখাবারের পয়সা জমিয়ে থিয়েটার দেখবে না, জলখাবারের পয়সায় জলখাবার খাবে। বুঝলে ?

ফিরে আসতে হল সেদিন। মুখ নিচু করে ফিরে আসতে হল। কিন্তু অমৃতলাল কি সেদিন ঘুণাক্ষরেও ভেবেছিলেন যে যাদের তিনি ফিরিয়ে দিলেন তাদের মধ্যে একজন থিয়েটার থেকে ফিরে যেতে আসে নি, থিয়েটারে সে চিরকাল থাকতে এসেছে ?

১৯০৫ সালে বঙ্গবাসী স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করেছেন শিশিরকুমার। গ্রাজুয়েট হয়েছেন স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে, ১৯১০ সালে।

প্রচুর পড়াশোনা করতেন শিশিরকুমার, বিস্তর বিখ্যাত বই শিশিরকুমারের নখমুকুরে, কিন্তু পরীক্ষার জন্যে অবশ্যপাঠ্য বইগুলো শিশিরকুমার তেমন পড়তেন না। ১৯১৩ সালে শিশিরকুমার ইংরেজীতে এম. এ. পাশ করলেন, কিন্তু সেবারেও শিশিরকুমার সব পাঠ্যবই নিজে পড়েন নি। অম্বিকা মল্লিক নামে

আরেকজন ছাত্র একঘরে বসে পড়ে যেতেন, তা শুনেই শিশিরকুমারের পড়ার কাজ হয়েছে।

শিশিরকুমারের বাবার ইচ্ছা, শিশিরকুমার হাইকোর্টের উকিল হয়। ল-ক্লাসে ভর্তি হতে হয়েছে তাই শিশিরকুমারকে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ল-পরীক্ষার সময় শিশিরকুমার অকাতরে বন্ধুদের মেসে দিবানিদ্রা দিয়েছেন। তারপর ঘুম থেকে উঠে কোনও একজন পরীক্ষার্থীর থেকে একখানা কালিমাখা প্রশ্নপত্র নিয়ে বাবার কাছে গিয়ে হাজির হয়েছেন। শিশিরকুমার যে ফাঁকি দিচ্ছেন না, ঘটা করে ল-পরীক্ষা দিচ্ছেন, ওই কালিমাখা প্রশ্নপত্রই তো তার অকাট্য প্রমাণ!

বাবার মৃত্যুর পর আর কোনও লুকোচুরির দরকার রইল না। সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়ল। শিশিরকুমারকে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে অধ্যাপকের চাকরি নিতে হল। মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন মানে এখনকার বিদ্যাসাগর কলেজ।

প্রায় নিত্য নতুন পোশাকে কলেজে যেতেন শিশিরকুমার। প্যান্টকোট পরে কলেজে যেতেন। কালো রঙের একটা গোল টুপি পরতেন। নেকটাই বদল করতেন প্রত্যেকদিন। সব সময় হাসিমুখ। চমৎকার পড়াতেন।

শুনতে পাই, দু-বছরের একটিমাত্র ছেলে রেখে শিশিরকুমারের স্ত্রী আত্মহত্যা করেছিলেন। শিশিরকুমার তখন ওই কলেজের অধ্যাপক।

শিশিরকুমার ক্লাসে ছাত্রদের ইংরেজী রচনা লিখতে শেখাতেন পুরোপুরি নতুন নিজস্ব ভঙ্গিতে। উদাত্তকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের একেকটি কবিতা আগাগোড়া আবৃত্তি করে ছাত্রদের বলতেন—যা শুনলে তার ভাবার্থ ইংরেজীতে লেখ।

সেসময়ে শিশিরকুমার ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকের নোট লিখতেন। শিশিরকুমারের নোটের ইংরেজীতে ভুল আছে—এই মর্মে একবার একখানা প্যাম্ফলেট বেরোল। প্যাম্ফলেটখানা লিখলেন জে. এল. ব্যানার্জি। ভুল? কিন্তু কার ভুল? অবিলম্বে আরেকখানা প্যাম্ফলেট বেরোল; শিশিরকুমার প্রমাণ করলেন যে তিনি কোনও ভুল করেন নি, জে. এল. ব্যানার্জিই ভুল করে ভুল ধরেছেন।

ক্লাসে পড়াতে-পড়াতে শিশিরকুমার একদিন নজর করলেন, কে একটি ছাত্র ঘুমোচ্ছে। শিশিরকুমার মাথা উঁচু করে বারবার ঘুমন্ত ছাত্রটির দিকে তাকালেন। যা হয়ে থাকে সচরাচর, পাশের একটি ছাত্র ঘুমন্ত ছাত্রটিকে জাগিয়ে দিল। সদ্য ঘুম-ভাঙা-ছাত্রটিকে শিশিরকুমার মৃদুহেসে জিজ্ঞেস করলেন—Were you sleeping?

ছাত্রটি বলল—No, Sir.

শিশিরকুমার আবার হাসলেন। বললেন— Oh, I beg yur pard o n.

কথাটি এমন কিছু নয়, কিন্তু বলবার ভঙ্গিটি এমন যে ক্লাসসুদ্ধ সকলে সমস্বরে হেসে উঠল।

আরেকদিন। ক্লাসের একটি ছাত্র শিশিরকুমারকে একটি ইংরেজী শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করল। শব্দটি চলতি নয়। শব্দটির অর্থ শিশিরকুমারের জানা নেই। কিন্তু শিশিরকুমার বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হলেন না, বললেন—Do I look like a dictionary ?

ছাত্রাবস্থায় একাধিক নাট্যাভিনয়ে অংশ নিয়েছেন শিশিরকুমার। অধ্যাপক-জীবনেও মঞ্চে দেখা দিয়েছেন। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে অভিনয় করেছেন, ওল্ড ক্লাবের সভ্য হয়ে অভিনয় করেছেন। ইংরেজী বাঙলা নানা নাটকে অভিনয় করেছেন। বলা বাহুল্য, সেসব অভিনয় শিশিরকুমার শৌখীন শিল্পীরূপে করেছেন। কয়েকটি ভূমিকার নাম করি: 'জুলিয়াস সিজারে' ব্রুটাস; 'হ্যামলেটে' রাজা, প্রেতাত্মা; 'ম্যাকবেথে' ম্যাকবেথ; 'কুরুক্ষেত্রে' অভিমন্যু; 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় কেদার, তিনকড়ি, অবিনাশ; 'রাণা প্রতাপে' আকবর; 'বুদ্ধদেবে' বুদ্ধদেব; 'চন্দ্রগুপ্তে' চাণক্য; 'জনা'য় প্রবীর; 'অশোকে' অশোক; 'ভীষ্মে' পরশুরাম; 'পুনর্জন্মে' অশ্বিনী, সৌদামিনী।

১৯১২ সালের গোড়ার দিকে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের জুনিয়র মেম্বাররা রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র অভিনয় করেছেন। শিশিরকুমার কেদার সেজেছেন। সেই অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র এমন সুনিপুণ অভিনয় এক আমাদের বাড়িতে গগন অবনদের ছাড়া আর কারুরই পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেদার আমার ঈর্ষার পাত্র। একদা ঐ পার্টে আমার যশ ছিল।

হ্যাঁ, একদা ওই কেদারের পার্টে রবীন্দ্রনাথের যশ ছিল। এককালে 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র শৌখিন অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, মতিলাল চক্রবর্তী আর নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ। একদিন এঁদের 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র অভিনয় দেখে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র। বলেছিলেন—এ রকম অ্যাক্টার সব যদি আমার হাতে পেতাম তবে আগুন ছিটিয়ে দিতে পারতাম।

আবার শিশিরকুমারের কথায় ফিরে আসি।

১৯২১ সালের মাঝামাঝি একদিন 'ওল্ড ক্লাব' স্টারের আসরে 'পাণ্ডবের

অজ্ঞাতবাস' করল। শিশিরকুমার সেদিন 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে' অভিনয় করেছেন। শৌখীন শিল্পীরূপে সেই শিশিরকুমারের শেষ অভিনয়। সেই অভিনয় সম্পর্কে ১৯২১ সালের ২৫শে জুন 'হিন্দুস্থান' লিখেছে ঃ

"সেদিন আমরা স্টার রঙ্গালয়ে, "ওল্ড ক্লাবে"র সভ্যগণের দ্বারা অভিনীত গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" দেখিতে গিয়াছিলাম।

আজকাল বাঙ্গালীর অভিনয়-শক্তির সম্বন্ধে নানা কারণে আমাদের মনে সন্দেহ জন্মিয়াছিল। সখের অভিনেতার কথা দূরে থাক, এখনকার প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে অভিনয় যাঁহাদের পেশা, তাঁহাদেরও অধিকাংশের অভিনয় দেখিয়া অনেকবারই আমাদের গায়ে দস্তুর মতন জ্বর আসিবার উপক্রম হইয়াছে। সেই মুখোসের মতন স্থির মুখ, পাথরের পুতুলের মতন আড়ষ্ট দেহ, সংযমহীন, বিকৃত ও উচ্চ কণ্ঠস্বর এবং ভ্রমপূর্ণ অসঙ্গত শব্দোচ্চারণ আমাদের মনকে যথেষ্ট দমাইয়া দিয়াছে এবং বঙ্গ রঙ্গালয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা যার-পর নাই হতাশ হইয়া পড়িয়াছি।

প্রকাশ্য পেশাদার থিয়েটারের যখন এ-হেন অবস্থা, তখন কোন সখের নাট্য সম্প্রদায়ে যে অভিনয়-কলার বিশেষ বিকাশ দেখিতে পাইব, এমন দুরাশা আমরা স্বপ্নেও করি নাই। কেবল এক বন্ধুর উচ্ছ্বসিত উৎসাহে কৌতূহলী হইয়া সেদিন আমরা ষ্টার রঙ্গালয়ে গমন করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, দুই-একটা দৃশ্য দেখিয়াই চলিয়া আসিব।

কিন্তু গিয়া যাহা দেখিলাম, সত্যই তাহা আশাতিরিক্ত! পেশাদারী অভিনয় দেখিতে গিয়া আমাদের মন ক্রমাগত পালাই-পালাই করিয়াছে;—বিদ্রোহী মনকে কোনরকমে দমন করিয়াই সে অভিনয়ের তিক্তরস ঔষধের মতন অনিচ্ছায় আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সেদিন "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে"র মতন একখানি বহু-পুরাতন নাটকের অভিনয় (তাও সখের নাট্য-সম্প্রদায়ের দ্বারা অভিনীত) দেখিতে গিয়া, বিশেষ একটি জরুরি কাজ থাকা সত্ত্বেও আমরা কিছুতেই উঠিয়া আসিতে পারি নাই, মন্ত্রমুগ্ধের মতন বসিয়া বসিয়া আমরা অভিনয় দেখিয়াছি। এর চেয়ে আর বেশী প্রশংসা কি আছে, আমরা তা জানি না।...

ভীমের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন ঃ শ্রীযুত শিশির ভাদুড়ী। ভাল অভিনেতা বলিয়া অনেকদিন আগেই আমরা তাঁহার সুখ্যাতি শুনিয়াছি—যদিও তাঁহার অভিনয় দেখার সৌভাগ্য এর আগে আমাদের হয় নাই। কিন্তু পরের মুখে ঝাল-

খাওয়ায় আমাদের আপত্তি ছিল বলিয়া সে সুখ্যাতিতে আমরা আস্থা স্থাপন করি নাই। সেদিন শিশিরবাবুর অভিনয় দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের সকল সন্দেহ ঘুচিয়া গিয়াছে। কীচকের কবলে দ্রৌপদীর অপমান দেখিয়া ছদ্মবেশী ভীম যখন যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে আত্মপ্রকাশ করিতে গিয়াও করিতে পারিতেছেন না (দ্রৌপদীর সকাতর অনুনয় ও অভিমানেও নয়), তখনকার সময়োপযোগী নিষ্ফল আক্রোশ এবং রুদ্ধ ক্রোধাবেগের ভাব শিশিরবাবু চমৎকার অতি চমৎকার ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে, শিশিরবাবুর অভিনয়-ক্ষমতা এমন অপূর্ব্ব যে, বর্ণনায় তাহা বুঝাইবার নয়।...

সর্ব্বশেষে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পেশাদারী রঙ্গালয়েও আজকাল কোন নাটকের এতটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও স্বাভাবিক অভিনয় আমরা দর্শন করি নাই।"

শৌখিন অভিনেতা হিসেবে শিশিরকুমারের তখন খুব নামডাক। ম্যাডান কোম্পানির ডাক এসে পৌঁছল শিশিরকুমারের কাছে। শিশিরকুমার সে-ডাকে সাড়া দিলেন। অধ্যাপকের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি রঙ্গালয়ের চাকরিতে চলে এলেন।

শিশিরকুমার বন্ধুদের বললেন—অধ্যাপনায় কোনদিনই পেট ভরবে না। অভিনেতা হিসেবে আমার যখন বাজারে চাহিদা আছে, আমি কেন সে-সুযোগ নেব না।

১০ই ডিসেম্বর, ১৯২১ সাল। সেদিন ম্যাডান কোম্পানির বাঙলা থিয়েটারে প্রথম 'আলমগীর' অভিনীত হল। নামভূমিকায় শিশিরকুমার। আলমগীরের ভূমিকায় অনিন্দ্যসুন্দর অভিনয় করলেন শিশিরকুমার। সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই শিশিরকুমার জনচিত্ত জয় করে নিলেন। উত্তরকালে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী লিখেছেন ঃ

'আলমগীর যেদিন খোলা হয় সেদিনকার কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। ইংলণ্ডের রাজপুত্র ভারতবর্ষে আসায় সমস্ত ভারতবর্ষ নানাভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করছিল। সেইদিন তিনি কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। চৌরঙ্গী অঞ্চলে ও সাহেবপাড়ায় ফুটল আলোর জৌলুষ আর দিশি পাড়ায় রৈল অন্ধকার। রাস্তায় একটিও গ্যাস জ্বলছে না। কোথা থেকে অ্যাসকেণ্টের চাঙড় তুলে এনে সমস্ত কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট জুড়ে ট্রামের লাইনের ধারে ও ওপরে সারি সারি করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফুটপাথের কোণের ডাষ্টবিন রাস্তার মধ্যখানে এসেছে। গাড়ী

নেই, ট্রাম নেই—ঘুটঘুটে অন্ধকার----রাস্তায় লোকজনও বিরল।...মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে ম্যাডান থিয়েটারের কাছে খুব মারামারি চলেছে।...কিন্তু পরে শোনা গেল—বিশেষ কিছু গোলমাল হয়নি, তবে দর্শকও সামান্যই হয়েছিল। এইভাবে আলমগীরের প্রথম রজনী অভিনীত হল।

কয়েকদিন পরে আমরা গুটিকয়েক বন্ধু দুপুরবেলার শো'তে আলমগীর দেখতে গেলুম। নির্দিষ্ট সময়ের আধঘণ্টা পৌনে একঘণ্টা আগে গিয়েও দেখলুম প্রেক্ষাগৃহ একেবারে জনপূর্ণ।...কর্তৃপক্ষ নির্বিকার----তখনও টিকিট বেচে চলেছে—দলে দলে লোক ঢুকছে। যাই হোক ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে যবনিকা উঠল।

প্রথম দৃশ্যেই শিশির এমন চমক লাগিয়ে দিলে যে দর্শক সাধারণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। তারপরে দৃশ্যের পর দৃশ্য চলতে লাগল। সমস্ত ষ্টেজখানা জুড়ে কেবল শিশির আর শিশির। অন্যান্য অভিনেতা ও অভিনেত্রী আসছে যাচ্ছে কিন্তু লোকে উদ্‌গ্রীবভাবে প্রতীক্ষা করছে শিশিরের। মনে হতে লাগল যেন এক অতুলনীয় শক্তিশালী যাদুকর তার মায়াজাল বিস্তার করেছে। পেক্ষাগৃহের প্রত্যেকটী লোক সে মায়ায় মুগ্ধ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে আছে।

আশ্চর্য্য কণ্ঠস্বর। অদ্ভুত সে কণ্ঠস্বরের ব্যঞ্জনা! অপূর্ব স্বরনিয়ন্ত্রণ শক্তি। আলমগীর নাটকের শেষ দৃশ্যে সম্রাট ঔরঙ্গজেব যখন রাণা রাজসিংহের কৌশলে দোবারীর গিরিবর্ত্মে সসৈন্যে আটকা পড়েছিলেন সেই সময় কয়েকদিনের অনাহারে তৃষ্ণায় কণ্ঠতালু শুষ্ক অবস্থায় শিশিরের সেই কণ্ঠস্বরের অভিব্যক্তি বোধ হয় পৃথিবীর যে কোন অভিনেতার পক্ষে গৌরবের কথা।

আমি হেনরি আরভিং, স্যার বীরভোম ট্রি বা কাচালফের অভিনয় দেখিনি কিন্তু আমাদের সময়ের সেক্সপীরীয় নাটকের সব থেকে বড় অভিনেতা ম্যাথিসন ল্যাং-এর হ্যামলেট, শাইলক ও ওথেলো দেখেছি। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি শিশিরের এই আলমগীর অভিনয় তাকেও নিঃসন্দেহে ছাড়িয়ে উঠেছিল।...'

তারপর শিশিরকুমার ১৯২২ সালের ১১ই মার্চ 'রঘুবীরে' রঘুবীর সাজলেন, ১৯২২ সালের ১লা জুলাই 'চন্দ্রগুপ্তে' চাণক্য সাজলেন। শিশিরকুমার যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী, এ-সত্যে কারো কোন সংশয় রইল না।

ম্যাডান কোম্পানি শিশিরকুমারকে নিয়ে আসার কিছুদিন পরেই মিনার্ভা থিয়েটার দুজন নতুন শৌখীন অভিনেতাকে সাদরে দলে ভর্তি করে নিল। নরেশচন্দ্র মিত্র আর রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

সেসময়ে শিশিরকুমার বলেছেন—নরেশ একজন গ্রেট আর্টিষ্ট

আর রাধিকানন্দ ? শিশিরকুমার বলেছেন—ভাল অভিনেতা।

যা-হোক, ম্যাডান কোম্পানি শিশিরকুমারকে বেশিদিন ধরে রাখতে পারল না।

এখানে একটা ঘটনা আছে।

রাজপুতনার ছোট এক ভুঁইয়ার বাড়ির একটি দৃশ্য আছে 'আলমগীরে'। ছোট এক ভুঁইয়ার বাড়ির দৃশ্যপট যেমন হওয়া উচিত, শিল্পীকে নির্দেশ দিয়ে শিশিরকুমার তেমনি একখানা দৃশ্যপট আঁকিয়ে নিলেন। কিন্তু কোম্পানির মালিক রুস্তমজী সেটা ঘোরতর অপছন্দ করলেন। বললেন—এ কি। আমি এক কোটি টাকা মূলধন নিয়ে যে থিয়েটার চালাতে যাচ্ছি তার দৃশ্যপট হবে এ-রকম ! এ হবে না, হবে না, সোনে লাগাও।

অর্থাৎ সোনা দিয়ে মুড়ে দিতে হবে। সত্যিই তো, যে-থিয়েটারের মূলধন এক কোটি টাকা, তার দৃশ্যপটে হোক না ছোট এক ভূঞার বাড়ির দৃশ্যপট—সোনা না থাকলে চলে কী করে ! শুধু সোনা কেন, সোহাগা থাকলে আরও ভাল হয় নিশ্চয়ই। সোনায় সোহাগায় এক কোটি টাকা মূলধনের থিয়েটার জমজমাট হয় তাহলে !

এই কোম্পানির হাতে বাঙলা থিয়েটারের ভার থাকলে তার ফল যে শুভ হবে না, সেকথা অনুভব করতে শিশিরকুমারের দেরি হয় নি।

শিশিরকুমার ম্যাডান কোম্পানির চাকরি ছেড়ে দিলেন। ম্যাডান কোম্পানি তখন নিয়ে এল নির্মলেন্দু লাহিড়ীকে।

একটা দুঃসংবাদ আছে এখানে। মিনার্ভার বাড়ি আগুনে পুড়ে গেল ১৯২২ সালের ১৮ই অক্টোবর। কিছুকাল এখানে-ওখানে ঘুরে-ঘুরে অভিনয় দেখাল মিনার্ভার দল, প্রায় তিনবছর পর নতুন বাড়ি উঠল, মিনার্ভা আবার আপন জায়গায় ফিরে এল।

কিন্তু তার আগে একটা সুসংবাদ আছে। 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড' নামে একটা নতুন কোম্পানি হয়েছে। বলা বাহুল্য হবে না, অপরেশচন্দ্র আর প্রবোধচন্দ্রের উদ্যোগেই এই নতুন লিমিটেড কোম্পানিটির জন্ম হয়েছে। এই কোম্পানির পরিচালনার ভার নিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সেন, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও কুমারকৃষ্ণ মিত্র। কিছুদিন বাদে ভূপেন্দ্রনাথ চলে গেলেন, তাঁর জায়গায় এলেন গদাধর মল্লিক।

স্টার থিয়েটারের স্বত্ব আর সাজ-সরঞ্জাম এই লিমিটেড কোম্পানি কিনে নিল পঞ্চাশহাজার টাকায়। নগদ পঁচিশ হাজার আর শেয়ারে পঁচিশ হাজার। আর কোম্পানিতে চাকরি পেলেন অপরেশচন্দ্র আর প্রবোধচন্দ্র। প্রবোধচন্দ্র হলেন আর্ট থিয়েটারের সেক্রেটারি। অপরেশচন্দ্র হলেন আর্ট থিয়েটায়ের নাট্যকার, নাট্যাচার্য ও ম্যানেজার।

১৯২৩ সালের ৩০শে জুন স্টারের আসরে আর্ট থিয়েটারের যাত্রারম্ভ হল। 'কর্ণার্জুন' নিয়ে আরম্ভ হল। খুব জনপ্রিয় হল 'কর্ণার্জুন', বিপুল গৌরবে চলতে লাগল আর্ট থিয়েটার। এই 'কর্ণার্জুনে'ই প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে দেখা দিয়েছেন কয়েকজন নতুন তরুণ অভিনেতা ঃ তিনকড়ি চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী, ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

জরাজর্জর বাঙলা নাট্যশালা নতুন করে নটদেবতার আশীর্বাদ পেল! বাঙলা নাট্যশিল্পে নতুন যুগের ভূমিকা রচিত হল। নতুনের কেতন উড়ল। নতুনের জয়ধ্বনি শোনা গেল।

কিন্তু শিশিরকুমার যদি সর্বাগ্রে সাধারণ রঙ্গালয়ে না আসতেন, তাহলে? তাহলে কি এমন করে নতুনের কেতন উড়ত, এমন করে নতুনের জয়ধ্বনি শোনা যেত?

নির্মলেন্দু লাহিড়ী তো স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন---শিশিরবাবু আগে না এলে পাবলিক থিয়েটারে যোগ দেবার সাহস আমাদের হতো না।

নাট্যশালার চরম দুর্দশার মুহূর্তে নটদেবতা প্রসন্ন হয়েছেন। কয়েকজন তরুণ নাট্যশিল্পী নতুন যুগ নিয়ে এসেছেন বাঙলার নাট্যলোকে। বাঙলার নাট্যশালাকে তাঁরা মুক্তি দিয়েছেন আশঙ্কা থেকে, হতাশা থেকে, হাহাকার থেকে, গতানুগতি থেকে। এই নতুন যুগ যাঁরা এনেছেন, বাঙলা নাট্যশিল্পের ইতিবৃত্তের একটি বিশেষ অধ্যায় তাঁদের কৃতিত্বে চিরকালের জন্যে সমুজ্জ্বল হয়ে রইল।

কিন্তু কিছুতেই একথা ভুললে চলবে না, বিশেষ করে শিশিরকুমারই এই নতুন যুগের প্রবর্তক। শিশিরকুমারই পুরোবর্তী, শিশিরকুমারই অগ্রদূত। তাই আপাতত বিশেষ করে শিশিরকুমারের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হই।

১৯২৩ সালের কথা। ইডেন গার্ডেনে মস্ত একজিবিশন হচ্ছে, সেখানে অভিনয় করার জন্যে ডাক পেলেন শিশিরকুমার। শিশিরকুমার ঠিক করলেন, একজিবিশনে

দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' অভিনয় করবেন। নতুন একটি দল গড়ে তুললেন শিশিরকুমার। সেই দলে ছিলেন ললিতমোহন লাহিড়ী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, রবি রায়, জীবন গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও কেউ-কেউ।

অভিনয়ের জন্যে একটি ক্ষণস্থায়ী মঞ্চ বাঁধা হল ইডেন গার্ডেনে। বিজ্ঞাপিত হল: 'ক্ষণস্থায়ী রঙ্গমঞ্চের জন্য গঠিত হইলেও এই অভিনয় ক্ষণভঙ্গুর হইবে না—ইহার স্মৃতি যাহাতে বহুদিন পর্য্যন্ত দর্শকদের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে তাহার সমস্ত আয়োজন ইহাতে আছে—কোথাও কার্পণ্য নাই।'

প্রয়োগনৈপুণ্যে ও অভিনয়গুণে আশাতীত লোকপ্রিয় হল দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'। শিশিরকুমার সাব্যস্ত করলেন, দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নিয়েই তিনি সাধারণ নাট্যশালায় স্বাধীনভাবে দেখা দেবেন।

অতএব আলফ্রেড থিয়েটার (এখন সেখানে গ্রেস-সিনেমাহল) ভাড়া নেওয়া গেল। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' অভিনয়ের দিন-তারিখ পর্যন্ত বিজ্ঞাপিত হল।

কিন্তু, হায়, দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' শিশিরকুমারের হাতছাড়া হয়ে গেল। শিশিরকুমারের অজ্ঞাতে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'র অভিনয়স্বত্ব কিনে নিল আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ। সেসময়ে শিশিরকুমার বলেছেন: ওঁরা 'সীতা' অভিনয় করবার জন্যে নেয় নি, আমাকে জব্দ করবার জন্যে নিয়েছে।

শিশিরকুমার মিথ্যে বলেন নি।

যা হবার হল, শিশিরকুমার কিন্তু হতাশ হলেন না। হাল ছেড়ে দিলেন না।

তাড়াতাড়ি একটা গানের পালা—নাম 'বসন্তলীলা'—তৈরি করা গেল। 'বসন্তলীলা'র জন্মের ইতিহাসটুকু হেমেন্দ্রকুমার রায় বর্ণনা করেছেন: "স্টার থিয়েটার হঠাৎ "সীতা" হরণ করাতে শিশিরকুমার মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন। অভিনয়ের বিজ্ঞাপিত তারিখ সামনেই, নূতন বা পুরাতন কোন নাটকই মহলা দিয়ে তৈরি করবার সময় নেই। ভেবে-চিন্তে ঠিক করা হল, নাটকের অভিনয় যখন অসম্ভব, তখন সেদিন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দের নায়কতায় হোরীর গানের আসর বসিয়ে নব-রঙ্গালয়ের উদ্বোধন করা হবে।

গুটিকয়েক পুরাতন ও বিখ্যাত হিন্দী গান নির্বাচিত হল। আমি শিশির ও মণিলালকে বললুম, "দেখ, খালি পুরনো কেন, দু-চারটে নতুন বাংলা গান লিখে এই সঙ্গে জুড়ে দিলে কেমন হয়?" কথাটা তাঁদের মনে লাগল। আমি গুটি ছয়েক গান লিখলুম। মণিলালও গুটি ছয়েক গান লিখলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ও

গুরুদাস গানগুলিতে সুর সংযোগ করলেন এবং গানের মহলা শুরু হল। নৃপেন্দ্রচন্দ্র করলেন নাচের পরিকল্পনা।

এর মধ্যে মণিলালের মাথায় নূতন বুদ্ধি এল, গানগুলির ভিতরে ভাবের পারম্পর্য রক্ষা করতে হবে। তিনি তখন প্রাচীন ও আধুনিক আরও কোনকোন কবির গান সংগ্রহ করে একটি গানের মালা তৈরি করলেন এবং সে কাজে তাঁর প্রধান সহায় হলেন আমাদের অন্যতম সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। এই হল "বসন্তলীলা"র জন্মকথা।"

এই 'বসন্তলীলা' নিয়েই বিজ্ঞাপিত দিনে আলফ্রেড থিয়েটার খোলা হল। 'বসন্তলীলা' সুন্দর হল।

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' যে হাতছাড়া হয়ে গেল, তার কী হবে? কী আর হবে, শিশিরকুমার যোগেশ চৌধুরীকে দিয়ে 'সীতা' নামে আরেকখানা পৌরাণিক নাটক লিখিয়ে নিয়ে নতুন করে তৈরি হতে লাগলেন।

তা বলে আলফ্রেড থিয়েটার বন্ধ হয়ে নেই। সেখানে পুরনো নাটকের অভিনয় হচ্ছে।

এখন, এতদিনে, একটি প্রচণ্ড পরিবর্তনের লগ্ন এসেছে। একটি সমাপ্তির প্রান্তে আরেকটি সমারম্ভের সময় উপস্থিত।

মনোমোহন থিয়েটারে দানীবাবু আছেন, তবুও মনোমোহন থিয়েটারের আয়ের অঙ্ক প্রায় অভাবনীয় ক্ষুদ্রকায় হয়ে দাঁড়াল। লোকে আর দানীবাবুকে চায় না। কেউ-কেউ বলল—দানী ঘোষকে পিঁজরাপোলে পাঠিয়ে দাও, এখন আর পুরনো দিয়ে চলবে না, নতুন চাই।

সত্য, দানীবাবু বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি এখন শ্রমক্লিষ্ট, ভগ্নস্বাস্থ্য। একদা দানীবাবুর অভিনয় দেখবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠত জনসাধারণ, আজ জরাজীর্ণ বৃদ্ধের পরিবর্তে বলদৃপ্ত নবযৌবনকে অভিনন্দিত করার জন্যে তারা উন্মুখ হয়ে আছে।

এই সময়েই শিশিরকুমারের পক্ষে একটা সুযোগ এসে গেল। মাসিক তিন হাজার টাকায় মনোমোহন থিয়েটার ইজারা পেলেন শিশিরকুমার।

অপরিসীম বেদনার সঙ্গে দানীবাবুকে মনোমোহন থিয়েটার থেকে বিদায় নিতে হল। বিদায় নিতে হল বিজয়ী বীরের মত নয়, হৃতগৌরব অশক্তের মত। এখানে দানীবাবু সর্বেশ্বরের মত এসেছিলেন, সর্বহারার মত চলে গেলেন।

শিশিরকুমার কিন্তু দানীবাবুকে একজন প্রবীণ মাননীয় অভিনেতারূপে নিজের দলে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দানীবাবু রাজী হন নি।

যা হোক, মনোমোহন থিয়েটার ইজারা নিলেন শিশিরকুমার। সেখানে খুললেন মনোমোহন—নাট্যমন্দির। যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা' নিয়ে শিশিরকুমার মনোমোহন-নাট্যমন্দিরে যবনিকা তুললেন। ৬ই আগস্ট, ১৯২৪ সাল।

'সীতা'র প্রথম অভিনয় আরম্ভ হবার আগে অমৃতলাল বসু একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতায় তিনি বললেন: 'কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশে নাট্যকলা অত্যন্ত হীন হয়ে পড়েছিল। সারা জীবন ধরে আমি এই কলার সাধনা ক'রে এসেছি, শেষে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে নাট্যকলার এই অবনতি দেখে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হচ্ছিল। কিন্তু আজ যাঁরা বাংলার নাট্যশিল্পে নবযুগ এনেছেন—আর্ট থিয়েটারে যাঁরা অভিনয় করছেন এবং বিশেষ করে শিশিরবাবুই এই নবযুগের প্রবর্ত্তক। যে ব্যথা নিয়ে আমায় ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হচ্ছিল,সে বেদনা থেকে এঁরা আমায় মুক্তি দিয়েছেন। যাদের সঙ্গে একসঙ্গে আমি এই কাজে নেমেছিলুম, তারা একে একে সকলেই এই সংসার থেকে বিদায় নিয়েছে—আমি ভাবছিলুম, ঈশ্বর কি আমাকে রঙ্গালয়ের এই হীন অবস্থা দেখবার জন্যই জীবিত রেখেছেন! কিন্তু আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি এঁরা আমায় সে আশঙ্কা থেকে মুক্তি দিয়েছেন।'

দিনের পর দিন 'সীতা'র অভিনয় হতে লাগল। শিশিরকুমার রাম, প্রভা সীতা। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ। অসামান্য অভিনন্দন।

'সীতা'র সর্বত্র নতুনত্ব, আদ্যন্ত নতুনত্ব, ভিতরে-বাহিরে নতুনত্ব।

মনোমোহন থিয়েটারে মঞ্চের সামনে একটা পুরনো থাম ছিল। সেটি ভেঙে মঞ্চের আয়তন বাড়িয়ে নেওয়া হল। পুরনো আসনের বদলে দর্শকদের জন্যে নতুন আসনের ব্যবস্থা হল। নাট্যশালায় পুরোনো এ-বি-সি-ডি মার্কার বদলে এল নতুন ক-খ-গ-ঘ ইত্যাদি। টিকিটে পর্যন্ত বাঙলা ভাষা। বিলেতী কনসার্টের বদলে দেশী রোসনচৌকি। 'সীতা'র নৃত্য পরিকল্পিত হল প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের আদর্শে।

মঞ্চের দু-ধারে কলাগাছ, পূর্ণকলস। প্রবেশপথে আম্রপল্লব, আলিম্পন। প্রেক্ষাগৃহে চন্দন-অগুরু, ধূপধুনা। তোরণপথে নহবত। আসনের নামকরণে, অনুষ্ঠান-লিপিতে, প্রবেশপত্রে—সর্বত্রই স্বদেশী সৌন্দর্য। সুসঙ্গত, চিত্তহারী।

পাদপ্রদীপ রইল না। তার বদলে আলোক-সম্পাতের ব্যবস্থা হল ওপর

থেকে, এপাশ-ওপাশ থেকে। একজন নাট্যবোদ্ধা যথার্থ লিখেছেন ঃ 'রঙ্গমঞ্চের আলোকশিল্পের মধ্যে যুগান্তর আনার প্রথম যে গৌরব, তাও শিশিরকুমারেরই প্রাপ্য।'

আগের যুগে সাজসজ্জার ব্যাপারে বাঙলা নাট্যশালায় কেউ ইতিহাসের পরামর্শ মেনে নেন নি। তাই বাঙলা থিয়েটারে মৌর্যযুগের অশোক মোগলাই পোশাক পরলে কিম্বা নূরজাহান বিলেতী জ্যাকেট পরে দেখা দিলে রঙ্গালয়ের কর্তাদের আক্ষেপের কোন কারণ থাকত না। কিন্তু 'সীতা'র সাজসজ্জার দিকেও শিশিরকুমার চোখ রেখেছেন। 'সীতা'র কোন নরনারী ইতিহাসের পক্ষে অবিশ্বাস্য পোশাক-আশাক পরে মঞ্চে আসে নি।

তারপর দৃশ্যপট। কোথায় সেই চিরাচরিত দৃশ্যপট? 'সীতা'য় পুরনো কায়দায় দৃশ্যপট নেই। সীনে-আঁকা ঘরবাড়ি দরজা-জানালা ইত্যাদি রইল না। 'সীতা'র সমস্ত দরজার মধ্য দিয়ে একজন জলজ্যান্ত মানুষ অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। সম্পূর্ণ নতুন ব্যবস্থা।

তারপর 'সীতা'র শেষদৃশ্য। জনতার দৃশ্য। অন্তত একশোজন অভিনেতা-অভিনেত্রী একটি দৃশ্যে মঞ্চে উপস্থিত। এমন জনতার দৃশ্য বাঙলা রঙ্গালয়ে আর কখনও দেখা যায় নি। হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন ঃ "গিরিশ-যুগে রঙ্গমঞ্চের উপরে যে-সব জনতার দৃশ্য দেখান হত, তা আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। নাট্যকার দেখাতে চান বিপুল জনতা, কিন্তু মঞ্চের উপরে দেখি মাত্র গুটিকয়েক লোক। উচিত মত পরিচালনার অভাবে তারাও অভিনয় করতে পারে না, দাঁড়িয়ে থাকে সাক্ষীগোপাল কাঠের পুতুলের মত। কাজেই দৃশ্যটা কেবল রসভঙ্গই করে না, হয়ে ওঠে দস্তুরমত হাস্যকর। আমাদের রঙ্গমঞ্চে "সীতা" নাট্যাভিনয়ে শিশির-কুমারই সর্ব্বপ্রথমে দেখান সুনিয়ন্ত্রিত জনতা। প্রাসাদ-অঙ্গনে উচ্চস্থানে প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা, নিম্নস্থানে জনসাধারণ, সকলের উপরে অলিন্দে উপস্থিত অন্তঃপুর-চারিণীরা। কেউ উপবিষ্ট, কেউ দণ্ডায়মান, কেউ চলমান এবং সকলেই করছে অভিনয়—কেউ ভাবে, কেউ ভাষায়।...এই জনতা-নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও প্রকাশ পায় প্রয়োগকর্ত্তার অসাধারণ নৈপুণ্য।"

নটকবি শিশিরকুমারের উদ্দেশে একটি কবিতা লিখলেন মোহিতলাল মজুমদার। কবিতাটি এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে তোমা হেরিনু যেদিন,
প্রত্যাসন্ন প্রভাতের শিশির-মুকুর!—

চমকি চাহিনু ঊর্দ্ধে, নিশার চিকুর
দিগন্তের নীলাকাশে হয় যে বিলীন

হেরিলাম, কলা-লক্ষ্মী আজি এ নবীন
নেপথ্য-লীলায় ধরি' নবতন সুর,
নয়ন-মোহন কাব্যে নিপুণ নূপুর
বাজাইতে বঙ্গে আর নহে উদাসীন।

ছন্দ হেথা শরীরী যে, বাক্য হতমান!
শব্দ-অর্থ প্রাণ পায় মূর্ত্ত রস-রাগে।

হৃদয়ের রসাতলে যার অধিষ্ঠান,
নর-কণ্ঠস্বরে তার কি আকূতি জাগে!

প্রতি অঙ্গ কথা কয় রসনা-সমান—
শ্রোত্র চেয়ে নেত্র তাই কাব্যসুধা মাগে!

তারপর আরেকটি কবিতা বেরিয়েছে শিশিরকুমারের নামে। সেটি লিখেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ

দীর্ঘ দুই বাহু মেলি' আর্তকণ্ঠে ডাক দিলে ঃ সীতা, সীতা, সীতা—
পলাতকা গোধূলি-প্রিয়ারে,
বিরহের অস্তাচলে তীর্থযাত্রী চলে গেল ধরিত্রী-দুহিতা
অন্তহীন মৌন অন্ধকারে।

যে-কান্না কেঁদেছে যক্ষ কলকণ্ঠা শিপ্রা-রেবা-বেত্রবতী-তীরে
তারে তুমি দিয়াছ যে ভাষা,
নিখিলের সঙ্গীহীন যত দুঃখী খুঁজে ফেরে বৃথা প্রেয়সীরে
তব কণ্ঠে তাদের পিপাসা।

এ-বিশ্বের মর্মব্যথা উচ্ছ্বসিছে ওই তব উদার ক্রন্দনে,
ঘুচে গেছে কালের বন্ধন,
তারে ডাকো, ডাকো তারে—যে-প্রেয়সী যুগে-যুগে চঞ্চল চরণে
ফেলে যায় ব্যগ্র আলিঙ্গন।

বেদনার বেদমন্ত্রে বিরহের স্বর্গলোক করিলে সৃজন
আদি নাই, নাহি তার সীমা ;
তুমি শুধু নট নহ, তুমি কবি, চক্ষে তব প্রত্যূষ-স্বপন
চিত্তে তব ধ্যানীর মহিমা ॥

এই সময়ের কথা স্মরণ করে পরবর্তীকালে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন : "শিশিরকুমার ভাদুড়ি এই সময় মনোমোহনে "সীতা" অভিনয় করছেন, আর সমস্ত কলকাতা বসন্ত-প্রলাপে অশোক-পলাশের মত আনন্দ-উত্তাল হয়ে উঠেছে। কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে বাণবিদ্ধ করার দরুণ বাল্মীকির কণ্ঠে যে বেদনা উৎসারিত হয়েছিল, শিশিরকুমার তাকে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে বাণীময় করে তুললেন। সমস্ত কলকাতা-শহর ভেঙে পড়ল মনোমোহনে। শুধু অভিনয় দেখে লোকের তৃপ্তি নেই। রাম নয়, তারা শিশিরকুমারকে দেখবে, নরবেশে কে সে দেবতার দেহধারী, তার জয়ধ্বনি করবে, পারে তো পা স্পর্শ করে প্রণাম করবে তাঁকে।"

'সীতা' সম্পর্কে যবনিকান্তরালের কয়েকটি দরকারী কথা এখানে বলা যেতে পারে। 'সীতা'র জন্যে শিশিরকুমার সঙ্গীতাচার্য করে নিয়ে এসেছেন কৃষ্ণচন্দ্র দে ও গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়কে। গীতরচনা, নৃত্য, দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা পরিকল্পনার জন্যে নিয়ে এসেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র রায়কে। সাধারণ নাট্যশালায় এঁরা নতুন, সকলেই নতুন। দলের প্রধান অভিনয়শিল্পীরাও, বলা বাহুল্য, নতুন। 'সীতা'কে ষোলোআনা নতুন যুগের যোগ্য করার জন্যে শিশিরকুমারের কী অপার অগাধ প্রতিজ্ঞা। মনে রাখলে ভাল হয়, শিশিরকুমারকে সেসময়ে সাহায্য করেছেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন বন্ধু।

'সীতা' দেখে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন : 'শিশির ভাদুড়ির প্রয়োগনৈপুণ্য সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে।'

'সীতা' দেখে শরৎচন্দ্র লিখেছেন : 'বিগত দুই রাত্রি উপর্য্যুপরি ও আদ্যোপান্ত মুগ্ধ হইয়া আমি এই নাটকের অভিনয় দেখিয়াছি। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে ইহার তুলনা নাই। আশ্চর্য্য এই স্বল্পকালের মধ্যে শিশির কি করিয়া না তাঁহার দলের নূতন লোকগুলিকে এমন মানুষ করিয়া তুলিলেন! বিশেষ করিয়া তাঁহার নিজের অভিনয় দেখিবার সময় বহুবারই মনে হইয়াছে এই বাঙ্গলা দেশের সমস্ত অভিনেতাই যে সবিনয়ে ইহাঁর কাছে আপনাদের শিশু বলিয়া মনে করেন, তাহাতে

বিস্মিত হইবার কিছু নাই! এবং সত্য স্বীকার করায় তাঁহাদের গৌরব আছে।'

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 'সীতা' দেখতে এলেন। সেদিন তিনি অসুস্থ। তবুও শেষপর্যন্ত না দেখে যেতে পারলেন না। দেশবন্ধু বলেছেনঃ 'আমি আমার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলাম যে শ্রীমান শিশিরকুমার ভাদুড়ী জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম। আজ আমি রামের ভূমিকায় তাঁহার অভিনয় দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহারা অতি সত্য কথাই বলিয়াছিলেন। রামের ভূমিকায় তাঁহার অভিনয় অপূর্ব্ব হইয়াছে।

আমি পূর্ব্বে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যে সকল অভিনয় দেখিয়াছি সে অভিনয়ে অপ্রধান চরিত্রগুলি কোনও দিনই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কিন্তু শিশিরকুমারের সম্প্রদায়ের এই অভিনয়ের অপ্রধান অংশগুলির অধিকাংশই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

সীতার চরিত্রে যে অভিনেত্রী অবতীর্ণা হইয়াছিলেন শিশিরকুমারের সহিত তুলনায় তাঁহার অভিনয় অনেক নিরেশ হইলেও সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদের তুলনায় তাঁহার অভিনয় শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর হইয়াছে।

মোটের উপর অভিনয় আমার এত ভাল লাগিয়াছিল যে আমার শরীর অসুস্থ থাকা স[illegible] অভুক্ত অবস্থায় শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া ফিরিতে পারি নাই।'

তা' দেখে অবনীন্দ্রনাথ একখানা চিঠি লিখেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায় ও মাস্কুর আতর্থীকে। চিঠিখানা তুলে দিচ্ছিঃ "শুনবেন—গত রবিবার শিশিরবাবুর মনোমোহন নাট্যমন্দিরে গিয়ে সীতাভিনয় কেমন দেখলেম?—ভালই দেখলেম—কেননা মন্দ দেখতে পাবো এটা যদি বোধ করতেম তো যেতেমই না, কিন্তু এই যে ভাল দেখলেম শব্দটি হাতের লেখার মধ্যে দিয়ে আপনাদের কাছে পৌঁছচ্ছে এটাতে আমি কতখানি যে ভাল দেখলেম তা বোঝাই তো গেল না! ঐ কথা দুটো যদি কোন দিনে এখানে এসে আমার মুখে শুনে যেতেন, তবে বুঝতেন কতখানি ভাল লেগেছে সেদিনকার সমস্ত অভিনয়টি! লেখার মধ্যে বাঁধা পড়লে শুধু যে কথাটা নির্জ্জীব হয়ে যায় তা নয়, অনেক সময় পাঠকের পড়ার দোষে কথাটার উল্টো অর্থ হয়ে পড়ে, সুতরাং "শতং বদ মা লিখ, এটা পণ্ডিতেরা বুঝে-সুঝেই উপদেশ দিয়েছেন, অথচ আপনারা চাচ্ছেন লেখার মধ্যে দিয়ে শুনতে আমার মনের কথা। ভাল, তাই হোক, কেউ উল্টা বুঝলে দায়-দোষ আপনাদের।

সে বছরে আমি আর একদিন কর্ণওয়ালিস থিয়েটারে গিয়ে আওরঙ্গজেবের ভূমিকায় শিশিরবাবুর অভিনয় দেখার সুযোগ পেয়েছিলেম। সেবারে দেখেছিলেম শিশিরবাবু একা সমস্ত অভিনয় ব্যাপারটি পরিপূর্ণ করে আছেন, তাঁর সহচর নেই, সমকক্ষ অভিনেতাও নেই, সেবারের রঙ্গমঞ্চে। এবারে মনোমোহন নাট্যমন্দিরে গিয়ে দেখলেম যে সব অভিনেতা অভিনেত্রীকে শিশিরবাবু নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন,—আস্তে আস্তে, তাঁরা যাতে তাঁর সমকক্ষতা করতে পারেন, তার কারণে নিজের অভিনয়পটুতা তিনি ইচ্ছা করেই সম্পূর্ণ প্রকাশ না করে অন্যের অভিনয়টিকে ফুটে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছেন। বড় যে, সে ছোটদের কল্যাণ কামনা করে নিজের বৃহৎ আওতা অনেকখানি সরিয়ে নিয়েছে, এটুকু আমার কাছে ভারি নূতন লাগলো। ইতিপূর্ব্বে বাংলার কোন রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা এমন করে নিজেকে একপাশ করে রেখেছেন দেখেছি বলে তো মনে হয় না। যে গড়ছে, সে যদি যাকে গড়লে তাকে আড়াল করে নিজেই এগিয়ে দাঁড়ায়, সে যে নিজেরই পায়ে নিজে কুড়ুল মারে, এ কথাটা কেবল যাঁরা সত্যিই রসিক তাঁরা বোঝেন এবং সেই বুঝে কাজও করে চলেন ; তথাকথিত রসিক তারা এটা বোঝে না, শুধু মুখে বলে। প্রখর আলোর মতো প্রতিভা যখন সম্পূর্ণ প্রকাশ পেতে চাচ্ছে, তখন কাঁচা অভিনেতা অভিনেত্রীদের খাতিরে তার উপরে আবরণ টেনে রাখতে যে কতখানি ধৈর্য্য এবং শক্তি ব্যয় করতে হয় বড় অভিনেতাকে, তার চাক্ষুষ প্রমাণ সীতাভিনয়ের গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত শিশিরবাবুর চলা-বলার মধ্যে আমি লক্ষ্য করে এসেছি। এক এক সময় তাকে দেখে মনে হল বুঝি এবারে বাঁধ ভাঙে মন আর বাগ মানে না। অভিনয় ব্যাপারে যারা নতুন, যারা ছোট তাদের উপরে এই মমতা অত্যন্ত মধুর ঠেকলো আমার কাছে। চারুচন্দ্র নিপুণ চিত্রকর, তিনি দৃশ্যপট সাজগোজ যত্নে রচনা করলেন—অভিনয়কে প্রাধান্য দিতে হলে নিশ্চয় দৃশ্যপটগুলিকে অনেকটা পিছনে রাখা দরকার, সেখানেও দেখলেম শিশিরবাবু অনেকটা বড় জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন দয়া করে চারুবাবুকে। প্রথম দৃশ্যেই এটা চোখে পড়ল আমার, তারপর যখন দুর্ম্মুখ প্রবেশ করলেন তখন এটা আরও স্পষ্টতর হয়ে উঠল। দুর্ম্মুখকে সাজ সজ্জায় শিক্ষা দীক্ষায় অভিনয়ের চাতুর্য্যে একেবারে নিখুঁত করে ছেড়ে দিয়েছেন শিশিরবাবু, অথচ নিজের বেলায় তিনি সবদিক দিয়ে একটুখানি ঢিলে দিয়ে বসে আছেন। রচয়িতাকে অনেকখানি আবরণ করে রচনা বর্ত্তমান হলে যা হয় ঠিক সেইটী হল সেদিনকার রামের পাশে অতি চমৎকার এই দুর্ম্মুখের

রচনা। এই দুর্ম্মুখের যখন আর একটা দৃশ্যে দেখলেম রামের কাছে মণিমালা ভিক্ষে চাচ্ছে, তখন শিশিরবাবুর অপূর্ব্ব প্রতিভার পরিপূর্ণতা চকিতের মত দেখা দিলে—হিমালয়ের চূড়া থেকে একটুখানি দাক্ষিণ্য যেন ঝরে পড়লো মুক্তনির্ঝরের ছলে পায়ের তলায় যে মহারণ্য পড়ে রয়েছে তার দিকে।

কি অভিনয় করার দক্ষতা, কি অভিনয় শিক্ষা দেবার ক্ষমতা দুই দিক দিয়ে শিশিরবাবুর পরিচয় নেবার সৌভাগ্য হয়ে গেল আমার সেদিন, এবং এটার জন্যও তাঁকেই আমার ধন্যবাদ দিতে হচ্ছে। তিনি যদি নিজের রচনা সীতা, তুঙ্গভদ্রা, দুর্ম্মুখ ইত্যাদি সবাইকে একেবারে নিখুঁতভাবে তৈরী করে নিয়ে তবে আমাকে ডাকতেন তো একটা মস্ত আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত করতেন, এবং তাঁর নিপুণ সৃষ্টিকৌশলের রহস্য ধরবার অবসর আমার অদৃষ্টে ঘটা সম্ভবও হতো না।

প্রথম দৃশ্যের একটি ঘটনা আমার কাছে বড় সুন্দর লাগলো। সীতা যেখানে রামচন্দ্রের কাছ থেকে আশীর্ব্বাদের মতো বনবাস-দুঃখ অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করেছেন এই ছবিখানির মধ্যে আমি যে শুধু রাম-সীতাকে দেখতে পেলেম তা তো নয়, আমি দেখলেম গুরুর কাছে শিষ্যা, বড়র কাছে ছোট নিজের কৃতজ্ঞতার ফুল করপুট ভরে নিয়ে এল, নূতন প্রণতি দিলে উত্তম ও নূতনতমকে।"

১৯২৪ সালের অক্টোবরে শিশিরকুমার 'আলমগীরে' গরীবদাসের ভূমিকায় অভিনয় করলেন।

১৯২৪ সালের ১০ই ডিসেম্বর মনোমোহন নাট্যমন্দিরে 'পাষাণী' অভিনীত হল। ইন্দ্র ও গৌতমের ভূমিকায় শিশিরকুমার। ১৯২৫ সালের ৩রা জুন 'জনা'; শিশির-কুমার প্রবীর, তারাসুন্দরী জনা। এর আগে প্রায় তিনবছর কোন মঞ্চে তারাসুন্দরী অভিনয় করেন নি, শিশিরকুমারই তারাসুন্দরীকে সসম্মানে মনোমোহন-নাট্যমন্দিরে নিয়ে এসেছেন। ১৯২৫ সালের ১৩ই আগস্ট 'পুণ্ডরীক' হল; শিশিরকুমার পুণ্ডরীক, তারাসুন্দরী শাকী। ১৯২৫ সালের শেষের দিকে 'চন্দ্রগুপ্ত' আর 'আলমগীরে'র পুনরভিনয় হল। 'চন্দ্রগুপ্তে' শিশিরকুমার চাণক্য তারাসুন্দরী মুরা; আলমগীরে শিশিরকুমার আলমগীর, তারাসুন্দরী উদিপুরি।

সমসাময়িক একটি আলোচনা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি: "নাট্যমন্দিরে আলমগীরের পুনরভিনয়ে এবার সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ ছিল শ্রীমতী তারাসুন্দরীর "উদিপুরী বেগম"। একখানি বহুবার অভিনীত নাটকের পুনরভিনয় দেখবার জন্য

এত বেশী দর্শক সমাগম বড় একটা দেখা যায় না। শ্রীমতী তারাসুন্দরী তাঁর পরিণত বয়সে এই জটিল ভূমিকার সুঅভিনয়ে যে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীরই যোগ্য হয়েছে। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'আলমগীরের অতুলনীয় অভিনয় এবার দ্বিগুণ উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল, শ্রীমতী তারাসুন্দরীর তেমনি অতুলনীয় উদিপুরীর অভিনয়ে! আলমগীর ও উদিপুরীর নাটকোক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে রঙ্গমঞ্চের উপর উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, সে যুগের ও এযুগের দুই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর অপরূপ কলা নৈপুণ্যের গুণে।"

অনেক আগেই বলা উচিত ছিলো, ১৯২৪ সালের ২৩শে জুলাইয়ের 'আত্ম-শক্তি'তে দিলীপকুমার রায় লিখেছেন ঃ 'ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মান ও রুষ এই কয় জাতির শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এবং আমার মনে হয় যে, বিখ্যাত রুষ অভিনেতা কাচালভ Katschalov ছাড়া আর কোনও অভিনেতাকেই আমি শিশিরকুমারের চেয়ে বড় অভিনেতা বলে মনে করি না।...কাচালভের সমকক্ষ হওয়াও তাঁর সাধ্যাতীত নয়।...এক কাচালভ ছাড়া অভিনয়ের Techniqueএ শিশিরকুমারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ গুণপণা অন্য কোন অভিনেতার মধ্যেই অন্তত আমি তো দেখিনি।'

যা হোক, ১৯২৫ সালের ২৩শে ডিসেম্বর নাট্যমন্দির লিমিটেড কোম্পানি রেজিস্টারি হল। মূলধন পাঁচলাখ টাকা, একেকখানা শেয়ার একশোটাকা। কোম্পানির তিনজন ডিরেক্টর—তুলসীচরণ গোস্বামী, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

——;*:——

আঠারো

১৯২৬ সালে নাট্যমন্দির খোলা হল কর্নওয়ালিস থিয়েটারে। সেখানে এখন শ্রী-সিনেমাহল। ১৯২৬ সালের ২৩শে জুন সেখানে 'সীতা' নিয়ে নাট্যমন্দিরের উদ্বোধন হল।

'বিসর্জন' অভিনীত হল তারপর।

'বিসর্জনে'র প্রথম অভিনয় হয়েছে ১৮৯০ সালের অক্টোবর মাসে। শৌখিন অভিনয়।

পরে আরও কয়েকবার 'বিসর্জনে'র অভিনয় করেছেন শৌখিন নাট্যশিল্পীরা। রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার 'বিসর্জনে'র অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন—কখনও রঘুপতি সেজেছেন, কখনও জয়সিংহ সেজেছেন।

রঘুপতিরূপে অভিনয়কালে একদিন খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। সেদিনের কথা অবনীন্দ্রনাথ পরে বলেছেন :

'রবিকাকাকে ও-রকম উত্তেজিত হতে কখনও দেখি নি। এখন, রঘুপতি সেজেছেন, জয়সিংহ তো বুকে ছোরা মেরে মরে গেল। স্টেজের এক পাশে ছিল কালীমূর্ত্তি বেশ বড়, মাটি দিয়ে গড়া। কথা ছিল রঘুপতি দূর দূর বলে কালীর মূর্ত্তিকে ধাক্কা দিতেই, কালীর গায়ে দড়াদড়ি বাঁধা ছিল, আমরা নেপথ্যে থেকে টেনে মূর্ত্তি সরিয়ে নেব। কিন্তু রবিকাকা করলেন কী, উত্তেজনার মুখে দূর দূর বলে কালীর মূর্ত্তিকে নিলেন একেবারে দু হাতে তুলে। অতো বড় মাটির মূর্ত্তি দু হাতে উঁচুতে তুলে ধরে স্টেজের এক পাশ থেকে আর-এক পাশে হাঁটতে হাঁটতে একবার মাঝখানে এসে থেমে গেলেন। হাতে মূর্ত্তি তখন কাঁপছে, আমরা ভাবি কী হল রবিকাকার, এইবারে বুঝি পড়ে যান মূর্ত্তিসমেত। তার পর উইংসের পাশে এসে মূর্ত্তি আস্তে আস্তে নামিয়ে রাখলেন। তখনও রবিকাকার উত্তেজিত অবস্থা। আমরা জিজ্ঞেস করলুম, কী হল রবিকাকা তোমার। ওই অতবড় কালীমূর্ত্তি দু হাতে একেবারে তুলে নিলে ?

উনি বললেন, কী জানি কী হল, ভাবলুম মূর্ত্তিটাকে তুলে একেবারে উইংসের

ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দেব। উত্তেজনার মুখে মূর্ত্তি তো তুলে নিলুম, ছুঁড়তে গিয়ে দেখি ও পাশে বিবি না কে যেন হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে। এই মাটির মূর্তি চাপা পড়লে তবে আর রক্ষে নেই—হঠাৎ সামলে তো নিলুম, কিন্তু কোমর ধরে গেল।

তারপর অতিকষ্টে এ পাশে এসে রবিকাকা কোনও রকম করে মূর্ত্তি নামান। সেই কোমরের ব্যথায় মাসাবধি কাল ভুগেছিলেন।'

না বললেও চলে নিশ্চয়ই, এখানে রবিকাকা মানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আর বিবি মানে উত্তরকালের ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

আরও একবার রঘুপতিরূপে অভিনয়কালে রবীন্দ্রনাথ স্থানকাল ভুলে গিয়েছিলেন। তার হাতের খাঁড়া যে সত্যি সত্যি তীক্ষ্ণধার, একথা মনে ছিল না। ধ্রুবের ভূমিকায় যে অভিনয় করছিল, অবস্থা বুঝে কে একজন তাড়াতাড়ি তাকে সরিয়ে নিল। তা না হলে রবীন্দ্রনাথের তন্ময়তার ফলে সেদিন একটা দারুণ দুর্ঘটনা নিতান্ত অসম্ভব ছিল না।

কিন্তু নট-নাট্যকার রূপে রবীন্দ্রনাথ প্রথম মঞ্চে দেখা দিয়েছেন কবে? ১৮৮১ সালের ২৬শে ফেব্রুআরি। জোড়াসাঁকোর বাড়ির শৌখিন নাট্যমঞ্চে। সেদিন 'বাল্মীকিপ্রতিভা' হল। রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করলেন। সেই অভিনয়ের দর্শকদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি বঙ্কিমচন্দ্র আছেন, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, রাজকৃষ্ণ রায় আছেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আছেন।

সেই অভিনয় দেখে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

"উঠ বঙ্গভূমি, মাতঃ, ঘুমায়ে থেকো না আর,
অজ্ঞানতিমিরে তব সুপ্রভাত হল হেরো।
উঠেছে নবীন রবি, নব জগতের ছবি,
নব 'বাল্মিকী-প্রতিভা' দেখাইতে পুনর্বার।
হেরো তাহে প্রাণ ভরে, সুখতৃষ্ণা যাবে দূরে,
ঘুচিবে মনের ভ্রান্তি, পাবে শান্তি অনিবার।
'মণিময় ধূলিরাশি' খোঁজ যাহা দিবানিশি,
ও ভাবে মজিলে মন খুঁজিতে চাবে না আর।"

আবার নাট্যমন্দিরে ফিরে আসি। নাট্যমন্দিরে 'বিসর্জনে'র প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়ের একটি বিজ্ঞাপন থেকে তুলে দিচ্ছি ঃ

"নমঃ নটনাথায়

নাট্যমন্দির

নবনিকেতন—১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার।

জগদ্বরেণ্য রবীন্দ্রনাথের

বিশ্ববিশ্রুত নাটক

বিসর্জ্জন! বিসর্জ্জন!!

রঘুপতি—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এই

বিসর্জ্জন

অধুনা প্রচলিত বিসর্জ্জন নাটককে ভাঙিয়া গড়িয়া প্রস্তুত হইয়াছে। আকারে প্রকারে যথেষ্ট নূতনত্ব দেওয়া হইয়াছে।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের

অনুগ্রহপূর্ণ আদেশ ও তাঁহার সুনিপুণ নির্দ্দেশে নাট্যমন্দিরের অভিনয়ার্থ এই নাটক পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অনেক নূতন গান

সংযোজিত হইয়াছে। দৃশ্যাবলীর সংস্থানেও অনেক পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। কাজেই এই বিসর্জ্জনে নূতনত্বের অভাব হইবে না।

কবির সুর ভাণ্ডারী

শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের

সুশিক্ষায় এই নাটকের গানগুলি সঠিকরূপে তৈরি হইয়া প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের ভাবোপযোগী দৃশ্যপট রূপদক্ষ শিল্পীর দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পুরাতন নাটক নূতন হইয়াছে।

বিসর্জ্জন

নাটকের এই নূতন রূপ দেখিবার জন্য সুধীবৃন্দকে সাদরে আহ্বান করিতেছি।"

'বিসর্জন' নাটকের সেই নতুন রূপ নাট্যমন্দির প্রথম দেখাল ১৯২৬ সালের ২৬শে জুন। বিজ্ঞাপনে যেমন আছে, সেদিন রঘুপতি সেজেছেন শিশিরকুমার।

সমসাময়িক একটি সমালোচনা থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি: 'রঘুপতির অভিনয়টাকে শিশিরকুমার নিতান্ত সহজভাবে গ্রহণ করেন নি; সেইজন্য আমাদের

বিশ্বাস নাটকের প্রথম দিকটায় তিনি সাধারণ দর্শকের সম্পূর্ণ মনহরণ করতে পারেন নি—যদিও আমরা তাঁর প্রত্যেক গতিবিধি বিস্ময় আগ্রহে লক্ষ্য কোরে চমৎকৃত হচ্ছিলুম। নাটকের এই অংশে ভাবাবেগে খুব খানিকটা চেঁচিয়ে ও হাত পা ছুঁড়ে আসর জমিয়ে হাততালি পাবার বেশ একটু সুযোগ ছিল; কিন্তু শিশিরকুমার সে প্রলোভন পরিত্যাগ কোরে চরিত্রের সূক্ষ্মাতীত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দিকে বেশী কোরে নজর দিয়েছিলেন। সেইজন্য তাঁর অভিনয় আড়ম্বরপূর্ণ না হয়ে সহজ সরল গতির সৌন্দর্য্যে মহীয়ান হয়ে উঠেছিল। তিনি নাটকের অংশ-বিশেষকে জমিয়ে তোলবার চেষ্টা না কোরে সমগ্র চরিত্রটিকে তার বিচার-মতো একটি বিশেষ রূপের রেখার মধ্যে দিয়ে পরিণতির দিকে অগ্রসর কোরে নিয়ে যাচ্ছিলেন যাতে কোরে রঘুপতি একটা পুরা মানুষ হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণত আমরা দেখি অভিনেতারা আপাত-প্রশংসার প্রলোভনে উদ্‌গ্রীব হয়ে খণ্ডর দিকে এতটা দৃষ্টি দিয়ে ফেলেন যে সমগ্র দৃষ্টিটা হারিয়ে যায়; তাতে ফল হয় এই যে, চরিত্র হয়ত খণ্ড হিসাবে কিছু কিছু জমে কিন্তু তার পরিণতিতে সে না পৌঁছে একটা কিম্ভূতকিমাকার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। শিশিরকুমার রঘুপতিচরিত্র অভিনয় করবার সময় কেমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এই পরিণতির সূক্ষ্ম জটিল পথ ধরে চলছিলেন সেটি লক্ষ্য করতে বিস্ময় ও আনন্দ আছে। তিনি যে ধারায় অভিনয় করছেন সে ধারার সঙ্গে মন মিলিয়ে তাঁর অভিনয় না দেখলে অনেকের তা পানসে লাগতে পারে, বাহবা হয়ত তিনি কম পাবেন; কিন্তু রসিকজনের আনন্দনিবেদন তাঁর জন্য অক্ষয় হয়ে থাকবে।'

'বিসর্জনে'র দশম অভিনয়রাত্রে দেখতে পাচ্ছি শিশিরকুমার রঘুপতির বদলে জয়সিংহ সেজেছেন। এবং রসিকজনকে বিমুগ্ধ করেছেন। জয়সিংহের ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় সম্পর্কে সমসাময়িক একটি মন্তব্যের একাংশ: 'নিপুণ রূপদক্ষ শিশিরকুমার সেই অভিশপ্ত জীবনের প্রত্যেকটি পলে যা কিছু ব্যথা যা কিছু আনন্দ—যেটুকু হাসি—যতখানি অশ্রু ছিল একেবারে উজাড় করে আমাদের দেখিয়েছেন।'

১৯২৬ সালের ১লা ডিসেম্বর 'নর-নারায়ণে'র প্রথম অভিনয় হল নাট্যমন্দিরে। শিশিরকুমার 'নর-নারায়ণে' কর্ণ সেজেছেন। পরে অবশ্যি শিশিরকুমার 'নর-নারায়ণে' কয়েকবার একসঙ্গে কর্ণ ও অর্জুনের ভূমিকা নিয়েছেন।

১৯২৬ সালে নাট্যমন্দিরে আর যেসব নাটকের অভিনয় হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে কয়েকখানার নাম করি: পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, আলমগীর, চন্দ্রগুপ্ত, ভীষ্ম,

মুক্তার মুক্তি, জনা। 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে' শিশিরকুমার একাই একাধিক পরস্পরবিরোধী ভূমিকায় চিত্তহারী অভিনয় করেছেন। শিশিরকুমার 'আলমগীরে' আলমগীর, 'চন্দ্রগুপ্তে' চাণক্য, 'ভীষ্মে' ভীষ্ম, 'মুক্তার মুক্তি'তে রতনচাঁদ, 'জনা'য় প্রবীর।

১৯২৭ সালের মাঝামাঝি নাট্যমন্দিরে প্রথম 'প্রফুল্লে' যোগেশের ভূমিকায় দেখা দিলেন শিশিরকুমার। ঘরোয়া সামাজিক নাটকে এই শিশিরকুমারের প্রথম মঞ্চাবতরণ।

১৯২৭ সালের ৬ই আগস্ট নাট্যমন্দিরে 'ষোড়শী'র প্রথম অভিনয় হল। শরৎচন্দ্রের 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের নাট্যরূপ এই 'ষোড়শী'। 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'ষোড়শী'। 'ষোড়শী'র সূত্রে অনিবার্যভাবে শিবরাম চক্রবর্তীর নাম এসে পড়ে। স্বয়ং শরৎচন্দ্র বলেছেন: 'বইখানা ভারতীতে যখন বার হয় নাটকাকারে রূপান্তরিত করেছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী। আমি আবার জাটখোল বদলে শিশিরের অভিনয়ের জন্য তৈরি করে দিয়েছি।...'

হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন: শিবরাম নাট্যকার এবং কাঁচা বয়স থেকেই পাকা নাট্যবোদ্ধা। যখন তিনি উদীয়মান, সেই সময়েই শরৎচন্দ্রের "দেনা-পাওনা"কে নাট্যাকারে পরিবর্তিত করে তার নাম রাখেন "ষোড়শী"। যদিও তা "ভারতী"তে প্রকাশিত এবং রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছিল শরৎচন্দ্রেরই নামে, কিন্তু নাট্যরূপের সফলতার জন্যে অনেকখানি প্রশংসার উপরে দাবি করতে পারেন শিবরামই।

তা পারেন নিশ্চয়ই। 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসের মধ্যে যে নাট্য-সম্ভাবনা আছে, এ-সত্য—শরৎচন্দ্র না, শিশিরকুমার না, আর কেউ না—শিবরাম চক্রবর্তীই প্রথম আবিষ্কার করেছেন; এবং তিনিই স্বেচ্ছায় 'দেনা পাওনা'র প্রথম নাট্যরূপ দিয়েছেন, 'দেনা পাওনা'কে 'ষোড়শী' করেছেন। অথচ, দুঃখের কথা, 'ষোড়শী'র বিপুল মঞ্চ-সাফল্যের দিনেও শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর সুকৃতির ন্যায্য মূল্য পান নি।

'ষোড়শী'তে শিশিরকুমার জীবানন্দ।

অমৃতলাল বসু বলে গিয়েছেন—'ষোড়শী'র জীবানন্দের মত wretched part-এ dignity দেওয়া একমাত্র শিশিরেরই সম্ভব।

১৯২৭ সালের ১২ই আগস্ট 'নাচঘর' লিখেছে: 'আসল নাটকে প্রকৃত অভিনেতা যে কী অকল্পিত সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করতে পারেন, জীবানন্দের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী তার জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়েছেন।...আমাদের

বিশ্বাস স্বয়ং জীবানন্দের স্রষ্টাই তাঁকে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়বেন, কারণ শিশিরকুমার হয়তো স্রষ্টার মানস-কল্পনাকেও অতিক্রম করেছেন !···

শিশিরকুমারের শক্তি ও কলাজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান এই জীবানন্দের ভূমিকার মধ্যে আমরা লাভ করেছি ।···

রঙ্গালয়ের জীবানন্দ কোথাও কর্ণভেদী গর্জ্জন বা হস্তপদের প্রচণ্ড আস্ফালন করে নি, কিংবা মুখ বিকৃত করে কোলের ছেলেদের ককিয়ে তোলে নি। অথবা চলচ্চিত্র ও বিলাতী অভিনয়ের সচিত্র কেতাব থেকে হরেক রকম ভঙ্গি চুরি করে আমাদের চোখকে চমকে দিতে পারে নি। কিন্তু এ-রকম ভূমিকায় যা পাওয়া উচিত আমরা তা-থেকে কিছুমাত্র বঞ্চিত হইনি ।···

বর্ত্তমান যুগে শিশিরকুমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা কেন ? কারণ তিনি এখানকার আর সব নটের চেয়ে সরলভাবে আপনাকে অভিব্যক্ত করতে পারেন। এবং কেবলমাত্র স্বাভাবিকতার মুখ চেয়ে তিনি থাকেন না, উপরন্তু স্বাভাবিকতাকে নিজের ঈপ্সিত আকারের মধ্যে এনে তিনি স্বেচ্ছামত ফুটিয়ে তুলতে পারেন—ভাস্করের হস্তে কর্দ্দমপিণ্ড যেমন তাঁর স্বেচ্ছামত আকার লাভ করে ।···

জীবানন্দের ভূমিকায় আমরা যা দেখেছি তা অভিনয় নয় ;—অভিনয় বললে তাকে যেন ছোট করা হয়—তা হচ্ছে সৃষ্টি, স্বাধীন সৃষ্টি—যা নাটকের মুখাপেক্ষা করে না !'

হয়তো এই আলোচনার ভাষায় কিছু উচ্ছ্বাস আছে। কিন্তু সমস্ত বাঙলাদেশই তো তখন শিশিরকুমারের অভিনয় বিষয়ে উচ্ছ্বসিত। সেই সময়ের শিশিরকুমার ও নাট্যমন্দিরের নামে উত্তরকালে বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন ঃ

'কলকাতার, সারা বাংলার, শিক্ষিত সমাজে কেউ কি ছিলেন যিনি শিশির-কুমারের অভিনয় বিষয়ে উচ্ছ্বসিত নন ? মনীষীদের মধ্যে এমন কেউ, যাঁর অন্যতম গন্তব্য নয় নাট্যমন্দির ? ইতিমধ্যেই, মাত্র কয়েকবছরের মঞ্চজীবনের পরে, শিশিরকুমার প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছেন, প্রায় একটি রূপকথায় ; আমরা তাঁকে তখনই গল্পের মানুষের মতো দেখছি, যেন তিনি সমালোচনার ঊর্দ্ধে, সাংসারিক আইন কানুনের পরপারে। পণ্ডিত বলে যশস্বী তিনি, আলাপশিল্পে সুদক্ষ বলে ; আর তাঁর অভিনয়-প্রতিভা এমন স্পষ্ট, প্রোজ্জ্বল ও তর্কাতীত যে তাকে অভিনন্দন জানাবার জন্য অচিন্ত্যকুমারকে কবিতা লিখতে হল। তাঁর কণ্ঠের 'সীতা' ডাক শুনে পুলকবেদনায় আপ্লুত হল কলকাতা।

যেমন তিনি অভিনয়ে অনন্য, তেমনি তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতা অভিনেতা সৃষ্টি



'বিসর্জনে'

রঘুপতি রূপে রবীন্দ্রনাথ

জয়সিংহ রূপে অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ





অমরেন্দ্রনাথ দত্ত



দীনবন্ধু মিত্র

অমৃতলাল বসু



করে নেবার। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে আর যাঁরা বিকশিত হলেন ঃ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শৈলেন চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শ্রীমতী প্রভা, শ্রীমতী চারুশীলা, শ্রীমতী কঙ্কাবতী—এই সব মৃত মানুষের নাম, আজকের তরুণদের কাছে যার কোন অর্থ নেই আর, সেই সব নাম কৃতজ্ঞ বেদনায় স্মরণ করা আমাদেরই কর্তব্য, আমরা যারা সেই সময়ে তরুণ ছিলাম। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন রঙ্গমঞ্চে নতুন, কিন্তু শিশিরকুমারের এক-একটি প্রযোজনায় প্রথম থেকে শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত কোথাও ছিল না আড়ষ্টতা বা ছন্দপতন ; আদ্যন্ত ছিল একসুরে বাঁধা একই সামঞ্জস্যের অন্তর্ভূত, এক পরিকল্পনার অনুগামী। 'সীতা', 'আলমগীর,' 'ষোড়শী'—এই তিনটি নাটক অভিনীত হবার পরেই এই সত্যটি অনুভূত হল যে,নাট্যমন্দির একটি রঙ্গমঞ্চমাত্র নয়, নয় কোন প্রমোদভবন যা থেকে বেরিয়ে এলে তার কথা আর বেশিক্ষণ মনে রাখতে হয় না ; তা আমাদের জীবনের মধ্যে স্থান ক'রে নিয়েছে, হ'য়ে উঠেছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যার সঙ্গে সংযোগ রেখে চলা বুদ্ধিজীবী প্রতি বাঙালীর অবশ্যকৃত্য।...'

নাট্যমন্দিরে রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' খোলা হল ১৯২৭ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর।

'গোড়ায় গলদ'কে অদলবদল করে রবীন্দ্রনাথ 'শেষ রক্ষা' করেছেন। 'গোড়ায় গলদে'র প্রথম অভিনয়ে—হ্যাঁ, শৌখিন শিল্পীদের অভিনয়ে—শ্রীশচন্দ্র বসু সেজেছিলেন চন্দ্রবাবু আর অটলকুমার সেন সেজেছিলেন শিবু ডাক্তার। গোড়ায় গলদের সেই অভিনয়ে নাট্যাচার্য ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

অটলকুমার নাকি একটা কাণ্ড করেছিলেন সেবার। অভিনয় নিখুঁত করার জন্যে, শুনতে পাই, তিনি সামনের দুটো আসল দাঁত তুলে ফেলে নকল দাঁত বাঁধিয়ে নিয়েছিলেন।

'গোড়ায় গলদে' চন্দ্রবাবুর গান গাইবার কথা। কিন্তু শ্রীশচন্দ্র বসু গান জানেন না। তাই একটা চমৎকার ব্যবস্থা করা হল। গানের দৃশ্যে চন্দ্রবাবুরূপী শ্রীশচন্দ্র বন্ধুদের বললেন—অপনারা একটু বসুন, রবিবাবুর এখন আসবার কথা আছে, তাঁর গান আপনাদের শোনাব।

সত্যি সত্যি রবীন্দ্রনাথ দেখা দিলেন সেই দৃশ্যে। গান গাইলেন। চন্দ্রবাবু-রূপী শ্রীশচন্দ্র বসু গান জানেন না বলে পালার গোড়ায় কিম্বা শেষে কোন গলদ রইল না।

শিশিরকুমার চন্দ্রবাবুর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। 'শেষরক্ষা'র অভিনয়ে একটা নতুনত্ব দেখিয়েছেন শিশিরকুমার। সে-সময়ে একজন ন্যাট্যবোদ্ধা লিখেছেন ঃ

"Fuchs, Littman, Copeau প্রভৃতি য়ুরোপীয় প্রয়োগকর্ত্তারা প্রেক্ষাগৃহ ও রঙ্গমঞ্চের মধ্যে যে অন্তরঙ্গতা বর্দ্ধনের চেষ্টা করেছেন এবং Meierhold ও Reinhardt যে চেষ্টা সফল করেছেন—"শেষরক্ষা"র অভিনয়ে বাংলা দেশে সর্ব্ব-প্রথমে এই উপভোগ্য আধুনিকতার সূচনা হয়েছে।

"শেষরক্ষার" শেষদৃশ্যের অভিনয়কালে দর্শকরা রঙ্গমঞ্চের উপরে গিয়ে অভিনেতাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এবং অভিনেতারা প্রেক্ষাগৃহে নেমে এসে দর্শকদের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন! ব্যাপারটা এমন নূতন যে, অনেক দর্শকই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে এই নূতনত্বের আসল কারণ বুঝতে পারেন নি!

এই যে "Theatrical intimacy", এর আর এক নাম হচ্ছে unity of action এবং এজন্যে মায়ারহোল্ড প্রভৃতিকে সমগ্র রঙ্গালয়ের গড়ন বদলাতে হয়েছে। নাট্যমন্দিরে আপাততঃ সে সুযোগ নেই, কাজেই রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রেক্ষাগৃহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সোপানশ্রেণী স্থাপন করে শিশিরকুমার অন্তরঙ্গতার বাধা যতটা সম্ভব দূর করেছেন।"

বাঙলা রঙ্গমঞ্চে এই নতুনত্ব যাঁর প্রয়োগনৈপুণ্যে সম্ভব হল, বাঙলা রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে নিশ্চয়ই তাঁর কিছু নতুন কথা বলবার আছে। হ্যাঁ, এই সময়েই শিশিরকুমার লিখেছেন ঃ 'বাঙলা দেশে রঙ্গমঞ্চের কথা বলতে হলে সর্ব্বপ্রথম মনে হয় এদেশে রঙ্গালয়ের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি না। যে দেশের লোক দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না সে দেশের লোক দুটি তিনটি রঙ্গালয় চালাতে পারে বলে আমার বিশ্বাস নেই। বিলাতী আদর্শে আমাদের রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা,—বিলাতী বললে ভুল হয়,—ইংরাজী। কিন্তু ইংরাজ অভিনেতারা কোনদিনই অভিনেতা হিসাবে Continental Actor-দের সমকক্ষ নন। ইংলণ্ডে Drama-র উৎকর্ষ হয়েছিল Shakespeare-এর সময়, কিন্তু Shakespeare-এর যুগটা Robust Realism-এর যুগ ছিল না। দৃশ্যপট ও property-র বাহুল্য যেটা আজকাল অপরিহার্য্য বলে মনে হয় সেইটাই তো বড় জিনিষ নয়। তার চেয়ে বড় জিনিষ হচ্ছে অভিনয়। আমরা ভুল করেছি ইংরাজী আদর্শের অনুকরণ করতে গিয়ে—সত্য জিনিষটাকে বাদ দিয়ে মিথ্যাটাকে বড় করেছি। অভিনয়কে বাদ দিয়ে, চরিত্রসৃষ্টি বাদ দিয়ে সাজসরঞ্জাম ও background-কে বড় করেছি। এ ভুল আমাদের শোধরাতে হবে।—ফিরে যেতে হবে পুরাণো যাত্রার রাস্তায়,—রসসৃষ্টি করতে হবে। ষ্টেজটা painter-এর সম্পত্তি না হয়ে হওয়া উচিত অভিনেতার আসর।'

১৯২৭ সালে শিশিরকুমার আর যেসব ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, তার প্রায় পূর্ণ তালিকা দাখিল করি ঃ 'সাজাহানে' সাজাহান ও ঔরংজেব ; 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদ ; দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'য় রাম ; 'ভ্রমরে' গোবিন্দলাল, 'আলমগীরে' আলমগীর ; 'চন্দ্রগুপ্তে চাণক্য ; 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে' কীচক ও ব্রাহ্মণ ; যোগেশচন্দ্রের 'সীতা'য় রাম এবং 'নর-নারায়ণে' কর্ণ।

১৯২৮ সালের ২৫শে জানুআরি 'বলিদানে' করুণাময় সাজলেন শিশিরকুমার। এ-বছরে গোড়ার দিকে এছাড়া আর কোন নতুন ভূমিকা নিয়ে শিশিরকুমার মঞ্চে দেখা দেননি।

১৯২৮ সালের ৬ই এপ্রিল অমৃতলাল বসু শিশিরকুমার সম্পর্কে একটি অসাধারণ উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ 'He is a genius···শিশিরের সম্পর্কে এই বললেই বোধ হয় যথেষ্ট হবে যে, এটা শিশিরের যুগ। যেমন গিরিশচন্দ্রের অর্ধেন্দু-শেখরের যুগ গিয়েছে, তেমনি এটা শিশিরের যুগ।'

কিন্তু শিশিরকুমারের যুগে দানীবাবু কোথায় ? দানীবাবুকে কি ভুলে গেল সকলে ?

মনোমোহন থিয়েটার থেকে বিদায় নেবার কিছুদিন পরে দানীবাবুকে আর্ট থিয়েটারে দেখতে পাচ্ছি। আর্ট থিয়েটারের সঙ্গে তিন বছরের জন্যে দানীবাবুর চুক্তি হয়েছে। দানীবাবু মাইনে পাবেন প্রথম বছরে আটশো টাকা, দ্বিতীয় বছরে নশো টাকা, তৃতীয় বছরে হাজার টাকা।

সে-সময়ে আর্ট থিয়েটারে শনি-রবিবার 'কর্ণার্জুন' হত, বুধবার 'ইরাণের রাণী' হতো বৃহস্পতিবার পুরনো নাটক—যেমন 'বিল্বমঙ্গল', 'প্রফুল্ল', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সরলা' ইত্যাদি—অভিনয়ের ব্যবস্থা। ঠিক হল, দানীবাবু ওসব পুরনো নাটকে অভিনয় করবেন।

২৪শে জুলাই, ১৯২৪ সাল। সেদিন দানীবাবু আর্ট থিয়েটারে 'চন্দ্রগুপ্তে' প্রথম চাণক্য সাজলেন।

কয়েকরাত্রি অভিনয় করা গেল আর্ট থিয়েটারে। তারপর অসুবিধায় পড়লেন দানীবাবু। স্ত্রী অসুস্থ, রাঁচিতে। দানীবাবু আর অভিনয় করতে চাইলেন না। অনেক সাধ্য-সাধনার পর রফা হল, অভিনয়ের আগের দিন দানীবাবু রাঁচি থেকে কলকাতায় আসবেন, অভিনয় করেই আবার রাঁচিতে চলে যাবেন। তাই হল।

কিছুদিন পর কলকাতায় নিয়ে আসা হল দানীবাবুর স্ত্রীকে। অসুখ সারল

না। সে-সময়ে দানীবাবু বলতেন—যদি যথাসর্বস্ব দিয়েও ওকে সুস্থ করে তুলতে পারি, তাহলে আবার মোট বয়ে সংসার চালাব, সেও ভাল।

কিন্তু কিছুতেই রোগমুক্তি হল না। দানীবাবুর স্ত্রী মারা গেলেন ১৯২৬ সালে। স্ত্রীর জন্যে ছেলেমানুষের মত কাঁদতেন দানীবাবু।

চুক্তি যে-রকম ছিল, দানীবাবু তিনবছর রইলেন আর্ট থিয়েটারে। নতুন নাটকে নতুন ভূমিকায়ও দানীবাবু আর্ট থিয়েটারে অভিনয় করেছিলেন, কিন্তু তা উল্লেখযোগ্য হয় নি।

তারপর মিনার্ভা থিয়েটারে এলেন দানীবাবু।

দানীবাবুর আমলেই মিনার্ভায় অমৃতলাল বসুর 'যাজ্ঞসেনী'র অভিনয় হল। প্রথমে দানীবাবুকে দেওয়া হল অর্জুনের ভূমিকা।

রিহার্সালের সময় অমৃতলাল একদিন দানীবাবুকে বললেন—তোর পার্টটা একবার বলবি দানী!

দানীবাবু পার্টটা বললেন না। অমৃতলাল হয়তো অসন্তুষ্ট হলেন।

কিন্তু দু-একদিন পরে দানীবাবু নিজেই এসে অমৃতলালকে বললেন—আমার পার্টটা একবার শুনবেন?

অমৃতলাল বললেন—শুনব বইকি বাবা।

শুনলেন। খুশি হলেন খুব। বললেন—বাঃ! গিরিশ ঘোষের ব্যাটা নইলে কি এমনভাবে বলতে পারে? কানটা জুড়িয়ে দিলি বাবা।

দানীবাবু কিন্তু 'যাজ্ঞসেনী'তে অর্জুনের ভূমিকায় অভিনয় করেন নি। ও-বয়সে কি অর্জুনের ভূমিকায় মানায়? দানীবাবু শেষপর্যন্ত নিলেন ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা।

মিনার্ভার পর দানীবাবুকে দেখা গেল মনোমোহন থিয়েটারে—১৯২৮ সালের কথা।

এই ১৯২৮ সালের ২রা অক্টোবর একটা বিশেষ ঘটনা আছে।

গিরিশ স্মৃতি-সমিতির উদ্যোগে, ১৯২৮ সালের ২রা অক্টোবর, 'প্রফুল্ল' ও 'আবুহোসেন' অভিনয়ের আয়োজন হল নাট্যমন্দিরে। ঠিক হল, সেদিন 'প্রফুল্লে' যোগেশ সাজবেন দানীবাবু, রমেশ সাজবেন শিশিরকুমার।

দানীবাবু এককথায় শিশিরকুমারের সঙ্গে অভিনয় করতে রাজী হন নি। অনেক সাধ্য-সাধনায় রাজী হলেন, কিন্তু বিনাশর্তে নয়। কী শর্ত? না, অভিনয়কালে দানীবাবুর কথা বলার সময় শিশিরকুমারকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

এই অদ্ভুত শর্তের একটা কারণ আছে বইকি।

একবার 'চন্দ্রগুপ্তে' দানীবাবু চাণক্য আর নরেশ মিত্র কাত্যায়ন করেছিলেন। একটা দৃশ্যে চাণক্য যখন কথা বলছেন, কাত্যায়নরূপী নরেশ মিত্র গিয়ে বেশ ভাল করে চাণক্যবেশী দানীবাবুর ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে দেন। বলা বাহুল্য হবে না, দানীবাবু তাতে পুলকিত হন নি।

যা হোক, দানীবাবু শেষপর্যন্ত রাজী হলেন। দানীবাবু আর শিশিরকুমারের একসঙ্গে এই প্রথম অভিনয়, একটা দেখবার মত বস্তু বইকি।

এই অভিনয়ের জন্যে দানীবাবু আগে থাকতেই ভালো রকম তৈরি হয়ে নিয়েছেন। পাছে কণ্ঠস্বরে কোন গোলমাল হয়, অভিনয়ের দুদিন আগে থেকে কারও সঙ্গে কথা বলেন নি, ইশারায় কাজ চালিয়েছেন। অভিনয়রাত্রে খুব খাওয়া-দাওয়া হল, কিন্তু শত অনুরোধেও দানীবাবু একবিন্দু মদ ছুঁলেন না।

সন্দেহ নেই, সেদিন সুন্দর অভিনয় করেছেন দানীবাবু। শিশিরকুমারও সেদিনের অভিনয়ে আপন খ্যাতির মর্যাদা রেখেছেন। এখানেই বলে রাখি, দানীবাবু আর শিশিরকুমার পরেও একসঙ্গে কয়েকবার অভিনয় করেছেন।

ভুল হয়ে গেছে, একটা খবর বলা হয় নি। আগের বছর, অর্থাৎ ১৯২৭ সালের গোড়ার দিকে, হার্ডিঞ্জ হোস্টেলের ছাত্ররা সভা করে শিশিরকুমারকে অভিনন্দন জানিয়েছে। সভাপতি প্রমথ চৌধুরী। সভায় উপস্থিত ছিলেন অমৃতলাল বসু, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।

সেই সভায় শিশিরকুমার একটি ছোটখাট বক্তৃতা দিয়েছেন। বাঙলা নাট্যশালার নতুন যুগের প্রবর্তকের মুখে কয়েকটি মূল্যবান কথা শোনা গেল। শিশিরকুমারের বক্তৃতার সারমর্ম : নতুন ও পুরনোর মধ্যে পার্থক্য কিছুই নেই। কাল যা নতুন ছিল, আজ তাই পুরনো হয়েছে। আর আজ যা নতুন কাল তা পুরনো হয়ে যাবে। পুরনোর সঙ্গে নতুনের কোন বিরোধ নেই। নতুনের মধ্যে কেবলমাত্র 'প্রয়োগশিল্প'ই এ-যুগের দান। গিরিশচন্দ্রের যুগে প্রয়োগশিল্পের কোন অস্তিত্ব ছিল না।

পরের বছর—১৯২৮ সালের ১৯শে এপ্রিল—একটা মস্ত সভা হল শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলে। অমৃতলাল বসুর জন্মদিন উপলক্ষে সভা। সভায় শিশিরকুমার উপস্থিত আছেন ? না, নেই।

নিমন্ত্রিত হয়েও বিস্তর নাট্যশিল্পী অনুপস্থিত থেকেছেন। আর কেউ আসেন নি বলে বিশেষ-করে নয়, শিশিরকুমার আসেন নি বলে অমৃতলাল বিশেষ করে দুঃখ করেছেন। বলেছেন—যার সম্বর্ধনায় আমি এই বৃদ্ধ বয়সেও আনন্দের সঙ্গে হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে উপস্থিত ছিলাম, যাকে আমি ভালবাসি, সেই শিশিরেরই কি আসা উচিত ছিল না ?

১৯২৮ সালের ১৯শে এপ্রিল নাট্যমন্দিরে 'চন্দ্রগুপ্ত' হল ; জনৈক পারিষদের একটি সামান্য ভূমিকায় শিশিরকুমার অভিনয় করলেন।

১৯২৮ সালের ১১ই মে 'নাচঘর' মন্তব্য করেছে ঃ 'নাট্যমন্দিরে' এখন একমাত্র 'ষোড়শী' ছাড়া প্রতি রাত্রেই পুরাতন নাটকের পর পুরাতন নাটকের স্রোত,—এটা যে 'নবযুগে'র নূতনত্বের পরিচয় নয়, আশা করি শিশিরবাবু নিজেই সেটা না মেনে পারবেন না। দুঃখের বিষয়, তাঁকে বারংবার এই সহজ সত্য কথাটা মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে। 'নাট্যমন্দিরে' আবার আমরা তরুণ সজীবতা দেখতে চাই নূতন নাটক, নূতন ভাব, নূতন পরিকল্পনা।

২৯শে মে, ১৯২৮ সাল। সেদিন 'বিল্বমঙ্গলে' বিল্বমঙ্গল সাজলেন শিশিরকুমার। এ-জাতের ভূমিকায় শিশিরকুমার এই প্রথম অভিনয় করলেন। ২৩শে জুন 'জনা' হল ; শিশিরকুমার নীলধ্বজ। ১৪ই জুলাই আবার 'জনা' হল ; সেদিন শিশিরকুমার আর নীলধ্বজ নন, বিদূষক।

কিন্তু এসব তো দেখছি পুরনো নাটক। নতুন নাটক কই ?

'হাসনো হানা' নামে একখানা নতুন নাটকের নাট্যমন্দিরে প্রথম অভিনয় হল ১৯২৮ সালের ২৫শে আগস্ট। শিশিরকুমার সাজলেন ঘাতক রুদ্রগিরি। নাট্য মন্দিরে তারপর নতুন নাটকের অভিনয় দেখতে হলে চলে আসতে হবে ১৪ই ডিসেম্বরে। সেদিন 'দিগ্বিজয়ী' নামে একখানা নতুন নাটকের প্রথম অভিনয় হল। দিগ্বিজয়ীই বটে ! 'দিগ্বিজয়ী'তে শিশিরকুমার নাদিরসাহ।

১৯২৮ সালের ২১শে ডিসেম্বর 'নাচঘর' লিখেছে ঃ

"দিগ্বিজয়ী"র ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় ! কি করে তার পরিচয় দেব, অবর্ণনীয়কে কি ভাষায় বর্ণনা করা যায় ? তাজমহলের উপযোগী বর্ণনা আজও পাঠ করিনি—তাজমহলের স্রষ্টাও ভাষায় তাকে ফোটাতে পারতেন বলে বিশ্বাস করি না। "দিগ্বিজয়ী"র অভিনয়ও ঐ তাজমহলের মত। তা বর্ণনা করবার সাধ্য আমাদের নেই এবং শিশিরকুমার নিজেও তা কথায় প্রকাশ করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে আমরা দু-চারটে ইঙ্গিত দিয়েই কাজ সারতে চেষ্টা করব।

অনেকে আমাদের জিজ্ঞাসা করেছেন, নাদির সাহের ভূমিকায় শিশিরকুমারের অভিনয় কি আলমগীরের মতই ভালো হয়েছে? এ-সব জিজ্ঞাসার উত্তর নেই। কারণ যে-শিল্পীর এক সৃষ্টি আর এক সৃষ্টিকে স্মরণ করিয়ে দেয়, তাঁর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবার অবকাশ আছে যথেষ্ট। আসল কলাবিদের প্রত্যেক সৃষ্টিই হয় আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, তারা পরস্পরের সঙ্গে তুলনাবিহীন এবং নূতনত্বের বিস্ময়ে অপূর্ব্ব।...“নাদির সাহ” যে “আলমগীরে”র মত হয়নি, এইটেই তার শ্রেষ্ঠতার বড় নিদর্শন।

কী সূক্ষ্ম এই “নাদির সাহের” অভিনয়! অসংখ্য স্থলেই শিশিরকুমার তাঁর মুহূর্ত্তস্থায়ী অঙ্গভঙ্গি বা কণ্ঠের সামান্য অর্দ্ধস্ফুট ধ্বনির ভিতরে এমন বৃহৎ ভাব বা অর্থকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, বাঙলা দেশের আর কোন অভিনেতাকে তেমন চেষ্টা করতে দেখিনি। এবং তেমন চেষ্টা করবার মত মস্তিষ্ক তাঁদের আছে কি না, সেও একটা ভাববার কথা।...

প্রথম অঙ্কে নাদির সাহ যে-ভাবে সিতারার কাছে প্রেম-নিবেদন করেছে তেমন অদ্ভুত ও মৌলিক উপায়ে যে স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ না করেও প্রেম জানানো যায়, শিশিরকুমারের অভিনয় দেখবার আগে আমরা তা বিশ্বাস করতুম না। অতি সুন্দর, অতি সুন্দর! কৃত্রিম ও চেষ্টাকৃত দরদ দেখানো নেই, বিকৃত থিয়েটারী কণ্ঠস্বর নেই, দৃশ্যকে জমকালো করবার জন্যে হরেক রকমের প্যাঁচ নেই, অথচ কত সহজে পৃথিবীর এই অতি-পুরাতন প্রেম নূতন রসের ধারায় দর্শকদের হৃদয়কে স্নিগ্ধ ও মুগ্ধ করে তুলেছে!

চতুর্থ অঙ্কের সর্ব্বশেষে ভারত-নারীর (এই ভারতনারী হচ্ছে নাট্যকারের বিচিত্র সৃষ্টি—অপূর্ব্ব মানসী প্রতিমা) করুণ আত্মনিবেদনের পরে নাদির সাহের সেই পা টান্‌তে টান্‌তে চলা যে কতখানি ভাবের সন্ধান দিয়েছে, রসিক দর্শক নিশ্চয়ই তা অনুভব করতে পারবে।...

আমরা দুটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলুম, কিন্তু নাদির-ভূমিকায় সর্ব্বত্রই এমনি সৌন্দর্য্যের কণা ছড়ানো আছে। একটি নূতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার জন্যে শিশিরকুমার যে রীতিমত মস্তিষ্ক চালনা করেন, তার মধ্যে যতটুকু সম্ভাব্য ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খুঁটিনাটি থাকে, তাঁর ভাবগ্রাহী চিত্ত সে সমস্তের কিছুই ত্যাগ করে না, “দিগ্বিজয়ী” তার অন্যতম উদাহরণ।...

শিশিরকুমারের মতন ভাবব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর যে এখন আর কোন বাঙালী অভিনেতার নেই, এতদিনে তা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়ে গেছে। সুতরাং

তা নিয়ে আর বিশেষ আলোচনা অনাবশ্যক। কিন্তু তবু এটা না উল্লেখ করে পারছি না যে, নাদির ভূমিকায় তাঁর এই বহু প্রশংসিত কণ্ঠস্বরের লীলা হয়ে উঠেছে অধিকতর অভাবনীয় ও বিচিত্রগতিমধুর। সে যেন এক ধ্বনি তরবারি—নিপুণ ওস্তাদের শাসনে লীলায়িত হচ্ছে অকল্পিত কৌশলে, বিদ্যুতের মত! ও কণ্ঠ রহস্যের ভাণ্ডার, ওর ভিতরে কী না সঞ্চিত আছে—বজ্রের নির্ঘোষ, বসন্ত বায়ুর উচ্ছ্বাস, তপ্ত মরুর আর্তনাদ, কুঞ্জকাননের অস্ফুট মর্ম্মর গীতি।

কে নাদির, কে শিশিরকুমার জানি না। ভূমিকার ভিতরে অভিনেতা ডুবে গেছেন, না অভিনেতার ভিতরে ভূমিকা লুপ্ত হয়ে গেছে? নাদির সাহের ভূমিকায় আমরা নটের অভিনয় দেখিনি, শতাব্দীর অন্ধকার ঠেলে ঐতিহাসিক নাদির সাহ চোখের উপরে জ্যান্ত হয়ে জেগে উঠেছে—তার রক্তের স্রোত, মাংসের তপ্ততা, হৃৎপিণ্ডের নৃত্য আমরা নিজেদের জাগ্রৎ অনুভূতির ভিতরে লাভ করেছি···।

দেখতে দেখতে ১৯২৯ সাল এসে গেল। ১৯২৯ সালের কলকাতার মাত্র কয়েকটি অভিনয়রাত্রির কথা এখানে লিখে রাখি।

১৯২৯ সালের ৩রা মে নাট্যমন্দিরে অমৃতলাল বসুর 'বিবাহ বিভ্রাট' হল। শিশিরকুমার সেজেছেন মিঃ সিং।

সেদিন শিশিরকুমার অমৃতলালকে নেমন্তন্ন করেছেন। গাড়ি পাঠিয়ে অমৃতলালকে যথাসময়ে নিয়ে এসেছেন থিয়েটারে।

সেদিন শিশিরকুমার অমৃতলালকে বললেন—আমার সাধ, আপনাতে আমাতে একসঙ্গে একবার নামব। 'তরুবালা' অভিনয় করব, আমি অখিল সাজব, আপনাকে মৃত্যুঞ্জয় ঠাকুর্দা সেজে নামতে হবে।

অমৃতলাল বললেন—তোমার সঙ্গে নামবার সাধ আমারও অনেকদিন থেকে আছে। আগে থাকতে আমায় জানিয়ো, আমি নামব বইকি!

কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে নি। ১৯২৯ সালের ২রা জুলাই অমৃতলাল মারা গেলেন। জীবনে শিশিরকুমার কখনও 'তরুবালা'র অভিনয় করেন নি।

১৯২৯ সালের ৮ই জুন নাট্যমন্দিরে বুদ্ধদেব' হল। নাম ভূমিকায় শিশিরকুমার।

'চিরকুমার সভা'র কথায় আসতে হয় এবার।

শুনতে পাই, 'চিরকুমার সভা' অভিনয়ের ভার শিশিরকুমারই প্রথম পেয়েছিলেন। মনোমোহন নাট্যমন্দিরে 'সীতা'র অভিনয় হচ্ছিল যেসময়ে, সেই সময়েই 'চিরকুমার সভা' এসেছিল শিশিরকুমারের হাতে। 'চিরকুমার সভা'র মহলাও শুরু করে দিয়েছিলেন শিশিরকুমার। কিন্তু 'চিরকুমার সভা'র অক্ষয়ের ভূমিকায় কে অভিনয় করবেন? তেমন ভালো গান জানা অভিনেতা কোথায়? শিশিরকুমারের দুর্ভাগ্য, একসঙ্গে সুগায়ক ও সুঅভিনেতা পাওয়া গেল না তাড়াতাড়ি, 'চিরকুমার সভা'র মহলা বাধ্য হয়ে স্থগিত রাখতে হল। সেই সুযোগে 'চিরকুমার সভা'র অভিনয়স্বত্ব নিয়ে নিল আর্ট থিয়েটার। 'চিরকুমার সভা' শিশিরকুমারের হাতছাড়া হয়ে গেল।

'চিরকুমার সভা'র প্রথম অভিনয় হয়েছে স্টারের আসরে আর্ট থিয়েটারে ১৯২৫ সালের ১৮ই জুলাই। আর্ট থিয়েটারে 'চিরকুমার সভা'য় অহীন্দ্র চৌধুরী চন্দ্র, তিনকড়ি চক্রবর্তী অক্ষয়, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রসিক, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণ, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় বিপিন, ইন্দু মুখোপাধ্যায় শ্রীশ এবং নীহারবালা নীরবালা সেজেছেন। অন্যের কথা কি, 'চিরকুমার সভা'র অভিনয় দেখে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ খুব খুশী হয়েছেন।

তারপর প্রায় চার বছর কেটে গেছে। ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে একটা অভাবনীয় কাণ্ড হল। বিজ্ঞাপিত হল যে ১৯২৯ সালের ২৯শে জুলাই বঙ্গরঙ্গমঞ্চে নবযুগের প্রবর্তক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রথম স্টার রঙ্গমঞ্চে এসে 'চিরকুমার সভা'র বিশেষ অধিবেশনে চন্দ্রবাবুরূপে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করবেন!

দেখি। চন্দ্রবাবুকে তো অহীন্দ্র চৌধুরী থিয়েটারের ভাষায় যাকে বলে জ্বালিয়ে দিয়েছেন। দেখি শিশিরকুমারের চন্দ্রবাবু কেমন হয়।

১৯২৯ সালের ২রা আগস্টের 'নবশক্তি' থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি: "শিশির-অহীন্দ্রের পারস্পরিক শক্তিমত্তার তুলনায় প্রবৃত্ত না হয়েও একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে,'চিরকুমার সভা'র চন্দ্রবাবু শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর একটি অপরূপ সৃষ্টি। এর উপর রঙ ফলাতে যাওয়ার বিপদ এই যে, এর উপর perfection এর ছাপ আছে!

তাই সকলে সাগ্রহ বিস্ময়ে ভাবছিল শিশিরকুমার একে অতিক্রম করবেন কি করে!

নয়তো একই ভূমিকায় শিশির অহীন্দ্রের অবতরণ আজ নূতন নয়। সাজাহান ও প্রবীরের ভূমিকায় নাট্যামোদীদের অভিবাদন করেন অহীন্দ্রবাবুই প্রথমে, তারপর শিশিরকুমার তাদের নূতন রূপ দেন। তেমনি আবার চাণক্যের ভূমিকায় শিশিরকুমারের দেশবিশ্রুত খ্যাতির পরও অহীন্দ্রবাবু ঐ ভূমিকায় নামতে কুণ্ঠিত হননি। সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি করলেও তাতে নাট্যামোদীদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য এ রকম উদ্বেল হয়ে ওঠেনি। শুধু একবার অনুরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল যখন বছর দেড়েক আগে আলমগীরের ভূমিকায় অহীন্দ্রবাবু প্রথম অবতরণ করেন। আলমগীর হচ্চে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের অতুল যশের প্রথম সোপান এবং অনেকের মতে আজও তা তাঁর জয়ধ্বজার উচ্চতম পতাকা। অহীন্দ্রের চন্দ্রবাবুর মত এরও উপরে শিশির প্রতিভার শ্রেষ্ঠ শক্তির ছাপ আছে। তাই সেসময়েও নাট্যামোদীদের মন আগ্রহে ও ঔৎসুক্যে এই রকমই উদ্বেল হয়ে উঠেছিল!

বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার একটি বিশেষত্ব এই যে শিশিরকুমার একা ষ্টার রঙ্গমঞ্চে এসে ষ্টারেরই অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে অভিনয় করলেন। সম্মিলিত অভিনয়ে এর পূর্ব্বে আর একবার মাত্র তিনি যোগ দিয়েছিলেন—গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার সাহায্য রজনী উপলক্ষে। তাও সে অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর নিজেরই রঙ্গমঞ্চে তাঁর সম্প্রদায়ের অন্যান্য নটনটীর সাহচর্য্যে। এই তথ্যটীও নাট্যামোদীদের ঔৎসুক্যের মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে কম সাহায্য করেনি।...

এইবার অভিনয়ের কথা বলি।...চন্দ্রবাবুর অভিব্যক্তিতে অহীন্দ্রবাবুর মূল conception শিশিরকুমার কোথাও বদলাননি, শুধু প্রকাশভঙ্গীতে তিনি দিয়েছেন নূতন রূপ। এবং সেই প্রকাশভঙ্গীর সর্ব্বাঙ্গে পড়েচে শিশিরকুমারের অননুকরণীয় প্রতিভার অক্ষয় ছাপ।...

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত—কত অল্প সময়ের মধ্যে এই ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে শিশিরকুমারকে প্রস্তুত হতে হয়েচে। এদিক দিয়ে তাঁর সাফল্য যথার্থ বিস্ময়কর।

অহীন্দ্রবাবুর সঙ্গে তুলনায় শিশিরকুমারের চন্দ্রবাবু সম্বন্ধে আমরা এই বলতে পারি যে অভিনয়ে তিনি অহীন্দ্রের চন্দ্রবাবুর প্রভাব অতিক্রম করলেও গৌরবে তাকে কোথাও খাট করতে পারেননি। চন্দ্রবাবু দুজনকারই দুটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।..."

তারপর আগস্ট মাসে নাট্যমন্দিরে 'রমা' হল। শিশিরকুমার রমেশের ভূমিকায় অভিনয় করলেন।

'পল্লীসমাজ' উপন্যাস ভাঙিয়ে শরৎচন্দ্র নিজেই 'রমা' নাটকখানা লিখেছেন। 'রমা' কিন্তু সর্বাগ্রে অভিনীত হয়েছে স্টারের আসরে আর্ট থিয়েটারে—প্রথম অভিনয়ের তারিখ, ৪ঠা আগস্ট ১৯২৮ সাল। সাকুল্যে স্টারে 'রমা' হয়েছে উনিশরাত্রি।

১৯২৯ সালের ২রা নভেম্বর নাট্যমন্দিরে 'শঙ্খধ্বনি' নামে একখানা নতুন নাটকের প্রথম অভিনয় হল, শিশিরকুমার সেজেছেন কেতনলাল। তারপর 'তপতী'র প্রথম অভিনয় হল ২৫শে ডিসেম্বর; শিশিরকুমার সেজেছেন বিক্রমদেব।

১৯৩০ সালের গোড়ার দিকে নাট্যমন্দিরে দু-খানা পুরনো নাটকের দুটি নতুন ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন শিশিরকুমার, 'প্রতাপাদিত্যে' প্রতাপাদিত্য আর 'বলিদানে' দুলালচাঁদ। তাছাড়া অবশ্যি কয়েকটি পুরনো ভূমিকায় নেমেছেন, সেসবের আর নাম করার দরকার নেই।

আসল কথা, 'তপতী'র পরে নাট্যমন্দিরে আর কোন নতুন নাটকের অভিনয় হয় নি। ১৯৩০ সালের ২৫শে মার্চ শেষ অভিনয় হল নাট্যমন্দিরে। সেদিন দু-খানা পুরনো নাটকের অভিনয় হল—'সীতা' আর 'ষোড়শী'। 'সীতা' শেষ হয়ে 'ষোড়শী'র অভিনয় আরম্ভ হবার আগে সেদিন শিশিরকুমার দর্শকদের যা বলেছেন তা যথাসম্ভব তুলে দিচ্ছি ঃ

'আজকের অভিনয়ই আমাদের এখানে শেষ অভিনয়; আর আমরা এখানে অভিনয় করবো না। কেউ যেন না মনে করেন, নাট্যমন্দির উঠে গেল; নাট্যমন্দির রইল ঠিকই; মাত্র আমরা এই ষ্টেজটি ছেড়ে দিচ্ছি। এবং যতদিন না সুযোগ সুবিধা হবে, ততদিন পর্য্যন্ত কলকাতায় অভিনয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। এখন আমরা কলকাতা ছেড়ে বাঙলাদেশের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াব। ভবিতব্য জানেন, আবার কবে আমরা আপনাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করব। এইখানে এই স্থানটি ছেড়ে দিচ্ছি কেন, তা জানানো দরকার। কলকাতায় landlordism বলে বস্তুটি প্রবল হয়ে উঠেছে। আমাদের এই বাড়ীটির জন্যে মাসের মাস তিনহাজার দুশো পঞ্চাশটি করে টাকা গুণতে হয়। এত বাড়ীভাড়ার সঙ্গে অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ চালানো দুষ্কর আমাদের দেশে। থিয়েটারের যে হারে টিকিটের দাম করা হয়েছে, তা এদেশের পক্ষে খুব বেশী।

থিয়েটার জিনিষটা exotic—এই যে Set-scene, এই যে আলোর প্যাঁচ—এ হচ্ছে বিলাতীর কতকটা অনুকরণ। আমাদের জাতি যদি বেঁচে থাকত, তার মধ্যে যদি জীবনীশক্তি থাকত, তাহলে আমাদের নিজস্ব যে যাত্রাভিনয়, তাই আজ এমন অবস্থায় এসে পৌঁছুতে পারত, যাকে জগতের সামনে দাঁড় করাতে পারতুম। তার জন্যে যে ধরণের নাটক লেখা হতো, তাই হতো আমাদের —বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাটক ; যেমন আমাদের বাঙলার কীর্ত্তন, বাউল কালীঘাটের পট প্রভৃতি। জাপানের লোক যে-নাট্যাভিনয় করে, সে তাদের নিজের মত ; আমাদের তেমন জিনিষ নেই।

নানারকম কল্পনা মাথায় নিয়ে এই নাট্যমন্দির খোলা হয়। নাট্যমন্দির একা শিশির ভাদুড়ী গড়েননি ; অনেক বন্ধুবান্ধব মিলে এটির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ; এই রকম আরও অনেকে আছেন। আমাদের বাসনার এক অংশও পূর্ণ হয় নি। বিলাতীর অনুকরণের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে experiment-এর দরকার এবং তার জন্যে টাকা চাই ; কিন্তু তা পাইনি। আগে বড়লোকদের কাছ থেকে অনেক ভরসা পেয়েছিলুম ; ঐ পর্য্যন্ত। নাট্যমন্দির লিমিটেড করা হল, অথচ সেয়ার বিক্রী হল মাত্র সাতাশ হাজার টাকা। বোল বলতে Rolls Royce গাড়ী কিন্তু অনেককেই কিনতে দেখি। এই অবস্থায় থিয়েটার চালাতে গেলে যা হয় তাই হয়েছে—ঋণের সুদ ও বছরে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা বাড়ীভাড়া দিতে প্রাণ বেরুচ্ছে, অথচ লাভ—অর্থাৎ নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি---হচ্ছে না একটুও। তাই ঠিক করা গেছে, দেনার অঙ্ক বাড়িয়ে আর কাজ নেই। এ সদভিপ্রায় এর আগেও বার দুয়েক হয়েছিল ; কিন্তু কাজে তা পরিণত হয়নি। অনেকের ধারণা, টিকিট বিক্রী বাড়াবার জন্যে ও একটা চাল ; তা নয়। আমাদের অবস্থা দাঁড়িয়ে ছিল কতকটা Charles Dickens-এর নভেলের সেই ঘোড়াটার মত—"The horse is going to go, but not going." আমি থিয়েটারই করতে শিখেছি, ব্যবসা করতে শিখিনি কখনও।

যা হোক, আমি এখনও হতাশ হয়ে পড়িনি। আমার অন্তরে নাট্যভারতীর যে-মূর্তি সাধনার দ্বারা গড়ে তুলেছি, তাকে আমি দেখাবই দেখাব। আমার যথেষ্ট আশা আছে, আমার দেহপাতের পূর্বে আমি আপনাদের satisfactoin-এর জন্যে একটা-না-একটা-কিছু করবো। যাঁরা আমাদের থিয়েটার দেখেন, টিকিট কেনেন, অনুগ্রহ করেন, ভালোবাসেন, তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ।'

না, জনসাধারণের সহানুভূতির অভাবে নাট্যমন্দির বন্ধ হয় নি। নাট্যমন্দির বন্ধ হয়েছে বলে যাঁরা জনসাধারণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন, তাঁরা অসত্যের প্রশ্রয় দেন। কতবার শিশিরকুমার প্ল্যাকার্ডে নিজের নাম ঘোষণা করে অভিনয়-কালে অদৃশ্য হয়েছেন। অসুস্থ শরীরে ও অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় মঞ্চে নেমেছেন। স্টেজের ওপর থেকে দর্শকদের উদ্দেশে উপদেশ ও কটূক্তি বর্ষণ করেছেন। স্টেজের ওপরে অপ্রস্তুত অবস্থায় নাটকের পার্ট ভুলে গেছেন।

তবু দর্শকেরা বিমুখ হয় নি। শিশিরকুমারের অভিনয়প্রতিভাকে ভালবেসে শিশিরকুমারের অনেক অন্যায় নিঃশব্দে সহ্য করেছে, রাতের পর রাত নাট্যমন্দিরের প্রেক্ষাগার পূর্ণ করে রেখেছে।

যে যাই করুক, নাট্যমন্দির বন্ধ হয়ে গেল।

কিছুদিন বাদে শিশিরকুমারকে দেখা গেল স্টারের আসরে আর্ট থিয়েটারে। না, শিশিরকুমার একা আসেন নি। শিশিরকুমারের সঙ্গে তাঁর দলের কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রীও আর্ট থিয়েটারে এসেছেন।

১৯৩০ সালের ২৪শে জুন শিশিরকুমার নিবেদন করলেন ঃ

'বাংলাদেশের নট একদিন কল্পনা করিয়াছিল যে বাংলার নাট্যকলার বৈশিষ্ট্য বঙ্গবাসীর নিকটে সে সম্পূর্ণভাবে প্রকটিত করিবে। সেই প্রচেষ্টা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল নাট্যমন্দিরে। নাট্যমন্দিরের অভ্যুদয় যে প্রাণবন্ত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ বাংলার নাট্যানুরাগী দর্শকের নাট্যমন্দিরের অভিনয় দর্শন করিবার একান্ত ব্যাকুলতা। কিন্তু কলালক্ষ্মীর চরণে উদ্দিষ্ট অর্ঘ্য তিনি গ্রহণ করিলেও, ব্যবসায় হিসাবে তাহার সাফল্য কি কারণে ঘটিল না, তাহা প্রকাশ করিতে নিবৃত্ত রহিলাম। নাট্যমন্দিরের দেউল আজ ভিত্তিহীন, নটরাজের পূজারীরা আজ আশ্রয়হীন। অভিযোগ করিতে চাহি না, ব্যঙ্গোক্তি বক্রোক্তির অপমান মাথায় পাতিয়া লইতেছি, কিন্তু রঙ্গমঞ্চ হইতে শেষ বিদায় লইবার পূর্ব্বে দুই একটি কথা বলিয়া যাইতে চাই।

বাংলার নাটক ভবিষ্যতে কি রূপ গ্রহণ করিবে তাহারই অনুসন্ধান প্রচেষ্টায় নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হইবার পূর্ব্বেই ব্যর্থতায় তাহার পরিসমাপ্তি হইল। ধনিকের অত্যাচার, কূটবুদ্ধি প্রতিদ্বন্দ্বীর ষড়যন্ত্র, শিক্ষাভিমানীর ঔদাসীন্য, অশিক্ষিতের অনাগ্রহ, কপট বন্ধুর অনৃতাচার,

স্বার্থান্বেষী প্রিয়জনের আত্মীয়তা—কর্ণবধের ন্যায় এ ষড়যন্ত্র—দরিদ্র নটগণের পূজা পণ্ড করিল।

এখন আপদ্ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নাট্যমন্দিরের নূতন জীবনের আশায় আমাদের বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়াসকে অনেকে উপহাস করিতেছেন—এই হেতু যে, আমরা আমাদের নট-নীতি বিসর্জ্জন দিয়া স্বৈরাচার করিতেছি—কথা মিথ্যা। বর্ত্তমান যে রঙ্গালয়ের সহিত নাট্যমন্দিরের উপাসকগণ সংশ্লিষ্ট, তাঁহারা শুধু এই কারণেই অল্পকালের জন্য আংশিকভাবে তাঁহাদের মত ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন যে, অভাব ও অবহেলার মেঘ অন্তর্হিত হইবার পর তাঁহারা পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিবেন। এই মেঘাচ্ছন্নকালের মেয়াদ মাত্র দুই মাস। তাহার পরের ঘটনা যদি আমাদের বিড়ম্বিত করে, তাহা হইলে সে অগৌরব যেন নাট্যমন্দিরের সেবকদেরই স্পর্শে—ইতি। সপার্ষদ শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী।'

পুরনো ভূমিকার কথা ছেড়ে দিই, আর্ট থিয়েটারে দুটি নতুন ভূমিকায় অভিনয় করলেন শিশিরকুমার—'মন্ত্রশক্তিতে' মৃগাঙ্ক, 'কর্ণার্জুনে' কর্ণ।

কিন্তু নাট্যমন্দিরের দল কি ভেঙে গেল? নাট্যমন্দিরের নাম কি মুছে গেল? ১৯৩০ সালের ১৮ই জুলাই 'নবশক্তি' লিখেছে: 'ষ্টার রঙ্গমঞ্চে যে সব অভিনয়ে শিশিরকুমার ও তাঁর সহ-অভিনেতৃরা আজকাল অবতরণ করচেন, সেসবের ঘোষণাপত্রে নাট্যমন্দির বা সম্মিলিত অভিনয়ের কোন নামগন্ধই খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না। সেই কারণে সাধারণে অনুমান করচেন যে শিশিরকুমার তাঁর কয়েকজন সহকর্ম্মীকে নিয়ে আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেচেন।...'

পরের সপ্তাহের 'নবশক্তি' থেকে আরেকটু তুলে দিচ্ছি: "শিশিরকুমার আজকাল নিয়মিতভাবে তাঁর সম্প্রদায়ের কয়েকজন নটনটীর সঙ্গে ষ্টারের অভিনয়-আসরে অবতরণ করচেন। কত বেতনে শিশিরকুমার আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের অধীনে এই চাকরী স্বীকার করেচেন অথবা অন্য কোনরকম বন্দোবস্তে তিনি এমনিধারা সম্মিলিত অভিনয়ে যোগ দিয়েছেন—সে সম্বন্ধে কোন সঠিক সংবাদ আমাদের জানা নেই।...আমাদের মনে হয় যে "আপদ্ধর্ম্ম" হিসাবেই শিশিরকুমার আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য হয়েচেন। এ অবস্থায় বাস্তবিকই শিশিরকুমারের আচরণে তাঁর কল্যাণকামী কারুরই ক্ষুণ্ণ হওয়া উচিত হয়। আমরা কিন্তু বিস্মিত হয়েচি তাঁকে "মন্ত্রশক্তি" ও "কর্ণার্জুনে"র মত দুখানি "নাটকে" ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখে। শিশিরকুমারের অন্তরঙ্গমণ্ডলীর মুখে, যাঁরা সত্যিকার

ড্রামা বোঝেন বলে একটা প্রসিদ্ধি আছে, আমরা একাধিকবার এই দুখানি "নাটকে"র নিন্দা শুনেচি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এই নাটক দুখানিকে "যন্ত্রশক্তি" ও "কর্ণমর্দ্দন" ছাড়া অন্য কোন নামে অভিহিত করতেও প্রস্তুত নন। এ হেন কুনাটকে ভূমিকা গ্রহণ করে শিশিরকুমার বাঙলা দেশে কুনাটকের প্রচারে সহায়তা করচেন—নিয়তির নির্ম্মম পরিহাস ছাড়া আর একে কি বলা যেতে পারে?"

এরিক বেনেট ইলিয়টকে এবার এখানে নিয়ে আসা যাক। ইলিয়টের সঙ্গে এই কলকাতায়ই শিশিরকুমারের আলাপ-পরিচয়। ইলিয়ট একজন স্কচ যুবক। শিশিরকুমার ইলিয়টের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন, বড় বেশি বন্ধুত্ব করেছেন। শিশিরকুমার ইলিয়টকে বিশ্বাস করেছেন, বড় বেশি বিশ্বাস করেছেন। তার যা কুফল হয়েছে তা জানবার জন্যে খুব বেশি অপেক্ষা করতে হবে না।

এরিক বেনেট ইলিয়ট আমেরিকায় গিয়ে মিস মার্বারীর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করলেন। কে মিস মার্বারী? মিস মার্বারী মাঝে-মাঝে ব্যবস্থা করে বিদেশের বিখ্যাত নাটুকে দল নিয়ে যেতেন আমেরিকায়। আমেরিকার নাট্যামোদীদের বিদেশী অভিনয় দেখাতেন।

এরিক বেনেট ইলিয়ট মিস মার্বারীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে শিশিরকুমারকে সদলে আমেরিকায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। এবং এরিক বেনেট ইলিয়ট ব্যর্থ হলেন না।

সদলে শিশিরকুমারের আমেরিকা যাবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল, কিন্তু যাবার আগে শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে নালিশ আছে। হাইকোর্টে নালিশ। সে-সময়ের 'নবশক্তি' থেকে তুলে দিচ্ছি ঃ

'অভিনেত্রী শ্রীমতী চারুশীলা দাসী প্রযোজক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর বিরুদ্ধে বাকী মাহিনার নালিশ করেছিলেন। শিশিরকুমারের আমেরিকা-যাত্রার অব্যবহিত আগেই চারুশীলা হাইকোর্টে দরখাস্ত করেন যে তার দাবীর টাকা জমা না রেখে শিশিরকুমারকে যেন হাইকোর্টের এলাকা ত্যাগ করবার আদেশ দেওয়া না হয়। ফলে হাইকোর্টের অনুজ্ঞা অনুযায়ী শিশিরকুমারকে আমেরিকা-যাত্রার পূর্ব্বে দুহাজার টাকা আদালতে জমা রাখতে হয়েচে।

শিশিরকুমারের আমেরিকা-যাত্রার বিরুদ্ধে আরও একখানি দরখাস্ত পড়েছিল হাইকোর্টে। এই দরখাস্তে প্রকাশ যে ভূতপূর্ব্ব নাট্যমন্দিরের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সনৎকুমার মুখোপাধ্যায় ও ম্যানেজার শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ ভাদুড়ী এক ভদ্রলোকের

কাছ থেকে পাঁচশো টাকা ধার নেন ; সেই ধার শোধ করতে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সই-করা একখানি চেক সনৎ বাবু ও হৃষীকেশ বাবু সেই ভদ্রলোককে দেন ; কিন্তু ব্যাঙ্কে সেই চেকখানি dishonoured হয় ; এই অভিযোগে সেই ভদ্রলোকটি ফৌজদারী মোকদ্দমা করচেন। অভিযোগকারী হাইকোর্টে প্রার্থনা জানান যে তার মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবার আগে শিশিরকুমারকে যেন আমেরিকায় যেতে দেওয়া না হয়। সুখের বিষয় হাইকোর্ট কর্তৃক এই আবেদন অগ্রাহ্য হয়েচে।'

যা হোক, শিশিরকুমার সদলে পাড়ি দিলেন আমেরিকার দিকে। একই জাহাজে একই সঙ্গে একই দিনে গেলেন না সকলে ; একই দল দু-ভাগ হয়ে আলাদা দিনে আলাদা জাহাজে রওনা দিলেন। শিশিরকুমার আর তাঁর চাকর ভিখাকে বাদ দিয়ে হিসেব করলে মেয়ে-পুরুষে মিলিয়ে দলে আছেন তেইশজন ঃ অরবিন্দ বসু ; শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ; পান্নালাল মুখোপাধ্যায় ; মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ; যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ; বিশ্বনাথ ভাদুড়ী ; অমলেন্দু লাহিড়ী ; রাধাচরণ ভট্টাচার্য ; তারাকুমার ভাদুড়ী ; শৈলেন্দ্র চৌধুরী ; শীতলচন্দ্র পাল ; শরৎচন্দ্র চন্দ্র (বেচাবাবু) ; রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ; মণিমোহন চট্টোপাধ্যায় ; পরিমল দেবী ; কঙ্কাবতী সাহু ; প্রভা ; সরলা (বেঁকি) ; ঊষা (পটল) ; বেলা ; হেনা ; কমলা এবং কালিদাসী।

সব খরচপত্র দিয়েছেন রুসভেল্ট-স্টিমশিপ-কোম্পানির উকিল ইরা ক্যাম্বেল। আরও একজনের নাম করে রাখি—কার্ল রীড। ইনি মিস মার্বারীর প্রয়োগশিল্পী।

শিশিরকুমার সদলে ন্যু-ইয়র্কে পৌঁছলেন।

কথা ছিল, ১৯৩০ সালের ২৮শে অক্টোবর বিল্টমোর থিয়েটারে অভিনয় হবে। কিন্তু শিশিরকুমারের দুর্ভাগ্য, সেদিন অভিনয় হল না। ১৯৩০ সালের ২৮শে অক্টোবর বিল্টমোর থিয়েটার অন্ধকার হয়ে রইল।

রবীন্দ্রনাথ তখন ন্যু-ইয়র্কে। শুনতে পাই, ব্যবস্থা হয়েছিল যে সেদিন সেখানে রবীন্দ্রনাথ শিশিরকুমারের অভিনয়-উদ্বোধন করবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হার্টের অসুখ। তাছাড়া অভিনয়ই তো হল না সেদিন।

হ্যাঁ, ন্যু-ইয়র্কে শিশিরকুমার দেখা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু শিশিরকুমারকে সদলে স্বদেশে ফিরে যেতে বলেছিলেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যাচ্ছে ঃ রবীন্দ্রনাথ বলেন, তাহাদের মেরিট (merit) যেরূপ আছে,

তাহাতে দেশের লোকের সেবায় নিয়োগ করিলে ঢের বেশী কাজের মত কাজ হইবে, বিদেশে শুধু তার অপচয় হইবে।...তিনি ইচ্ছা করেন না যে তাহার কোন স্বদেশবাসী সেখানে থাকিয়া দুঃখ কষ্ট ভোগ বা সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে। উপার্জনের ও তাহা হইতে ব্যয় সঙ্কুলানের বিশেষ আশা তিনি করেন না।

রবীন্দ্রনাথের কথা অক্ষরে-অক্ষরে সত্য হয়েছে! আয়ের থেকে ব্যয় ঢের বেশি হয়েছে।

ন্যু-ইয়র্কে দুর্দশার আরম্ভ হল ১৯৩০ সালের ২৭শে অক্টোবর। অর্থাৎ, বিণ্টমোর থিয়েটারে যেদিন অভিনয় আরম্ভ হবার কথা, তার আগের দিন। ড্রেস-রিহার্সালের রাত্রে।

এ-বিষয়ে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন ঃ

"সাতাশে অক্টোবর আমাদের ড্রেস-রিহার্সাল হয়; আর, আটাশে অভিনয় হইবার কথা ছিল। আমাদের সংগে তম্পা-জাহাজে দৃশ্যপট ও পোষাক পরিচ্ছদ আসিলেও অনেক কিছুই কলিকাতা হইতে আনা সম্ভবপর হয় নাই। সেগুলি এখানে প্রস্তুত করিয়া দিবার কথা ছিল। নিউইয়র্কে নামিয়াই আমরা শুনিলাম, আগামী মঙ্গলবার অভিনয়। মাঝে আছে আর চারদিন। যদি আমাদের লোকজন সংগে থাকিত, একদিনেই 'স্টেজ' সাজানো সম্ভব হইত। কিন্তু, বিদেশী লোক,—একাজে তাহারা অনভ্যস্ত! তার উপর, পুরা দুইটি দিন লাগিয়া গেল 'কাস্টমসে'র নিকট হইতে জিনিসপত্র ফিরিয়া পাইতে। ড্রেস-রিহার্সাল দিতে গিয়া দেখি, 'সিন'গুলি সাজানো হইয়াছে, কিন্তু প্ল্যাটফর্ম নাই, সিঁড়ি নাই, পিছনের পর্দা নাই! এরিক কলিকাতায় বলিয়াছিলেন যে, এখানে আসিয়া ওগুলি সংগ্রহ করা হইবে, কিন্তু হয় নাই।

তারপর রিহার্সাল আরম্ভ হইল—Dress-rehearsal, which is as good as play. আলোর যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকিলেও আলোকসম্পাতের কোন লোক নাই। ইলেকট্রিশিয়ানকে নির্দেশ দিতে পারেন, এমন কেহ ছিল না। Indian Orchestra, যাহার একান্ত আবশ্যক ছিল—সেটি একেবারে নাই। এদেশে হার্মোনিয়াম লোকের দু'চোখের বিষ! আবার, বাঁশী বাজাইবার লোকও আমাদের ছিল না। এক, বাঁয়াতবলা—তাও শীতলবাবু মেয়েদের পায়ের তাল দেখাইবার জন্য জোরে দুম্‌দাম্ পিটিতেছিলেন। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত সবরকমের অসুবিধা সত্ত্বেও রিহার্সাল আরম্ভ হইল। শ্রীশবাবু 'দুর্মুখ', ভদ্রলোক পার্ট পর্যন্ত মুখস্থ করেন নাই। প্রথম হইতেই তিনি "তো-তো" আরম্ভ করিলেন।

শিশিরবাবু মৃদুস্বরে তাহাকে সাহায্য করিলেন। প্রেক্ষাগৃহ হইতে তাহা শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। পরে শুনিয়াছিলাম, কার্ল রীড নাকি শ্রীশবাবু সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"My god! The man does not know his role. And I hear the play has run there hundred nights."

যা' হোক, কোন রকমে ভালয় ভালয় প্রথম অংকের অভিনয় হইয়া গেল, আর কোন গণ্ডগোল ঘটে নাই। গোলযোগ বাধিল 'দ্বিতীয় অংকে'! মূল নাটকের দ্বিতীয় অংকে শম্বুকবধ। সময়-সংক্ষেপের জন্য উহা বাদ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় অংক হইয়াছে বাল্মীকির তপোবনের দৃশ্য। অথচ, এই আঠার বৎসর সময় যে চলিয়া গেল, তার কোন ইংগিত মধ্যে কোথাও দেওয়া হইল না। বরং, অংকের প্রথমে নাচগানের জন্য "মঞ্জুল মঞ্জরী নব সাজে" গাওয়া হইল। সীতার বনবাসের করুণ দৃশ্যের পর, শুধু অকারণ পুলকে নাচগান। তাও আবার মোট সাতজন নর্তকীর মধ্যে যে দুইজন নাচ জানে, সে দুজনেই কালো। একজন মোটা, একজন রোগা! এইবার মিস্ মার্বারী জ্বলিয়া উঠিলেন এবং এরিককে গালিবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। এরিক নিজের দোষ শিশিরবাবুর ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা করিল। তারপর বাল্মীকি মহাশয় প্রবেশ করিলেন, পরে লব-কুশ। শুধু লোকই যাওয়া-আসা করে। তারপর আসিলেন কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ শত্রুঘ্ন—শ্রীমান বেচা চন্দর। তার আসিবার ও কথা কহিবার ভংগী দেখিয়াই মিস মার্বারীর পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন—"Look at the man, has he ever been on the stage?" ইহার পরই তাঁরা চলিয়া যান। বাকি দুই অংক অভিনয় হইল বটে, কিন্তু নাটক কোথাও জমিল না। শ্রীশবাবু আবার পাট ভুলিলেন। "লক্ষ্মণ, ভরত,—ফিরাও বালকে" বলিতে আলো নিভিল না। শিশিরবাবুকে অত্যন্ত সজ্ঞানে মূর্চ্ছা যাইতে হইল। কোন গতিকে রিহার্সাল শেষ হইল।"

রিহার্সাল শেষ হল এবং দুর্দশার আরম্ভ হল। রিহার্সাল দেখে ইরা ক্যাম্বেল বললেন—এ চলবে না, আমি আর টাকা দেব না।

অতঃপর নানারকম টীকা-টিপ্পনী। এমন কথাও শোনা গেল যে কলকাতা থেকে একটা বাজে কোম্পানি এসেছে, আসল শিশির ভাদুড়ী বোধ হয় আসেননি, কে না কে একজন শিশির ভাদুড়ী সেজে এসেছে!

সুদূর বিদেশে শিশিরকুমার বিপদে পড়লেন। সতু সেন তখন ন্যু-ইয়র্কে। শিশিরকুমারের সেই দুঃসময়ে সতু সেন বিস্তর সাহায্য করেছেন। সতু সেন

সাহায্য না করলে ন্যু-ইয়র্কে শিশিরকুমারের দুর্দশা কোন চূড়ায় গিয়ে পৌঁছতো, সেকথা কল্পনা করতেও ভয় হয়।

সতু সেনের চেষ্টায় ন্যু-ইয়র্কে নতুন মুরুব্বী পাওয়া গেল। নতুন মুরুব্বীরা রিহার্সাল দেখে খুশি হলেন। ভ্যাণ্ডারবিল্ট থিয়েটারে 'সীতা'র প্রথম অভিনয় হল ১৯৩১ সালের ১২ই জানুআরি। পর-পর কয়েকরাত্রি 'সীতা' হল সেখানে। শিশিরকুমার রাম, প্রভা সীতা, যোগেশচন্দ্র বশিষ্ঠ, মনোরঞ্জন বাল্মীকি। ইংরেজীতে নয়, বাঙলাভাষাতেই অভিনয় হল। তবু অভিনয়ের প্রশংসা হল। বিশেষভাবে প্রশংসা পেলেন শিশিরকুমার ও প্রভা। ভাষার দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও সীতারূপিণী প্রভার চোখের জল অনেক দর্শকের চোখ অশ্রুসজল করে তুলতে পেরেছে।

কিন্তু অর্থভাগ্য অন্ধকার। নাচের জন্যে সাতজন শ্বেতাঙ্গিনী নর্তকীকে দলে নিতে হয়েছিল, কিন্তু যথাসময়ে তাদের প্রাপ্য মেটানোর মুহূর্তে দেখা গেল, উপায় নেই, সঙ্গতি নেই। সব অবস্থা খোলাখুলি বলা হল। অবস্থা বুঝে নর্তকীরা বলে গেলেন—well, money is indeed necessary, but we have to face it anyhow.

তারপর একটা ইস্কুলে অভিনয় করা গেল। এবং ওই পর্যন্ত।

লাভ তো দূরের কথা, শেষপর্যন্ত হিসেব করে দেখা গেল, ন্যু-ইয়র্কে ঋণের পরিমাণ আড়াই হাজার টাকার কম নয়। ন্যু-ইয়র্ক থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজে উঠতে হলে ওই ঋণ শোধ করে যাওয়া উচিত। কিন্তু সেটা অসম্ভব কথা।

সতু সেন পরম বন্ধুর কাজ করেছেন সেখানে। সকল ঋণের দায়-দায়িত্ব তিনি নিজে নিয়েছেন।

ন্যু-ইয়র্ক থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন শিশিরকুমার। ফিরতি-পথে নিউ-দিল্লীতে কয়েকদিন অভিনয় দেখিয়ে এলেন।

—:০:—

উনিশ

আমেরিকা থেকে বাঙলায় ফিরে এসে শিশিরকুমার প্রথম মঞ্চে দেখা দিলেন—না, খাস কলকাতায় নয়—হাওড়ায় 'নাট্যপীঠে'—১৯৩১ সালের ৩রা এপ্রিল। সেদিনই সকালবেলা 'নাট্যপীঠে'র তরফ থেকে সভা করে শিশিরকুমারকে অভিনন্দিত করা হল। অভিনন্দনের উত্তরে শিশিরকুমার যা বলেছেন সংক্ষেপে তা যথাসম্ভব তুলে দিচ্ছি: 'আমি নট হিসেবে, প্রয়োগ-শিল্পী হিসেবে বাঙলার নাট্যমঞ্চের বিশেষ কিছু করে উঠতে পারিনি, অথচ অনেক কিছুই করবার ছিল। আমার মনে হয়, আজও বাঙলার নাট্য-শিল্পের যৌবন আসেনি,—তার বাল্য বা কৈশোর চলচে বলতে পারা যায়। আমাদের নাট্যমঞ্চ এখনও বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেনি। সকল দেশেরই যেমন একটা জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে, আমাদের নাট্যের ক্ষেত্রে তেমন কিছু আজও ফুটে ওঠেনি। আমাদের নাটক নেই, নাটকের রূপ নেই, তার আধখানা ইংরেজী, সিকিখানা সংস্কৃত ইত্যাদি গোছের। অথচ আমাদের দেশে প্রতিভার অভাব নেই, অন্য দেশের কাছে লজ্জিত হবার মত আমাদের অবস্থা নয়; যে কোনও দেশ রীতিমত গর্ব করতে পারে, এমন প্রতিভা আমাদের ভিতর আছে। কিন্তু এই সব প্রতিভা আজ ব্যর্থ হতে চলেছে একটি মাত্র কারণে।

আমাদের একমাত্র গ্লানি আমাদের পরাধীনতা। আমেরিকায় গিয়ে যে জিনিষটা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছি, যে চরম অভিজ্ঞতা লাভ করে এসেছি, সে হচ্ছে এই যে, আমাদের এই পরাধীনতার বন্ধন দূর করতে না পারলে ভারতের বাইরে আমাদের স্থান নেই, ভারতের বাইরে কোথাও গিয়ে আমাদের কোনও সত্যকারের লাভ নেই, আমাদের বেঁচে থেকে সুখ নেই। আমেরিকার কাগজ আমাকে বড় অভিনেতা বলেছে বা বড়লাট বাহাদুর আমার খুব সুখ্যাতি করেছেন, তাতেই আমি বড় হয়ে গেলুম না,—এই জিনিষটা আমার কাছে মোটেই বড় জিনিষ নয়। আমাদের নিজেদের ওপর বিশ্বাস রাখা দরকার, আমাদের আত্মপ্রত্যয় জন্মান দরকার, আর তার জন্যে

আমাদের সকলের এই সাধনা হোক—আজ দেশে যার জন্যে তুমুল আন্দোলন চলেছে, তাকে সফল করতে হবে, সার্থক করতে হবে, আমাদের এই জাতীয়গ্লানি পরাধীনতাকে দূর করতেই হবে। বন্দে মাতরম্।'

১৯৩১ সালের ১৯শে এপ্রিল আরেক সভায় শিশিরকুমার বললেন: 'সমাজ রঙ্গালয়কে উপেক্ষা করতে পারে না। রাশিয়ার বিপ্লবে অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে; কিন্তু তারা film আর stageকে আঁকড়ে ধরে আছে। আমাদের দেশে এই সেদিনও যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী, কীর্তন, রামলীলা প্রভৃতি ছিল—তার দ্বারা আমাদের জন-সাধারণ শিক্ষিত হত—আমাদের একটা বড় cultural brackground তৈরী হয়েছিল; আমরা illiterate নই, আমাদের 99% এই শিক্ষায় শিক্ষিত। আজ আমরা এইসব জিনিষ ক্রমে ক্রমে হারিয়ে ফেলেছি—আমরা হয়েছি অর্দ্ধেক ইংরেজ, অর্দ্ধেক বাঙালী, আমাদের এত বড় cultural tradition আজ লুপ্ত। আমাদের আবার সেই culture ফিরিয়ে আনতে হবে, সেই জাতীয়তার অধিকারী হতে হবে, রঙ্গালয়কে জাতীয়তা উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে।...আমার কাজ হবে এখন থেকে, নাটককে দেশের রূপ দিতে, দেশী করে তুলতে। বিদেশ থেকে হয়ত কিছু নিতে হবে, কিন্তু তাকেও ভেঙ্গেচুরে জাতীয় রূপ দিতে চেষ্টা করব।'

হাওড়ার নাট্যপীঠ ছেড়ে শিশিরকুমার এলেন কলকাতার আলফ্রেডে। তারপর দিন দুয়েকের জন্যে শিশিরকুমারকে নাট্যনিকেতনের মঞ্চে অভিনয় করতে দেখা গেল। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে প্রবোধচন্দ্র গুহ 'নাট্যনিকেতন' নামে নতুন একটি নাট্যশালা খুলেছেন। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে।

এই সময়েই শিবরাম চক্রবর্তী লিখেছেন 'অচল টাকা' ও 'উপসংহার'। শিশিরকুমার বাঙলা রঙ্গমঞ্চের মুখপাত্র ও মুখ্যপাত্র; অতএব শিবরাম চক্রবর্তী বাঙলা রঙ্গমঞ্চ ও শিশিরকুমার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন 'অচল টাকা' ও 'উপসংহারে'। 'অচল টাকা'র প্রায় ষোল আনা তুলে দিচ্ছি:

'আমেরিকা থেকে ফিরে শিশিরকুমার ইতিমধ্যে কয়েকবার মুখ খুলেছেন...। এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে। শিশিরকুমার যা বলেছেন তার মর্ম্মার্থ ও মর্ম্মান্তিক অর্থ হচ্ছে এই যে আমেরিকায় তিনি সুবিধা করতে পারেননি। কেননা সেখানে তাঁর দশা হয়েছিল কামারশালায় গিয়ে ছুঁচ বিক্রির মতো। যে-এলিজাবেথীয় ধরণে তাঁর অভিনয় ও প্রয়োগকুশলতা, পাশ্চাত্যদেশে তা বহুকাল পরিত্যক্ত হয়েছে। তার আগে চীনে ও জাপানী অভিনেতারা

নিউইয়র্কে গেছলেন। তাঁদের অভিনয়ধারায় প্রাচ্যদেশীয়তা ছিল বলে' তবু তাঁরা কল্কে পেয়েছেন। কিন্তু শিশিরকুমার—

তারপর তিনি আরও বলেছেন যে কি নাটক, কি অভিনয়, কি প্রয়োগশিল্পের দিক থেকে বাংলা ষ্টেজে অনেক কিছু করার ছিল কিন্তু তিনি তার কিছুই করতে পারেননি। আর পারেননি যে তার কারণ দেশের পরাধীনতা। আমাদের পুনরায় কালিদাসের আমলের নাটক ও অভিনয় রীতিতে ফিরে যেতে হবে, কেননা তারি মধ্যে আমাদের প্রাচ্যতা নিহিত এবং সেই প্রাচ্যতাতেই আমাদের মুক্তি।

শিশিরকুমারের অভিভাষণে যে সব পয়েণ্ট উত্থিত হয়েছে তার আলোচনা হওয়া দরকার, কেননা তার প্রত্যেকটিই আমাদের ষ্টেজের টার্নিং পয়েণ্ট হতে পারে। এবং আমাদের ষ্টেজে আলোর যুগ আসবে কি অন্ধকার যুগ ফিরবে তাও নির্ভর করছে সেই টার্নের ওপরে।

শিশিরকুমার যখন জলযাত্রায় বেরিয়েছিলেন তখনি অনেকের আশঙ্কা ছিল যে এ-যাত্রায় তিনি রেকর্ড করতে পারবেন না। তবু অতি ভক্তির একটা অন্ধতা আছে তার সাহায্যে অনেক কিছুকে আমরা বনস্পতির মত দেখতে পারি—আসলে যা বনৌষধি মাত্র। অন্ধতার একটা ট্র্যাজিডি এই যে তা কেবল ভক্তকে নয় ভক্তিভাজনকেও মূঢ় করে তোলে। সেই মূঢ়তায় সর্ব্বনাশ। ভক্তিভাজন ভাবেন, আমি এক এবং অদ্বিতীয়, আমাকে পায় কে! আমার ক্ষেত্রে আমি যা দিয়েছি তাই সব চেয়ে বড়ো নিরিখ, আমার আর কিছু দেবার শেখবার বা সাধনা করবার নেই। তখন তিনি চোখ বুজে বসেন তা ধ্যানের জন্য নয় এবং যখন চোখ খোলেন তা কেবল নাকের নীচে তাকাতে। এইজন্যই পলিটিক্স, সাহিত্য বা শিল্পের ক্ষেত্রে যাঁরা সাধক তাঁদের মূঢ়তার উপক্রম দেখলেই নিষ্করুণ ভাবে তার চিকিৎসার দরকার।

এই মূঢ়তার অন্ধ লগ্নেই শিশিরকুমারের বিদেশ যাত্রা। শিশিরকুমারের বিদেশ যাত্রার মূলে কোন serious misson ছিল না, স্বদেশের আর্টের আদর্শকে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করবার মহৎ অনুপ্রেরণা তাঁকে বিচলিত করেনি। তা যদি করত তাহলে তিনি যেতেন যাত্রার গুরুত্ব বুঝে, ভারতীয় শিল্প সাধনার সঞ্চয় নিয়ে, বৈদেশিক অবস্থানের সন্ধান জেনে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে। সেই দূর ভূখণ্ডে বিবেকানন্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ভারতীয় পতাকা উড়িয়ে এসেছেন, কেবল শিশিরকুমার এলেন পতাকা নামিয়ে।

এর কারণ শিশিরকুমার বেরিয়েছিলেন খেয়ালের বশে, খেল দেখিয়ে বিদেশের হাটে পয়সা কুড়োতে। কিন্তু যখন দেখলেন যে পেট ভরবার আশা নেই উপরন্তু জাতও যায় তখন তিনি স্বাজাত্যের বুলি আওড়াতে সুরু করলেন। তিনি বুদ্ধিমান লোক, সহজেই বুঝলেন যে দেশে এখন স্বাদেশিকতার বড় জোর আগুন—তারই ধোঁয়ার আড়ালে মুখ ঢেকে যদি কোন রকমে ফেরা যায়।...এই ন্যাশনালিজমই একদিন তাঁর কাছে উপহাসের বস্তু ছিল। কিন্তু সে ছিল একদিন, আজ তিনি নিজেই যখন উপহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছেন অবস্থাগতিকে, তখন ন্যাশনালিজমের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গতি কই? ন্যাশনালিজম শিশিরকুমারের আপদ্ধর্ম্ম, আর আপদ্ধর্ম্ম শ্বাপদধর্ম্মকেও দাবিয়ে রাখে।

শিশিরকুমার বলেছেন, নাটক, অভিনয় ও প্রয়োগ-কারুর দিক থেকে অনেক কিছু করার ছিল, কিন্তু দেশের পরাধীনতা, সেই জন্যই তিনি কিছু করতে পারেন নি। দেশের পরাধীনতার জন্যে নানাক্ষেত্রে আমাদের দুঃখ দুর্দশার সীমা নেই, তা জানি, কিন্তু সেজন্যে যে শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রে সৃজন প্রতিভা বাধাগ্রস্ত হয়েছে তা আজ জানলাম। স্বাধীনতা অবশ্যই চাই, স্বাধীন দেশে আর্টের চর্চা বাড়ে তাতেও কোন ভুল নেই, কিন্তু দেশ, কাল ও অবস্থা নিরপেক্ষ শিল্পীর যে-এক-বিশেষ স্বাধীনতা আছে শিশিরকুমার সেকথা ভুলে গেছেন। পলিটিক্যাল স্বাধীনতা না থাকলেও শিল্পীর এই ব্যক্তিক ও অভিব্যক্তিক স্বাধীনতা চিরদিন অক্ষুণ্ণ। পর-শাসিত দেশে, পরানুগত অবস্থায়, হাজার রকমের বন্ধনের মাঝেও শিল্পপ্রতিভা চিরদিনই নিজের পথ সৃষ্টি করেছে, যত বাধা পেয়েছে তত বেড়েছে তার বেগ। জারের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপের মধ্যেও টলষ্টয় ও গোর্কির প্রতিভা বিকশিত হয়েছে, পরাধীন ভারতেও রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের কাব্য-কলা ক্ষুণ্ণ হয় নি।

কিন্তু শিশিরকুমারের নিজের মাথায় যদি আইডিয়া না থাকে তার জন্য নিশ্চয়ই দায়ী এই পরাধীন দেশ! তিনি যদি নাচতে না পারেন তাহলে উঠোনকে দোষী করাই উচিত। কাব্য ও কলার ক্ষেত্রে নবযুগ আনতে পারে সত্যিকারের প্রতিভা কেননা প্রতিভারই আছে সেই দুঃসাহস; শিশিরকুমারের যদি সেই প্রতিভা সে দুঃসাহস না থেকে থাকে তার জন্যে বন্দে মাতরমের দোহাই পাড়তে হবে বই কি!

অভিনয় ও প্রয়োগ-কৌশলের দিক দিয়ে নূতনত্ব সৃষ্টির সুবিধা দিতে পারে

কেবল নূতন টেক্‌নিকের—নিত্য নূতন ধরণের—নাটক, কিন্তু নূতনকে বোঝবার শক্তি ও নূতনকে প্রয়োগ করার প্রতিভা থাকা চাই অভিনয়-কর্ত্তার। কিন্তু শিশিরকুমারের কি সত্যিকারের নাট্যবোধ আছে? অভিনয়ের কোনখানে কি প্যাঁচ কষলে হাততালি মিলবে তা তিনি ভালরকমই জানেন ভুল নেই, কিন্তু নাট্য-বোধ, নাটকের টেক্‌নিকের জ্ঞান? আমার যথেষ্ট সন্দেহ।...

শিশিরকুমার একটা কিন্তু খুব গুরুতর কথা বলেছেন যদিও আসলে তা হচ্ছে মজার কথা। তিনি বলেছেন যে আমাদের কালিদাসের আমলের নাটক ও অভিনয়-রীতিতে ফিরে যেতে হবে, আমাদের প্রাচ্য হতে হবে—তা না হলে আমাদের মুক্তি নেই। কথাটা গুরুগম্ভীর কেননা কালিদাসের আমলের নাট্যরস গুরুগম্ভীর, এবং কথাটা মজার এই জন্যে যে তিনি ধরে নিয়েছেন প্রাচ্য হওয়া মানেই প্রাচীন হওয়া।

পাশ্চাত্যে তিনি পাত্তা পেলেন না যেহেতু তিনি গেলেন সেখানে দুশ বছরের পুরনো ডাম্বেল ভাঁজতে, বহুৎ আচ্ছা, এর শোধ তিনি তুলবেন দুহাজার বছর আগেকার মুগুর আমদানি করে। নাট্য-পীঠকে শক্ত করা চাইতো! ছিলেন তিনি এক একসট্রিমে তো চল্লেন আরেক এক্‌সট্রিমে—অবসলিট্ থেকে মোর্ অবসলিট্-এ!

কিন্তু আমি বলি—প্রাচীন হওয়া নয়, আমাদের হতে হবে সকল রকমে মডার্ণ। কেবল আপ-টু-ডেট হলেই চলবে না, একশো বছর পরের যে-অনাগত তাকে আগিয়ে আনতে হবে আজকের বর্ত্তমানে; কেবল শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, রাষ্ট্রে ও সমাজে, জীবনের সকল বিভাগে। তাতেই পাব আমাদের প্রতিভার পরিচয়, আমাদের শক্তির সার্থকতা—এবং তা যদি পারি তাহলেই আমরা জগতের কাছে শ্রদ্ধা দাবী করতে পারব, সম্মান আদায় করতে পারব। যেমন পেরেছে রাশিয়া।

কালিদাসের আমলের নাট্যরীতিকে অনুসরণ করার মতো অক্ষমতা ও অসম্মান আধুনিক লেখকের আর কিছু হতে পারে না। প্রাচীন ধারাকে বজায় রাখার অর্থ এ নয় যে প্রাচীন কঙ্কালকে অবলম্বন করা; নদী তার পর্ব্বত-জঠরকে একান্তভাবে আশ্রয় না করে যখনই নূতনের সন্ধানে বাহিরে বেরয় তখনি তার প্রাচীন ধারা নব নব ঘাটে নূতন করে স্বীকৃত হয়। রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতায় উপনিষদের গন্ধ হয়ত আছে কিন্তু তার রূপ (form) উপনিষদের আমলের নয়। তাঁর রচনায় প্রাচীন ধারাকে স্বীকার করেও নূতন ধারা বজায়

রয়েচে,—তিনি কি প্রাচ্য নন্? আমাদের অভিনেতারা যদি অজন্তা গুহার ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চান থাকুন দাঁড়িয়ে, আধুনিক নাট্যকারের কিন্তু কালিদাসের কালে জন্ম নিলে চলবে না। কালিদাস দূরে থাক, ইব্‌সেন এমন কি বার্ণার্ড্‌শর নাট্যরূপের অনুসরণ করাও তাঁদের পক্ষে হবে লজ্জার—সম্পূর্ণ নিজের ভাবনা থেকে নব নব রূপের উদ্ভাবনায় তাঁদের এগিয়ে যেতে হবে।

শিশিরকুমার যখন প্রথম রঙ্গমঞ্চে এলেন তখন সকলেরই চমক লেগেছিল একটা নতুন প্রতিভা এলো বুঝি। তিনি নাট্যকলার সব বিভাগেই নবযুগ আনবেন তাঁর কাছে এই প্রত্যাশাই ছিল অনেকের। ইচ্ছা করলে তিনি অনায়াসেই পাহাড় টলাতে পারতেন, নব সৃষ্টির মুক্তধারা বহিয়ে দিতে পারতেন—কেননা তাঁর কাছ থেকে নতুন কিছু নেবার জন্যেই সবাই প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তিনিও যখন প্রাচীন ধারার চোরাবালিতে আত্মসমর্পণ করলেন, তাঁর চলা বন্ধ হয়ে নামা সুরু হলো, সেইদিনই আমাদের ষ্টেজের সব চেয়ে বড় ট্রাজিডি, তার গ্রেট বিট্রেয়াল্। কেননা আর্টের সাধনা বড় কঠিন, অবহেলায় ভাগ্যলক্ষ্মীকে বরং পাওয়া যায় কিন্তু কলালক্ষ্মীকে না। কিন্তু আমাদের শিল্পীরা ফাঁকি দিয়ে কাজ সারতে যান; আমাদের অভিনেতারা বিলিতি প্যাটার্ণের গিলটির গয়না পরে বড়াই করেন, পরের ড্রামাটিক্ ফর্ম্ চুরি করে আমাদের অপরাজেয় ঔপন্যাসিক রাতারাতি নামজাদা নাট্যকার হয়ে ওঠেন,—তাঁরা সস্তায় কিস্তি মারতে চান। কিন্তু আর্টের দেবতা অতি অকরুণ, তাঁর কাছে চালাকি অচল, বিনা তপস্যায় তিনি বর দেন না।

তবে শিশিরকুমার একটা জিনিস আমাদের রঙ্গমঞ্চে দিয়েছেন সেকথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে। তা হচ্ছে প্রযোজনার আইডিয়া। যদিও প্রয়োগশিল্প অন্য দেশের ষ্টেজে বহুদিনের, তবু আমাদের ষ্টেজে তার অস্তিত্ব ছিল না শিশিরকুমারের আবির্ভাবের আগে। কিন্তু এ ছাড়া শিশিরকুমারের আর বিশেষ কোন দান নেই। তাঁর প্রেরণায় কোনও নতুন নাট্যসাহিত্য গড়ে ওঠেনি, এবং তিনি কোনও মৌলিক অভিনয় ধারার প্রবর্ত্তন করতে পারেননি। আসলে তাঁর অভিনয় হচ্ছে গৈরিশী অভিনয় ধারারই অনুসরণ—যাকে বলা যেতে পারে decorative acting—অলঙ্কৃত অভিনয়ের ধারা। গৈরিশরীতির সঙ্গে তাঁর অভিনয়ের যা কিছু পার্থক্য তা হচ্ছে তাঁর কতকগুলো উপরি প্যাঁচ-ওয়ার্ক। নাট্যজগতে নবযুগের প্রবর্ত্তক বলতে ষ্ট্রিক্‌টলি যা বোঝায় শিশিরকুমারকে কোন ক্রমেই তা বলা যায় না; বস্তুতপক্ষে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবে যে অভিনয়ধারার

সূচনা, শিশিরকুমারে সেই ধারারই উজ্জ্বল পরিসমাপ্তি। নবপ্রভাত তিনি আনতে পারেননি—অরুণোদয়ের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে অনাগত অভিনেতার পথ চেয়ে।

শিশিরকুমারের বক্তৃতা পড়ি আর অচিন্ত্যর একটি লাইন মনে হয়।

—"টাকাটা অচল, বাজে, কিন্তু চলে না।"

সেই জন্যই টাকাটা বাজে।

নিজের বাড়ীর মেজেয় যদি বা কোনও রকমে গড়িয়ে চালানো যায়, কারেন্সিতে গেলেই কাটা পড়ে।'

'উপসংহার' থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি ঃ

'শিশিরকুমারের আমেরিকা-অভিযান আগাগোড়াই একটি বিরাট ফার্স। এবং ট্র্যাজিডিও বটে। খাঁটি ফার্স মাত্রই প্রচ্ছন্ন ট্র্যাজিডি—ফার্সের দ্রষ্টার কাছে যা নিতান্তই প্রহসন, তার স্রষ্টার কাছে তা মর্ম্মন্তুদ ব্যাপার, বিশেষতঃ যে প্রহসন জীবনে ঘটে। দুঃসাহস প্রতিভার পরিমাপক,—নাট্যজগতের কোথাও দুঃসাহসিক প্রতিভার পরিচয় না দিলেও তাঁর এই নাট্য-যাত্রায় সেই ত্রুটি তিনি পুষিয়ে নিয়েছেন। অশ্বমেধের দ্বারা দিগ্বিজয়ের প্রথা ছিল, কিন্তু গর্দ্দভমেধের দ্বারা সেই দুঃসাধ্য-সাধন হয় কিনা তাঁর এই পরীক্ষার মূল্য কম নয়—অন্ততঃ তাঁকে কম মূল্য দিতে হয়নি।...

শিশিরকুমারের অভিনয়, প্রযোজনা ও নাট্যবোধ সম্বন্ধে যে মতামত 'অচল টাকায়' আমি প্রকাশ করেছি তা আমার আজকের নয়, বহুদিনের। শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় যখন বিলেত থেকে ফেরেন তখনো কথাপ্রসঙ্গে এই মত তাঁর কাছে ব্যক্ত করেছিলুম।...টাকার আসলত্ব নিয়ে বরাবর সন্দেহ ছিলই,—কারেন্সিতে চালাতে গিয়ে সেই সন্দেহটাই সত্য বলে প্রমাণিত হোলো। তাঁর এই সমুদ্রলঙ্ঘন যে ব্যর্থ হবে লঙ্ঘনের ভূমিকাতেই আমার এ আশঙ্কা অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ আমার সাহিত্যিক বন্ধুদের বলেছিলুম,—তাঁরা অবশ্য সায় দিতে পারেন নি। কিন্তু যখন খবর এলো যে নিউইয়র্কে শিশিরকুমারের অভিনয়-উদ্বোধন করবেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং সেই রবীন্দ্রনাথেরই হৃৎকম্প উপস্থিত তখনি বুঝলুম যে আমেরিকা-বিজয়ের আর আশা নেই,—তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়! অবশেষে যখন জানা গেল যে ভাণ্ডারবিল্ট্ ষ্টেজে শ্রীমতী প্রভা

সত্যিকারের অশ্রুমোচন করেচেন তখনি বুঝলুম যে ট্র্যাজিডির চূড়ান্ত হয়েছে! প্রেক্ষাগৃহের শূন্যতা দেখেই তিনি কেঁদে ভাসাচ্ছিলেন কিনা জানিনে, তবু এর নির্গলিতার্থ সকলের কাছেই স্পষ্ট হোলো আমেরিকার পাষাণ প্রাণ গলিত হবার নয়।

জাত গেল তার জন্য দুঃখ আছেই, কিন্তু সে দুঃখও ততটা গায়ে লাগত না যদি পেট ভরত, কেননা পেটে খেলে পিঠে সয়। জাত যে যাবে এটা জানা কথাই, কেননা যে এলিজাবেথের আমলের পুচ্ছ সংগ্রহ ওদের দেখাতে তিনি নিয়ে গেছলেন সেই ময়ূরপুচ্ছের রেওয়াজ আর ওদেশে নেই। এই কারণেই আমার বন্ধুদের বলেছিলুম যে ওতে হবে না, শিশিরকুমারের উচিত হচ্ছে বোকা ঘোষকে সঙ্গে নেওয়া এবং তা যদি নিতেন তাহলে 'সপার্ষদ' তিনি আজ দেশে ফিরতেন 'স-পার্ষ' (purse) হয়ে, কেবল 'দ' হয়ে নয়। ভাণ্ডারবিল্ট্ থিয়েটারের বদলে কোনও পুকুর ভাড়া নিয়ে তাতে শ্রীমান প্রফুল্ল ঘোষকে ছেড়ে দিলে ভাণ্ডার তিনি নিজেই build করতে পারতেন। জলযাত্রায় রেকর্ড রাখার ক্ষমতা শুধু প্রফুল্লেরই আছে—তাঁর অহোরাত্রব্যাপী জলকেলি দেখতে লাখ লাখ আমেরিকান 'রিয়্যালমানি' খরচ করে ছুটতো। নিজের এবং পরের যে-টাকাটা (শুনচি প্রায় আশী হাজার ডলার) শিশিরকুমার জলে দিয়ে এলেন অন্ততঃ তার চারগুণ টাকা শ্রীমান জল থেকে তুলে আনতেনই।

বোকা ঘোষকে না হয় নাই নিলেন অন্ততঃ তাঁর অন্তরঙ্গদের পরামর্শটাও নিতে পারতেন। তাঁদের কেউ কেউ তাঁকে বলেছিলেন নিউইয়র্কে গিয়ে যাত্রার আসর জমাতে। আমারও মনে হয়, রাম-থিয়েটারের বদলে তাঁর রাম-যাত্রা ঢের বেশি জমতো। রাম-যাত্রায় "রাম নাচে, সীতা নাচে, নাচে হনুমান"—এবং সেই নাচের ছন্দে ইয়াঙ্কির পকেটের ডলারও নাচত। সীতার দেহের প্রস্থ দেখিয়ে তিনি তাদের যা অবাক না করতে পেরেছেন তার চেয়ে ঢের বেশি তাক্ লাগিয়ে দিতে পারতেন হনুমানের ল্যাজের দৈর্ঘ্য দেখিয়ে।

আমাদের দেশে শিশিরকুমার যে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও শ্রেষ্ঠ প্রযোজক আমার 'অচল টাকা'য় একথা কোথাও অস্বীকার করিনি। আমাদের রঙ্গমঞ্চে প্রযোজনার আইডিয়া প্রথম আনার বাহাদুরিও তাঁকে আমি দিয়েছি। তবে আমি জোর দিতে চেয়েছি 'আমাদের দেশে' এই বাক্যাংশের ওপর—'শ্রেষ্ঠ' এই কথাটির ওপর তত নয়। কেননা নিষ্পাদপ দেশে বনস্পতি মনে করার খুসী যাকে আমাদের আছে পৃথিবীর মধ্যে তা আদপেই বনস্পতি গণ্য না হতেও

পারে। কিন্তু সে-দোষ পৃথিবীর বনস্পতিরও নয়, বেচারা বনস্পুত্রেরো নয়—যদি কারু থাকে তবে আমাদের বৃক্ষ-ভাগ্যের।...

নাট্যজগতের গোড়ার কথাটা নাটক, পরের কথা অভিনয় ও প্রযোজনা—এই তিন নিয়েই নাট্যজগত। নাটক, অভিনয় ও প্রযোজনায় নবযুগ আনার মানে এই তিনের রূপান্তর-সাধন। শিশিরকুমারের সাধনায় কি সেই রূপান্তর দেখা গেল? আমাদের রঙ্গমঞ্চে পঞ্চাশ বছর আগে যে-নাটক ও যে-অভিনয় চল্‌ছিল, আজও কি তাই চল্‌ছে না?—বরং আজ তা চলছে আরও জাঁকালো রকমে, এইটুকুই প্রযোজনার কৃতিত্ব। পচা মাংসে তাজা কাটলেট ভেজে পরিবেষণ করা হচ্ছে, এইখানেই রাঁধুনির প্রয়োগ-নৈপুণ্য। পুরানো জিনিষ প্রাচীন ধারায় ইমিটেশন-ষ্টেজে চলচে—এর মধ্যে রূপান্তর কোনখানে, নবযুগই বা কোনখানে? পুরানো কাঠামোয় প্রযোজনার প্যাচওয়ার্ক করে এবং অভিনয়ের প্যাঁচ-ওয়ার্ক কষে, টাকা কামানো যায়, কিন্তু নবযুগ আনা যায় না।

আমাদের অভিনয়ে আজও সেকেলে ধারা বজায় আছে, এখানে ওখানে এক-আধটু সরে-ঘুরে গেছে হয়ত কিন্তু প্রাচীন ধারা চলেছে অব্যাহত। শিশির-কুমারের ষ্টাইলে বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে—কিন্তু অভিনয়ের ষ্টাইল ও ধারা এক জিনিষ নয়। শিশির, অহীন্দ্র ও রাধিকানন্দ তিনজনেরই ষ্টাইল আলাদা, কিন্তু তাঁরা একই ধারার অভিনেতা। একে অতিরঞ্জিত অভিনয় বা extrovert acting-এর ধারা বলতে পারি। Introvert বা অন্তর্মুখ অভিনয় কোনও ভূমিকার কোথাও যে একেবারেই দেখা যায় নি একথা আমি বলছি না তবে বিশেষ ঝোঁকটা বহির্মুখী বহ্বাড়ম্বরের দিকেই।...

নাট্যজগতের গোড়ার কথা নাটক—গোড়ায় জল না ঢেলে যদি কারুর আগাকে পল্লবিত করার নিষ্ফল প্রয়াস দেখি তাহলে তাঁকে যুগপ্রবর্ত্তক বলতে আমি রাজি আছি কিন্তু সে-যুগান্তর তিনি এনেছেন প্রতিভার রাজ্যে নয়, পাগ্‌লামির রাজ্যে! উন্মাদনায় অনেক অসাধ্য-সাধন হয় শুনেচি, কিন্তু তার দ্বারা ছোট বেলার কোট বড় বেলায় গায়ে ফিট্ করানো যায় কিনা আমার সন্দেহ আছে। হয় তাতে কোট ফাঁসে, নয় ভুঁড়ি ফাঁসে—যদি কোনও প্রকারে দুই বজায় রাখা যায় তাতে চেহারাটা দাঁড়ায় প্রহসন। যে-চেহারা আমাদের আজকের ষ্টেজের। সেকালের বা সেকেলে নাটকের একেলে প্রোডাক্‌-শান্ দেখলে যে-চেহারার কথা আমার মনে পড়ে; ভস্মে ঘি ঢালার চেয়েও

হাস্যকর ট্র্যাজিডি যদি কিছু থাকে ত সেই প্রোডাক্‌শান্‌---যার নাটক শুনে পায় কান্না আর অভিনয় দেখে পায় হাসি !···

নাট্যরূপ, নাট্যরস ও নাটকত্বের ধারণা প্রতি যুগেই বদলে যাচ্ছে, পঞ্চাশ বছর আগে নাটক বলতে যা বোঝাত আজ তা বোঝায় না—যে নাট্যাধ্যক্ষ রঙ্গমঞ্চে সত্যই নবযুগ আনতে চান এবং নিজেকে নাট্যবোদ্ধা বলে পরিচিত করার প্রয়াসী, তাঁকে নাট্যপ্রগতির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে হবে। আধুনিক নাটক অভিনয় করে তিনি আধুনিক নাট্যকারকে অনুগ্রহ করেন না, আধুনিক নাটক অভিনয় করতে তিনি বাধ্য। তিনি অভিনয় না করতেও পারেন, কিন্তু তাতে আধুনিক নাট্যরচনার মূল্য কমে না, তিনিই backnumber বলে পরিচিত হন,—পাশ বিলিয়ে ভক্তদের করতালি তিনি কুড়োতে পারেন, কিন্তু ভাবী ঐতিহাসিকের বাহবা তিনি পাবেন না।···

এদেশের নাটক, অভিনয় ও প্রযোজনার আদর্শ কেন উঁচু হয় না সে সম্বন্ধে আমি ভেবেছি। এর কারণ হচ্ছে আমাদের মাপকাঠি আন্তর্জ্জাতিক নয়, নিতান্তই আমাদের ঘরোয়া। অল্প দিয়ে এবং অল্প পেয়েই আমরা সন্তুষ্ট। অমুক রায় নাটক লিখে অমুক মুখুজ্যেকে মারতে পারলেই খুসী—পৃথিবীর নাট্যকারদের সমকক্ষ হবার কল্পনাও তাঁর নেই ; অমুক ভাদুড়ি যদি অমুক চৌধুরীকে অভিনয় ও প্রযোজনার কায়দায় উনিশে ফেলে নিজে বিশ হতে পারেন তাহলেই তাঁর দায় খতম। ভারতবর্ষের বাইরে যেন আমাদের জগৎ নয়, আমাদের অন্ধকূপে বড় হতে পারলেই হল। পৃথিবীর মধ্যে বড় হবার ভাবনা আমাদের নেই এবং ভাবনা নেই বলে শক্তিও নেই, সিদ্ধিও নেই।

এমন কি হেমেন্দ্রকুমারের মত নাট্যবোদ্ধাও একথা বলেন—"বাংলা দেশের মধ্যে শিশিরকুমার বড় এইটেই সব চেয়ে বড় কথা।"

না, বড় কথা নয়। এটা হাসির কথা। কেননা তাহলে বাঁকুড়ার মধ্যে বড় কিম্বা বাগবাজারের মধ্যে বড় এটাও ক্রমশঃ বড় কথা হয়ে দাঁড়াবে।

সাহিত্য ও শিল্পকে বিচার করতে হবে আন্তর্জ্জাতিক মানদণ্ডে—তার অন্য কোন মাপকাঠি হতে পারে না। সাহিত্যিক ও শিল্পীর বিচারও সেইভাবে। উপন্যাস অথবা নাটক, অভিনয় অথবা প্রযোজনা যদি সেই বিচারে উত্তীর্ণ হয় ভাল, নতুবা সে বাতিল। এই মানদণ্ডকে খাটো করে বিশ্বের দরবারে আমাদের দর বাড়বে না, আন্তর্জ্জাতিক সম্মান কোনদিন আমরা পাব না—সেখানে অপমান দণ্ডই আমাদের বহন করতে হবে।

এই মানদণ্ডের ব্যতিক্রমেই শিশিরকুমারকে বিপর্য্যস্ত হতে হল বিদেশে। অথচ সেই বিদেশেই উদয়শঙ্করের নব নব অভ্যুদয় দেখচি, জয়পতাকা উড়িয়ে চলেছেন তিনি বড় মাপকাঠির বিচারে বড় বলে। রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পেলেন তাঁর রচনা আন্তর্জ্জাতিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হল বলেই—কিন্তু শরৎ চাটুজ্যে বহুকাল মাথা ন্যাড়া করে বসে থেকেও সে বেল তাঁর মাথায় ভুলেও পড়ল না। আজ কাঁচা প্রেমের আতিশয্যে কাউকে 'কাচালাভ' বলে নাচানো সহজ কিন্তু তাতে কালকের পাকা লোকসান থেকে তাকে বাঁচানো যায় না। একথা কবে আমরা বুঝব যে মানদণ্ড না বাড়িয়ে যাকে আমরা বাড়াই—তাকে আমরা যথার্থ সম্মান দিইনে, তাকে প্রাণদণ্ডই দিই।

তবে একটা কথা। লোকের মধ্যে চাওয়াটা বড় না হলে বড় সৃষ্টি সম্ভব হয় না। দ্রষ্টার প্রার্থনা প্রবল হলেই স্রষ্টা তাঁর অন্দরের মালখানায় তালা খোলার তাগিদ পান। এটা সত্য কথা—কিন্তু সত্যের সবখানি নয়। কেননা এই দ্রষ্টা যেমন বাইরে, তেমনি নিজের মধ্যেও আছে। আবার লোকের চাওয়াটাকে বড় করাও স্রষ্টার একটা কাজ। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম এসেছিলেন তখন লোকে তাঁকে বোঝেনি এবং চায়নি—রবীন্দ্রনাথকে চাইতে পারে এত বড় লোকমন তখন গড়ে ওঠেনি। লোকে আর দশজনের কাছে যা পেত ও যা চাইত তেমনি সস্তা জিনিসই তাঁর কাছে প্রত্যাশা করেছিল, কিন্তু তিনি লোকমন ও লোকমতকে মানেননি। লোকে যা চেয়েছিল তা না দিয়ে তিনি যা চেয়েছিলেন তাই তিনি দিলেন—তার ফলে আজ লোকের চাওয়াও বড় হল, পাওয়াও বড় হল।

কেবল সাহিত্যেই নয়—চিত্র, সঙ্গীত, অভিনয়, প্রযোজনা প্রভৃতি আর্টের অন্যান্য ক্ষেত্রেও লোকের চাওয়াটাকে ক্রমাগত বড় করে যাওয়াই স্রষ্টার বড় কাজ। যিনি সৃষ্টি-প্রতিভা নিয়ে এসেছেন এ-দায় তাঁর আছেই, একে তিনি কিছুতেই বিদায় দিতে পারেন না, নিজের বড় চাওয়া দিয়ে লোকের চাওয়া বড় তাঁকে করতে হবেই, কেননা সেই পথেই বড় পাওয়া তিনি আদায় করেন, সেই পথেই তাঁর যথার্থ সিদ্ধি। কিন্তু আমাদের নাট্যজগতে এ দায় যেন কারু নেই, এখানে নবযুগের প্রবর্ত্তন-ঘোষণা হয় এক পয়সার সাপ্তাহিকে এবং প্রবর্ত্তকের দেখা পাই রাস্তার বড় বড় প্লাকার্ডে। আমাদের কাজ খুব হিসেবী এবং তাই খুব সংক্ষিপ্ত—কোন দায় নেই, কোন বালাইও নেই।

কিন্তু কোন অভিনেতা, যদি অভিনেতামাত্র না থেকে, নিজেকে নাট্যজগতের

নেতা বলে জাহির করতে চান তাহলে তাঁকে নেতার কর্ত্তব্য ও দায় দুইই স্বীকার করতে হবে—এবং তা আধাআধি ভাবে নয়, সম্পূর্ণ ভাবে। লোক প্রস্তুত নয়, লোকে চায় না, এ অজুহাত নিয়ে নেতা কোনদিন বসে থাকেন না। দেশ প্রস্তুত নয় বলে মহাত্মা গান্ধী যদি বসে থাকতেন তাহলে দেশ কোনদিন প্রস্তুত হত না—নিজে প্রস্তুত হওয়া মাত্র তিনি দেশকেও প্রস্তুত দেখলেন। যে-মুহূর্ত্তে তিনি নিজের চাওয়াটাকে বড় করতে ও স্পষ্ট করতে পারলেন সেই মুহূর্ত্তেই তাঁর সেই চাওয়া অলক্ষ্যে সমস্ত দেশে সংক্রামিত হল।

আমাদের নাট্যজগতে নবযুগের নেতা ও অভিনেতা এখনো আসেনি, আমার এ অভিযোগ এইজন্যই সত্য বলে মনে হয়। আমার দেশের লোক পলিটিক্সের জন্য ধনপ্রাণ খোয়াতে প্রস্তুত, কিন্তু আর্টের জন্য প্রথম শ্রেণীর থিয়েটার দেখতে প্রস্তুত নয়, একথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনে। হয় আমাদের নাট্যজগতে শক্তিমান নেতা আসেননি, নয় যাঁরা নেতা বলে বাজারে চলছেন তাঁরা শক্তিমান নন কিম্বা তাঁদের শক্তি সত্ত্বেও তাঁরা যে-দায় ও যে trust hold করেন তা ইচ্ছে করেই betray করছেন। কিছু কিছু সত্য এই তিনটেতেই আছে আমি মনে করি। Betrayer অন্য দেশে a bit rare হতে পারে, কিন্তু এ-মুলুকে একেবারে rampant!

সমস্ত নবসৃষ্টির মূলে আছে নূতন প্রশ্ন, সমস্ত সম্ভাবনার গোড়ায় রয়েছে জিজ্ঞাসা। 'অচল টাকা' হচ্ছে আমার জিজ্ঞাসা—সত্যই কি এদেশের নাট্য-জগতে নবযুগ এসেছে? না, মামুলি জিনিষই রকমফের করে চালান হচ্ছে? শিশিরকুমারকে আমি ব্যক্তি হিসেবে দেখিনি, দেখেচি বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রতিনিধি-রূপে; যেখানে আমার এই প্রশ্ন তিনি কি বাঙলা ষ্টেজকে বড় করতে পেরেচেন সেখানে ইঙ্গিত এ নয় যে তিনি তা পারেননি এবং অন্য কেউ পেরেচে। অবশ্য নবযুগ আনার দায় একমাত্র তাঁর নয়, হয়তো সে-সাধনা তিনি করবেনই না বা সে-সাধনায় তিনি নিষ্ফল হবেন, হয়তো তাঁর কোন সহযোগী তিনি যা পারেননি তাই সম্ভব করবেন—কিন্তু এপর্য্যন্ত তিনিই আমাদের রঙ্গমঞ্চের মুখপাত্র ও মুখ্য পাত্র। রাজাকে আক্রমণ করলে যেমন সমস্ত দেশকে আক্রমণ করা হয় তেমনি তাঁকে expose করে আমি আমাদের stage-কেই expose করতে চেয়েচি।...'

ইতিমধ্যে 'রঙমহল' নামে নতুন একটি নাট্যশালার জন্ম হয়েছে কলকাতায়। শিশিরকুমার কয়েক হাজার টাকা অগ্রিম নিয়ে পাঁচবছরের চুক্তিতে সেখানে এলেন। 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' নাটক নিয়ে রঙমহলের উদ্বোধন হল ১৯৩১ সালের ৮ই আগস্ট। 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায়' শিশিরকুমার শ্রীগৌরাঙ্গ।

'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' ছাড়া রঙমহলে শিশিরকুমারের আমলে আর কোন নতুন নাটকের অভিনয় হয়নি। কেবল পুরনো নাটক, কেবল পুরনো ভূমিকা।

১৯৩১ সালের ১১ই ডিসেম্বর 'নাচঘর' লিখেছে ঃ "শিশিরকুমারের হল কি? তাঁকে আমরা নবযুগের নেতা বলি, অথচ "রঙমহলে" যোগ দিয়ে পর্য্যন্ত তিনি "সীতা" বা "ষোড়শী" বা "আলমগীরে"র মতন একখানি অভিনয়ের জন্যে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় নাটক খুলতে পারলেন না, "রঙ্‌মহল"কে পুরাতন নাটকেরই দোকান করে রাখলেন, "বিষ্ণুপ্রিয়া"র সঙ্গে "বিষ্ণুপ্রিয়া"র দেহের চেয়েও মস্ত লেজুড় জুড়ে দেন, কোনদিন বা আবার লাঙ্গুলহীন "বিষ্ণুপ্রিয়াকে"ই সুমুখে এনে হাজির করেন, কোনদিন পাদপ্রদীপের সাম্‌নে আসেন এবং কোনদিন বা আসেন না,—এ-সব কিসের ফল? খামখেয়ালের, না অকাল-বার্দ্ধক্যের জড়তার? শিশিরকুমার কি ইচ্ছে করেই ক্রমশঃ মিইয়ে পড়েছেন? তাঁর কি আর কিছু দেবার নেই?"

দিনকয়েক পরে একটা চূড়ান্ত কেলেঙ্কারি হল রঙমহলে। ১৯৩২ সালের ১৫ই জানুআরি 'নাচঘর' লিখেছে ঃ "আজকাল বাজার বড় মন্দা, অনেক থিয়েটারই প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। শিল্পীরা নিয়মিত মাহিনা পাচ্ছেন না—অনেকেরই তিন চার মাসের মাহিনা বাকি পড়েছে। শিল্পীদের এমন দুর্ভাগ্য দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই। এমন ক্ষেত্রে শিল্পীরা যদি চাকুরি ছেড়ে দেন, তাহলে কারুর কিছু বলবারও নেই। কিন্তু তাঁদের হঠাৎ চাকুরি ছাড়বার কোন অধিকারই নেই—কারণ তাঁদের পেশা হচ্ছে আর্টের পেশা এবং সে পেশার উপরে জনসাধারণের দাবি আছে অনেকখানি।

কিন্তু অধুনালুপ্ত "নাট্যমন্দিরে"র এমন কয়েকজন নট ও নটী সংপ্রতি "রঙ্‌মহলে" কাজ করছিলেন, যাঁরা জনসাধারণের সঙ্গে নিজেদের পেশার কোন সম্পর্কই স্বীকার করেন না। গেল হপ্তায় তাঁরা এমন এক কাণ্ড করেছেন, যে জন্যে তাঁদের ছি-ছি করা ছাড়া উপায় নেই। "রঙ্‌মহলে"র কর্তৃপক্ষ শনি ও রবিবারের অভিনয়তালিকা যথানিয়মে সহরময় প্রচার করেছিলেন এবং তখন তাঁরা কেউই টের পান নি যে, ভিতরে ভিতরে মস্ত একটা ষড়যন্ত্র চোরকাঁটার

মতন প্রস্তুত হয়ে আছে, হঠাৎ তাঁদের জব্দ করবার জন্যে।...শনিবারেই আচম্বিতে জানা গেল যে "নাট্যমন্দিরে"র প্রায় তেরো-চৌদ্দজন নট ও নটী "রঙমহলে" আর অভিনয় করবেন না!

একসঙ্গে এতগুলি নট ও নটীর অভাব পূরণ করা যে কি-রকম ব্যাপার, তা আর খুলে বলবার দরকার নেই। এবং যথাসময়ে ক্রুদ্ধ জনসাধারণের সামনে "রঙমহলে"র কর্তৃপক্ষকে যে-মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল সেটাও সহজে অনুমেয়। তারপর যে-ভাবে তাঁরা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে পাদপ্রদীপের আলোককে ম্লান হতে দেননি, এখানে তা সবিস্তারে বর্ণনা না করলেও চলবে। তবে চক্রান্তকারী-দের আর একটা নীচতার দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া দরকার। রবিবার সন্ধ্যায় আলো জ্বালতে গিয়ে রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষকে আর এক বিপদে ঠেকতে হল কারণ আলোক-শিল্পী অদৃশ্য এবং বিজলী সরবরাহের তারগুলোও কে কেটে দিয়ে গেছে!..."

এই গোলমাল নিশ্চয়ই একটা ষড়যন্ত্রের ফল। কিন্তু, বলা দরকার, শিশির-কুমার সেই ষড়যন্ত্রে নেই। গোলমালের ঠিক আগেই শিশিরকুমার 'রঙমহল' থেকে কিছুদিনের জন্যে ছুটি নিয়ে গেছেন।

'রঙমহল' থেকে গোলমাল পাকিয়ে যাঁরা চলে গেলেন, কিছুদিন পরে তাঁরা, আরও কয়েকজনের সঙ্গে একত্র হয়ে, ঘোষণা করলেন যে শালিখার নাট্য-পীঠে আবার 'নাট্যমন্দির' খোলা হবে। এই 'নাট্যমন্দিরে' শিশিরকুমার নেই, পাঁচবছরের জন্যে তিনি 'রঙমহলে'র সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ।

আরও একটা খবর আছে, রঙমহলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নাট্যমন্দির-মার্কা ধর্মঘটী নটনটীদের মামলা-মোকদ্দমা বেঁধে গেছে।

শেষপর্যন্ত অবশ্যি একটা আপোস-মীমাংসা হয়ে গেল।

১৯৩২ সালের ৪ঠা মার্চ 'নবশক্তি' লিখেছে:

"রঙমহলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর একটা আপোষ-মীমাংসা হয়ে গেছে এবং তার ফলে শিশিরকুমার তাঁর পাঁচ বছরের চুক্তি থেকে মুক্তি পেয়েছেন। এই আপোষ-মীমাংসার দুটি প্রধান সর্ত হয়েছে এই যে রঙমহলে যোগদানের সময়ে শিশিরকুমার যে হাজার কয়েক টাকা অগ্রিম নিয়েছিলেন সে টাকা আর তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে না, তার বদলে নাট্যমন্দির মার্কা যে সব নটনটী ধর্ম্মঘট করে রঙমহলের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছেন তাঁদের বাকী মাহিনার সমস্ত দাবী শিশিরকুমার নিজে পূরণ করবেন। এই সম্পর্কে রঙমহলের কর্তৃপক্ষ ও ধর্ম্মঘটী নটনটীদের মধ্যে যে মামলা-মোকদ্দমার সৃষ্টি হয়েছে উভয়

পক্ষই তা প্রত্যাহার করবেন এবং এর পর পরস্পরের বিরুদ্ধে কারুরই আর কোন দাবী দাওয়া থাকবে না।

এই সব নটনটীর বেতন বাবদ সমস্ত পাওনা শিশিরকুমার যে নিজের পকেট থেকে চুকিয়ে দেবেন—ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। পত্রান্তরে প্রকাশ যে—"নব-বিজ্ঞাপিত নাট্যমন্দির-প্রতিষ্ঠানের সহিত কয়েকটা দিন বিনা পারিশ্রমিকে অভিনয় করিয়া তিনি উক্ত নটনটীদের এই দাবী মিটাইবেন।" এই ব্যবস্থা যে খুবই মনোলোভা এবং শিশিরকুমারের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধাজনক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।...

কাল সন্ধ্যায় গঙ্গা-পার শালিখার নাট্যপীঠ-রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।..."

শিশিরকুমার চলে যাবার বছরখানেক পরে রঙমহলে 'মহানিশা' আরম্ভ হল। 'মহানিশা'র প্রথম অভিনয় হল ১৯৩৩ সালের ১৫ই এপ্রিল। বিশেষভাবে 'মহানিশা'র নাম করছি, কেননা, 'মহানিশা'ই বাঙলা রঙ্গালয়ে রিভলভিং-স্টেজে অভিনীত প্রথম নাটক।

১৯৩৩ সালের ২১শে এপ্রিল 'নবশক্তি' লিখেছে ঃ "বাঙলা রঙ্গালয়ে ঘূর্ণায়মান বা revolving ষ্টেজের প্রথম প্রবর্ত্তন এই 'মহানিশা'র অভিনয়েই হয়েচে। আমাদের নাট্যশালার ইতিহাসে এই ঘটনাটি সোণার অক্ষরে লিখে রাখবার মত। ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চে বাস্তবের অনুরূপ সেট তৈরী করবার এবং তাকে যথেচ্ছভাবে প্রদর্শন করবার এত সুবিধা আছে যে এ দেশের রঙ্গালয়ে এর আগে কেউ এই সুবিধার সদ্ব্যবহার কেন যে করেন নি তা' সত্যিকার বিস্ময়ের বিষয়। ষ্টেজ-পরিচালনার টেকনিক্যাল বিভাগে শ্রীযুক্ত সতু সেন যে একজন কত বড় গুণী 'মহানিশা'র অভিনয় তা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেচে। এই নাটকের সেটের পরিকল্পনা ও রচনায় শ্রীযুক্ত সেন যে মাত্রাজ্ঞান ও সুরুচির পরিচয় দিয়েচেন এ দেশের অল্প ষ্টেজেই আমরা তার অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখেচি। প্রত্যেক ঘরের আভ্যন্তরীণ দৃশ্যে তার ceiling পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হয়েচে। কোন দৃশ্যের মঞ্চসজ্জা তার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বেমানান দেখায়নি। এমন কি প্রত্যেক দৃশ্যে আলোক-পাত করা হয়েচে এই পারিপার্শ্বিকের mood এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। ষ্টেজের ওপর একই সঙ্গে একাধিকবার যে ভাবে দুটি composite দৃশ্য দেখানো হয়েচে এ দেশে তাকেও সম্পূর্ণ নূতন বলতে পারি। এই সব জিনিষের অভিনবত্ব দর্শকসাধারণকে যেমন মুগ্ধ করবে, তেমনি কলাবিদ ও টেকনিসিয়ানকে একাধারে

চিন্তার খোরাক ও উপভোগের উপাদান যোগাবে। বাঙলা রঙ্গালয়ে এতদিন নউ ইয়র্ক ল্যাবরেটরি থিয়েটারের ভূতপূর্ব্ব টেকনিক্যাল-ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত সতু সেনের অবস্থা ছিল যেন ঢাল এবং তলোয়ারবিহীন নিধিরাম সর্দ্দারের মত! উপযুক্ত হাতিয়ার পেলে তিনি যে কেমন করে দিগ্বিজয় করতে পারেন 'মহানিশা'র মঞ্চ-ব্যবস্থায় তিনি তার অপর্য্যাপ্ত পরিচয় দিয়েছেন।...”

খানিকক্ষণের জন্যে এবার একটু পিছনের দিকে যেতে হবে। মনোমোহন থিয়েটারে যেতে হবে।

মনোমোহন থিয়েটারে 'পথের শেষে'র প্রথম অভিনয় হয়েছে ১৯২৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর। দুর্গাশঙ্করের ভূমিকা নিয়েছেন দানীবাবু। মনের মত ভূমিকা। দানীবাবু মনের মত অভিনয় করেছেন, সে-অভিনয় দর্শকদের মনের মত হয়েছে। একজন শোকাহত বৃদ্ধের করুণ ভূমিকা দানীবাবুর অভিনয়গুণে এমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে মহিলাদের আসন থেকে বহুবার দানীবাবুর উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে কাতরোক্তি শোনা গেছে—আর বলো না, আর বলো না বাবা, আর সহ্য করতে পারছি না।

'পথের শেষে' খুলবার বছর-দুয়েক বাদেই মনোমোহন থিয়েটারের পালা শেষ হয়ে গেল।

মনে আছে, এই বাড়িতেই স্টার থিয়েটারের জন্ম হয়েছিল। তারপর একে-একে কত থিয়েটার এ-বাড়িতে এসেছে, গিয়েছেঃ গোপাললাল শীলের এমারেল্ড, অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাসিক, শরৎকুমার রায়ের কোহিনুর, শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাট্যমন্দির। শিশিরকুমার চলে যাবার পরেও কয়েক হাতে গিয়েছে মনোমোহন-থিয়েটার। শেষপর্যন্ত ইমপ্রুভমেণ্ট-ট্রাস্টের হাতে গেল। বিনোদিনীর আত্ম-ত্যাগের মূল্যে যে-রঙ্গালয় একদিন গড়ে উঠেছিল, নগর কলকাতার ক্ষুধার দাবিতে তা বিলুপ্ত হয়ে গেল। বহু বিচিত্র নাট্যাভিনয়ের স্মৃতিবিজড়িত সেই রঙ্গগৃহ দীর্ঘকাল যেখানে জীবিত ছিল, সেখানে এখন বিডন স্ট্রীট আর চিত্তরঞ্জন এভিন্যু সম্মিলিত হয়ে আছে!

অনেক আগেই নিবেদন করেছি, ১৯৩১ সালের মার্চমাসে 'নাট্যনিকেতন' জন্ম নিয়েছে। নাট্যনিকেতনে দানীবাবু গোড়ায় ছিলেন, কিন্তু ওই পর্যন্তই।

দানীবাবুর সঙ্গে নাট্যনিকেতনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। দানীবাবু বাড়িতে বসে রইলেন।

অনেকেই সেসময়ে দানীবাবুকে বলেছেন—আপনি নিজে একটা নতুন থিয়েটার খুলে অভিনয় করুন।

তারাসুন্দরী একদিন বললেন—দানীদাদা, তুমি যা করবে, ভেবে করবে। এখনও জিতপায়া তোমারই।

কিন্তু দানীবাবু থিয়েটার খোলেন নি।

১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে নাট্যনিকেতনের বিজ্ঞাপন দেখা গেল ঃ

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণ ভরসা

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রমুখ নাট্যমন্দির ও নাট্যনিকেতনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতৃ সমাবেশে নাট্যনিকেতন…'

১৯৩২ সালের ২৫শে নভেম্বর একখানা নতুন নাটক খোলা হল নাট্যনিকেতনে, নাম 'মহাপ্রস্থান'। শিশিরকুমার 'মহাপ্রস্থানে' শ্রীকৃষ্ণ। তার অল্প কিছুদিন আগে নাট্যনিকেতনে শিশিরকুমার 'চিরকুমার সভা'য় রসিক সেজেছেন, 'গৈরিকপতাকা'য় শিবাজী সেজেছেন।

সন্দেহ নেই, শিশিরকুমারের তখন দুর্দিন। ১৯৩২ সালের ২৫শে নভেম্বর 'নাচঘর' লিখেছে ঃ

"যে-যুগে শিশিরকুমারকে একদিন পথ দিয়ে যেতে দেখলে লোকে নিজেকে ভাগ্যবান্ বলে মনে করত ঃ যে-যুগে শিশিরকুমার হয়ে উঠেছিলেন আমাদের Demigod……আজ আর সেদিন নেই। নিজের হাতে শিশিরকুমার নিজেকে বহু নিম্নে এনে ফেলেছেন। মনে হয়, যেন তিনি বেয়ে-চেয়ে দেখতে চাইছেন, 'ডুবেছি না ডুবতে আছি, দেখি পাতাল কতদূর'।…

আজ শিশিরকুমার তাঁর মধুস্রাবী কণ্ঠস্বর হারিয়ে ফেলেছেন ; কখনও যে আর ফিরে পাবেন, তাও মনে হচ্ছে না। নিয়মিত অত্যাচারের ফলে কোনও নাটকের সমগ্র রূপ কল্পনা তো দূরের কথা, মাত্র নজর ভূমিকা সম্বন্ধেই চিন্তা করবার জন্যে যতটুকু মস্তিষ্কের আবশ্যকতা আছে, ততটুকু মস্তিষ্কও তাঁর মাথার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাঁর নূতন নূতন ভূমিকাগুলির অভিব্যক্তি দেখে। কেন যে তিনি কি করছেন, তা যেন তিনি নিজেই বুঝে উঠতে পারছেন না।…

আজকের শিশিরকুমারকে দেখে ভূতপূর্ব্ব শিশিরকুমারকে চিন্‌তে পারা যায় না ; দুঃখ হয়, সহানুভূতি হয়, কাঁদতে ইচ্ছে করে।..."

কিন্তু দানীবাবু কোথায় ? দানীবাবু শেষপর্যন্ত কোথায় গেলেন ?

আর কোথায়, আর্ট থিয়েটারে। দানীবাবুর শেষ কর্মক্ষেত্র আর্ট থিয়েটার।

একটা সুন্দর ঘটনা বলা হয় নি।

কে একজন নাট্যরসিক সাহেব আর্ট থিয়েটারে এসেছেন। 'চন্দ্রগুপ্ত' হচ্ছে সেদিন, দানীবাবু চাণক্য সেজেছেন। দানীবাবুর অভিনয় দেখে সাহেব বিমুগ্ধ। দানীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন তিনি।

এ আর বেশি কথা কি। দানীবাবুকে খবর পাঠানো হল। সাহেব এসে অপরেশচন্দ্রের ঘরে বসলেন।

কিন্তু কোথায় দানীবাবু! না বলে-কয়ে তিনি সরাসরি বাড়ি চলে গেছেন।

না, সাহেবের সঙ্গে দানীবাবুর দেখা হল না। কথায়-কথায় মাইনের কথা উঠল। সাহেব শুনলেন, দানীবাবু হাজার টাকা মাইনে পান। শুনে সাহেব আশ্চর্য হলেন। বললেন—মাত্র হাজার টাকা? আমাদের দেশে এরকম অভিনেতা একরাত্রি অভিনয় করলে একশো পাউণ্ডের কম পাবেন না।

কিন্তু দানীবাবু চলে গেলেন কেন ?

পরদিন দানীবাবু অপরেশচন্দ্রকে বললেন—অপরেশবাবু, বল কি, উনি অভিনয় দেখেছেন, মানুষটিকে তো দেখেন নি। আমার সঙ্গে আলাপ হলে উনি নিশ্চয়ই উল্টো ধারণা নিয়ে ফিরে যেতেন, বলতেন, 'বাঙলাদেশের অভিনেতাগুলো কী মুখ্যু!' আমি কি ভাই আমার জাতের অপমান করব? তাই চলে গিয়েছিলাম।

যাক। শেষবার আর্ট থিয়েটারে এসে দানীবাবু যে-সমস্ত ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, তাদের ভেতর থেকে মাত্র দুটির নাম করি : চাপালগোপাল আর শ্যামাকান্ত। 'শ্রীগৌরাঙ্গে' চাপালগোপাল আর 'পোষ্যপুত্রে' শ্যামাকান্ত।

একজন নাট্য-সমালোচক লিখেছেন : সমগ্র নাটকে চিত্রিত পুরুষ-চরিত্রগুলির মধ্যে সব-চেয়ে ফুটে উঠেছে "চাপাল গোপাল"। এই ভূমিকাটি গ্রহণ করেছেন দানীবাবু এবং যোগ্য ভূমিকায় এই বয়সেও তিনি যে অতুলনীয়, তাঁর 'চাপাল গোপাল' সকলের চোখে আঙুল দিয়ে সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে।...রঙ্গ-ব্যঙ্গের ও করুণ রসের ভিতর দিয়ে সরল ও মূর্খ চাপাল গোপালের জীবনের ট্রাজেডি ও কমেডি দুইই ফুটে উঠেছে চমৎকার!

'পোষ্যপুত্রে'র শ্যামাকান্ত ? অপরেশচন্দ্র বলেছেন—দানীবাবুর শ্যামাকান্ত—কাশীর চন্দ্রগ্রহণ।

কয়েকরাত্রি অভিনয় করার পর দানীবাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তা অসুস্থ শরীর নিয়েও কয়েকরাত্রি অভিনয় করলেন। বললেন—থিয়েটার না করলে আমার ঘুম হবে না।

অসুখ বেড়ে গেল। বাধ্য হয়ে দানীবাবুকে অভিনয় বন্ধ করে দিতে হল।

অসুস্থতার জন্যে দানীবাবু অভিনয় বন্ধ করেছেন, কিন্তু গুঞ্জন উঠল, দানীবাবুর সঙ্গে আর্ট থিয়েটারের গোলমাল হয়েছে, দানীবাবু আর্ট থিয়েটার ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবেন।

'পোষ্যপুত্রে'র অর্ধশততম অভিনয়রাত্রে দানীবাবু আর্ট থিয়েটারে এলেন। লাঠিতে ভর দিয়ে রোগজীর্ণ শরীরে মঞ্চে দাঁড়ালেন। দর্শকদের বললেন—আমি অন্যত্র যাব বলে কথা উঠেছে, কিন্তু তা সত্য নয়। কোথায় আর যাব মশাই, যে কটা দিন বাঁচি, এখানেই থাকব।

কিন্তু কদিনই বা আর বেঁচে ছিলেন তারপর। ১৯৩২ সালের ২৮শে নভেম্বর দানীবাবুর মৃত্যু হল।

একটি শোকসভায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বললেন—দানীবাবু তাঁর সিংহাসন শূন্য করে চলে গেলেন। কিন্তু সেই শূন্য সিংহাসন তিনি কার জন্যে রেখে গেলেন ?

১৯৩৪ সালের ১৬ই মার্চের 'নাচঘর' থেকে কিয়দংশ উদ্ধার করি ঃ

"গ্রাসো হচ্ছেন ইতালীর বিখ্যাত—সম্ভবতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—অভিনেতা। কেবল ইতালী নয়, য়ুরোপের সকল দেশই তাঁর শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে থাকে। নাট্য-সমালোচক গর্ডন ক্রেগ কিন্তু গ্রাসোকে অভিনেতা বলে মনে করেন না। তাঁর মতে, গ্রাসো হচ্ছেন একটি নির্ঝর বা জলপ্রপাতের মতন। অভিনেতা বললে তাঁকে খাটো করা হয়—তিনি একটি প্রাকৃতিক শক্তি।

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের কথা মনে করলেই গর্ডন ক্রেগের কথা আমাদের মনে পড়ে। অভিনেতা বলতে আমরা যা বুঝি, তিনি তার চেয়েও বড় ছিলেন। তিনি একটি প্রাকৃতিক শক্তি।...

গত যুগের অভিনেতাদের সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের অভিনেতাদের তফাৎ বোঝাবার জন্যে অনেকেই একেলে অভিনেতাদের সঙ্গে 'শিক্ষিত' শব্দটি জুড়ে দেন। এই অদ্ভুত আচরণ সমর্থন করি না। একেলে অনেক অভিনেতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের

শিক্ষা পেয়েছেন বলেই যে গতযুগের অভিনেতাদের চেয়ে অভিনয়ে অধিকতর শিক্ষিত বা উন্নত হবেন, এমন মনে করবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এম-এ, বি-এ পাস করলেই কেউ অভিনেতা হতে পারে না। এ একটা আলাদা বিদ্যা। সুরেন্দ্রনাথ একটাও পাস করেন নি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর মতন একজন অভিনেতাও বাংলাদেশকে দান করতে পারে নি। ললিত-কলার বিভিন্ন-ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রতিভাধরই ভগবানের এক এক বিশেষ দানপত্র ললাটে নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। যার ললাটে এই পত্রলিখন নেই, পৃথিবীর কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ই তাকে বিশিষ্ট করে তুলতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ঢুকলেই কেউ যেমন 'শিক্ষিত' অভিনেতা হতে পারে না, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনও প্রবেশ করেন নি বলেও কেউ অশিক্ষিত অভিনেতা হন না। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত অভিনেতা বলতে বর্ত্তমান বা গত যুগের অভিনেতা নয়,—বোঝা উচিত কেবল শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট অভিনেতা। অভিনয়-কলায় যিনি দক্ষ, শিক্ষিত অভিনেতা হচ্ছেন তিনিই।

সুরেন্দ্রনাথ যে সুশিক্ষিত অভিনেতা ছিলেন, একথা না বললেও চলে…। নাট্যকারের কালির আঁচড়ের ভিতর থেকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন কত বিচিত্র জগৎ কত নূতন সৃষ্টি, কত অভাবিত বিশ্বের সৌন্দর্য্য! নাটক পাঠ করে আমরা যা পাই নি, তাঁর নটচর্য্যার মধ্যে আমরা আবিষ্কার করেছি সেই দুর্লভ রসরূপ-রেখাকে। তিনি ছিলেন কলাবিদ, তিনি ছিলেন স্রষ্টা। তাঁর মতন শিল্পী পৃথিবীর যে কোন জাতির গর্ব্বের নিধি। এই জন্যেই তাঁর নাম বাংলাদেশে চিরস্মরণীয় হওয়া উচিত।…"

---০ঃ০০ঃ০-*-

কুড়ি

১৯৩৩ সালে শিশিরকুমারকে কোন নতুন নাটকে দেখা গেল না। কয়েকটি পুরনো নাটকে সাধারণ রঙ্গালয়ে নতুন ভূমিকা নিয়ে অবশ্যি তিনি দেখা দিলেন ঃ 'বৈকুণ্ঠের খাতায়' কেদার, 'রিজিয়া'য় ঘাতক ও বক্তিয়ার, 'দক্ষযজ্ঞে' দক্ষ।

সে-সময়ে শিশিরকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। একজন প্রত্যক্ষদর্শী অভিযোগ করেছেন ঃ "নাট্যনিকেতনে দেখতে গেলুম 'চন্দ্রগুপ্ত'; প্লে হবে ঘোষিত হল 'কারাগার'। কারণ—শিশিরবাবু 'অসুস্থ'।...শিশিরবাবু ও অহীনবাবুর সম্মিলিত অভিনয় হল 'প্রফুল্ল'। যোগেশ আদৌ ভাল হচ্ছে না দেখে দর্শকেরা মন্তব্য প্রকাশ করায় শিশিরবাবু অভিনয় ছেড়ে দিয়ে, দর্শকদের সঙ্গে বাক-যুদ্ধ সুরু করে দিলেন। আমরা অভিনয়ের স্থলে শিশিরবাবুর তর্জ্জা দেখে এলুম।...দেখতে গেলুম শিশিরবাবুর শিবাজী। শিবাজী তখন —কোন গূঢ় কারণে জানি না—বিচলিত হয়ে ডিগবাজী খাচ্ছেন, শ্যামলীকে বলছেন বীরা এবং বীরাকে বলছেন শ্যামলী। সর্ব্বশেষে শিবাজী ষ্টেজের ওপর বসে পড়লেন।...দেখতে গেলুম শিশিরবাবুর 'রঘুবীর'। তথাকথিত 'অসুস্থতার' জন্যে প্লে কচ্ছেন শিশিরবাবু অতি জঘন্য। কোন দর্শক প্লে ভাল হচ্ছে না বলায় তিনি মাথার চুল খুলে, শ্রীটাক যুক্ত মস্তক বার করে, সেই দর্শকের সঙ্গে তর্জ্জা সুরু করে দিলেন।"

সে-সময়ে অবস্থা এমন যে শিশিরকুমার সত্যি-সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়লেও লোকে সেকথা বিশ্বাস করতে চায় না, থিয়েটারে হাঙ্গামা বেঁধে যায়।

১৯৩৩ সালের ২৮শে এপ্রিল 'নবশক্তি' লিখেছে ঃ 'গত তিন বৎসর যাবৎ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সম্প্রদায় সহরের কোন-না-কোন রঙ্গ-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্তভাবে অভিনয় করে আসচেন। বর্ত্তমানে এই সম্প্রদায়টি নাট্য-নিকেতনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন।...নাট্যনিকেতন ও নাট্যমন্দিরের এই সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানটি আবার ষ্টার থিয়েটারের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে গত দু'হপ্তা অভিনয়

করেচেন।...গতকাল মিনার্ভা, ষ্টার, রঙমহল, নাট্যমন্দির ও নাট্যনিকেতন এই পাঁচটি সম্প্রদায়ের একটি সম্মিলিত অভিনয় হয়ে গেছে।'

১৯৩৩ সালের ১৬ই জুন 'নবশক্তি' লিখেছেঃ 'ষ্টার, রঙমহল ও নাট্য-নিকেতনের লীলা সাঙ্গ করে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী পুনরায় সদলবলে ষ্টারের আস্তানায় ফিরে এসেচেন। বর্ত্তমানে সেখানে বহু-প্রসিদ্ধ একাধিক নাটকের সম্মিলিত অভিনয় চলচে।...'

১৯৩৩ সালের ২৩শে জুন 'নাচঘর' লিখেছেঃ 'হায় শিশিরকুমার! তোমার জনপ্রিয়তা ছিল দেবতারও কাম্য, বিশ্বকর্ম্মার লোভের বস্তু! সেই অসাধারণ জনপ্রিয়তাই আজ তুমি স্বেচ্ছায় হারিয়ে বসে আছ। এখনো তুমি যখন চোখ খুলে চাইলে না, তোমার পক্ষে তখন আর সে হারা-মণি উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। তোমার নাট্যপ্রতিভা বাংলা নাট্যজগতে আজ অতীত স্মৃতিতে পরিণত হতে চলেছে, বাংলার নবযুগ তোমার কাছ থেকে আর কিছুর প্রত্যাশা রাখে না, বাংলার শিক্ষিত নটদের জাতে তুলতে গিয়ে তাদের গায়ে তুমি পাঁক ছড়িয়ে দিয়েছ—তোমার শক্তিও আজ বুঝি আত্মঘাতিনী হয়েছে! তোমাকে আর হিতকথা বা কটুবাক্য শোনাতে যাওয়াও অরণ্যে রোদন, বাংলার নাট্যরসিকরা তোমার জন্যে আজ সুধু নীরবে অশ্রুত্যাগই করতে পারে। তুমি আর 'ট্র্যাজেডি'র অভিনেতা নও, তোমার জীবনই আজ মস্ত-একটা 'ট্র্যাজেডি'। তোমার জন্যে দুঃখিত, আমরা দুঃখিত।'

১৯৩৩ সালের ১১ই আগস্ট 'নবশক্তি' লিখেছেঃ 'বাঙলা নাট্যজগতের প্রবল প্রতাপান্বিত যুগাবতার শ্রীল শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় সম্প্রতি দেউলে খাতায় নাম লেখানোয় তাঁর বন্ধুরা বিস্মিত এবং তাঁর পাওনাদারেরা রুষ্ট হয়েচেন। ভাদুড়ী মশায়ের সঙ্গে আমাদের টাকাকড়ির কোন সম্পর্ক না থাকলেও একদিন অভিনয় ব্যাপারে তাঁর কাছে আমাদের দাবী তাঁর কোন পাওনাদারের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। কিন্তু যেদিন থেকে তিনি মত্তাবস্থায় পাদপ্রদীপের সম্মুখান হতে আরম্ভ করলেন সেদিন থেকে আমাদের বুঝতে দেরী হয়নি যে অভিনেতা হিসাবে তিনি কতখানি দেউলে হয়ে পড়েচেন। তারপর ইয়াঙ্কিস্থানের কেলেঙ্কারী, রঙমহলের রঙ্গ এবং নাট্য-নিকেতনের 'মহাপ্রস্থান' আমাদের সকল দাবী নিঃশেষে মুছে দিয়েচে। আজ তাই তাঁর পাওনাদারদের প্রতি সমবেদনা ছাড়া আমরা আর কিছুই অনুভব করচি না। আইনের চোখে দেউলে অবস্থায় নাকি মানুষের দেওয়ানী

মৃত্যু ঘটে। দেওয়ানা অবস্থায় শিশিরকুমার কি করেন এখন শুধু তাই দ্রষ্টব্য।'

১৯৩৩ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর 'নবশক্তি' লিখেছে ঃ 'নাট্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী তাঁর ভাঙ্গা দলটিকে নিয়ে এখনো স্রোতের ফুলের মত ভেসে বেড়াচ্চেন। তাঁর সমস্ত চেষ্টা এখন পর্য্যবসিত হয়েচে দাঁও-মত দু'দিন এ-দল এবং আর দু'দিন অপর একদলের সঙ্গে অস্থায়ীভাবে অভিনয় করে কোনরকমে নিজের নামটি বজায় রাখা।'

ইতিমধ্যে আর একটি ঘটনা হয়েছে, স্টারের আসর থেকে আর্ট থিয়েটারকে বিদায় নিতে হয়েছে। আর্ট থিয়েটার উঠে যাবার পর স্টারের আসরে অল্প সময়ের জন্যে নাট্যকুঞ্জ নামে একটি নতুন দলের অভিনয়ের সংবাদ আছে। তারপর ১৯৩৩ সালের একেবারে শেষের দিকে ছাপার অক্ষরে সংবাদ বেরোলো ঃ 'আগামী ২৭শে ডিসেম্বর হইতে ষ্টার বোর্ড ভাড়া লইয়া বর্ত্তমান বাংলার নটগুরু শিশিরকুমার ভাদুড়ী মাত্র একসপ্তাহের জন্য নাট্যমন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবেন।'

শিশিরকুমার স্টারের আসরে এলেন। আবার নাট্যমন্দির খুললেন সেখানে। আবার নাট্যমন্দিরে অভিনয় আরম্ভ হল। অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।

১৯৩৩ সালের ২৭শে ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সবই পুরোন নাটক। একটি ছাড়া—'রমা'য় গোবিন্দ গাঙ্গুলী—সবই শিশিরকুমারের পুরোন ভূমিকা।

স্টারের আসরে নাট্যমন্দিরে শিশিরকুমার 'অভিমানিনী' নামে একখানা নতুন নাটক খুললেন ১৯৩৪ সালের ১৯শে জানুআরি। 'অভিমানিনী'র প্রধান ভূমিকায় শিশিরকুমার।

কয়েক সপ্তাহ পরে হল 'ফুলের আয়না'। ছোটদের জন্যে অভিনয়। হ্যাঁ, ছোটদের জন্যেও শিশিরকুমার অভিনয়ের আয়োজন করেছেন। নরেন্দ্র দেবকে দিয়ে রূপকথার ভিত্তিতে লিখিয়ে নিয়েছেন 'ফুলের আয়না'। মঞ্চে যদিও 'ফুলের আয়না' দীর্ঘায়ু হয় নি, তবু একথা ভুললে চলবে না যে এদেশে শিশিরকুমারই প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে ছোটদের জন্যে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন।

১৯৩৪ সালের এপ্রিলে নাট্যমন্দিরের নামের আগে একটু নতুনত্ব এল। ছিল নাট্যমন্দির, হল নব-নাট্যমন্দির। আর্ট থিয়েটার স্টারের আসর থেকে

উঠে যাবার পর পুরোপুরি এক বছরও কাটেনি, ১৯৩৪ সালের ১৫ই মে অপরেশচন্দ্রের মৃত্যু হল।

১৯৩৪ সালের ১৮ই মে 'নাচঘর' লিখেছে ঃ

"নানা কারণে বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে অপরেশচন্দ্রের নাম অমর হয়ে থাকবে। নানা কারণে বর্ত্তমান বাংলা নাট্যজগতে তাঁর সমকক্ষ আর কারুর নাম আমাদের মনে পড়ছে না। একে একে সেই কারণগুলির কথা বলব।...

অপরেশচন্দ্র ছিলেন এখনকার বাংলা নাট্যজগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য নাট্যকার। ষোলো বৎসর আগে অপরেশচন্দ্র ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ করেছিলেন। এবং সেই সময় থেকে গত বৎসর পর্য্যন্ত "ষ্টারে"র অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল প্রধানতঃ তাঁরই লেখনী।...তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ভিতরে অপরেশচন্দ্রের শক্তি এই নাটকগুলিকে সফল ক'রে আমাদের নাট্যজগতে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করেছিল ঃ—'অযোধ্যার বেগম', 'কর্ণার্জ্জুন', 'ইরাণের রাণী', 'চণ্ডীদাস', 'মন্ত্রশক্তি', 'পোষ্যপুত্র' ও 'মা'।...

অভিনেতা রূপেও অপরেশচন্দ্র বাংলা নাট্যজগতের উপরে একটি বিশিষ্ট ছাপ রেখে গিয়েছেন। অভিনেতা রূপে বাংলা রঙ্গালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তিনযুগেরও বেশী। এবং এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে বিভিন্ন ভূমিকায় হাস্য ও করুণ রস সৃষ্টিতে তিনি যে বিচিত্র শক্তির পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন তা অপূর্ব্ব বললেও অত্যুক্তি হবে না। অভিনয় শিক্ষায় তাঁর প্রধান গুরু ছিলেন স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর। তাঁর মতন শিষ্য পাওয়া যে-কোন গুরুর পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। এবং ধরতে গেলে অর্দ্ধেন্দুশেখরের ছাত্রদের মধ্যে প্রধান আসনের দাবি করতে পারেন একমাত্র অপরেশচন্দ্রই।...উচ্চশ্রেণীর কলাবিদের উপরে যুগধর্ম্মের পরিবর্ত্তন বিশেষ কাজ করতে পারে না। সেখানে প্রবীণ কলাবিদ প্রাচীন হলেও নবীন রূপে বিচরণ করেন। গিরিশ-অর্দ্ধেন্দুর যুগে যে অভিনয়ভঙ্গি ছিল এখন আর তা নেই, একথা সকলেই জানে। কিন্তু নবযুগের নূতন ভঙ্গী ধাতস্থ করতে না পেরে গতযুগের অনেক বড় অভিনেতাও ক্রমেই এখন পিছিয়ে পড়ছেন। এ-দলের ভিতরে অপরেশচন্দ্রকে আমরা দেখতে পাইনি কোনদিনই। গতযুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে অপরেশচন্দ্র 'সীতারাম', 'শঙ্কর', 'কিশোর', 'মালজী', 'হিরু ঘোষাল', ও 'ইয়াগো' প্রভৃতি ভূমিকায় প্রত্যেক দর্শকের দৃষ্টি নিজের দিকে

আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। সেই সময়ে তাঁর পাশে যে-সব বিখ্যাত সহ-অভিনেতা ছিলেন বিশ্বনাট্যশালায় আজও তাঁদের অনেকেই বিদ্যমান আছেন বটে, কিন্তু রঙ্গালয়ে আর্টের আসরে আজ আর তাঁদের মধ্যে কেউ জীবনের লক্ষণ খুঁজে পায় না। নবযুগের শক্তিধর অভিনেতাদের মধ্যে তাঁদের দেখলে মনে হয় দলভ্রষ্ট জীব বলে। কিন্তু অপরেশচন্দ্র সম্বন্ধে এমন অভিযোগ করবার উপায় নেই। এই সেদিনও তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, শিশিরকুমার, রাধিকানন্দ, অহীন্দ্র চৌধুরীর মতন শক্তিমান অভিনেতাদের মাঝখানে বৃদ্ধ বয়সে ব্যাধি-জীর্ণদেহে দাঁড়িয়েও "রসিকের" ভূমিকায় তিনি যে অতুলনীয় নাট্য-নৈপুণ্য প্রকাশ করে গিয়েছেন, তার অনুপম স্মৃতি কেউ কোনদিন ভুলবে না। নবযুগের প্রধান পুরোহিত স্বয়ং শিশিরকুমার পর্য্যন্ত "রসিকের" ভূমিকায় অপরেশচন্দ্রের গৌরব একটুও ম্লান করতে পারেননি। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে এই, গতযুগের অন্যান্য অনেক অভিনেতার মতন তিনিও 'মেলো-ড্রামাটিক' বা কৃত্রিম অতি-অভিনয়ভঙ্গীকে অবলম্বন করেননি। সাধারণতঃ সহজ স্বরে ও স্বাভাবিক ভাবে তিনি অভিনয় করতেন, এবং তাঁর সব-চেয়ে উল্লেখ্য সম্পদ ছিল, কণ্ঠস্বর। এমন গম্ভীর অথচ মধুর গীতিপূর্ণ স্বর খুব অল্প অভিনেতার কণ্ঠেই আমরা শ্রবণ করেছি। হায়, সেই মোহনীয় কণ্ঠ আজ চিতাভস্মে পরিণত, তার কলধ্বনি আর কেউ শুনবে না।...

অভিনয়-শিক্ষক রূপেও অপরেশচন্দ্রের অদ্ভুত শক্তির সঙ্গে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত আছি। তাঁর হাতে নূতন ও পুরাতন যুগের অনেক নট-নটীই তৈরী ও মানুষ হয়েছেন। তাঁর শিক্ষাদানপদ্ধতির এক বিশেষত্ব ছিল এই, প্রত্যেককেই তিনি প্রত্যেকের মিলন করে শেখাতে পারতেন, নিজের ভঙ্গীকে (এখনকার অধিকাংশ অভিনয়-শিক্ষক যা করে থাকেন) কারুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন না। যার কোন গুণই নেই সেও তাঁর শিক্ষার গুণে চলনসৈ হয়ে এসে রঙ্গমঞ্চের উপরে দেখা দিতে পারত।

তারপর আসে তাঁর অধ্যক্ষতার কথা। নিজের নট-জীবনের অধিকাংশ ভাগই তিনি অধ্যক্ষতা করে কাটিয়ে গিয়েছেন। আগেকার গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর থেকে এখনকার শিশিরকুমার পর্য্যন্ত বাংলার সকল শ্রেণীর প্রায় সকল নট-নটীই কোন-না-কোন সময়ে তাঁর অধ্যক্ষতা স্বীকার করেছেন। এর মধ্যে তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ বাংলা নাট্যজগতের এমন সব মহারথ নিয়ে সুচারুভাবে অধ্যক্ষতার কর্ত্তব্য পালন করা ব্যক্তিত্বহীন

ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নয়। কেবল অধ্যক্ষরূপেই বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। কোন্ সময়ে কেমন ভাবে কাজ চালালে রঙ্গালয়ের উন্নতি হয়, এ-জ্ঞান যে তাঁর যথেষ্টই ছিল, 'কর্ণার্জ্জুন', অভিনয়কালে "ষ্টারের" পতাকার তলায় নবযুগের নব-নব অভিনেতাকে আহ্বান করে তিনি তার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়ে গেছেন।..."

আবার শিশিরকুমারের কাছে চলে আসি।

শিশিরকুমার স্টারের আসরে নবনাট্যমন্দিরে 'বিরাজ বৌ' খুললেন ১৯৩৪ সালের ২৮শে জুলাই। শিশিরকুমার নীলাম্বর।

'বিরাজ বৌ'য়ের কথায় একটা তর্ক-বিতর্কের কথা আছে। শুনতে পাই, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে শিশিরকুমারের একটু তর্কাতর্কি হয়ে গেছে।

শরৎচন্দ্র বলেছেন—আমার বই এত জনপ্রিয় যে তা কুকুরের গলায় বেঁধে পথে ছেড়ে দিলেও সবাই তার গলা থেকে নিয়ে পড়বে।

শিশিরকুমার প্রতিবাদ করেছেন। বলেছেন—না, কেউ পড়বে না। কিন্তু আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে অ-আ-ক-খ আবৃত্তি করলেও সকলে ওই বই ছেড়ে আমার আবৃত্তি শুনতে আসবে।

নব-নাট্যমন্দিরে 'সরমা' খোলা হল ১৯৩৪ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর। শিশিরকুমার রাবণ। ১৯৩৪ সালের ২৪শে নভেম্বর 'দশের দাবী'। শিশিরকুমার দয়াল। ১৯৩৪ সালের ২২শে ডিসেম্বর 'বিজয়া'। শিশিরকুমার রাসবিহারী।

বিশেষভাবে আরেকটি ভূমিকার নাম করতে হয়, ১৯৩৪ সালের ৭ই নভেম্বর শিশিরকুমার 'প্রতাপাদিত্যে' রডা সেজেছেন। পুরনো নাটকে নতুন ভূমিকা।

এখানে একটা ঘটনা আছে।

রডার ভূমিকায় অভিনয় করার আগে কয়েকদিন শিশিরকুমার খুব ইতিহাস পড়লেন। শিশিরকুমারের একজন বন্ধু শিশিরকুমারকে বললেন—করবে তো রডা। তা এত কি পড়াশোনা করছ?

শিশিরকুমার বললেন—এখনও তোমরা বালক। কেন এমন পড়াশোনা করছি, অভিনয়ের দিন বুঝতে পারবে।

সত্যিই 'প্রতাপাদিত্য' অভিনয়ে রডারূপী শিশিরকুমার একটা নতুনত্ব করলেন। নাটকে রডার মুখে হিন্দি সংলাপ, কিন্তু শিশিরকুমারের রডা চাটগেঁয়ে ভাষায় কথা কইছে। এ কি কাণ্ড।

কে একজন দর্শক উচ্চকণ্ঠে মন্তব্য করলেন—রডা আবার চাটগেঁয়ে ভাষা শিখল কবে?

শিশিরকুমার তখন কিছু বললেন না। দৃশ্যটা শেষ হল, যবনিকা পড়ল। একটা সাদা চাদরে রডার রূপ ঢেকে শিশিরকুমার বাইরে এলেন। হাতে কয়েকখানা ইতিহাসের বই। পিছনে থিয়েটারের চাকর। তার হাতে ম্যাপ।

শিশিরকুমার বললেন—আপনাদের ভেতরে কে বললেন, রডা চাটগেঁয়ে ভাষা শিখল কবে?

কেউ আর সাড়া দেয় না।

শিশিরকুমার বলে চললেন—দেখুন, রডা পর্তুগীজদের হয়ে আসে এবং চাটগাঁয়ের দিকে ধরা পড়ে। সে-সময়ে ইংরেজ সরকার ছিল না, দিল্লিতে ইংরেজের ক্যাপিটাল ছিল না, এবং রডা দিল্লী-আগ্রা যায় নি; রডার পক্ষে তাই হিন্দী বলা স্বাভাবিক নয়, বরং পূর্ববঙ্গীয় ভাষাতেই কথা বলা স্বাভাবিক।

আপন উক্তির স্বপক্ষে শিশিরকুমার ম্যাপ দেখিয়ে বোঝালেন, ইতিহাস থেকে খানিকটা পড়ে শোনালেন। প্রায় সকলেই মুগ্ধ হলেন। কিন্তু কয়েকজন আপত্তি করে বলে উঠলেন—রিমার্কগুলো ওভারলুক করেন না কেন? এটা তো ক্লাসরুম নয়, এটা থিয়েটার।

শিশিরকুমার ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন—ওভারলুক করতে পারি না আপনাদের মূর্খতা দেখে। থিয়েটারে আপনারা নাচ দেখতে আসেন, তাই আমাকে ক্লাস করতে হয়, শিক্ষা দিতে হয়।

নব-নাট্যমন্দিরে 'শ্যামা'র প্রথম অভিনয় হল ১৯৩৫ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর। 'শ্যামা' দীর্ঘায়ু হয় নি মঞ্চে। 'শ্যামা'য় সাকুল্যে দুটি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শিশিরকুমার—চন্দনক ও উত্তীয়।

১৯৩৫ সালের ১১ই ডিসেম্বর নব-নাট্যমন্দিরে 'রীতিমত নাটকে'র অভিনয় আরম্ভ হল। শিশিরকুমার দিগম্বর।

শিশিরকুমার একদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে এলেন। বললেন—আপনি একদিন 'রীতিমত নাটক' দেখে আসবেন চলুন।

রবীন্দ্রনাথ রাজী হলেন।

কিন্তু যেদিন অভিনয় দেখতে যাবার কথা, সেদিন দুপুরে কয়েকজন ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথকে বুঝিয়ে গেলেন—আপনার নিজের নাটকের অভিনয় আপনি দেখতে যেতে পারেন, কিন্তু পরের লেখা নাটকের অভিনয় আপনি দেখতে যাবেন কেন?

অনেক আলাপ-আলোচনার পর সাব্যস্ত হল, রবীন্দ্রনাথ 'রীতিমত নাটক' দেখতে যাবেন না।

শিশিরকুমার এসব কিছুই জানেন না। তিনি বিকেলবেলা রবীন্দ্রনাথকে থিয়েটারে নিয়ে যেতে এলেন। এসে শুনলেন, রবীন্দ্রনাথ যাবেন না।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—ওহে শিশির, আমার যাওয়া হবে না।

সন্দেহ কি, শিশিরকুমার দারুণ দুঃখ পেলেন। চোখ ছলছল করে উঠল তাঁর। বললেন—আমি অনেককে জানিয়েছি আপনি যাবেন। আপনি না গেলে আমি অপদস্থ হব।

রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহপাত্র শিশিরকুমার। রবীন্দ্রনাথের জন্যে শিশিরকুমার অপদস্থ হবেন, তা কখন হতে পারে?

—তুমি অপদস্থ হবে!—এক মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ দুপুরবেলায় আলাপ-আলোচনার কথা ভুলে গেলেন, বললেন—আমি নিশ্চয়ই যাবো।

রবীন্দ্রনাথ থিয়েটারে গেলেন, 'রীতিমত নাটক' আদ্যন্ত দেখলেন, খুশি হলেন অভিনয় দেখে।

১৯৩৬ সালের ২২শে অক্টোবর নব-নাট্যমন্দিরে 'অচলা'র প্রথম অভিনয় হল। 'অচলা' শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহে'র নাট্যরূপ। 'অচলা'য় শিশিরকুমার দুটি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—কেদার ও সুরেশ।

নব-নাট্যমন্দিরে রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগে'র অভিনয় আরম্ভ হল ১৯৩৬ সালের ২৪শে ডিসেম্বর। শিশিরকুমার মধুসূদন সেজেছেন।

১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি নব-নাট্যমন্দির বন্ধ হয়ে গেল। 'যোগাযোগে'র পর সেখানে আর কোন নতুন নাটকের অভিনয় হয় নি।

বাঙলা নাট্যশালায় শিশিরকুমারের চেয়ে বেশি করে আর কেউ কি রবীন্দ্রনাথের রচনাকে আশ্রয় করেছেন? বোধ করি, না।

বলতে গেলে, শিশিরকুমারের আগের যুগে সাধারণ বাঙলা নাট্যশালায় রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা একখানা মাত্র পূর্ণাঙ্গ নাটক—'রাজা ও রাণী'—মঞ্চস্থ

দেখতে পাই। অবশ্যি, সে-যুগেও রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাস ভাঙিয়ে কয়েকখানা পালার অভিনয় হয়েছে। বলা বাহুল্য, সেসব গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপ রবীন্দ্রনাথ নিজে দেন নি।

এ-বিষয়ে হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন ঃ

"রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত "রাজা ও রাণী" এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল বহুকাল আগে, অর্থাৎ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে। শুনতে পাই, ওই সময়ে ওখানে তাঁর ক্ষুদ্র নাট্যকাব্য "চিত্রাঙ্গদা"ও একবার নাকি মঞ্চস্থ হয়েছিল, কিন্তু আমরা সে সম্বন্ধে কোনই সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি। "রাজা ও রাণী" মঞ্চস্থ হবার পর প্রায় দুই যুগ কেটে যায়, এবং এর মধ্যে আমাদের থিয়েটারের কর্ত্তারা রবীন্দ্রনাথের লেখনীর নিজস্ব দান গ্রহণ করার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ দেখাননি। তারপর হঠাৎ কি কারণে বা কোন খেয়ালে জানি না, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষ মঞ্চস্থ করে বসলেন রবীন্দ্রনাথের "বিদায়-অভিশাপ" নামে খণ্ড নাট্য-কাব্যখানি। যদিও দানীবাবু (কচ) ও তারাসুন্দরী (দেবযানী) এর দুই ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন, তবু এই অভিনয়কে উল্লেখযোগ্য বলতে পারি না। কারণ পালাটিকে বোধ হয় একরাত্রির পরে আর মঞ্চস্থ করা হয়নি।

তারপর আরও সাত বৎসর কেটে যায়। এর মধ্যে বাংলা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষদের একবারও মনে পড়েনি, বঙ্গদেশে রবীন্দ্রনাথ নামধেয় জনৈক নাট্য-কারের অস্তিত্ব আছে। ইতিমধ্যে মিনার্ভা থিয়েটারের ভার গ্রহণ করেছেন উপেন্দ্রকুমার মিত্র এবং বিদেশী ম্যাডানদের থিয়েটারে আত্মপ্রকাশ করেছেন শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী। উপেন্দ্রবাবু ছিলেন শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তখনকার চলতি বাংলা থিয়েটারগুলির মালিকদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এদেশের নাট্যজগতে নূতন যুগকে আর ঠেকিয়ে রাখা চলবে না।...আমরা উপেন্দ্রবাবুকে রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জ্জন" নাটক খোলবার জন্যে অনুরোধ করেছিলুম। কিন্তু তিনি ইচ্ছা সত্ত্বেও সে অনুরোধ রক্ষা করতে পারেননি; কারণ থিয়েটারের অন্যান্য লোক তাঁকে ভয় দেখান যে "বিসর্জ্জনে"র শেষ-দৃশ্যে যে প্রতিমা বিসর্জ্জনের দৃশ্য আছে তা দেখলে দর্শকরা বিদ্রোহ প্রকাশ করবে। তখন প্রখ্যাত সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে উপেন্দ্রবাবু রবীন্দ্রনাথের "বশীকরণ" কৌতুকনাট্যখানি নিজের রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ করেন। প্রধান পুরুষ-ভূমিকায় রাধিকানন্দের অভিনয় হয়েছিল চমৎকার। এ হচ্ছে ১৯২২



ভয়ার্ত ভাবে অর্ধেন্দুশেখর

শিশিরকুমার ভাদুড়ী বলেছেন ঃ অভিনেতা হিসেবে অর্ধেন্দুবাবু গিরিশবাবুর চেয়ে অনেক বড়।



আলোকচিত্র: শ্রীপরিমল গোস্বামী আলমগীররূপে শিশিরকুমার

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : শিশির ভাদুড়ির প্রয়োগনৈপুণ্য সম্বন্ধে
আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে।

খৃষ্টাব্দের কথা। অর্থাৎ "রাজা ও রাণী" খোলবার প্রায় বত্রিশ বৎসর পরে বাংলা রঙ্গালয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত নাটকের নিয়মিত অভিনয় সম্ভবপর হয়েছিল। বাঙ্গালীর পক্ষে এটা খুব গৌরবের কথা নয়।

তার কিছুকাল পরেই বাংলা নাট্যজগতে নবযুগের প্রবর্ত্তক শিশিরকুমার মনোমোহন নাট্যমন্দিরের পত্তন করলেন। তাঁর মত মনীষী যে রবীন্দ্রনাথের ভক্ত হবেন, এটুকু সহজেই অনুমেয়। "সীতা" খোলবার পরেই তিনি রবীন্দ্রনাথের নাটক অবলম্বন করতে চাইলেন। এবং তাঁর বিশেষ আগ্রহ দেখে রবীন্দ্রনাথও পূর্ব্বলিখিত "চিরকুমার সভা"কে অভিনয়ের উপযোগী করে দিলেন। কিন্তু শিশিরকুমারের দুর্ভাগ্যক্রমে ওই নাটকখানি কি করে যে তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়, সেসব কথা বলা হয়েছে যথাসময়েই। মোট কথা, তিনিই উৎসমুখ খুলে দিয়েছিলেন, তাই তার ধারা গিয়ে পড়েছিল ষ্টার থিয়েটারে। সেখানে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে "চিরকুমার সভা" মঞ্চস্থ হয়। বাংলা রঙ্গালয়ের নবযুগে এই নাটকখানি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের অগ্রদূতের মত। কারণ যে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ের জন্যে কোনদিনই মাথা ঘামান নি, তিনিই এর পর তার মুখ চেয়ে "গৃহপ্রবেশ", "শোধবোধ" ও "শেষরক্ষা" প্রভৃতি পালাগুলিকে অভিনয়ের উপযোগী করে দিয়েছিলেন। এবং তার পরও রবীন্দ্রনাথেরই মতানুসারে তাঁর "পরিত্রাণ", "বিসর্জ্জন", "তপতী" ও "বৈকুণ্ঠের খাতা" প্রভৃতি নাটকও সাধারণ বাংলা রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়। সেকালকার বাংলা থিয়েটারে বত্রিশ বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত একখানিমাত্র নাটকের নিয়মিত অভিনয় সম্ভবপর হয়েছিল, কিন্তু সেখানে নূতন দলের শিল্পীদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নিজের লেখা একখানি নাটকের সঙ্গে জনসাধারণ পরিচিত হবার সুযোগ পায়। এ হচ্ছে নবযুগেরই বিশেষত্ব।"

আবার বলি, বিশেষ করে শিশিরকুমারই এই নবযুগের প্রবর্তক। শিশির-কুমারই পুরোবর্তী, শিশিরকুমারই অগ্রদূত।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অল্পকাল পরে প্রকাশিত হয়েছে শিশিরকুমারের 'রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ'। সেই রচনাটি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি ঃ

"বাংলার জাতীয় রঙ্গমঞ্চের বিশেষ প্রয়োজন ছিল রবীন্দ্রনাথের মত নাট্য-কারের। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি, নট ও প্রয়োগকর্তা। যৌবনের প্রারম্ভ হতে, যদিও ব্যবসাদার হিসেবে নয়, তিনি নট ও প্রয়োগকর্তারূপে তাঁর গুণমুগ্ধদের সম্মুখে অনেকবার আবির্ভূত হয়েছেন। এমন কি বার্ধক্যে পদার্পণ

করবার পরও তাঁর অত্যাশ্চর্য প্রয়োগনৈপুণ্যের বিবিধ কলাকৌশল দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। আমাদের দেশে নাট্যকারদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, দর্শক বিচারকের মত আসনে বসে থাকবেন এবং অভিনেতা মঞ্চের কাঠগড়ায় আবদ্ধ আসামীর মত অভিনয় করবে—এই ব্যবস্থার মধ্যে একটা ঘোরতর অসামঞ্জস্য আছে। দর্শক এবং অভিনেতার মধ্যে যে বেড়া সেকালের যাত্রায়, গ্রীক ট্র্যাজেডির অভিনয়ে, এমন কি শেক্সপিয়রের থিয়েটারে ছিল না, যে বেড়া তুলে দেবার জন্য বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দুইজন প্রয়োগাচার্য (মায়ারহোল্ড ও রাইনাহার্ট) চেষ্টা করে আংশিকভাবে কৃতকার্য হয়েছেন, সেই বেড়া তুলে দেবার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথও, নিজস্ব দল নিয়ে দু-একবার করেছেন।

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, আমাদের রঙ্গমঞ্চের দুর্ভাগ্য, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠভাবে ঘটে উঠল না। আমি নিজে তাঁকে এদিকে আনবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বাধা এসেছে নানা দিক থেকে। যে অপূর্ব প্রতিভা বঙ্গসাহিত্যের প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত আপনার আলোকে উজ্জ্বল করে বিশ্বসাহিত্যের সভায় বাংলাসাহিত্যের হয়ে সমান আসন দাবি করা সম্ভব করে তুললো, সেই নব নবোন্মেষশালিনী প্রতিভা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ বিভাগ নাটকে তাঁর শক্তির এবং প্রাচুর্যের অতি অল্প অংশই ব্যয় করলেন। যেভাবে শেক্সপিয়র, ইবসেন বা হাউটম্যান তাঁদের জাতীয় নাট্যসাহিত্য এবং নাট্যমঞ্চ সবল করে তুলবার জন্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সেইভাবে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যদি নিজের দেশের নাট্যমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্য পুষ্ট করবার সম্ভাবনা ঘটে উঠত, তাহলে আজকে বাংলার জাতীয় নাট্যমঞ্চ সুসম্পন্ন প্রায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারত।

লোকশিক্ষার জন্য যত রকম আয়োজন সকল জাতির মধ্যে আছে, তার মধ্যে রঙ্গমঞ্চ সর্বশ্রেষ্ঠ। এই কথা গ্রীক সভ্যতা, হিন্দুসভ্যতা, রোমক সভ্যতা, জগতের সকল সভ্যতার যুগে, এমন কি বর্তমানের কম্যুনিস্ট রাশিয়াতে পর্যন্ত অবিসম্বাদীভাবে স্বীকৃত হয়েছে। য়ুরোপীয় সমালোচনা সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁদের বলে দিতে হবে না যে, ফাইন আর্টের আরম্ভ স্থাপত্য, দেবায়তন, চার্চ ও মসজিদ নির্মাণ কৌশল থেকে এবং এর পূর্ণ পরিণতি নাটকে। নাট্যমঞ্চকে বাদ দিয়ে নাটক হয় না, নাটক লেখা চলে না। আমাদের হিন্দু আলঙ্কারিক বলেন, নাটক দৃশ্যকাব্য। সুতরাং শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তিনি যিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁকে নটের সঙ্গে সাহচর্য করতে হবে। 'No

Playwright has home halves with the actor more than Shakespeare" এই যে শেক্সপিরীয়ান অন্তর্দৃষ্টি, নাটক লেখার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই দুর্লভ ক্ষমতা ছিল। তাঁর 'চিরকুমার সভা', 'শেষরক্ষা', 'তপতী' এইসব যাঁরা অভিনয় করেছেন বা অভিনয় দেখেছেন, এ বিষয়ে তাঁদের আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন হলে আমরা পেতাম অপূর্ব সমৃদ্ধ নাট্যসাহিত্য, জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন রঙ্গশালা ও সমাজের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের যে আবয়বিক সম্বন্ধ সেটা সুষ্ঠু ভাবে স্থাপিত হতে পারত।

কিন্তু হায়, এত কিছু হবার পূর্বেই—

"রঙ্গমঞ্চে একে একে নিবে গেল যবে দীপশিখা,
রিক্ত হলো সভাতল, আঁধারের মসী অবলেপে
স্বপ্নচ্ছবি মুছে যাওয়া সুষুপ্তির মতো শান্ত হলো
চিত্ত মোর নিঃশব্দের তর্জনী সংকেতে।"

নব-নাট্যমন্দির বন্ধ হয়ে যাবার পর দীর্ঘদিন কেটে গেল, কোনও রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার আর নিয়মিত দেখা দেন না, ঘুরে-ঘুরে এখানে-ওখানে অভিনয় করেন। সাদা কথায়, তিনি তখন মঞ্চহারা, ভাড়াটে। কিম্বা বলি, ভাড়াটে কেষ্ট। 'ভাড়াটে কেষ্ট' কথাটা শিশিরকুমার নিজেই বলতেন তখন রঙ্গ করে।

১৯৪১ সালে নাট্যনিকেতন উঠে গেল। সেই বাড়িতে সেই বছরের ২৮শে নভেম্বর 'জীবনরঙ্গ' নাটক নিয়ে শিশিরকুমার 'শ্রীরঙ্গম' নামে নতুন একটি নাট্যশালা খুললেন। 'জীবনরঙ্গে' শিশিরকুমার নাট্যাচার্যের ভূমিকায় অভিনয় করলেন।

১৯৪২ সালে তিনখানা নতুন নাটকের অভিনয় হল শ্রীরঙ্গমে। 'উড়োচিঠি', 'দেশবন্ধু', 'মায়া'। 'উড়োচিঠি'র প্রথম অভিনয় হল ১১ই মার্চ। 'দেশবন্ধু'র ১২ই সেপ্টেম্বর। 'মায়া'র ২৩শে ডিসেম্বর। তিনখানা নাটকেই শিশিরকুমার অভিনয় করেছেন।

১৯৪৩ সালের ২৩শে এপ্রিল 'মাইকেলে'র প্রথম অভিনয় হল। শিশিরকুমার মাইকেল। 'বিপ্রদাসে'র প্রথম অভিনয় হল ১৯৪৩ সালের ২৫শে নভেম্বর। সেবারে শিশিরকুমার 'বিপ্রদাসে' কোনও ভূমিকায় অভিনয় করেন নি। কয়েক বছর পরে 'বিপ্রদাসে'র পুনরভিনয়ে শিশিরকুমার নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

১৯৪৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর 'বিন্দুর ছেলে'র প্রথম অভিনয় হল। 'বিপ্রদাসে' যেমন, 'বিন্দুর ছেলে'তেও তেমনি প্রথমবারের অভিনয়ে শিশিরকুমার মঞ্চে দেখা দিলেন না। কয়েক বছর পরে শিশিরকুমার 'বিন্দুর ছেলে'তে যাদব সেজেছেন।

১৯৪৯ সালের ১০ই আগস্ট শ্রীরঙ্গমে 'পরিচয়ে'র প্রথম অভিনয় হল। শিশিরকুমার রায়বাহাদুর। ১৯৫১ সালের ১০ই মে 'তখৎ-এ তাউস' আরম্ভ হল। শিশিরকুমার জাহান্দার। জাহান্দার তরুণ সম্রাট। শিশিরকুমারের অভিনয়গুণে অতীতের একটি তারুণ্য মঞ্চের ওপর জীবন্ত হয়ে উঠল। শিশিরকুমার যে বৃদ্ধ হয়েছেন জাহান্দারকে দেখলে সেকথা ঘুণাক্ষরেও মনে আসে না।

জাহান্দারকে দেখে একদিন দু-জন বিদেশী ভদ্রলোক শিশিরকুমারকে বললেন —মিস্টার ভাদুড়ী, আপনি যে আজ বৃদ্ধ হয়েছেন, আপনার অভিনয় দেখে তা একেবারেই বোঝা যায় না। প্রায় দু-যুগ আগে আপনাকে আমেরিকায় যেমন দেখেছিলাম, আজও আপনি ঠিক তেমনি আছেন।

শিশিরকুমার হাসলেন। বললেন—মঞ্চের ওপরে এ আমার নকল যৌবন। আসলে আমি বৃদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নই।

১৯৫৩ সালের ৩রা জানুআরি শ্রীরঙ্গমে 'প্রশ্ন' নামে আরেকখানা নতুন নাটকের অভিনয় হল। শিশিরকুমার নীতিন। 'প্রশ্নে'র পর শ্রীরঙ্গমে আর কোনও নতুন নাটকের অভিনয় হয় নি।

যেগুলোর নাম বলা হল, সেগুলো ছাড়াও আরও কয়েকখানা নতুন পালার অভিনয় হয়েছে শ্রীরঙ্গমে। 'তাইতো', 'বন্দনার বিয়ে,' 'তুলসীদাস', 'উল্কা', 'দুঃখীর ইমান'। কিন্তু এগুলোর কোনোটিতেই শিশিরকুমার কোনও ভূমিকায় অভিনয় করেন নি।

চোদ্দ বছরের চেয়ে অল্পকিছু বেশিকাল শ্রীরঙ্গমের অস্তিত্ব ছিল। এই কালের মধ্যে বিস্তর পুরনো নাটকের পুনরভিনয় হয়েছে শ্রীরঙ্গমে, সেসব নাটকে শিশির-কুমার নানা বিচিত্র ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। কয়েকটি নাম করি: 'চাটুয্যে-বাড়ুয্যে'তে বাড়ুয্যে, 'খাসদখলে' নিতাই, 'চন্দ্রশেখরে' ফস্টর, 'মন্ত্রশক্তি'তে রমাবল্লভ, 'মিশরকুমারী'তে আবন, 'সাজাহানে' একসঙ্গে সাজাহান ও ঔরংজেব, 'আলমগীরে' একসঙ্গে আলমগীর ও রাজসিংহ, গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা'য় সিরাজদ্দৌলা।

তারপর একদিন শ্রীরঙ্গম বন্ধ হয়ে গেল। টাকার অভাবে বাড়িভাড়ার দায়ে

শ্রীরঙ্গম বন্ধ করে দিতে হল। ১৯৫৬ সালের কথা। সেসময়ে শিশিরকুমার একজনকে ডেকে বলেছিলেন—ঠিক আছে, টাকার অভাবে শ্রীরঙ্গম না হয় ছেড়ে দিলাম, তাতে দুঃখের কী আছে। বাঙলাদেশ ভাল নাট্যশালার কদর বোঝে। দেখো, একবছর দেড়বছরের মধ্যে একটা কিছু নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।

কিন্তু কিছুই হয় নি। সেদিন তিনি ভুল ভেবেছিলেন, ভুল বলেছিলেন। একথা শিশিরকুমার নিজেই অবশ্যি পরে বুঝেছিলেন। মর্মে-মর্মে বুঝেছিলেন।

শ্রীরঙ্গমের মৃত্যু হল। মাসকয়েক পরে সেই বাড়িতেই আরেকটি নতুন নাট্যশালার জন্ম হল। বিশ্বরূপা।

আর শিশিরকুমার? ইহজীবনে আর কোনও মঞ্চে তিনি নিয়মিত দেখা দিলেন না। ঘুরে-ঘুরে এখানে-ওখানে অভিনয় দেখাতে লাগলেন। জীবনের শেষ দুটি অভিনয় করেছেন মহাজাতি সদনে, ১৯৫৯ সালে; ৮ই মে 'আলমগীরে' আলমগীর, ১০ই মে 'রীতিমত নাটকে' দিগম্বর।

অভিনেতা ও পরিচালকরূপে শিশিরকুমার কয়েকবার চলচ্চিত্রে দেখা দিয়েছেন। কিন্তু শিল্পের সেই বিভাগে শিশিরকুমারের দান তাঁর প্রতিভার তুলনায় নগণ্য। হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই শিশিরকুমার অনুভব করেছিলেন যে চলচ্চিত্র তাঁর স্বধর্ম নয়, নাট্যমঞ্চই তাঁর স্বস্থান। হয়তো সেজন্যেই শিশির-কুমার চলচ্চিত্রের রাজ্যে কায়েমী হয়ে থাকেন নি।

শিশিরকুমার অসামান্য অভিনেতা, এ-সত্যে তিলার্ধ সংশয় নেই। কিন্তু অভিনয়কালে শিশিরকুমার কি অভিনেয় ভূমিকার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতেন? রামরূপী শিশিরকুমার কি সীতার বিরহে রামের ভাবে অভিভূত হতেন?

শিশিরকুমার এ-প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছেন এবং এ-প্রশ্নের সুন্দর উত্তর লিখে দিয়েছেন:

"একটা মস্ত বড় ভ্রান্ত ধারণা সকলে পোষণ করেন যে,—নট নাট্যকারের পুত্তলিকা-মাত্র; তিনি যে ভাবে নাচান—সেইভাবে নটকে নাচিতে হয়। কিন্তু আর্ট (Art) বলিয়া যদি কোনও পদার্থ থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক আর্টই স্বতন্ত্র,—অর্থাৎ self-contained;—অর্থাৎ, অভিনয়-কলাবিকাশ নাট্যকারের অপেক্ষা রাখে না এবং সেইজন্যই যাহাকে ইংরাজিতে Good play বলে, তাহা সব সময় নাট্যসাহিত্যে Good drama হইয়া দাঁড়ায় না। তবে, নটের কৃতিত্ব কোথায়? চতুঃষষ্ঠী কলার অন্তরে আছে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা। চিত্রকর তাঁহার

চিন্তা চিত্রে প্রকাশ করেন, কবি তাঁহার কল্পনা ভাষায় মূর্ত্তি দেন, ভাস্কর পাষাণের রেখার মধ্যে কল্পনাকে রূপ দেন, নাট্যকার চরিত্র-বিশ্লেষণে লিপির চাতুর্য্য দেখান, কিন্তু নট—একাধারে চিত্রকর, ভাস্কর, কবি এবং নাট্যকার,—সকলের কৃতিত্ব দখল করিয়া আপন কণ্ঠ ও আপন কায়া দ্বারা নিজের কৃতিত্ব নাট্যরসিক ও নাট্য-অনুরাগীজনের মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া দেন। কিন্তু হায়, আমার নমস্য পূর্ব্বগামী আর একজন প্রসিদ্ধ নট (যিনি নাট্যকারও ছিলেন) তাঁহার ভাষায় বলিতে হয়—"দেহ-পট সনে নট সকলি হারায়।"...

লোকমুখে শুনি, আমি ভাল অভিনেতা। অনেকে বলেন—আমার অভিনয় দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হন,—এবং সময় সময় প্রশ্ন করেন,—"আপনি কি সত্য-সত্যই সীতার বিরহে রামের ভাবে অভিভূত হইয়া পড়েন?" আমি তাঁহাদের বলি,—সত্য-সত্যই ভাবে অভিভূত হইলে—চারিদিকে বৈদ্যুতিক আলোর পরিবেষ্টনের সম্পূর্ণ সুযোগ পাওয়া অসম্ভব। যে মুহূর্ত্তে "লবের" মুখ দেখিয়া আমি "সীতার" কল্পনায় আত্মহারা হইয়া যাই, সেই মুহূর্ত্তেই "লবকে" আমার দক্ষিণ পার্শ্বে সরাইয়া নিজের মুখে ঐ পাঁচশো ওয়াট্-কাণ্ডেল-পাওয়ারের (watt-candle power) সবটুকু আলোর সুযোগ-সুবিধা সম্পূর্ণ নিজেকে গ্রহণ করিতে হয়। আত্মহারা হইলে কি এটা সম্ভব হয়? "সু-অভিনয়" মানে "দৃশ্যপট, স্বকীয় পরিচ্ছদ, পারিপার্শ্বিক আলোকসম্পাত,—সর্ব্ব বিষয়ে সজাগ থাকা"! এ থাকিতে না পারিলে শুধু "ভাবাহত" হইলে "সু-অভিনয়" করা চলে না।

"আর্ট" শব্দের অর্থ হইতেছে "সৃষ্টি" (creation)! স্রষ্টা যদি সজাগ না থাকেন, তাহা হইলে তিনি সৃষ্টি করিবেন কি প্রকারে? প্রত্যেক সু-অভিনেতা, প্রত্যেক "আর্টিষ্ট্", (Artist) শিল্পী—নিজের মস্তিষ্কের মধ্যে দুইটী মানুষকে বহন করেন। একজন—যিনি সৃষ্টি করেন, আর একজন যিনি সৃষ্ট হন। এক-জন "বিচারক,"—একজন "কর্ম্মী"। এই দুইয়ের সুষ্ঠু সমন্বয়ে সত্যকার আর্টিষ্টের জন্ম। এ কথা যিনি না বুঝিবেন, তাঁহার অভিনয় করা বৃথা। কারণ, অভিনেতা শুধু "পাঠক" নহেন, নাট্যকারের ভাষার পুত্তলিকা নহেন। প্রাণবন্ত সজীব সুন্দর দেহভঙ্গী—ভাষার প্রত্যেক "মোচড়ে" ভাবকে জীবন্ত করিয়া তোলা, এই হইতেছে অভিনয়ের অঙ্গ।"

একথা বুঝেছেন বলেই সার্থক হয়েছে শিশিরকুমারের অভিনয়। প্রাণবন্ত সজীব সুন্দর দেহভঙ্গিতে, ভাষার প্রত্যেক মোচড়ে ভাবকে তিনি মঞ্চের ওপর জীবন্ত করে তুলেছেন।

সাফল্যের জন্যে শিশিরকুমারকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে থাকতে হয় নি। তিনি এসেছেন আর জয় করেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—জনসাধারণ শিশিরকুমারকে যত তাড়াতাড়ি অভিনেতা ও প্রয়োগকর্তা বলে স্বীকার করে নিয়েছে, তত তাড়াতাড়ি আমি কবি ও সাহিত্যিকরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি নি।

মঞ্চের ওপর শিশিরকুমার জীবন্ত করে তুলেছেন অসংখ্য ভূমিকা। কিন্তু তাঁর তৃষ্ণার শান্তি হয় নি। ভালো নাটকের অভাবে তিনি সারাজীবন অতৃপ্ত থেকেছেন। আলমগীর, রঘুবীর, রাসবিহারী ইত্যাদি ভূমিকা তাঁর প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারে নি। বহুবার তিনি রঙ্গ করে বলেছেন—সারাজীবন হালুমবীর, ঘুঘুবীর আর বাঁশবেহারীই করলাম। নাটকের মত নাটক পেলাম কই?

এককালে মাতাল হয়ে রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়েছেন, অভিনয়ে অবহেলা করেছেন, —শিশিরকুমারের নামে এ-অভিযোগ আছে। গোপন করে লাভ নেই, শিশিরকুমার মদ খেতেন।

একবার একজন বড়মানুষের কাছে থিয়েটারের জন্য টাকা চাইতে গিয়েছেন শিশিরকুমার। তিনি শিশিরকুমারকে বললেন—টাকা আমি আপনাকে দেব, কিন্তু কথা দিন, আপনি মদ ছেড়ে দেবেন।

শিশিরকুমার বললেন—না, সেকথা আমি আপনাকে দিতে পারব না।

নির্ভীক সত্যাশ্রয়ীর কথা। টাকার জন্যে মিথ্যে করে মদ ছাড়বার প্রতিশ্রুতি দিলেন না, সত্যকে ধরে রইলেন।

শিশিরকুমারকে মদ ছাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন একজন। নাম বললে অনেকেই চিনতে পারবেন তাঁকে। কঙ্কাবতী। চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সার্থক হতে পারেন নি। কত দুঃখ করেছেন সেজন্যে।

শেষপর্যন্ত অবশ্যি শিশিরকুমার মদ ছেড়েছেন। কিন্তু কঙ্কাবতী সেকথা জেনে যেতে পারেন নি। মৃত্যুর ওপার থেকে যদি ইহলোকের সংবাদ জানা যায়, তাহলে হয়তো কঙ্কাবতীর আত্মা জেনেছে যে তাঁর চেষ্টা শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয় নি।

একবার শিশিরকুমারের একজন ভক্ত গিয়েছেন শিশিরকুমারের কাছে। শিশিরকুমারের জন্যে উপহার নিয়ে গেছেন—সন্দেশ, ফল, বই আর কয়েক বোতল মদ।

শিশিরকুমার বোতল কটি নিলেন না। বললেন—ছাখ, আমি মদ খাই।

মাতালও যে হই না, এমন কথা বলি না। কিন্তু এরকম উপহার কাউকে দিতে নেই। সন্দেশ, ফল আর বই আমি সানন্দে নিচ্ছি, কিন্তু বোতল কটি তুমি ফেরত নিয়ে যাও।

ভক্তকে ক্ষমা চাইতে হল। মদের বোতল কটি ফেরত নিয়ে যেতে হল।

একাধিকবার শিশিরকুমার মুহূর্তের মধ্যে জটিল প্রশ্নের সুন্দর উত্তর দিয়েছেন, সুধীজনেরা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়েছেন। আশ্চর্য, কেমন করে তিনি দারুণ সহজে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারেন। তাঁর জ্ঞানের পরিধি কি নানা দিকে অভাবিতরূপে বিস্তৃত ?

না, সে-রকম অহঙ্কার শিশিরকুমার করেন নি। বরং একাধিকবার সবিনয়ে বলেছেন—আমি যে মাতাল।

যেন মদ খেয়েছেন বলেই তিনি শিশিরকুমার, যেন মদ না খেলে তিনি শিশিরকুমার হতে পারতেন না !

শিশিরকুমার একটা চমৎকার গল্প বলেছেন ঃ

'একদিন থিয়েটারে একদল মাতাল খুব গোলমাল করছে, বিরক্ত হয়ে গিরিশ-বাবু একটা খিস্তি করে (কথায় কথায় খিস্তির মাত্রা দেওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল) তাদের ডেকে আনতে বললেন। তারা এসে বোধ হয় তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলেছিল, কারণ তিনি উত্তর দিলেন—মদ খেলে আমি মাতাল, না খেলে গিরিশ ঘোষ। মদ না খেলে তু বেটারা কে রে ?'

ঠিক ওই রকম কথা বলা যায় শিশিরকুমার সম্পর্কে। মদ খেলে তিনি মাতাল, মদ না খেলে তিনি শিশিরকুমার।

কিন্তু শুধুই কি মদ ? আর কি কোনও নেশা নেই ? আছে। মদের চেয়েও দুর্মদ নেশা আছে। বইয়ের নেশা। জীবনে মদের নেশা ছাড়তে পেরেছেন কিন্তু বইয়ের নেশা ছাড়তে পারেন নি। আর বই মানে শুধু নাট্যকলার বই নয়। সাহিত্য ও চারুকলার নানারকম বই। জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও পড়াশোনার আগ্রহ একতিল কমে নি। কত বিনিদ্র রাত্রি তিনি বই পড়ে ক্ষয় করেছেন। কতদিন বলেছেন—হাতে যদি আরও বেশি টাকা পাই তাহলে মনের সাধে আরও বেশি বই কিনতে পারি।

যেমন অগাধ পড়েছেন, তেমনি অপার ভেবেছেন। কথায়-কথায় তাঁর ভাবনার কথা বলেছেন সুন্দর করে। যাঁরা শুনেছেন তাঁরাই জানেন শিশির-কুমারের সঙ্গে আলাপ করাও জীবনের একটি তুলনাহীন আনন্দ।

আলাপশিল্পে সুদক্ষ শিশিরকুমার সম্পর্কে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন ঃ

'অভিনয়ের কথা কি বলব, সহজ আলাপে বা সাধারণ বিষয়েও এমন বাচন আর কোথাও শুনিনি। যত বড় তিনি অভিনয়ে তত বড় তিনি বলনে-কথনে। তা খৃষ্টধর্মের ইতিহাসই হোক বা শেক্সপিয়রের নাটকই হোক বা রবীন্দ্র নাথের গীতি-কাব্যই হোক। কিংবা হোক তা কোন অন্তরঙ্গ বিষয়, প্রথমা স্ত্রীর ভালোবাসা। তাঁর সেই সব কথা মনে হত যেন বিকীরিত বহ্নিকণা, কখনো বা মৃগমদবিন্দু। অভিনয় দেখে হয়তো ক্লান্তি আসে, কিন্তু মনে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাত জেগে কাটিয়ে দিতে পারি তাঁর কথা শুনে। তাতে কি শুধু পাণ্ডিত্যের দীপ্তি? তা হলে তো ঘুম পেত, যেমন উকিলের অতিকৃত বক্তৃতা শুনে হাকিমের ঘুম আসে। না, তা নয়। তাতে অনুভবের গভীরতা, কবিমানসের মাধুর্য আর সেই সঙ্গে বাচনকলার সুষমা। তা ছাড়া কি মেধা, কি দীপ্তি, কি দূরবিস্তৃত স্মরণশক্তি! মুহূর্তেই বোঝা যায় বিরাট এক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসেছি—বৃহৎ এক বনস্পতির প্রচ্ছায়ে।'

প্রশ্ন থেকে যায়, কোন্ শিশিরকুমার বড়, নট শিশিরকুমার না নাট্যাচার্য শিশিরকুমার? মঞ্চের ওপরে নট শিশিরকুমারকে দেখবার সৌভাগ্য অনেকের হয়েছে, কিন্তু নেপথ্যে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারকে কজন দেখেছেন! কেবলমাত্র তাঁর শিষ্য, সহকর্মী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব ছাড়া বিশেষ কারও নাট্যাচার্য শিশির-কুমারের দেখা পাবার কথা নয়।

শিশিরকুমারের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন ঃ 'মহলার সময়ে মঞ্চের উপরে বাইরের জাঁকজমক কিছুই থাকে না—না অত্যুজ্জ্বল আলোক মালা, না বর্ণবিচিত্র দৃশ্যপট ও পোষাক-পরিচ্ছদ, না অবিচ্ছিন্ন ও ক্রমবর্দ্ধমান নাটকীয় ক্রিয়া, কিন্তু তবু শিশিরকুমার যখন একাই একাধিক ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন পুরুষ ও নারী ভূমিকায় অভিনেয় যা-কিছু তা বুঝিয়ে দিতে আরম্ভ করেন, তখন বার বার আমার মনে হয়—কোন্ শিশিরকুমার বড়? প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের বিশেষ ভূমিকার অভিনেতা শিশিরকুমার, না অপ্রকাশ্য মহলায় একাধারে বহু ভূমিকার নাট্যশিক্ষাদাতা শিশিরকুমার? রঙ্গমঞ্চের উপরে তাঁকে দেখি কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর অভিনেতা রূপে, কিন্তু মহলার আসরে তাঁকে

দেখতে পাই উচ্চতর ও মহত্তর এক বিপুল ও বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী কলাবিদ রূপে। সেখানে তিনি ছবি না এঁকেও ছবিকার, নাট্যকার না হয়েও নাট্যরসস্রষ্টা, সুরকার না হয়েও সঙ্গীতজ্ঞ এবং নৃত্যপরায়ণ না হয়েও নৃত্য-কলাবিদ্ ; সেখানে তিনিই নট, তিনিই নটী এবং তিনিই মূক কাটা-সৈনিক ; সেখানে তিনি ভাবুক, কাব্যরসিক, ঐতিহাসিক ও সমালোচক ; সেখানে তিনি স্রষ্টা, শ্রোতা ও দ্রষ্টা।'

শিশিরকুমার মাঝে মাঝে বলেছেন—আমি বড়-বড় নামজাদা অ্যাক্টর বা অ্যাক্ট্রেস চাই না। দরকার হলে আমি লোক তৈরী করে নেব।

এমন উক্তি শিশিরকুমারের মত একজন নাট্যাচার্যের মুখেই মানায়। বড়-বড় অ্যাক্টর-অ্যাক্ট্রেস নিয়ে আসর জমিয়ে নয়, সামান্যকে অসামান্য করে তোলার মধ্যেই শিশিরকুমারের প্রতিভার পরিচয়।

অন্যের কথা কি, স্বয়ং তারাসুন্দরী বলেছেন—গিরিশবাবুর রিহার্সালও দেখেছি, ভাদুড়ী বাবারও দেখেছি। এমন শেখাবার কৌশল তাঁর ছিল না।

আজ আর একথা কারও অজানা নেই, শিশিরকুমার নিজের হাতে গড়ে তুলেছেন বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শৈলেন চৌধুরী, প্রভা, কঙ্কা এবং আরও অনেক অভিনয়শিল্পীকে। কিন্তু শিশিরকুমারের দুর্ভাগ্য, শিশিরকুমারের জীবদ্দশায়ই তাঁর হাতে-গড়া একাধিক অভিনয়শিল্পী ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন। কেউ-কেউ আবার বেশি পয়সার টানে শিশিরকুমারের থিয়েটার ছেড়ে অন্য থিয়েটারে চলে গিয়েছেন।

জীবনের শেষ পর্বে শিশিরকুমার কতদিন আক্ষেপ করে বলেছেন—নিজে হাতে করে যাদের শিখিয়েছি—বিশ্বনাথ, প্রভা, শৈলেন, কঙ্কা—সব একে-একে সরে গেল। আমি একলা পড়ে গেলাম। শেষের দিকে যাদের শেখালাম, তাদের সব বেশি পয়সা দিয়ে অন্য থিয়েটার ডেকে নিয়ে গেল।

সুধাসুমধুর অতীতের দিনগুলি আর সত্য হয়ে ফিরে আসে না, ফিরে আসে নি। অন্তত সত্যের ছায়া হয়ে কি আসে নি, একবারও কি আসে নি ?

একবারের কথা বলি তাহলে।

শ্রীরঙ্গম বন্ধ হবার দিন কয়েক আগের কথা। 'সীতা' হবে সেদিন। শিশিরকুমার যথারীতি রাম সাজবেন।

রামের রূপসজ্জায় শিশিরকুমার নিজের জায়গায় বসলেন। দু-হাতের

পাতায় দু-চোখ ঢেকে বসলেন। পালা আরম্ভ হতে অল্প একটু দেরি আছে। মঞ্চে ধূপধুনো দেওয়া হচ্ছে।

হাত সরিয়ে নিলেন। এদিক-ওদিক তাকালেন। সব ঠিক আছে? সব ঠিক আছে। কটা বাজল? ছটা পঁয়ত্রিশ।

ছটা পঁয়ত্রিশ? ব্যস্ত হয়ে উঠলেন শিশিরকুমার—প্রভা সীনে গেছেন?

আশেপাশে যাঁরা ছিলেন, চমকে উঠলেন। প্রভা! কোথায় প্রভা! প্রভার শরীর তো কয়েক বছর আগে নিমতলার শ্মশানঘাটে ভস্ম হয়ে গেছে।

পলকে সংবিৎ ফিরে পেলেন শিশিরকুমার। মুহূর্তে ফিরে এলেন বর্তমানে। এ-'সীতা' সে-'সীতা' নয়। এটা মনোমোহন-নাট্যমন্দির নয়, শ্রীরঙ্গম। যেদিন যায় সেদিন আর ফেরে না।

শিশিরকুমার ডানহাতটা মুঠো করে কপালে ঠুকলেন। হৃদয়ের অতল থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। কম্পিতকণ্ঠে বললেন—ও—হো—হো···

অতীতের বর্ণবহুল আনন্দের মুহূর্তের কাছে বর্তমানে কি পাওয়া গেল? একটি বিচিত্রিত বেদনার মুহূর্ত।

জানতে ইচ্ছা করে শিশিরকুমারের মত একজন অভিনেতার চোখে কে দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। কে? আর কে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। শিশিরকুমার বলেছেন—রবীন্দ্রনাথই দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। স্টেজের ওপর হাত ও আঙুল দিয়ে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি। হাত ও আঙুলের ব্যবহারই সবচেয়ে শক্ত কাজ, এবং সেকাজে পূর্ণ দক্ষতা ছিল রবীন্দ্রনাথের।

রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত শিশিরকুমার।

সকলেই জানেন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের উপর রবীন্দ্রনাথ একটি বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে রামমোহন লাইব্রেরীতে একটি শোকসভা হল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি সেই সভায় পড়লেন।

সভা শেষ হল। বাইরে এসে শিশিরকুমার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, একজন বন্ধুকে বললেন—ভাই, আমার জন্যে রবীন্দ্রনাথ যদি এমনি একটি কবিতা রচনা করেন তা হলে এখনি আমি চলন্ত মোটরের তলায় চাপা পড়ে মরতে রাজি আছি।

অসামান্য কথা। মনে প্রাণে কাব্যরসিক না হলে এমন কথা কি কারও মুখ থেকে বেরোতে পারে।

১৯৫৯ সালের জানুআরির এক সকালবেলা খবর-কাগজ দেখে শিশিরকুমার অবাক হয়ে গেলেন। ভারত-সরকার শিশিরকুমারকে নাকি 'পদ্মভূষণ' উপাধি দিয়েছে!

আশ্চর্য কথা। শিশিরকুমারের অনুমতি নেওয়া দূরের কথা, শিশিরকুমারকে এ বিষয়ে আগে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানানো হয় নি। পাকা খবর পেলেন দু-দিন পরে। দিল্লী থেকে টেলিগ্রাম এল। টেলিগ্রাম এসেছে, আরেক আশ্চর্য, শ্রীরঙ্গমের পুরোন ঠিকানায়। অথচ শিশিরকুমারের শ্রীরঙ্গম বন্ধ হয়ে গেছে, এক আধদিন নয়, বছর তিনেক আগে। আশ্চর্য হবার মত কথা বইকি।

পত্রপাঠ শিশিরকুমার 'পদ্মভূষণ' ফেরত দিলেন। ভারত-সরকারকে জানিয়ে দিলেন—তোমাদের দেওয়া এই সম্মান আমি চাই না। সরকারী খেতাবে আমার দরকার নেই।

কিন্তু খেতাব ছাড়া সরকারের কাছে অন্য কিছু পেলে কি শিশিরকুমার খুশি হতেন? হ্যাঁ, হতেন।

শিশিরকুমার বলেছেন—আজ তিনবছর নাট্যশালা ছেড়ে এমনি বসে আছি। কই, কেউ তো কোনদিন এসে বললেন না, 'এস, তোমাকে একটা নাট্যশালা খুলে দিই, তোমার ইচ্ছেমত অভিনয় করে যাও।' আমার ওপর দরদ থাকলে নাট্যশালার ওপরেও দরদ থাকত। ওই পদবী দেবার বদলে খুশি হতাম, সরকার যদি এই কলকাতায় ভালো একটা নাট্যশালা খোলার কথা ঘোষণা করতেন। তাছাড়া ওসব খেতাব, পদবী জিনিসগুলোই ভুয়ো। কোন দাম নেই।

জীবনের শেষপর্বে রচিত শিশিরকুমারের দুটি নিবন্ধ থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করি:

"এখনও আমাদের দেশে নট ও নাট্যের আদর হয়নি। যাত্রার বেলায় যেমন, থিয়েটারের বেলায়ও তেমনি স্বত্বাধিকারীর সম্মান আছে পয়সার সম্মানে—কিন্তু সাধারণ নাট্যব্যবসায়ীর খাতির নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের মধ্যে নটের ব্যবসা অবলম্বন করতে কারো মন চায় না। নট নটী একটা আলাদা জাত, কিন্তু উঁচু জাত নয়। পঁচিশ, ত্রিশ বৎসর আগে এ ভাবটি যত প্রবল ছিল এখন

ততটা প্রবল নয় সত্য, কিন্তু অন্য পাঁচটা কাজের মত থিয়েটারের কাজটা লোকে এখনও সহজভাবে নিতে পারেননি। ত্রিশ বৎসর পূর্বে একজন ধনী জমিদারের ছেলে বর্তমান লেখককে প্রশ্ন করেছিলেন—"থিয়েটারের দরকার কি?" "ওগুলো উঠে গেলে ক্ষতি কি?" উত্তর—"কাব্যের প্রয়োজন কি? সংগীতের প্রয়োজন কি? সকল ললিত কলাই আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। অপ্রয়োজনের মধ্যেই তার প্রয়োজন। নাট্যশালা উঠে গেলে বুঝতে হবে জাতির জীবনীশক্তি, জাতির সৃজনীশক্তি লুপ্ত হয়েছে।

বাংলার নাট্যশালা এখনও সর্বাঙ্গীণ উন্নতিলাভ করেনি। জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিদের নাট্যশালার সঙ্গে হয়ত আমাদের রঙ্গমঞ্চ এখনও অনেক বিষয়ে তুলনীয় নয়। কিন্তু জাতির পরিচয় তার রঙ্গমঞ্চে; সুতরাং জগতে বড় জাতি বলে পরিচিত হতে হলে উন্নত নাট্যশালার প্রয়োজন। নাট্যশালাকে উন্নত করতে হলে সর্বাগ্রে মনের ভিতর থেকে নাট্যশালা সম্বন্ধে যে অনুদার ভাব আছে তাকে দূর করা দরকার। নাট্যশালা জাতীয় কৃষ্টির ধারক ও বাহক। এই নাট্যমঞ্চে এসে সকল কলা মিলিত হয়। নৃত্যগীত, অভিনয়, সাহিত্য, ইতিহাস, নাট্যে সকলেরই বিকাশ। সর্বজাতির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা নাট্যকার। সাহিত্যের মুকুট-মণি নাট্য। অভিনয় ব্যতিরেকে নাট্য সম্পূর্ণ হয় না। অতএব নাট্যশালার উৎকর্ষ আমাদের জাতীয় প্রয়োজন।"

"আমাদের বাংলা দেশে দীর্ঘ পাঁচ ছয়শত বৎসর কাল যাত্রা নামধেয় যে নাট্য প্রচলিত ছিল তার রূপ বর্তমান বাংলা থিয়েটার থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। তাতে না ছিল মঞ্চ না ছিল পট এবং আলোকেরও সমারোহ ছিল না। আপামর সাধারণের কাছেও এই নাট্য ছিল অত্যন্ত প্রিয়। এর ভিত্তি গঠিত হয়েছিল আমাদের হিন্দুধর্ম ও পুরাণকে আশ্রয় করে। আমাদের দর্শন ও পুরাণ যে জীবনবেদের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমাদের নাট্য ও নাটক তারই ব্যাখ্যা করত। দর্শনের গুরুগম্ভীর তত্ত্ব পৌরাণিক গল্পের মধ্য দিয়ে একেবারে অজ্ঞ, অশিক্ষিত সাধারণ লোকের মনের মধ্যে ফুটিয়ে তোলাই ছিল আমাদের দেশের যাত্রার কাজ।

দেখা যায় ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলায় যাত্রা ছিল সামাজিক জীবনের এক প্রধান অঙ্গ। শুধু তাই নয়, এ জিনিস তখন এত বহুলভাবে প্রচলিত ছিল যে মনে হয় দুই তিন শত বর্ষ ধরে এই যাত্রা অবিচ্ছিন্নভাবে আমাদের সমাজে চলে আসছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত ছিল যাত্রার লোকপ্রিয়তা। কিছুকাল আগেও গ্রামে গ্রামে ভুঞামারা, দুর্গাপূজা, দোল ও রাস উপলক্ষ্য করে বহুদিন

ধরে নাট্যোৎসব করতেন। এখনও যাত্রার অপ্রচলন হয়নি তবে যাত্রার মূর্তি বদলেছে। অল্পদিন পূর্বেও যাত্রা ছিল দেব-দেবীর পূজার অঙ্গ। শুধু পূজার অঙ্গ নয় লোকশিক্ষারও অঙ্গ। আমাদের দেশে লোক অক্ষর পরিচয়কেই শিক্ষার একমাত্র সোপান মনে করতেন না। বর্ণজ্ঞান না থাকলেও আমাদের দেশের নিরক্ষর কৃষক এই পৌরাণিক উপাখ্যানমূলক যাত্রার সাহায্যে হিন্দু ধর্মের ও দর্শনের সঙ্গে মোটামুটিভাবে পরিচিত হতে সক্ষম হত। জীবনের উচ্চ উচ্চ আদর্শ গুলি, সত্যানুরাগ, পরোপচিকীর্ষা, পরার্থে আত্মত্যাগ, সতীধর্ম, পিতৃভক্তি, সৌহার্দ্য ও দেবদ্বিজে ভক্তি লোকের মনে সংক্রামিত হত; কিন্তু অত্যধিক পুরাণপ্রিয়তা শেষকালে যাত্রাকে সমসাময়িক জীবন হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। নাটকে মানুষের সাধারণ জীবন ও তার বিবিধ সমস্যা আমাদের যাত্রার পালায় কোন রকম স্থান পেল না।

অত্যন্ত অবাস্তব জিনিস লোকপ্রিয় হয় না, লোকের কোন কাজেই আসে না। কাজে কাজেই যাত্রার লোকপ্রিয়তা নষ্ট হতে লাগল আর অনাদৃত হবার অবশ্যম্ভাবী ফল, অধঃপতন ঘটতে লাগল। পৌরাণিক নাটকের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তির পর লৌকিক (Secular) নাটকের প্রয়োজন অনুভূত হতে লাগল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হতে অর্থাৎ ইংরাজ শাসনের সূত্রপাত হতেই কলকাতায় ইংরেজী থিয়েটারের প্রবর্তন হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই থিয়েটার পরিপুষ্ট হয়। এই থিয়েটার দেশীয় ধনী ও নামজাদা লোকের যথেষ্ট আনুকূল্য ও অর্থ সাহায্য লাভ করেছিল। কলকাতার মুষ্টিমেয় ইংরাজের দ্বারা ইংরেজী থিয়েটার চালানো সম্ভবপর ছিল না। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজের নেতারা সাহায্য না করলে সেসময় কলকাতায় ইংরেজী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব ছিল। "শাঁসুঁচি" থিয়েটার অগ্নিগ্রাসে পতিত হলে দ্বারকানাথ ঠাকুর থিয়েটারের সাহেব পরিচালকদের আর একটি থিয়েটারের বাড়ি সংগ্রহ করে দেন। দেশের ইংরেজী জানা লোকেরাই এই ইংরেজী থিয়েটার খুব আগ্রহের সঙ্গে দেখতে আরম্ভ করেন। বাঙ্গালী অভিনেতা বৈষ্ণবচরণ আঢ্য ইংরাজ নট-নটী দিয়ে অভিনীত ইংরেজী থিয়েটারে শেক্সপীয়রের নাটকে নায়কের অংশে অভিনয় করেন। স্কুল ও কলেজে এই সময়ে Shakespeare অভিনয় প্রচলিত হতে আরম্ভ করে। এই ইংরেজী অভিনয়ের ধারা এখনও লুপ্ত হয়নি। এইরূপে ইংরেজী থিয়েটার থেকে বাঙ্গালীর জন্য বাংলা থিয়েটার প্রতিষ্ঠার আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে।...

যাত্রার আসর অনাদৃত হয়ে থিয়েটার আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু একথা সত্য যে যত লোক থিয়েটার দেখে তার চেয়ে ঢের বেশী লোক এখনও যাত্রা দেখে যদিও যাত্রার রূপ থিয়েটার-ঘেঁষা ও অকুলীন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে Europe-এ ঝোঁক এসেছে মঞ্চ তুলে দেবার দিকে। পাটাতনের উপরে দৃশ্যপট সজ্জিত, আলোকোজ্জ্বল, দর্শকের মণ্ডলী থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; এক কল্পলোক তুলে দিয়ে দর্শককে একেবারে অভিনেতাদের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে নাটককে রূপ দেওয়ার একটা চেষ্টা এসেছে। এরই নাম Arena Theatre বা Theatre in the round কিন্তু এই জিনিস আমাদের দেশে বহু শতাব্দী থেকে প্রচলিত আছে। আমাদের দেশ দরিদ্র। বেশী টাকার টিকিট কিনবার সামর্থ্য সাধারণ দর্শকের নেই। আলোকপ্লাবিত মঞ্চের উপর নয়নাভিরাম দৃশ্যপটের সৃষ্টি করার খরচ অনেক। এর আরও একটা কুফল হচ্ছে, নাট্যের যে প্রাণ অভিনয়, তার চেয়ে দৃশ্যপটের জাঁকজমককে লোক বেশী মুগ্ধ হয়, এতে নাট্যের ক্ষতি। দৃশ্যপট, চমকপ্রদ আলোক সম্পাত, এসব একেবারে বাদ দিলেও রসসৃষ্টির কোনোরকম ব্যাঘাত হয় না। সুতরাং এই ব্যয়সাধ্য রঙ্গমঞ্চ তুলে দিয়ে যদি যাত্রার আসরকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাতে রস-পরিবেশনের কোনরূপ ব্যাঘাত তো হবেই না বরং নাট্য সম্প্রদায়গুলির পরমায়ু বাড়বে ও প্রয়োগকর্তা ও নটমণ্ডলী অনেক বৃথা পরিশ্রম থেকে নিষ্কৃতি পাবেন। চার পাঁচশত বৎসর ধরে যে যাত্রা লোকের মনে ভাবের তরঙ্গ তুলতে সক্ষম হয়েছে তাকে যদি আমরা মরে যেতে দিই তাহলে সেটা দেশবাসীর পক্ষে গৌরবের কথা হবে না।—Loss of an achievement.

অভিনয় যতই ভাল হোক, পশ্চিম দেশের মত ঝকঝকে আলোর কায়দা ও পশ্চাৎপটের নানারকম কৌশল যদি বা আমরা আয়ত্ত করি তা কিছুতেই জাতীয় নাট্য হবে না। জাতীয় নাট্যশালার নাম দিয়ে যদি কোন নাট্যশালা গড়ে তোলা হয় পশ্চিমের অনুকরণে, তা ব্যয়বহুল আড়ম্বর প্রদর্শনের স্থান ছাড়া আর কিছুই হবে না। আজ যখন পশ্চিমে চেষ্টা হচ্ছে Picture Frame stage তুলে দেবার, তখন আমরাই বা আমাদের যাত্রার আসরে নাট্যকে স্থান দেব না কেন? যাত্রাকে নূতন করে কালোপযোগী করে গড়ে তুলব না কেন?"

শেষের দিকে শিশিরকুমার নিদ্রায়-জাগরণে একটিমাত্র স্বপ্ন দেখেছেন। জাতীয় নাট্যশালার স্বপ্ন। জীবনে জাতীয় নাট্যশালা ছাড়া আর কোনোও আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই।

সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার অবসান হল একদিন। ১৯৫৯ সালের ৩০শে জুন শিশিরকুমারের মৃত্যু হল। সংসারের রঙ্গশালার একজন অবিস্মরণীয় অভিনেতা আপন ভূমিকার অভিনয় ইহজন্মের মত সাঙ্গ করে চলে গেলেন।

বাঙলা নাট্যশালার ইতিহাসকে শিশিরকুমার অকৃপণরূপে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। পূর্বসাধকদের কাছে যে-ঐশ্বর্য তিনি পেয়েছিলেন, আপন প্রতিভায় তিনি তাকে বর্ধিত করেছেন। সত্যকে তিনি সুন্দর করেছেন, সুন্দরকে তিনি সত্য করেছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন ঃ 'বাংলাদেশে যে-যুগের আমরা মানুষ তার একদিকে রবীন্দ্রনাথের অভ্রংলিহ প্রতিভাশিখর আর অন্য সীমান্তরেখায় জগদীশচন্দ্র চিত্তরঞ্জন আশুতোষ প্রফুল্লচন্দ্র সুভাষচন্দ্র শিশিরকুমার প্রভৃতি কয়েকজন অসামান্য শক্তিধর দিক্‌পাল।...বাংলা রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমারের দান ও প্রভাব অবিস্মরণীয়।...জীবন-কালেই কিংবদন্তী হয়ে ওঠার দুর্লভ গৌরব যাঁরা লাভ করেন—শিশিরকুমার তাঁদেরই একজন।'

কিন্তু অনেক কথা যে বলা হল না। অনুক্ত থেকে গেল বহু বিচিত্র ইতিবৃত্ত। যবনিকান্তরালে রইল অনেক কথা-কাহিনী, সুখ-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, বাসনা-বেদনা। যা হল তার অনেক বেশি হল না। শেষ হয়ে এসেও শেষ হল না।

কিন্তু কিছুই কি শেষ হয়।

সংসারে সব কিছুরই আরম্ভ আছে, কিন্তু কোন কিছুরই শেষ নেই। আদি আছে, অন্ত নেই। শেষ নেই, শেষ নেই, শেষ নেই। পথের শেষ কোথায়, কে জানে। কী আছে শেষে, কে বলবে। শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে।

এক আকাশে অস্ত, আরেক আকাশে উদয়। এক নিশ্বাসে মৃত্যু, আরেক নিশ্বাসে জন্ম। এক মুহূর্তে সমাপ্তি, আরেক মুহূর্তে সমারম্ভ॥

॥ সমাপ্ত ॥

এই পুস্তকের উপাদান প্রধানত নিম্নলিখিত গ্রন্থ ও সাময়িক-পত্রাবলী থেকে সংগৃহীত ঃ

The Bengali Theatre	...	Syama Prasad Mookerjee
The Indian Theatre	...	E. P. Horrwitz
The Indian Stage	...	Hemendra Nath Das Gupta
The Indian Theatre	...	R. K. Yajnik
Theatre in the East	...	Faubion Bowers
অভিনয় শিক্ষা	...	ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
অভিনেতৃ-কাহিনী	...	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত
অমরেন্দ্রনাথ	...	উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
অমৃত মদিরা	...	অমৃতলাল বসু
অর্ধেন্দুশেখর	...	উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
আত্মচরিত	...	শিবনাথ শাস্ত্রী
আমার কথা	...	বিনোদিনী দাসী
গিরিশ গ্রন্থাবলী	...	সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রকাশিত
গিরিশচন্দ্র	...	অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
গিরিশচন্দ্র	...	দেবেন্দ্রনাথ বসু
গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য	...	কুমুদবন্ধু সেন
ঘরোয়া	...	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি	...	বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
তিনকড়ি	...	উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
পুরাতন প্রসঙ্গ	...	বিপিনবিহারী গুপ্ত
বঙ্কিম-প্রসঙ্গ	...	সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলিত
বঙ্গরঙ্গমঞ্চ ও দানীবাবু	...	হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত
বঙ্গীয় নাট্যশালা	...	ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬)		ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণকাণ্ড)	...	নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তফী
বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	...	মন্মথমোহন বসু
বাংলা রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার	...	হেমেন্দ্রকুমার রায়
বিনোদিনী ও তারাসুন্দরী	...	উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ
বিশ্বকোষ ('রঙ্গালয়' অংশ)	...	নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত
মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত	...	যোগীন্দ্রনাথ বসু

যাঁদের দেখেছি	...	হেমেন্দ্রকুমার রায়
রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ	...	রমাপতি দত্ত
রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর	...	অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
রঙ্গালয়ের রঙ্গ-কথা	...	অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
রবীন্দ্র-কথা	...	খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
রবীন্দ্র-জীবনী	...	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত	...	শ্রীম
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ	...	স্বামী সারদানন্দ
সন্দর্ভ সংগ্রহ	...	মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা (খণ্ড ৫০, ৫১, ৬৭, ৬৮)	...	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(The) Amrita Bazar Patrika ; Calcutta Review ; Hindoo Patriot ; Indian Daily News.

অনুশীলন ; অনুশীলন ও পুরোহিত ; অনুসন্ধান ; আত্মশক্তি ; আনন্দবাজার পত্রিকা ; উদ্বোধন ; তত্ত্ব-মঞ্জরী ; দীপালি ; দেশ ; নববিভাকর-সাধারণী ; নবশক্তি ; নাচঘর ; নাট্যমন্দির ; পঞ্চপুষ্প ; পরিচয় ; পুরোহিত ; বঙ্গবাণী ; বিচিত্রা ; ভারত-সংস্কারক ; মধ্যস্থ ; মানসী ও মর্ম্মবাণী ; মাসিক বসুমতী ; যুগান্তর ; রঙ্গ-দর্শন ; রঙ্গালয় ; রূপ ও রঙ্গ ; রঙ্গমঞ্চ ; সঙ্কল্প ; সচিত্র শিশির ; সমাচার চন্দ্রিকা ; সাধারণী ; সাহিত্যের খবর ; সুলভ সমাচার ; হিন্দুস্থান ।

সংশোধন ও সংযোজন

পৃষ্ঠা-৪০, পংক্তি—৭ ঃ "১৮৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার খোলা হয়। কিন্তু" স্থলে "অমৃতলাল বসু বলেছেন ঃ সাণ্ডেল-বাড়ীর উঠানে আমাদের ৩।৪ রাত্রি অভিনয়ের পরেই ঠন্‌ঠনের কালীতলার নিকট ৺কৃষ্ণ সরকার মহাশয়ের বাড়ীর উঠানে ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার নাম দিয়ে ঝামাপুকুর অঞ্চলের কয়েকজন ভদ্রলোক একটি প্রকাশ্য রঙ্গালয় খোলবার চেষ্টা করেন, কিন্তু দুই বা তিন রাত্রি ব্যতীত সেখানে আর অভিনয় হয়নি ··।" পড়তে হবে।

—*০*—

JADAVPUR UNIVERSITY LIBRARY
Bingali
Jnan Sancheyan
Rs. 10
25.1.63.